# শ্রীগুরু-কথা-প্রসঙ্গ

শ্রীপাদ রামদাস বাবাজী মহারাজের

শ্রীমুখোদ্গীর্ণ উপদেশাবলী

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি।

ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥

# শ্রীগুরু-কথা-প্রসঙ্গ


পরম-ভাগবত বৈষ্ণবাচার্য্য
শ্রীপাদ রামদাস বাবাজী মহারাজের
শ্রীমুখোদ্গীর্ণ উপদেশাবলী



সন ১৩৭৫ ॥ ২৬শে আষাঢ়
শ্রীগুরু-পূর্ণিমা





প্রকাশক :
শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ ট্রাষ্ট
পাঠবাড়ী আশ্রম
বরাহনগর, কলিকাতা-৩৫

প্রাপ্তিস্থান :
বরাহনগর পাঠবাড়ী আশ্রম
নবদ্বীপ সমাজবাড়ী

ভিক্ষা—তিন টাকা

মুদ্রাকর :
শ্রীব্যোমকেশ বসাক
বসাক ট্রেডিং কোং
৩০, রাজকুমার মুখার্জী রোড
কলিকাতা-৩৫

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

# প্রকাশকের নিবেদন

বৈষ্ণবাচার্য্য ১০৮ শ্রীশ্রীপাদ রামদাস বাবাজী মহারাজের পরিচয় জগতে সুবিদিত। শাক্ত, [illegible], গাণপত্য বৈষ্ণব যে কোন সম্প্রদায়ের লোক তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিয়াছেন বিশেষতঃ বৈষ্ণব [illegible]দায়ের তো কথাই নাই। তিনিও সকল সম্প্রদায়ের সাধুকে সমাদর করিয়াছেন। বিদ্বেষ ঘৃণা [illegible]ার স্বরূপে ছিল না। শ্রীপাদ বাবাজী মহারাজের দৈন্যাত্মিকা শ্রীমূর্ত্তিটী ভাগবতী ভক্তির পরম সুখাসন [illegible]াছিল। ভাগবতী ভক্তির মধ্যে তরতমভাবে যেমন গোপীভাবে শ্রীগোবিন্দের ভজন পরমতম [illegible] বিরাজমান আবার সেই শ্রীরাধাপ্রেমের নির্য্যাস-মূরতি শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দর ও শ্রীশ্রীনিতাই [illegible]রের ভজন আরও গূঢ়তম। শ্রীপাদ বাবাজী মহারাজ সেই শ্রীরাধা প্রেমে বিভাবিত শ্রীগৌর[illegible]র ও শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রেম-মূর্ত্তিমান শ্রীনিতাই-সুন্দরের ভজনে রসাস্বাদনে সকল জীবের পরম গূঢ় ভজনপদ্ধতি দান করিয়াছেন। যে গোপীপ্রেম সর্ব্বোপরি সাধ্যরূপে বিরাজমান তাহাও [illegible]নিত্যানন্দ-পাদপদ্ম-ভজনাধীন। ঠাকুর নরোত্তম বলিয়াছেন—**"হেন নিতাই বিনে ভাই [illegible]াকৃষ্ণ পাইতে নাই"**। কলিজীবের একমাত্র ভজনীয় শ্রীশ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গ-পাদপদ্ম। [illegible]ৗরাঙ্গ-ভজনে শ্রীরাধা-প্রেম হৃদয়ে আপনিই উছলিত হইবে। শ্রীপাদ সরস্বতী বলিয়াছেন—

**যথা যথা গৌর-পদার-বিন্দে, বিন্দেত ভক্তিং কৃতপুণ্যরাশিঃ।**
**তথা তথোৎসর্পতি হৃদ্যকস্মাদ্ রাধা-পদাম্ভোজ-সুধাম্বুরাশিঃ।**

অর্থাৎ কৃতপুণ্যরাশিজণ, যেমন যেমন শ্রীগৌরাঙ্গ-পাদপদ্মে ভক্তি লাভ করিবে, তেমনি তেমনি [illegible]রিমানে আপনা হইতেই শ্রীরাধা-পাদপদ্ম-সুধা-সাগর তাহার হৃদয়ে উছলিত হইয়া উঠিবে।

শ্রীপাদ বাবাজী মহারাজ সমস্ত জীবনে এই নিগূঢ় এবং শাস্ত্রসিদ্ধান্তপূত ভজনপদ্ধতি নিজ আচরনে জগদ্বাসীকে শিখাইয়াছেন।

তাঁহার শ্রীমূর্ত্তির সান্নিধ্যে যাঁহারা আসিয়াছেন তাঁহারাই জানেন সে শ্রীমূর্ত্তি কেমন? শ্রীপাদকে দেখিলে মনে হয় যেন সকল অঙ্গই ভাগবতী ভক্তিশোভিত। সকল আচরণই ভক্তিপূত। সকল উপদেশবাক্যই প্রেমমাখা।

সমস্ত জগতে এক বিরাট ঐতিহ্যের সৃষ্টি করিয়াছে—তাঁহার কীর্ত্তন। শ্রীপাদ বাবাজী মহারাজের কীর্ত্তন যাহাদের শ্রবণ-সুযোগ ঘটিয়াছে তাঁহারাই জানেন যে, সে কীর্ত্তন কি বস্তু। [illegible]ীর্ত্তন নয় যেন প্রেমের বন্যা। অষ্ট সাত্ত্বিক বিকারে ভূষিত শ্রীপাদের তনুখানি কীর্ত্তনকালে দেখিলে মনে হয় যে অশ্রু, কম্প, স্বেদ, বৈবর্ণ্য, হাস্য প্রভৃতি সাত্ত্বিক বিকারাবলী একসঙ্গে উদিত হইয়া তাহার দেহকে বিদলিত করিতেছে। সে কীর্ত্তন যাঁহার কর্ণে প্রবিষ্ট হইয়াছে, কীর্ত্তনকালে তাঁর তনুখানি যাঁহার নয়নগোচর হইয়াছে তিনি জানেন শ্রীপাদ বাবাজী মহারাজের মহিমা। হয়তো লিখিয়া জানাইতে বসিয়া আমরা তাঁহার মহিমা ক্ষুণ্ণই করিলাম। সেই সাত্ত্বিকবিকারাবলীমণ্ডিত তনুখানি এবং শ্রীশ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গ-প্রেমের বিলাসময় কীর্ত্তনের অক্ষরগুলির মহিমা ভাষায় বর্ণন করা যায় না। আমাদের এই "বামন হইয়া চাঁদ ধরিবার অক্ষমতার জন্য তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে এবং তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ভ[illegible] অনুরাগী জনের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

শ্রীপাদের কীর্ত্তন যেমন এক নূতন সৃষ্টি, তেমনি তাঁর শ্রীমুখের উপদেশাবলী ও এক নূতন সৃষ্টি। যাহারা ভজন করেন তাহাদের অনেক বিঘ্ন। শ্রীপাদ সরস্বতী বলেছেন—'শ্রীভক্তিমার্গ ইহ কণ্টক-কোটিরুদ্ধঃ। সুতরাং ভজনের সঙ্গে ভক্তিসিদ্ধ মহাপুরুষগণের উপদেশ বড় হিতকারী। কোথায় আমার ভজনে ত্রুটী তাহা ধরা যায়, ভজনে দৃঢ়তা আনে, অনুরাগ বৃদ্ধি করে; প্রাকৃত-বাসনা সরিয়ে দেয়। অভিমান নষ্ট করে। ভজনানুকুল সামগ্রী উদয় করায়।

তাঁহার দীর্ঘ ৭৭ বৎসরব্যাপী প্রকটকাল যেন এক প্রেমবন্যায় প্রবাহিত। শ্রীশ্রীনিতাইগৌরাঙ্গ সুন্দরের প্রেমবন্যা কিছুকাল ধরিয়া যেন মন্দবেগে প্রবাহিত হইতে ছিলেন, শ্রীপাদ বাবাজী মহারাজ কীর্ত্তনের মধ্যে হা নিতাই! হা গৌর বলিয়া অবিরল নয়নধারায় সেই প্রেমবন্যার বেগকে প্রবল করিয়া তুলিলেন। ইহা প্রত্যক্ষদর্শী সকল মহানুভবগণেরই অনুভব আছে। তাঁর নয়নজল যেন বহু মানুষের হৃদয়স্থ নিতাই-গৌরাঙ্গ-ভজন-বীজ অঙ্কুরিত করিল। তাঁহার কীর্ত্তন-রুচি অনেকের ভজনরুচি জন্মাইল। তাঁহার নয়নজল কত ত্রিতাপদগ্ধ জীবের ত্রিতাপ অনল নির্ব্বাপিত করিল তাহার ইয়ত্তা নাই।

শ্রীপাদ বাবাজী মহারাজেরই প্রবর্ত্তিত শ্রীশ্রীনিতাইসুন্দর মাসিক পত্রিকায় তাঁহার শ্রীমুখের উপদেশবাণী কিছু কিছু প্রকাশ পাইতেছিলেন। তাহাতে আমাদের শ্রীগুরু ভাই ভগ্নীদের তথা অন্যান্য ভক্তমহোদয়গণের তৃপ্তি হইতেছিল না। তাই আমরা তাঁহাদের আস্বাদনের কিঞ্চিৎ আনুকুল্য করিবার ইচ্ছায় শ্রীপাদের সেই কলিকুলুষহারী, ভজনরুচিজনক, প্রেমবৃদ্ধিকারী শ্রীমুখের উপদেশাবলী একত্র সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থাকারে "**শ্রীগুরু-কথা-প্রসঙ্গ**" নামে প্রকাশ করিলাম। যথাসম্ভব উপদেশের স্থান, কাল নির্ণয়ের চেষ্টা করা হইয়াছে। এইরূপে প্রকাশিত হওয়ায় যদি আমাদের শ্রীগুরুভাই ভগ্নীদের এবং সাধু সজ্জন ভক্তজনের কিঞ্চিৎ তৃপ্তি সাধন করে তাহা হইলে আমরা কৃতার্থ।

পূর্ব্বে শ্রীপাদের কীর্ত্তনাবলী এক খণ্ডে 'শ্রীগুরু কৃপার দান' নামে প্রকাশিত হইয়াছেন। ২য় খণ্ড শীঘ্রই প্রকাশিত হইবেন, যাহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে শ্রীপাদের মুখোদ্গীর্ণ শ্রীশ্রীগোস্বামীপাদ-গণের সূচক।

আমাদের পরম দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা আর শ্রীপাদকে প্রকটলীলায় পাইতেছি না। অথচ সে স্মৃতি ভুলিলে আমাদের অপমৃত্যু হইবে। তাই কীর্ত্তনরূপে এবং উপদেশাবলীরূপে তাঁহার বিরাজমানতা আকাঙ্ক্ষা করিয়া এই প্রচেষ্টা করিতেছি। সকল সাধু বৈষ্ণব সজ্জনগণের কৃপা প্রার্থনা করি যেন আমরা কীর্ত্তন স্বরূপে ও উপদেশাবলীরূপে শ্রীপাদ বাবাজী মহারাজের প্রাকট্য উপলব্ধি করিতে পারি।

ইত্যলং—

**শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ ট্রাষ্ট**

বরাহনগর

শ্রীপাঠবাড়ী আশ্রম।

কলিঃ ৩৫

# ঃ সূচীপত্র ঃ


পত্রাঙ্ক

**১৩৫৪ সাল, পৌষ মাস**

শুক্লপক্ষ আসবেই। ... ২

দ্বিতীয়তে অভিনিবেশ হ'লে ভয় থাকে। ... ২

কথা আছে স্বতন্ত্র প্রকাশ কর না। ... ২

আমি করি এ বড় জালা ... ৩

ওগো সবই আছে সবই থাকবে হরিনাম; মূর্ত্তি,
প্রসাদ। কিন্তু অবিশ্বাসেই সব ফাঁক। ... ৩

তন্ত্র মন্ত্র সবই ওই বুড়ো বুড়ীর কাছে থেকে ... ৩

**১৩৫৪ সাল, ৭ই মাঘ**

আমি পুতুল নাচের ব্যবস্থা করেছি কি না; ... ৪

সর্ব্বত্র করুণা অনুভূতি ... ৫

ভবরোগের চিকিৎসা ... ৫

**১৩৫৪ সাল, ৮ই মাঘ**

গৃহীর পক্ষে গুরু করণ। ... ৬

আচার ও প্রচার ... ৭

প্রচার নয় ভোগ করা ... ৭

**১৩৫৪ সাল, ৯ই মাঘ**

অপরাধ এড়ানোর উপায় ... ৯

নামের করুণা ... ১০

নেতাজীর জন্মোৎসবে ... ১১

নামের নিত্য প্রভাব ... ১২

**১৩৫৪ সাল, ১০ই মাঘ**

শ্রীভগবৎ স্বরূপের বহুত্বে গ্রহণ ও বর্জ্জন ... ১৩

শ্রদ্ধা ও অধিকার ... ১৪

নাম রহস্য ভোগ ও অজ্ঞাত বৈভব দান ... ১৫

ত্রিকাউ সত্য লীলা ... ১৬

সেবা ও সেবক ... ১৭

**১৩৫৪ সাল, ১৩ই মাঘ**

বেলা গেল তোলরে পসার ... ১৮

| | | পত্রাঙ্ক |
|---|---|---|
| সাবধান বাণী | ... | ১৯ |
| ভক্তি | ... | ২০ |
| অবতার ও মহৎ কৃপা | ... | ২০ |
| **১৩৫৪, সাল ১৬ই মাঘ** | | |
| সাধকের ভোগ সবার উপরে | ... | ২১ |
| সাধনের ক্রম ও মহৎ কৃপা | ... | ২২ |
| ভক্তিপথে প্রাথমিক পাঠ্য নির্ব্বাচন | ... | ২২ |
| স্বাধীনতা | ... | ২৩ |
| এবার ভবে পথ ভুলে এসেছি | ... | ২৩ |
| চিত্রপট দর্শন | ... | ২৪ |
| আজব ছুনিয়া একি দেখি আজব কারখানা | ... | ২৪ |
| শ্রীগুরু তত্ত্ব | ... | ২৪ |
| প্রণতির রীতি | ... | ২৫ |
| বৈষ্ণব শরীরে হয় কৃষ্ণের বিলাস | ... | ২৫ |
| **১৩৫৪ সাল, ২০শে মাঘ** | | |
| সাপের ছোবল | ... | ২৬ |
| শান্ত রসই সকল রসের ভিত্তি | ... | ২৬ |
| বস্তু নির্দ্দেশ | ... | ২৭ |
| শ্রীনিতাই গৌর তত্ত্ব | ... | ২৮ |
| অপরাধের ভয় | ... | ২৯ |
| ব্রজবাসীর প্রীতি | ... | ৩০ |
| প্রীতির রীতি | ... | ৩০ |
| প্রতিকূলে কৃপার ভোগ | ... | ৩১ |
| বিপরীত পুত্র | ... | ৩১ |
| **১৩৫৪ সাল, ২২শে মাঘ** | | |
| হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র | ... | ৩৩ |
| সিদ্ধ প্রণালী | ... | ৩৩ |
| প্রচ্ছন্ন অবতার | ... | ৩৪ |
| দাতা শ্রীরামানুজ | ... | ৩৪ |
| ইষ্ট গোষ্ঠী | ... | ৩৫ |

পত্রাঙ্ক


পরীক্ষার রীতি ... ৩৫
দন্ত ভঙ্গ ... ৩৬
দৈন্যের স্বভাব ... ৩৬
শ্রীগৌর লীলার স্বাতন্ত্র্য ... ৩৬
নিষ্কাম সাধুর উৎসব কৃত্য ... ৩৭

১৩৫৪ সাল, ২৫শে মাঘ

জীবের কর্ত্তৃত্ব কোথায় ... ৩৭
কৃপার অনুভূতি চাই ... ৩৭
ফল লাভে ধৈর্য্য চাই ... ৩৮
পতিতপাবনের দৃষ্টি ... ৩৯
ভাষাতত্ত্ব ... ৩৯
গোরানাম অঙ্কনের মাধুরী ভোগ ... ৪০
সাধন স্মরণ লীলা ... ৪০
মানুষ হ ... ৪১
ধান ভানা ... ৪১
কৃষ্ণদাসের স্বভাব জাগে কখন ... ৪২
শ্রীজগন্নাথে মাতৃ ভাব ... ৪২
সেব্য সেবক ... ৪৩

১৩৫৪ সাল, ১৮ই চৈত্র

সাধন স্মরণ ... ৪৩
কোহয়ং চৈতন্য ... ৪৪
শাস্ত্র ব্যাখ্যা ... ৪৫
সংসারী লোকের ভজন সাধন ... ৪৫
ভবরোগের চিকিৎসা ... ৪৬
ত্যাগীর আশ্রমের রীতি ... ৪৭
কুলোচিত আদর্শ চিন্তা ... ৪৭

১৩৫৪ সাল, ২২শে চৈত্র

প্রদর্শণী দেখা ... ৪৯

১৩৫৪ সাল, ২৩শে চৈত্র

ত্যাগীর মহোৎসব রীতি ... ৫১

পত্রাঙ্ক

ব্রজ দর্শন ... ৫২
নাম ও মনের বাসনা বেগ ... ৫২
নিরপেক্ষভাবে কীর্ত্তন ... ৫৩
পতিতের প্রতি করুণা গৌরব ... ৫৩
রাগের উপাসনা ... ৫৪

১৩৫৪ সাল, ২৮শে চৈত্র
একই কর্ম্মের দুই ফল ... ৫৫
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি ... ৫৫
স্বার্থ বুদ্ধিতে ঈশ্বরের প্রতি দোষারোপ ... ৫৫
ভাগবত পড় গিয়া বৈষ্ণবের স্থানে ... ৫৭

১৩৫৫ সাল, ১২ই বৈশাখ
প্রসাদ দর্শন ... ৬৩
ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম ... ৬৪
পথের কাঁটা ... ৬৫
বাউল বৈষ্ণব ... ৬৫
আশয় অনুযায়ী ফললাভ ... ৬৬
বৈষ্ণবের স্বভাব ... ৬৬
শ্রীগুরুরূপের বহুত্ব এবং একত্ব ... ৬৬
শ্রীগুরু-কৃপাহীনের দুর্দ্দশা ... ৬৭
অধিকার ও কৃত্য ... ৬৮

১৩৫৫ সাল, ১৪ই বৈশাখ
প্রিয়তমে অভিমান ... ৭০
পথের বাধা ... ৭১
ভক্তি পথে অনন্যা গতি ... ৭১
ন গুরোরধিকম ... ৭২
বৈষ্ণবের দৈন্য দৃষ্টি ... ৭২
মাতাপিতার সেবা বিমুখের ভজন প্রত্যবায় ... ৭৩
যেখানে মন বাঁধা আছে ... ৭৩
শ্রীগুরু কল্পতরু ... ৭৪

পত্রাঙ্ক

শ্রীগুরুর পরীক্ষা ... ৭৫
শ্রীজগদ্বন্ধু ও শ্রীবড় বাবাজী মহাশয়ের স্মৃতি ... ৭৫
আবরণী শক্তি ও বস্তুর প্রকাশ ... ৭৬
আহ্বান ও অবস্থা ... ৭৬
পাঠকের মনোবৃত্তির প্রভাব ... ৭৭
পথের শত্রু ... ৭৭
জীবের শুভলগ্ন ... ৭৮
অপ্রাকৃত বিকাশে অনুভূতি ... ৭৮
শ্রীনাম প্রসঙ্গে পূর্ব্বস্মৃতি ... ৭৯

৩৫৫ সাল, ১৬ই বৈশাখ

দাস করে দেহ মোর প্রেমধন ... ৮১
ততোহনু কম্পাং সুসমীক্ষ্যমানঃ ... ৮১
পীড়াকে হেতু করিয়া কৃপাদান ও
জীবের অহংজ্ঞানের উপযুক্ত দণ্ড ... ৮৩
ব্রজ গোপীর ভোগ লালসা ... ৮৩
গ্রহনেই তো ভাবকান্তি গ্রহণ .. ৮৪
মুক্তা গর্ত্ত ... ৮৭
আবেশের গতি ... ৮৭

৩৫৫ সাল, ১৮ই বৈশাখ

সর্ব্বেশ্বর প্রসন্ন হইলে সকলেই প্রসন্ন হন ... ৮৯
বৈরাগীর জীবিকা ... ৯০
আনুগত্যই ভজন পথের রীতি ... ৯০
বেলা বাড়ে না গো বেলা কমে ... ৯১

৩৫৬ সাল, ৩রা জ্যৈষ্ঠ

অন্তর্যামী ... ৯২
দান ও গ্রহণ ... ৯২
ছলে প্রয়োজন উন্মেষ ... ৯৩
কাহাকেও তাপ দিও না ... ৯৩

পত্রাঙ্ক

| | | |
|---|---|---|
| রথযাত্রার ক্রম প্রসঙ্গ | ... | ৯৩ |
| অভিনয় নয় | ... | ৯৪ |
| আ-রতি কীর্ত্তন | ... | ৯৪ |
| অখণ্ড নাম যজ্ঞের প্রবর্ত্তন | ... | ৯৫ |
| **১৩৫৬ সাল, ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ** | | |
| নিষ্ঠার চরম পরিণতি | ... | ৯৬ |
| বিগ্রহ সেবা ও সহজ রীতি | ... | ৯৭ |
| লীলায় আবরণ ও বিকাশ | ... | ৯৭ |
| লঙ্কার গাড়ীর ও ঝাঁঝ | ... | ৯৭ |
| ধান, চাল, ভাত | ... | ৯৮ |
| নামে ভোগ করান | ... | ৯৯ |
| সব পাওয়ার সেরা | ... | ৯৯ |
| **১৩৫৬ সাল, ৫ই জ্যৈষ্ঠ** | | |
| নাম গ্রহণ ও নিয়ম | ... | ১০০ |
| নাম ও ভক্তির পরামর্শ সভা | ... | ১০০ |
| খাইতে শুইতে নাম | ... | ১০১ |
| ত্যাগীর ক্রটী লোক নিন্দা | ... | ১০১ |
| অনুশীলনের স্থান আশ্রম | ... | ১০১ |
| নকল ও মঙ্গল | ... | ১০১ |
| সাধন বেড়া | ... | ১০২ |
| বন্ধু প্রসঙ্গে শাসন স্মৃতি | ... | ১০২ |
| সাধারণের কল্যাণ ও গোপন এবং ক্লেশ স্বীকার | ... | ১০২ |
| মকলের সহজ ও কঠিন দিক | ... | ১০৩ |
| রাসলীলা শোনা | ... | ১০৩ |
| **১৩৫৬ সাল, ১০ই জ্যৈষ্ঠ** | | |
| আঁখির স্ফূর্ত্তি | ... | ১০৪ |
| এবারের বিপরীত খেলা | ... | ১০৪ |
| সূচক কীর্ত্তনে শক্তি লাভ | ... | ১০৫ |

পত্রাঙ্ক


বৈষ্ণবের আগমনে ... ১০৫
শ্রীধাম কলিকাতা ... ১০৫
সংসারের ওজন ... ১০৫
কলিরাজের সুযোগ ... ১০৬
উল্টো চাপ ... ১০৬
কার্য্য কারণ ... ১০৭
দায়ে পড়েছেন ... ১০৭

১৩৫৬ সাল, ১১ই জৈষ্ঠ

এবার রাসস্থলী পথে, ঘাটে, মাঠে ... ১০৮
তিনটী অবস্থা ... ১০৮
নিরপেক্ষের মালা নির্ম্মাণ ... ১০৯
ভূমি, ধাম, ও স্ফুর্ত্তি ... ১০৯
ব্রজে যাওয়া ও কথা না কওয়া ... ১১০
সাইন বোর্ডের কাজ দেখা ... ১১০
বিধি নিষেধের বেড়া ডিঙ্গিয়ে কে যায় ... ১১০
নিতাইচাঁদের নূতন রঙ্গ ... ১১১
বটতলায় হারানো পাওয়া ... ১১১
গৌর ভোগী ... ১১১
গৌর নাম আর ভুলব না মা ... ১১২

১৩৫৬ সাল, ১২ই জৈষ্ঠ

রসের আলাপ ও অধিকার ... ১১৩
কেউ করে আর ধরা পড়ে অন্য ... ১১৪
ঠাকুর দেখিয়ে লোক ঠকান ... ১১৪
সরস্বতীর প্রকাশ ... ১১৫
স্বভাবের ইতিকথা ... ১১৫
নিত্য কিশোরের সবই নূতন ... ১১৬
বিদ্যার দৌড় ... ১১৬
বিচার সভা ... ১১৭
আচরণ করার অবস্থা ... ১১৮

পত্রাঙ্ক

১৩৫৬ সাল, ১৩ই জ্যৈষ্ঠ
আশ্রয় তত্ত্বের অনুসন্ধান ... ১১৯
তবে কি সন্তান বাঁচে ... ১১৯
সম্বন্ধের বাঁধন ... ১১৯
আরশোলা ও কাঁচপোকা ... ১২০
ঘোড় সওয়ার ... ১২০
সদাচার ... ১২১
অদোষদর্শী ... ১২২

১৩৫৬ সাল, ১৩ই জ্যৈষ্ঠ
সাধু দর্শন ... ১২২
ভাল গৃহস্থ ... ১২৩
বৈষ্ণবী মায়া ... ১২৩
কিশোরী কুণ্ডের বাবাজী ... ১২৩
ব্রজে সঞ্চয় ... ১২৪
গোস্বামীগণের ঐশ্বর্য্য ... ১২৪
পূর্ব্বের সৌভাগ্য রবি পশ্চিম আকাশে ... ১২৫
মু কাহে গঙ্গা স্নানে জীবি ... ১২৫

১৩৫৬ সাল, ১৪ই জ্যৈষ্ঠ
বনিক কুলের নাথ ... ১২৬
ঐ তো গোড়া ... ১২৭
এবার এদের আসা কেন ... ১২৭
যে মাটীতে পড়ে লোক ... ১২৮
আরও বিষম ল্যাঠা ... ১২৮
সাপ পেছনে পেছনে ঘুরছে ... ১২৯

১৩৫৬ সাল, ১৮ই জ্যৈষ্ঠ
সংযম শিক্ষা হবে ... ১৩১
স্বভাবের দোষে কৃপা ভোগ হচ্ছে না ... ১৩১
আমির চেষ্টা গেলেই খাস দখলে ... ১৩২
মাঝির কাজ মাঝি করবে ... ১৩২

পত্রাঙ্ক

১৩৫৬ সাল, ১৯শে জ্যৈষ্ঠ

কৃপা সিদ্ধের সাধন ... ১৩৪
দুটীর তফাৎ ঢের ... ১৩৪
সম্পত্তি যেন নষ্ট না হয় ... ১৩৪
শরণাগতি ... ১৩৫

১৩৫৬ সাল, ২০শে জ্যৈষ্ঠ

এ দান কার ... ১৩৭
লঙ্কার গাড়ী চলে গেল ... ১৩৭
যখন যেমন তখন তেমন ... ১৩৮
কৃপা পড়লে অনুশীলনী আসে ... ১৩৯
বলবান প্রভু ... ১৩৯

১৩৫৬ সাল, ২১শে জ্যৈষ্ঠ

আমি তো জানি তুমি তো জান না ... ১৪০
ইচ্ছা মত হয় না ... ১৪১
কাতর হয়ে প্রার্থনা ... ১৪১
ওর ভেতরই তাঁর কৃপার কথা ... ১৪১
বৃক্ষমূলে জল ... ১৪২
অমনি ছুট ... ১৪২
আমি ঢুকলেই ছোবল ... ১৪২
শান্তি ... ১৪৩

১৩৫৬ সাল, ২২শে জ্যৈষ্ঠ

সঙ্কেত সংগীত ... ১৪৪
দীক্ষাদান প্রসঙ্গ ... ১৪৪
কি হোলো ... ১৪৪
বকলমা ... ১৪৫
বড় সহজ নয় ... ১৪৬
ছড়াকাটা ... ১৪৭

পত্রাঙ্ক

১৩৫৬ সাল, ২২শে জ্যৈষ্ঠ


ভাব ও ভাষা ... ১৪৮
নতুন প্যাঁচ ... ১৪৮
চোরের দায়ে ধরা পড়া ... ১৪৯
শুধরে যাবে ( যাবে ) ... ১৪৯
শাসন করবে কে আর ... ১৪৯
মেনে নেবে ... ১৪৯
কে তোরা এর ... ১৪৯
এখন তো ফাঁক থাকছে ... ১৫০
সম্বন্ধের দিকে তাকিয়ে করিয ... ১৫০


১৩৫৬ সাল, ২৩শে জ্যৈষ্ঠ


শ্রীগুরুপদাশ্রয় ও প্রারব্ধ ... ১৫১
গুরু দক্ষিণা ... ১৫২
অনুরোধ উপরোধ ... ১৫৩
অনেক দূরের কথা ... ১৫৩
সাধু সঙ্গ ... ১৫৩
অভিমান না গেলে হয় না ... ১৫৩
প্রসাদ পাওয়া ... ১৫৪
কে সামলাবে ... ১৫৪


১৩৫৬ সাল, ১২ই অগ্রহায়ণ


জগজীবের কল্যাণ সাধনই শ্রীনিতাই চাঁদের লক্ষ্য ... ১৫৬


১৩৫৬ সাল, ১৬ই অগ্রহায়ণ


অর্দ্ধ কুক্কুটী ন্যায় ... ১৫৭
শ্রীধন্বন্তরী শ্রীভগবানের অবতার ... ১৫৭
খোদার উপর খোদগিরি ... ১৫৮
দেখ রোগ সাধারণতঃ দুই কারণে হয় ... ১৫৮
কলিযুগে কর্ম্মকাণ্ড ঠিক মত করা বড় সোজা নয় ... ১৫৯
ঔষধের ব্যবস্থা তো শ্রীভগবানের ... ১৫৯

পত্রাঙ্ক

বৈষ্ণবের ক্রিয়ামুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয় ... ১৬০
অপ্রাকৃত ভক্ত দেহেও দেহধর্ম্ম বশতঃ রোগাদি আসে ... ১৬০
পারলে খুব ভাল এবং একটু পরীক্ষার ফল নিশ্চয়ই পাবে... ১৬১
দেখ রোগ হ'ল মাষ্টার ... ১৬২

১৩৫৬ সাল, পৌষ মাস

একাদশী কর ... ১৬৩
ইহা নৃলোকে না হয় ... ১৬৪
নাম সঙ্কীর্ত্তন কলিযুগে পবম উপায় ... ১৬৫
মহামন্ত্র শ্রীচৈতন্য মুখোদগীর্ণ ... ১৬৭
শ্রীশিক্ষাষ্টক পড়ে নাম কি দিতে পারে দেখ ... ১৬৭

১৩৫৬ সাল চৈত্র মাস

ভগবান অপেক্ষা তাঁর ভক্তই বড় ... ১৬৯
এ যুগে ভজন বড় শস্তা নাম কর ... ১৭০
নামাশ্রয় কিভাবে করিতে হয় ... ১৭১
ধামের জীব তোমার আমার চেয়ে ঢের বড় ... ১৭২
সবই তো নিতাইর সত্বা ... ১৭৪
ক্ষণের পূজা ... ১৭৪
গৌর ভক্ত কভু নাহি যায় বৃন্দাবন ... ১৭৪
হরদম গুরুজীর নাম লইও ... ১৭৬
গোড়ায় গলদ থাকলেই ভাব রাজ্যের ভাষা বোঝা যায় না ... ১৭৭
ক্ষান্তিরব্যর্থ কালত্বং ... ১৭৮
ক্ষমা তার ভিৎ ... ১৭৮
এবা হোলো ব্রহ্মচর্য্য বৈরাগীর তাই হলো আসন ... ১৭৯
নামে মড়া বাঁচে ... ১৭৯
কাজ আগে করতে হয় তবে বুঝতে হয় ... ১৮০
সেবা মানে সুখ দেওয়া ... ১৮১
অব্যর্থ-কাল ... ১৮১
বৈরাগ্য ... ১৮২
তৃনাদপি স্বভাবে ব্রজবাস ... ১৮৩

পত্রাঙ্ক

১৩৫৬ সাল, ২৫শে চৈত্র

শ্রীগুরু কল্পতরু ... ১৮৫
আনন্দ হয় কিরূপে ... ১৮৬
স্মরণ ... ১৮৭
স্থাবর জঙ্গম দেখে, না দেখে তার মূর্তি ... ১৮৭

১৩৫৭ সাল, শ্রাবণ

মহাপ্রসাদে বিশ্বাস ... ১৮৯
মহদনুভূতি শাস্ত্র অপেক্ষা কম ওজনের নয় ... ১৯০
প্রীতিই সৌন্দর্য্য ... ১৯১
শ্রবণ হ'ল ভক্তির প্রথম অঙ্গ ... ১৯২

১৩৫৭ সাল, ৩০শে আশ্বিন

শ্রীশ্রীহরিদাস ঠাকুরের নির্য্যাণ কীর্ত্তন স্মরণে ... ১৯৩
পরোক্ষে প্রকৃতিশ্চৈব প্রত্যক্ষে পুরুষস্তথা ... ১৯৫
জীবের স্বরূপ ... ১৯৬
"করেছি ও করেছেন" ... ১৯৬
করুণায় কে বাঁধা ? ... ১৯৭

১৩৫৭ সাল, ১৪ই কার্ত্তিক

ক্ষমা ভিক্ষা চাওয়া ... ২০০
অবিচারে মহাপ্রসাদ গ্রহণ ... ২০০

১৩৫৭ সাল, ৬ই অগ্রহায়ণ

আজকাল সবাই বৈষ্ণব সাজতে চায় ... ২০১
পাগলের কথা পাগলেই বুঝবে ... ২০২

১৩৫৭ সাল, ২৪শে অগ্রহায়ণ

অক্ষরময়ী কৃপা ... ২০৩
প্রভুপাদের প্রতি বৈষ্ণব কৃপা ... ২০৩
পদ পদার্থ বিধি ... ২০৩
শব্দ ব্রহ্মের প্রকট স্বরূপ ... ২০৪

পত্রাঙ্ক


৩৫৭ সাল ৩০শে অগ্রহায়ণ

গুরুর কক্ষায় বসিবার অধিকার আমার নাই ... ২০৬

৩৫৭ সাল, ২রা মাঘ

ব্রহ্মমুহূর্ত্ত ও প্রকৃতির সাম্য ... ২০৭

সিদ্ধ ভগবানদাস বাবাজী আদি বৈষ্ণব ... ২০৭

অমানীর প্রকট রূপ ... ২০৮

কুকুরের দৃষ্টান্তে সেবকের প্রভুনিষ্ঠা ... ২০৮

১৩৫৮ সাল, জ্যৈষ্ঠ

আমির অবসান ও কৃপা ... ২০৯

ভগবদ্বিস্মৃতির জন্মক্ষেত্র ... ২১০

সংসারী ও ত্যাগী ... ২১০

জীবনের অন্তিম কোথায় ... ২১০

সৎসঙ্গের বিশ্লেষণ ... ২১১

জাত বাঁচানর ফাঁকি ... ২১১

১৩৫৮ সাল, ২৩শে অগ্রহায়ণ

ভুলেছ বলেই গোল ... ২১২

অতি গূঢ় নিত্যানন্দ এই অবতারে ... ২১২

১৩৫৮ সাল, ১৫ই ফাল্গুন

মন তো পথে পড়ে থাকলো ... ২১৪

দুচাকা না হলে রথ চলে ... ২১৫

১৩৫৮ সাল ২৯শে চৈত্র

যে যেখান থেকেই কথা বলুক সকলের এক সুর ... ২১৭

সকলকে যে দিয়ে খায় সেই মানুষ ... ২১৭

আত্মসমর্পণের লক্ষণ ... ২১৮

শ্রীগুরুস্বরূপেই নিতাই দাতা ... ২২০

১৩৫৮ সাল, চৈত্র

শ্রীভগবান ও ভক্তাধীন ভক্তও শ্রীভগবানাধীন ... ২২২

পত্রাঙ্ক

শ্রীহরিদাস ঠাকুরের সেবা ... ২২৪
শ্রীশ্রীহরিদাস ঠাকুরের সমাধি মঠ রক্ষা ... ২২৬
শ্রীশ্রীহরিদাস ঠাকুরের নির্যান প্রসঙ্গ ... ২৩৫
শ্রীশ্রীহরিদাস ঠাকুরের প্রসঙ্গ ... ২৩৬
স্মরণ না থাকলে ভোগ হয় না ... ২৪৮

১৩৫৯ সাল, ২৩শে পৌষ
"প্রতিষ্ঠার ভয়ে পুরী যায় পলাইয়া" ... ২৪৯
পতিত পাবন নাম শুনেছ ... ২৫০
কোথা নিতাই পতিত খোঁজা ... ২৫০
"নিন্দুক বেচারী মিত হামারী" ... ২৫১
"ছিঃ চাঁদে কলঙ্ক" ... ২৫১

১৩৫৯ সাল, ৬ই মাঘ
পথে তিনজনের সঙ্গে দেখা হবে ... ২৫২
কৃপাসিদ্ধ থেকে জীবে দয়া আসে ... ২৫৩

১৩৫৯ সাল, ৯ই মাঘ
"দৈব দৌড়ী মাহুষ গাই" ... ২৫৪
প্রভু দয়া হবে কবে ... ২৫৫
গৌরমন্ত্র নাই বলে বৃন্দাবন ত্যাগ ... ২৫৫
মনের স্মরণই হচ্ছে প্রাণ ... ২৫৬

১৩৫৯ সাল ২৪শে মাঘ
"নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেম প্রদায়তে" ... ২৫৭

১৩৫৯ সাল চৈত্রমাস
প্রীতি রাজ্যের এই তো রীতি ... ২৬১

১৩৬০ সাল, ২৯শে বৈশাখ
দেওয়ার সময় আলাদা ... ২৬৩
আচার্য্য বুঝি গায়ে লেখা থাকে ... ২৬৪

পত্রাঙ্ক

১৩৬০ সাল, ১৫ই জ্যৈষ্ঠ
বটতলার ছাপা গ্রন্থ ... ২৬৬

১৩৬০ সাল, ২১শে জ্যৈষ্ঠ
গৌর ভগবান কি না ... ২৬৬

১৩৬০ সাল, ২৬শে জ্যৈষ্ঠ
সাধন ভজন কি ... ২৬৭

১৩৬০ সাল, ৩১শে জ্যৈষ্ঠ
বৈষ্ণব সাজিও না ... ২৬৭

১৩৬০ সাল, ২রা আষাঢ়
মহাপ্রভুর লীলা এখনও চলছে ... ২৬৮

১৩৬০ সাল, ১৪ই আষাঢ়
ঠাকুর লীলাময় ... ২৭০
একপাশ করে থুয়ে গেছে ... ২৭০

১৩৬০ সাল, ১৭ই আশ্বিন
নাম কি আর মানুষ করে ... ২৭২
পতিত পাবন নাম শুনেছ ... ২৭৩

১৩৬০ সাল, ৪ঠা কার্ত্তিক
ভগবান গোলা মানে ... ২৭৬
তারাই পাকা মহাজন ... ২৭৬
কৃষ্ণ-দাসত্ব জীবের স্বরূপ ... ২৭৭

১৩৬০ সাল, ১০ই অগ্রহায়ণ
জাহ্নবা মায়ের কথা অপূর্ব্বলীলা ... ২৭৮
সেই হরিণামামৃতবিনে, খায় যদি অন্ন পানে ... ২৮০
হরিনাম কি মধুর নাম ... ২৮১

—:০:—

# —শ্রীগুরু-কথা-প্রসঙ্গ—

পরমারাধ্য শ্রীগুরুদেব ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্‌রামদাস বাবাজী মহারাজ যেখানে অবস্থান করিতেন সেখানে শ্রীনাম-কার্ত্তন, সৎপ্রসঙ্গ, গ্রন্থপাঠ ও সাধু মহাত্মাগণের আগমনে এবং বিবিধ মহোৎসবের অনুষ্ঠানে আনন্দের স্রোত বহিয়া যাইত। অনেকেই তাঁর কাছে জিজ্ঞাসু মন লইয়া আসিতেন, নানা উপদেশ প্রার্থনা করিতেন। কিন্তু নিরভিমান এবং 'তৃণাদপি' যাজনের পূর্ণপ্রতীক্ শ্রীগুরুদেব তাঁহাদের সহিত এমন বিনয় নম্র ব্যবহার করিতেন এবং দীনতাসূচক কথা বলিতেন—সত্যই যেন তিনি কোনরূপ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন নাই এবং উৎকৃষ্ট সদুপদেশ দিবার মত বক্তিও তিনি নহেন। আবার যিনি তাঁহার কীর্ত্তনের অক্ষর (আঁখর) গুলির গভীর অনুভূতি ও অসাধারণ পাণ্ডিত্য প্রাতভার দিকে দৃষ্টি দিয়া তাঁহার কথা প্রতিবাদ করিতেন তখন তিনি মধুর হাসিয়া বলিতেন **"ও সব তিনি যা দেন তাই"**। তাঁহার এই উক্তির মধ্যে কত গভার আন্তরিকতা ভাবিতে গেলে বিস্মিত হইতে হয়। তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত কীর্ত্তনের অনুলিপি গ্রহণ করিয়া পুনশ্চ তাঁহাকে শুনাইবার সময়ে তাঁহার আঁখরে যদি কেহ নিজের কথা প্রবেশ করাইয়া দিতে চাইত তাহা ভাল কথা হইলেও শুনিয়া বলিতেন **"কথাতো ভাল কিন্তু ভাল হলেও তখন সে আমায় দেয় নাই।"** অর্থাৎ আমি যখন হাত পাতিয়া বসিয়া ছিলাম তখন আমায় তিনি দেন নাই এখন বা লইব কেন?

অপূর্ব্ব সিদ্ধান্ত, এ উপদেশটির গুরুত্ব অসাধারণ। বেদান্ত মঞ্জুষা বলেন—

**"তদস্তু সারং মম কিং ভবেদ্বা**
**ময়ি প্রসঙ্গাদপি চেন্নভাতি।"**

অর্থাৎ তাহা ভাল হইতে পারে, কিন্তু আমাতে যখন প্রসঙ্গক্রমেও প্রকাশ পায় নাই তাহাতে আমার কি হইবে? অনুভূতির চরম দশা।

এইরূপ অহন্তাশূন্য অনুভূতির কথা প্রসঙ্গক্রমে 'কল্যাণনিধি শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখ হইতে যাহা নিঃসৃত হইয়াছিল তাহার কিয়দংশ পাঠক পাঠিকাগণের সম্মুখে উপস্থাপিত করা হইতেছে ইহার অনুশীলনে অবশ্যম্ভাবী আত্মকল্যাণের কামনায়।

**১৩৫৪ সাল, পৌষ মাস :: স্থান—কলিকাতা, সময়—সকাল ৭॥০—৮॥০ পর্য্যন্ত**

তখন শ্রীগুরুদেব কলিকাতায় এক ভাগ্যবান্ ব্যাক্তির বাড়ীতে স্বতন্ত্রভাবে অবস্থান করিতেছিলেন, উপরোক্ত সময়ে অনুগতগণ তাঁহার বাম পার্শ্বে বসিয়া কেহ মালা জপ করিতেছেন, কেহ শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া আছেন, শ্রীগুরুদেবও মালা

জপ করিতে করিতে তাঁহাদের পানে চাহিয়া দুই একটি কথা বলিতেছেন,—তোমরা যে সব পাঠ করো—

"জীবের নিস্তারলাগি নন্দসুত হরি।
ভুবনে প্রকাশ হন গুরু রূপ ধরি॥"
"গুরুর বিক্রিয়া যদি দেখহ কখন।
তথাপি অবজ্ঞা নাহি কর কদাচন॥"

এ কি রকম হোলো, গুরুর আবার বিক্রিয়া কি? গোড়ায় ব'ল্লেন নন্দসুত হরি, তা হোলে হরিই ত গুরু, তাঁর আবার বিক্রিয়া হোলে লাগে কোথায়, রহস্যটা ভাল!

তোমার চিত্তের বিক্রিয়ার উপর লক্ষ্য করে একথাগুলি, ওগুলি যেন তাঁতে আরোপ কোরো না।

বলিতে বলিতে গম্ভীর হইলেন, উঁহার সম্মুখে অল্পদূরে একটি ভদ্রলোক বসিয়া শুনিতে ছিলেন। তিনি প্রশ্ন করিলেন, বাবা! সময়টা বড়ই বিপদের ভিতর দিয়া কাটছে, চারদিকে হানাহানি, আর কতদিন এমন চল্‌বে?

শুনিয়া শ্রীগুরুদেব হাসিতে হাসিতে বলিলেন,

শুক্লপক্ষ আস্‌বেই, তবে অমাবস্যাটা না কাট্‌লে সে কি ক'রে আস্‌বে। তবে অবশ্য-কর্ত্তব্য ক'রে গেলে এদিকে খেয়ালই থাক্‌বে না।"

এ উপদেশটি আমাদের প্রতি। অর্থাৎ সংসারের প্রতি আমাদের কর্ত্তব্য থাকিলেও আমাদের "অবশ্য কর্ত্তব্য" হরিভজন। এদিকে মন দিলে সংসারের অবশ্যম্ভাবী দুঃখময় পরিণামগুলির দিকে মন থাকে না। আবার বলিলেন—

"কি গো তাইতো তোমাদের পাঁজি পুথিতে বলেছে না? দ্বিতীয়তে অভিনিবেশ হ'লে ভয় থাকে।

ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাৎ। (ভাঃ ১১।২।৩৭।)

আর একটি ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন, ইঁহার নাম শ্রীজ্যোতিষ চন্দ্র ঘোষ, ইনি কাশীধামে শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণপূত স্থানটির প্রকাশের জন্য চেষ্টা করিতেছেন। তিনি বলিলেন, আপনার বরাহনগর পাঠবাড়ীর পরিকল্পনাটি দেখে বড় আনন্দ হ'ল, আজ কাল ঐ ভাবে না ক'রতে পার্‌লে, কোন কিছুর প্রচার করাই সম্ভব নয়। শুনিয়া শ্রীগুরুদেব হাসিয়া বলিলেন—

"কথা আছে* স্বতন্ত্র প্রকাশ ক'রনা, প্রাচীন স্থানের সংস্কার ছাড়া অন্য কিছু কর না।" তারপর বলিলেন,- -

*("কথা আছে" বলিতে তাঁর শ্রীগুরুদেব শ্রীরাধারমণ চরণদাস শ্রীল বড় বাবাজী মহাশয়ের আদেশ)।

এই পাঠবাড়ী সম্বন্ধে আমার মনে জেগেছিল মহাত্মা শিশির ঘোষের কাগজের ইঙ্গিতে। তিনি বলেছিলেন "মহাভাগ্যবান্ কলিকাতাবাসী, তোমাদের এখানে ভগবান্ গৌরসুন্দরের চরণপুতস্থান বরাহনগর। এখানেই তাঁর প্রকট।" সেই থেকে ওখানের বাসনা জেগেছিল, সময়ে হ'য়ে গেল।

'স্বতন্ত্র প্রকাশ' কথাটির উপর জোর দিয়াই যাহা বুঝাইলেন—তাহাতে জানা গেল সর্ব্বক্ষেত্রে আনুগত্য চাই, এমনকি পূজা অর্চ্চনা, মঠ মন্দির প্রভৃতি সর্ব্বক্ষেত্রেই স্বাতন্ত্র্যবোধ অনিষ্টকর। আর আনুগত্যে কাজ করিলে ইষ্ট লাভ হয়। তাই, আবার বলিলেন—

"আমি করি এ বড় জালা। একটি গল্প আছে, এক সময় এক দরিদ্র ভক্ত-ব্রাহ্মণ শ্রীবিগ্রহের সেবার জন্যে, আর একটি মন্দির স্থাপনের উদ্দেশ্যে ভিক্ষায় বের হ'লেন, কিছুদিন পর বেশ কিছু ধনরত্ন সংগ্রহ হ'ল, তাঁর এই সব সংগ্রহ দেখে এক ডাকাত তার পিছু নিলে। সন্ধ্যায় গঙ্গার ধারে সেই ভক্তটি সন্ধ্যা ক'রতে বসেছেন, ডাকাতও লুকিয়ে থাক্‌লো, সুযোগ হলেই সর্ব্বস্ব নেবে। এদিকে ওখানে লক্ষ্মী নারায়ণ পাশা খেলছিলেন, হঠাৎ নারায়ণ হাত থামিয়ে উঠে পড়লেন। ঠাকুরাণী বল্লেন, ওকি! উঠলে কেন? নারায়ণ বল্লেন এক ভক্তের সর্ব্বস্ব ডাকাতে কেড়ে নিচ্ছে, সে আমায় স্মরণ করেছে কাতর ভাবে। এই কথা বলে একটু থেমেই আবার খেল্‌তে বস্‌লেন, দেবী জিগ্যেস্ করলেন—কি হল? থেমে রইলে যে? নারায়ণ হেসে বল্লেন, ও হ'য়ে গেছে। ব্রাহ্মণ ভাবলে আমিই বা কেন শুধু শুধু ছাড়বো, একটু দেখেই নিইনা! ব্যস্, আর আমার কাজ নেই, যতক্ষণ আমার ওপর ভরসা করেছিল, তখন ছুট্‌ছিলুম, কিন্তু যখুনি তার অহংজ্ঞান এসে পড়লো আমার কাজও ফুরোলো।"

এই কথা বলিয়া মৃদু মধুর হাসিতে লাগিলেন। উপস্থিত সকলের মনে আনন্দের সঞ্চার হইলে, শ্রীগুরুদেব আবার বলিলেন—

"ওগো সবই আছে সবই থাক্‌বে—হরিনাম, মূর্ত্তি, প্রসাদ। কিন্তু অবিশ্বাসেই সব ফাঁক্।"

ইহার পর শ্রীগুরুদেব গম্ভীর হইলেন, বাহিরে আসিয়া দালানে ধীরে ধীরে পায়চারী করিতে লাগিলেন। হাতে মালা, আপন মনেই অনুচ্চ কণ্ঠে কি বলিতেছেন আবার একটু থামিয়া ভাবস্থ হইতেছেন, অতি সন্তর্পণে পিছনে অনুসরণ করাতে শুনা গেল—

"কি বল্‌বো, বলার কিছুই নেই, তন্ত্র মন্ত্র সবই তো ওই বুড়ো বুড়ীর কাছ থেকে, তা হ'লে কাকে ফেলে কার কাছে যাব। তবে তৎপর হতে হবে না, কিন্তু মেগে নিতে হবে সবারই কাছে। তাঁর নাম নিয়ে যারা সে পথের পথিক হয়, তারা

কি কাউকে ছাড়তে পারে? যদি সে বুদ্ধি না আসে, তবে তারা যেন তাঁর নাম মুখেও না আনে।”

বলিতে বলিতে দৃঢ় গম্ভীর মুখে চাহিলেন। বুঝা গেল কেন এরূপ বলিলেন, শ্রীঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন—সর্ব্বদেব পূজিবে নাহবে তৎপর।....

মন্ত্র ও আরাধনা সবই প্রায় তন্ত্র হইতে প্রকট। ঐ তন্ত্রসমূহ শ্রীশঙ্কর-শঙ্করীর নিকট হইতেই জগতে প্রচারিত হইয়াছে। তাই শ্রীগুরুদেব উঁহাদিগকে ‘বুড়ো বুড়ী’ ঈঙ্গিত করিলেন। তাঁহাদেরই কৃপায় জগতে আরাধনার প্রচার। সাম্প্রদায়িকতা বা গোঁড়ামীর স্থান উদার বৈষ্ণব ধর্ম্মে নাই।

## ১৩৫৪ সাল, ৭ই মাঘ :: সকাল ৮টা হইতে পৌনে ৯টা

এই কয়দিন মেঘলা ভাব, শীতও খুব পড়িয়াছে। পরম করুণানিধান শ্রীগুরুদেবের বাম পার্শ্বে আমাদের বিশিষ্ট গুরু ভ্রাতাগণ বসিয়া আছেন। শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখের দিকে সকলের দৃষ্টি নিবদ্ধ। কোন এক ভাগ্যবান্ শ্রীগুরুদেবের অঙ্গে একখানি উৎকৃষ্ট গরম কাপড়ের জামা পরাইয়া দিয়াছেন। শ্রীগুরুদেবও বালকের মত উহা পরিয়া আবিষ্ট মনে উপবিষ্ট হইয়া মালা করিতেছেন। কঠোর বৈরাগী আজ ধনী বালকের বেশে অপরূপ সাজিয়াছেন। মনটী একটু একটু করিয়া যেন ইহ জগতে আসিতে লাগিল। শিশুর সরল হাসি শ্রীমুখে ফুটিয়া উঠিল। আহা! এ হাসি যে দেখে নাই সে বড় দুঃখী। কি বলিতে বলিতে থামিয়া গেলেন, যেন ভুলই হইল, তারপর অনুসন্ধানের দৃষ্টিতে বলিলেন—

**দেখ একবার শ্রীখণ্ডের কথা বলি, তখন গৌরঠাকুরের পিতা সর্ব্বানন্দ ঠাকুর বড়ডাঙ্গার উৎসবে ভারী মজা করেছেন, আমাকে ডেকে বল্‌লেন, “রামদাস! এরা সব আমাকে বকাবকি করছে, আমি পুতুল নাচের ব্যবস্থা করেছি কি না; আচ্ছা বলতো! কি অন্যায় হয়েছে? কতদূর থেকে সব লোক আস্‌বে, তারা সব পাড়াগাঁয়ের লোক, এ সব দেখে বেশ তৃপ্তি পাবে, তারপর তোমাদের যাত্রা শুনবে, আর গৌরও দেখবে, কেমন বেশ হবে না?” আমি ভাবলাম ওঃ দেখ, তাঁর কেমন খেলা, ওখানে পুতুলে মন প্রথম জম্‌বে, তারপর কথা কইছেনা দেখে ভাল লাগবে না, আসবে যাত্রা শুন্‌তে, একটু এগিয়ে এসে সেখানে আবার রঙ্‌ ঢঙ্‌ দেখে মন ভাল লাগবে না, আসবে মহাপ্রভুর ওখানে, সেখানে ওরূপ দেখে আর মন সরবে না যেতে, ব্যস চরম, নাকি বল, দেখ দেখি তার প্রচারের কৌশল।**

এই কথা বলিয়া বালকের মত হাসিতে লাগিলেন। শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখ হইতে এইরূপ সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়া শ্রোতাগণের মনে বড় আনন্দ হইল। বিষয়াসক্ত জীবকে

পরমপুরুষ ভগবানের কাছে লইয়া যাইবার জন্য ঠিক এই পদ্ধতিতেই বেদপুরানাদিতে নানা উপাখ্যানের অবতারণা করা হইয়াছে। বিচিত্র রসাল ঘটনাবলীর ভিতর দিয়া বিষয়োন্মুখী মনুষ্যকে ঈশ্বরোন্মুখী করিবার জন্য অপূর্ব্ব কৌশল অবলম্বন করা হইয়াছে। "সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তি।

## সর্ব্বত্র করুণা অনুভূতি ঃ

ইহার পর শ্রোতাগণের মধ্যে একজন বলিলেন—পূর্ব্ববঙ্গ হইতে বহু হিন্দু পশ্চিমবঙ্গে চলিয়া আসিতেছে।

শুনিয়াই শ্রীগুরুদেব বলিলেন,—

**"ত্যাখ, কৃপার কেমন অদ্ভুত কৌশল, হিন্দুস্থান পাকিস্থান কোরে দিয়ে কত লোককে যে নবদ্বীপে গঙ্গার ধারে এনে হাজির করেছেন তার ঠিক নাই, তারা জানুক আর নাই জানুক প্রতিকূলেও করুণা ক'রে অজ্ঞাতে ধামের পরশ পাইয়ে সমান ফল ফলাবেন।**

বলিতে বলিতে ঊর্দ্ধ দৃষ্টিতে চাহিলেন; যেন বলিলেন এইতো তোমার উদ্দেশ্য? আবার সকলের দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া বলিলেন—

**"ধামতত্ত্বইতো ব্যাপক শ্রীনিতাইতত্ত্ব, আবার ওই তো শ্রীরাধাতত্ত্ব, নয়গা? এই যে সে দিন কীর্ত্তন প্রসঙ্গে এলো কথা—স্বরূপজাগান মূর্ত্তি? সংকীর্ত্তন রাসপ্রসঙ্গে সবাইকে আনালেন, জানালেন আর জাগালেন!—**

বলিতে বলিতে শ্রীগুরুদেবের শরীরটী যেন ভাব সাগরে টল মল করিতে লাগিল, বাহ্য আবেশ কোথায় চলিয়া গেল, আবার পরক্ষণেই অদ্ভুত ভাবে স্থির ও গম্ভীর হইলেন। ওঃ কিছুক্ষণ আগের স্বরূপে আর এইস্বরূপে কত তারতম্য যেন ভাবিতেও বিস্মিত হইতে হয়। অল্পক্ষণ পূর্ব্বে যিনি শিশু স্বভাবে হাসিতেছিলেন তাঁহাকেই এখন দেখিতে শরীর মন চক্ষু ও ভীত হয়। ক্ষণে ক্ষণে যেন নূতন নূতন ভাবের খেলা।

## ভবরোগের চিকিৎসা ঃ

প্রায় পনর মিনিট কাল এইভাবে কাটিয়া গেল কাহারও মুখে কথা নাই; কিছুক্ষণ পরে শ্রীগুরুদেব ভাব সম্বরণ করিয়া এদিক ওদিক চাইলেন। প্রায় ৮॥টা বাজিয়া গেল, নিত্য ক্রিয়ার সময় হইতেছে, সহজে সেদিকে খেয়াল হইবেনা জানিয়া ভয়ে ভয়ে অনুগত এক কবিরাজ বলিলেন 'হাতখানি একবার দেখি' অমনি আবার হাসি—। হাসিতে হাসিতে বলিলেন—

**"হ্যাঁগো হ্যাঁ তোমাদের আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে তো ব্যবস্থা আছে পিত্ত রোগী মিছরী খেতে চায়না তোমরা কি তা ব'লে দেবেনা? না রোগ সেরে গেলে দেবে? কৈ তাতো হয় না,**

তা হ'লে কি রোগ কারও সারে? পিত্তরোগী খেতে না চাইলেও, নানা রকমে অল্প অল্প ক'রে দিতে হয়, এওতো তেমনি গানে নাচে একটু একটু ক'রে দিয়ে দেয়, তবে তো? আর কানু ছাড়া কি গীত আছে গা? এরা না চাইলেও সে তো চিকিৎসক, ছাড়বে কেন? কত দিক্ দিয়ে রোগ সারাবার ব্যবস্থা করছে।—

মন বাহ্য জগতে ফিরিয়া আসিয়াছে, হাতের নাম মালার সংখ্যা রাখিলেন, বড্ডো ঠাণ্ডা বলিয়া অতি সন্তর্পণে কবিরাজ বলিলেন—আজ কি পুরোপুরি স্নান না কর্‌লে চল্‌বে? শ্রীগুরুদেব ঈষৎ হাসিলেন। ভাবটী এই যে, তোমাদের এজগতের আবেশে মন ভরিয়াই আছে, যতই শোন, সেই দেহেতেই আবেশ।

## গৃহীর পক্ষে গুরু করণ।

৮ই মাঘ। সকাল ৭॥—৯টা।

গতকাল অপেক্ষা আজ শীত আরও বেশী। শ্রীগুরুদেব নিজের ভজন প্রকোষ্ঠে বসিয়া আছেন, চারিদিকের জানালা বন্ধ, অদূরে বৈষ্ণবখণ্ডে শ্রীগুরুদেবের নিত্য সহচর ভক্তবৃন্দ বেশ মধুর কণ্ঠে প্রভাতী-কীর্ত্তন করিতেছেন, এদিকে শ্রীগুরুদেবও নামকীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া আপন মনেই নামের অক্ষর আস্বাদন করিতেছেন। উঁহার বামপার্শ্বে নিত্য দর্শন প্রয়াসী ভক্তবৃন্দ উপবেশন করিয়া মালা করিতেছেন; শ্রীগুরুদেবের ইচ্ছা নয় নাম সংকীর্ত্তনস্থল ছাড়িয়া কেহ তাঁহার নিকট বসেন। কয়েকদিন পূর্ব্বে এবিষয়টী আকারে ইঙ্গিতে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন, যেদিন এটী প্রকাশ করেন এখন সেইদিনের প্রসঙ্গই লিপিবদ্ধ করা হইবে। নাম সমাপ্তির পর তদুদ্দেশে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া শ্রীগুরুদেব কম্বলের আসনে পূর্ব্ববৎ বসিলেন। মনে গাম্ভীর্য্যভাব বিদ্যমান থাকিলেও বাহ্যতঃ বেশ প্রফুল্ল। অবসর বুঝিয়া একজন প্রশ্ন করিলেন—বাবা! অনেকে বলেন সংসারী ব্যক্তির পক্ষে ত্যাগী গুরুর আশ্রয় গ্রহণ অসামঞ্জস্য। কারণ, উভয়ের আচরণ পৃথক্; অনুসরণ করা বড় শঙ্কার হয়, অথচ শ্রীগুরুর আচরিত পথ ত্যাগ করিলে আশ্রিত থাকে কোথায়?

শ্রীগুরুদেব! বাধা কি? ত্যাগের পথে এগোতে হবে তো? না বারোমাস পড়ে থাকবে? কাকে দেখে এগোবে? ত্যাগীগুরুর স্বরূপটী ভাববে আর বাঁধন ছিঁড়তে মনে হবে। তোমাদের তো পাঁজিপুঁথিতে বলেছেন—"পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা।" পুত্র হ'লেই পত্নীর সঙ্গে সম্বন্ধটা তো বিরুদ্ধ হবে, পুত্রকে তো আত্মজ বল, তাহ'লে পত্নী তো আর পত্নী থাকেনা! নাকি বল? এসব তো ঋণ শোধের ব্যাপার কর্ত্তব্যবুদ্ধি মাত্র, অবশ্য-কর্ত্তব্যও তো আছে তোমার, কর্ত্তব্য তাঁর এবার সে করুক, তুমি "অবশ্য কর্ত্তব্য" কর।

## আচার ও প্রচার ঃ

এইটুকু বলিয়াই মুহূর্ত্তের মধ্যে ভাবস্থ হইলেন, প্রায় ৫।৬ মিনিট পরেই বল্‌ছেন—

**দেখ, কাকেও কিছু ব'লনা, বললেও করবে না, নকল করলেও মঙ্গল হবে ; একটা কথা আছে জান ? "হাঁজি হাঁজি করতে রহনা বৈঠে আপনা ঠাম।"**

ইহা কেন যে বলিলেন বোঝা গেল না। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সকলে চাহিয়া রহিলেন—এরূপভাবে কি লিলেন, অথচ সাহস করিয়া প্রশ্ন করিতে কেহ পারিল না। অপার করুণাময় অন্তর্য্যামী শ্রীগুরুদেব তাহা বুঝিয়াই আবার বলিতে লাগিলেন—

**"দেখ, স্বতন্ত্র নিরপেক্ষ আচরণ ক'রলে তার আকর্ষণ খাঁটি হয় ; আচরণ করলে তার ফল যাবে কোথায় ? ওতে কি কম প্রচার হয় ! ওই যে গোঃ শ্রীচরিতামৃতে বলেছেন না,**

**'পরমাত্মনিষ্ঠামাত্র বেশ ধারণ।**
**মুকুন্দসেবায় হয় সংসার তারণ॥**

বলিয়াই কি যেন ভাবিতে লাগিলেন। একে অল্পভাষী স্বরূপ, তাহাতে আবার ক্ষণে ক্ষণে আবিষ্টভাব, আবিষ্ট-ভাষা তাহার সূত্র মাত্র, পাণ্ডিত্যাভিমানে উহার ব্যাখ্যা হয় না। তবে কোন অর্থ টীকে লক্ষ্য করিয়া সিদ্ধপুরুষগণ আবিষ্ট ভাষায় সূত্র ঈঙ্গিত করেন তাহার মর্ম্মার্থ উপলব্ধি করিতে তাঁহাদের করুণাসম্বল ব্যক্তিগণই পারেন। আমরা সংক্ষেপে যথাযথ রচনাবদ্ধ করিতেছি মাত্র। কালে শ্রীগুরুকৃপায় এ সবের অর্থ হৃদয়ে অবশ্য বিকাশ পাইবে।

## প্রচার নয় ভোগ করা ঃ

শ্রোতারা আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিতে লাগিলেন—যদি কিছু বলেন। ক্রমে তাঁহার অধর ওষ্ঠ দুটী ঈষৎ কম্পিত হইতে লাগিল। আবার মধুর হাসিতে মুখখানি ভরিয়া গেল। আবার বলিলেন—

**লোকে আমায় বলতো আপনি খুব প্রচার করেন, আপনার দ্বারা জীবের খুব কাজ হ'চ্ছে। এসব শুনছি আর ভাবছি, তাতে একদিন স্বপ্ন দেখলাম....**

বলিতে বলিতে অলক্ষ্যদৃষ্টিতে মুখ ফিরাইলেন। কথা বলিতে ইচ্ছা করিলেও কান্নায় তাঁহার কণ্ঠ যেন রোধ হইয়া আসিল, তবু স্থির ভাবে বসিয়া নাম করিতে করিতে বলিলেন—

**"তখন ত্রিসন্ধ্যা কীর্ত্তন নিয়মিত ভাবে প্রায় হ'ত না। সকালে কুঞ্জদাদা আর সন্ধ্যায় মধুদাদা কীর্ত্তন করতেন ; আমি ত' ফাঁকে ফাঁকে থাকতাম, তিনি ( শ্রীবড় বাবাজী ) গা**

ঢাকা দিলেন। হরিদাস দাদা পাকা ঘুঁটি কেঁচে গেল, সব ঝোঁক আমার ওপর আর দিদির ( শ্রীললিতাসখী দাসী ) ওপর পড়লো। তখন আমাদের আর একটি গুরুভাই হাওড়ার বিপিনদাদা। তাঁর ওপর স্বপ্নাদেশ হ'ল ত্রিসন্ধ্যা নাম কীর্ত্তনের। কথাটা আমাদের ওপর জোর করলে না; তারপর আমিও একদিন স্বপ্নে দেখছি, পাঠ হ'চ্চে, বহু লোকজন উপস্থিত, দেখলাম কর্ত্তা ( শ্রীবড়বাবাজী মহাশয় ) এককোণায় বসে আছে; ভাবলাম রয়েছে তো, আমি বাইরের কাজটুকু সেরে আসি, তারপর ধরবো, ব্যস, এসে দেখি নেই, জিগ্যেস করলাম সে কোথায় গেল যে কোণায় বসেছিল? তারা বল্‌লে ঐ দিকে চলে গেল। আমি দৌড়ালাম, সে তখন মাঠে মাঠে দৌড়ছে, আমিও সঙ্গ নিয়েছি, দেখিনা একটা জলা জায়গায় সে ঝাঁপদিলে, আমিও ঝাঁপালাম ওপারে উঠে হাঁপাতে হাঁপাতে গিয়ে তাকে ধরলাম। সেখানে সন্ন্যাসীদের লাল কাপড় চোপড় সুকুচ্চে। সে আমার হাঁপানি দেখে বল্‌লে, কেন হাঁপাচ্ছিস্? আমি চুপ; সে বল্‌লে ত্রিসন্ধ্যা নাম কর। সেই থেকে এই কাণ্ড ( ত্রিসন্ধ্যা কীর্ত্তনের ব্যবস্থা ) কিন্তু এতেই কি সায়েস্তা হলাম? না—; আমি ত পালের গোদা, নামের কাছে ত যাই না। লোকে ডাকে, যাই নাম করতে; ভোগ হয় খুব, এত হয় যে চার ঘণ্টা। তাহলে বোঝ, যে আধ ঘণ্টা নাম করে না সে চার ঘণ্টা কি ক'রে করে? তবে সে কি আমি প্রচার করার উদ্দেশ্যে করি? সে নানা রূপ ধ'রে ডাকে, সে তো দেবার জন্যেই ডাকে নেবার জন্যে কি কেউ ডাকে রে? আমি ত কিছু দিই না, আমাকেই দেয়। লোকে বলে আমি প্রচার করি; আরে পাগল!

বলিতে বলিতে রুদ্ধ ক্রন্দন প্রকাশ হইয়া পড়িল। অভিমানে মুখ ভরিয়া উঠিল, ধীরে ধীরে কথা বন্ধ হইরা গেল, ভাবস্থ হইলেন। চক্ষু দুইটি মুদ্রিত হইয়া গেল। সমবেত ভক্তবৃন্দের হৃদয়ে একটী অলক্ষ্য মূর্ত্তির অনুভূতি স্পন্দন হইতে লাগিল, সকলের চক্ষু জলসিক্ত। এ ভাবটী কাটিতে প্রায় ১৫ মিনিট লাগিল। আর কোন কথা না বলিয়া শ্রীগুরুদেব উঠিয়া পড়িলেন, তখনও তাঁর হাতে নামের মালা। উপস্থিত সকলে গৃহ হইতে বাহির হইলেন। তিনি ঐ গৃহেই পায়চারী করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন—

এঁরা ব্রজে আছেন ( কাহাদের লক্ষ্য করিয়া বলিলেন স্পষ্ট বুঝা গেল না ) গৌরে আবেশ না রেখে লীলা কথায় আবেশ এলে উপলব্ধি হওয়াটা আকাশ কুসুম। "যদি গৌরাঙ্গ না হ'তো কি মেনে হইত" পদটী ভাবলেই হয়।

আবার স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া গম্ভীর হইলেন, এবং টলিতে টলিতে কম্বলের আসনটীর দিকে অগ্রসর হইলেন, গৃহে কেহ ছিলেন না, আশঙ্কা হইল পড়িয়া যাইতে পারেন। ইতিমধ্যে নিত্য সেবক নন্দদাস আসিল।

১৩৫৪ সাল ৯ মাঘ। সকাল ৭॥টা হইতে সোওয়া ৯টা।

# অপরাধ এড়ানোর উপায়

শ্রীগুরুদেবের দর্শনপ্রার্থী বহু ভক্ত তাঁহার পার্শ্বে ও সম্মুখে উপবিষ্ট হইয়াছেন, সকলেই উঁহার শ্রীমুখের পানে চাহিয়া মালা জপ করিতেছেন। শ্রীগুরুদেবও স্থির গম্ভীর ভাবে কম্বলের আসনে বসিয়া মালাজপে নামের মাধুরী আস্বাদন করিতেছেন। এই কয়দিন উত্তরোত্তর শীত বাড়িয়াছে, শ্রীগুরুদেবের সর্ব্বাঙ্গ আবৃত, মস্তকে ত্যাগী বৈষ্ণবের সাদা টুপী। মাঝে মাঝে ভাবাবিষ্ট হইয়া অস্পষ্ট ভাবে অস্ফুট কণ্ঠে কি যেন বলিতেছেন। কিছুক্ষণের জন্যও উঁহার শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ না করিলে ঐ ভাষার একটি বর্ণও বুঝা যায় না। হয়তো কিছুক্ষণ পূর্ব্বে কোন প্রসঙ্গ উঠিয়াছিল তাহারই আস্বাদনে ও স্মরণে বিভোর হইয়া আছেন। শ্রীগুরুরূপে করুণা স্বয়ং মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে, করুণার সহিত বাৎসল্যও আনুগত্য করিয়াছে। বিশ্বের সব কিছুরই আশ্রয়স্থান শ্রীগুরুদেব। কোন ভাবের, কোন রসের, কোন আনন্দের অপূর্ণতা নাই তাঁহাতে। "পূরল সব মন আশ।" আজ শ্রীগুরুদেব সেই করুণার মূর্ত্তিতে বিভাবিত হইয়া নিজ স্নেহের বৃত্তিস্বরূপ অনুগতদিগকে বলিলেন—

"তাই তো শোনা গেছে, শ্রীগুরুপদাশ্রয় করলেই স্বভাব জাগিয়ে দেয়, শুধু কি স্বভাব জাগায় গা! অভাব ঘুচিয়ে স্বভাব জাগায়। তাইতো বলেছেন শ্রীকবিরাজ—

"নাম সংকীর্ত্তন হইতে পাপ সংসার নাশন।
চিত্ত শুদ্ধি সর্ব্বভক্তি সাধন উদ্‌গম॥
কৃষ্ণপ্রেমোদ্‌গম প্রেমামৃত আস্বাদন।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি সেবামৃত সমুদ্রে মজ্জন॥"

আবার কথা হ'য়েছে—

"হেন কৃষ্ণ নাম যদি লয় বহু বার।
তথাপি না হয় প্রেম না বহে অশ্রুধার॥
তবে জানি অপরাধ আছয়ে প্রচুর।
কৃষ্ণনাম বীজ তাহে না হয় অঙ্কুর॥"

প্রেম দান তো হয়না, অপরাধ থাকতে কি কৃষ্ণনামে প্রেম সঞ্চার হয়? শ্রীকবিরাজের কথা শুনলেই প্রাণ বড় হতাশ হয়, নয়? তা হ'লে উপায়? অপরাধ থাকতে কৃষ্ণনামে তো তা দেন না, অমনি হতাশা নিবৃত্তি করে আশ্বাস দিয়েছেন—

"নিতাই চৈতন্যে নাই এ সব বিচার।
নাম লইতে প্রেম হয় বহে অশ্রুধার॥"

কলির জীব আমরা, আমাদের কি অপরাধ এড়িয়ে চলবার জো আছে? চারদিকে বাধা, তাই অভয় দিয়ে ব'লেছেন এযুগে কিছুই ভাববার নেই, অমন অদোষদরশী প্রভুর প্রকট, পতিতের তো এই গতি; শ্রীনিতাই চাঁদের মারফৎ দ্বারে দ্বারে তাইতো প্রচার, বিধি নিষেধের বাঁধ নেই।"

শ্রীগুরুদেব এই পর্য্যন্ত বলিয়া অকস্মাৎ গম্ভীর হুঙ্কার করিলেন, শ্রোতৃবৃন্দের হৃদয়ে শক্তি সঞ্চার করিয়া দিলেন। সকলে আত্মহারা হইয়া মুগ্ধ-দৃষ্টিতে শ্রীগুরুদেবের মুখের পানেই চাহিয়া রহিলেন। সকলের মন কি যেন এক অপ্রাকৃতরাজ্যে চলিয়া গেল, কিছুক্ষণের জন্য পরিবেশটী নিবিড় নিস্তব্ধতায় ভরিয়া গেল। শ্রীগুরুদেব মুদ্রিতনয়নে বসিয়া রহিলেন। পুলকে মুখখানি ভরিয়া উঠিল; অস্ফুট ভাষায় কি বলিতে লাগিলেন খুব নিবিষ্টমনে শুনিলে মনে হইল "শ্রীগুরু শ্রীগুরু" বলিয়া গদ্‌গদভাবে উচ্ছ্বসিত হইতেছেন। জলভরা মেঘের মত তাঁহার চক্ষু দু'টি টলমল করিতে লাগিল। মাঝে মাঝে মাতালের মত কাঁপিতে কাঁপিতে টলিতে লাগিলেন। এইভাবে কিছু সময় গত হইলে পিছনের দিকে ঠেস্ দিয়া আবার স্থির হইয়া বসিলেন। ভাব সম্বরণে আরও বিলম্ব হইল। ক্রমে চোখ খুলিলেন; বেশ লাল হইয়াছে, যেন কাহারও উপর কোন কারণে বড়ই ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, কিন্তু অধরোষ্ঠের দিকে চাহিলে যেন কাহারও দিকে চাহিয়া বড় মধুর হাসিতেছেন বলিয়া মনে হইল।

## নামের করুণা

পরমদয়াল শ্রীশ্রীগুরুদেব পতিতপাবন শ্রীশ্রীনিতাই চাঁদের করুণা রসে এইভাবে নিজে তন্ময় হইয়া সবাইকে তন্ময় করিয়া আবার বলিতে লাগিলেন—

"আর একবারকার কথা শোন, শ্রীবৃন্দাবনে গেছলাম, তখন শ্রীমাধবদাস বাবাজী মহাশয় প্রভৃতির দর্শনে গেছি, নানা প্রসঙ্গ হ'লো, আমি ব'ল্লাম ক'লকাতা যাচ্ছি, তিনি যেন সামান্য ক্ষুব্ধ হ'য়েই বল্‌লেন, কী তোমাদের ক'লকাতা-প্রেম! এই বৃন্দাবনে কি ভাল লাগেনা? কী সুখ পাও সেখানে? আমি বল্‌লাম কী সুখ পাই সেখানে, ব'লবো? শুনুন তবে। আপনারা তো এখানে থাকেন নিরপেক্ষ ভাবে, ক'লকাতা রাজধানী, সেখানে সব কিছুই আপনাদের বিরক্তিকর। আমার পক্ষে কিন্তু অন্য রকম। একজন হয়তো নামজাদা অসৎ প্রকৃতির লোক, তিনি হয়তো একদিন দৈবক্রমে কীর্ত্তন শুন্‌তে এলেন, তারপর নামের করুণায় ধীরে ধীরে প্রকৃতি বদ্‌লে যেতে লাগলো। শেষে

নামের কাছে আত্মসমর্পণ, একি কম আনন্দের কথা? এখন বুঝুনতো, আপনাদের আনন্দের সঙ্গে ওজন করা যায় কি না? তখন তাঁরা বিস্মিত হ'য়ে বললেন ঠিক কথা, তুমিই তাঁর করুনা যথার্থ ই উপলব্ধি কর"।

এই বলিয়াই যেন তাঁহাদিগকে স্মরণ পথে আনিয়া তাঁহাদের সহিত আবার এ কথা যাচাই করিতে লাগিলেন। বাহ্য আবেশে আছেন কি অন্তর আবেশে ডুবিলেন বুঝা গেল না, দৃষ্টি সকলের প্রতি ফিরিতেছে, কিন্তু এ দৃষ্টিতে কাহারও বুঝিবার উপায় নাই যে কাহাকেও দেখিতেছেন কি না। মুখে মধুর হাসি, নয়নে অলক্ষ্য দৃষ্টি, ওষ্ঠ অধরে নাম জপের মৃদু কম্পন, নয়নের নীলাভ তারকা দুইটির অর্দ্ধ প্রকাশ, অন্তঃপ্রবেশী দৃষ্টি যাঁহারই উপর পড়িতেছে, অব্যক্ত ভাষায় তিনিই বলিতেছেন প্রভো! তুমি ছাড়া আর আমার কে আছে?

## নেতাজীর জন্মোৎসবে

আজ বড় আনন্দের ক্ষণ আসিয়াছে। শ্রীগুরুদেবের প্রসন্ন মনের করুণা প্রভাব তাঁহার অনুগত জনের সবারই ভিতর সমান ভাবে প্রবেশ করিতেছে, দূর নিকটের বিচার নাই, কণাভোজনে ষাট হাজারের উদর পূর্ত্তির মত সবাই তৃপ্ত হইতেছে। প্রায় সাড়ে আটটা বাজে, ভক্তবৃন্দ সময় বুঝিয়া উঠিবার উপক্রম করিতেছেন, তখন একজন কানাকানি স্বরে বলিলেন, আজ নেতাজীর জন্ম তিথিতে ছুটী, সহরে নানা উৎসবের আয়োজন হ'চ্ছে। মৃদু ভাবে কথা উঠিলেও শ্রীগুরুদেব শুনিলেন এবং পার্শ্বে দৃষ্টি ফিরাইয়া বলিলেন—

"নেতাজীর জন্মোৎসব, মনিব আজ ছুটী দিয়েছেন, আমরা কি করবো বল্‌ছে? শুন্‌ছো কথা, আরে আজ মনিবের ছুটী দেওয়া মানে বুঝ্‌লেনা? অন্যদিন যা কর তাতো রোজই কর, আজ আর তা না ক'রে উৎসবের 'অবশ্যকর্ত্তব্য' কর। বেশতো তোমরাও আজ অবশ্য-কর্ত্তব্য নাম কর, এও তো মনিবের কাজ, লোকে জানুক তার শুভ কামনা ক'রে নাম হ'চ্ছে, আর তোমাদেরও কাজ হোক, ভাই ভাই ডেকে ডুকে নাম কীর্ত্তন করলে কেমন হবে? দেখ একটা কথা মনে হয়, এখনো সাহেবদের আইনে চল্‌তে হয়, তারা কিন্তু ছ'দিন কাজ করে, আর রবিবার দিনটিতে সকাল সকাল বেরিয়ে যায়; যে যার চার্চ্চে গিয়ে সে দিনের অবশ্য-কর্ত্তব্য করে, কিন্তু ও আইনে ভারতের এরা চল্‌লেও কেবল ওইটি বাদ, সেই দিনেই যত কাজ, বরং ছুটী ব'লে বেশী কাজ সারতে হয়"

এই বলিয়া ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে চাহিয়া মৃদু হাসিলেন। শ্রোতৃবৃন্দের মনে আত্মমূঢ়তার লজ্জা আসিল। তখন আসন ছাড়িয়া শ্রীগুরুদেব বাহিরে আসিলেন, এদিক ওদিক তাকাইলেন, কতিপয় বালিকাদের আসিতে দেখিয়া বলিতে লাগিলেন,—

"ওই দেখ, এই সব ছোট ছোট মেয়েরা কেমন এসেছে দেখেছো? আজ ছুটীর দিনে এরা সব কেমন মনে এসেছে বল দেখি, ওদের মনে জেগেছে কি জান? আজতো ছুটী অমনি একটু দেখে আসি"

এই বলিয়া স্নিগ্ধ করুণ দৃষ্টিতে কন্যাদিগকে দেখিলেন, তাহারাও ব্যস্ততার সহিত আসিয়া দূর হইতে প্রণাম করিয়া সরিয়া দাঁড়াইল।

## নামের নিত্য প্রভাব ঃ

শ্রীগুরুদেবও স্থান ত্যাগ করিয়া মালা করিতে করিতে গৃহের ভিতরে আসিয়া ধীরে ধীরে পায়চারি করিতে লাগিলেন। নিত্য সেবক আসিয়া ঠাকুরের শ্রীচরণামৃত দিলে প্রণাম করিয়া পান করিলেন। ভক্তবৃন্দের মধ্যে কেহ কেহ এইবার ফিরিবার চেষ্টা করিতেছেন। তিনি পুনরায় সেই নামময় অবস্থায় মত্ত হইয়া গমনোদ্যত ভক্তদিগকে বলিতে লাগিলেন—

"শোনো গো শোনো, একবার নাম সংকীর্ত্তনের সময়, তখন কর্ত্তা বর্ত্তমান (শ্রীবড় বাবাজী মহাশয়)। আমাদের শ্যামদাদার জানা শোনা স্বামী সচ্চিদানন্দ এসে হাজির। ইনি ভাস্করানন্দজীর শিষ্য, খুব হঠ যোগী। সে দিন কীর্ত্তন প্রসঙ্গও অদ্ভুত ভাবে প্রকাশ পেয়েছিলেন। তারপর শেষে বল্‌লেন, "এখনকার বিজ্ঞান যুক্তিতে বলে কিছু যাবার নয়, এই যে ঘর বাড়ী, সব ইট বালী চূণের নয়? এতে নামের পরশ হ'লো তো? আধুনিক বিজ্ঞানে বলে সব চিহ্ন পৃথিবী ধারণ করে, তা'হোলে এ সব চিহ্ন ধারণ ক'রে অনন্ত কাল থাক্‌বে না, কি? এখনও তো সেই সব শব্দ স্পর্শ রস গন্ধ এতে আছে তো? আবার এদেরও সব থাকলো, সময় হ'লেই এগিয়ে যাবে।" উঃ কী ভোগ।"

বলিয়াই শ্রীগুরুদেব ক্ষণেকের জন্য পঞ্চতত্ত্বাত্মক বিশ্বের ব্যাপক শ্রীনিতাই তত্ত্বে আবিষ্ট হইলেন। সকলে তাঁহার এই অবস্থা দর্শনে শঙ্কিত হইল। তারপর আবার বাহ্য আবেশে ফিরিয়া বলিলেন—

"আরেক বার তখন আমরা এখানে, তিনি তখন গা ঢাকা দিয়েছেন, শ্রীধাম পুরী থেকে সব ফিরে আসা হ'য়েছে, তখন ওখানে প্রায় থাকা হয় (সম্ভব শীল বাড়ীতে)। ভাইদের কণ্ঠের নামের ধ্বনি কিরকম ক'রে বুড়ো (সচ্চিদানন্দ স্বামী) শুনেছেন—বড় পরিচিত নাম-ধ্বনি। শুনে পূর্ব্বস্মৃতিতে (শ্রীবড় বাবাজী মহাশয়ের প্রকট কালীন) ডেকে পাঠালেন, গেলাম; তখন তাঁর শরীরটা রুগ্ন, যোগে কি একটু বিক্রিয়া টিক্রিয়া হ'য়েছে, তাই বায়ু টায়ু আট্‌কে গেছে, হাঁপানি হ'য়েছে। কাছের সকলকে বল্‌লেন, তোমরা যাও আমার কথা আছে। বুড়ো তখনও বেশ তেজী, একটু রুক্ষ প্রকৃতিও ছিলেন। আমাকে চুপি চুপি বল্‌লেন রাম! তোমার সেই নাম মনে আছে? আমি বললাম, হ্যাঁ আছে। বললেন

গাও, ধরলাম "আবার বল হরিনাম আবার বল" তখন তো ওই নামেই তাঁর স্মৃতি,* বুড়োর তখন ভাবস্ফূর্ত্তি আরও হলো, তারপর যখন "প্রেম দাতা নিতাই বলে আবার বল হরিনাম আবার বল" গাহিলাম তখন বুড়ো আর থাকতে পারলেন না, আমার মুখ চেপে ধ'রলেন.......... ......"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া শ্রীগুরুদেব স্থির হইলেন, আর কণ্ঠস্বর প্রকাশ পাইল না; একেবারে নিশ্চল শরীর, কেবল ওষ্ঠাধরে কম্পন, নয়নে অবিরল জলধারা, গণ্ড দুইটী অস্ফুট বাক্-প্রকাশের বাষ্পে স্ফীত। ওষ্ঠাধরের পাশ দিয়া সামান্য ফেনা বহিতে লাগিল, উপস্থিত ভক্তদের মধ্যে অনেকেই এই অবস্থা দর্শনে অস্থির হইয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। শ্রীগুরুদেব ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কাঁদিতে লাগিলেন; যেন উদার বালক ভাল জিনিষ নিজে পাওয়ায় সুখী নয়, অপরে না পাওয়াতে দাতার নিকট অভিযোগ ও অভিমানের কান্না। দশ পনর মিনিট এইভাবে রহিলেন। ৯টা বাজিয়া গিয়াছে। এইভাবে প্রসঙ্গ থাকিলে উত্তরোত্তর তরঙ্গ বাড়িবে থামিবে না, মধ্যাহ্নকৃত্যে বিলম্ব হইবে বুঝিয়া ভক্তবৃন্দ একে একে প্রণাম করিয়া উঠিলেন।

সন ১৩৫৪ সাল ১০ মাঘ সকাল ৭ টা হইতে ৯ টা।

## শ্রীভগবৎ স্বরূপের বহুত্বে গ্রহণ ও বর্জ্জন।

আজ শ্রীগুরুদেব দর্শনপ্রার্থী ভক্তবৃন্দের পরিবেষ্টনে যে গম্ভীর ভাবে বসিয়া আছেন, কাহার সাধ্য ইঁহার সঙ্গে কথা কয়। ৭ টার বহুপূর্ব্বেই দর্শনপ্রার্থী ভক্তবৃন্দ উপস্থিত; কিন্তু পরিবেশ বড় নিস্তব্ধ। সম্ভব কোন প্রসঙ্গ হয় নাই।

এইভাবে অধিক সময় কাটিতে থাকায় কেহ কেহ ভীত সন্ত্রস্ত হইতেছে বুঝিয়াই যেন শ্রীগুরুদেব বাহ্য আবেশে ফিরিয়া আসিলেন এবং হাসিমুখে বলিলেন—

"দেখ ছোট বেলার একটি কবিতা মনে পড়ে—

সাধনার থাকিলেও বিভিন্ন পদ্ধতি।
সকল সাধকের এক ঈশ্বরেতে মতি॥

শ্রীকবিরাজও বলেছেন না?

অনেক লোকের বাঞ্ছা অনেক প্রকার।
কৃপাতে করিল অনেক নামের প্রচার॥

* অর্থাৎ যে সময় শ্রীবড় বাবাজী মহাশয়ের ওখানে শুনেছিলেন তখন নিতাই গৌর রাধে শ্যাম নাম প্রকাশ পান নি।

আর তাইতো তাঁর নাম বিশ্বম্ভর, বিশ্বরূপ। তোমার ভাল না লাগে তো কি কোরবে? কিন্তু বাদ দেবে কেন? বিরাটের বিশ্বরূপের কোনোটি বাদ দিয়ে কি বিরাট হয়? না বিশ্বরূপ হয়? সব নিয়েই তবে তো! না কি বল! সবেতেই সর্ব্ব শক্তি আছে না? ওই যে বলেছেন—

"সর্ব্বশক্তি নামে দিল করিয়া বিভাগ।" তবে বিচার ক'রে গ্রহণবর্জ্জন দৃষ্টি তো দুর্দ্দৈবেই হয়।

বলিতে বলিতে বিশ্বময় নাম রূপের প্রকট দর্শনে যেন মত্ত হইয়া বিভোর হইয়া রহিলেন, শ্রীমুখের ভাষা কণ্ঠেই রহিয়া গেল, এই অবস্থায় এই ভাবোন্মত্ত পুরুষের অস্ফুটবাণী সংগ্রহ করা বড় কঠিন। কিয়ৎক্ষণ পরে ভাবরুদ্ধ কণ্ঠে আবার বলিলেন—

"এই যে সব যাত্রা থিয়েটার, এ সব লুকানো মিছরি, আরে কানু ছাড়া তো গীত নাই! যাবে কোথা, যে কথাই বলুক না কেন, জাঁক জমকে মন আকৃষ্ট হ'লেই সেই ভেতরে ভেতরে পিত্তের চিকিৎসা, পিত্তও কাটছে, মিছরিতেও টান পড়ছে। শেষটা মিছরি নইলে ভালই লাগছে না। সে তার স্বভাব ছাড়বে কেন।"

এই বলিয়াই শ্রীগুরুদেব যেন নাট্যরসেও তাঁহার কৃপা আস্বাদনে মুগ্ধ হইলেন। কি বলিতে বলিতে কি যেন বাকী রহিয়া গেল।

## শ্রদ্ধা ও অধিকার:

শ্রীগুরুভক্তির যিনি নিজেই প্রকৃষ্ট উদাহরণের স্থান, যিনি শ্রীগুরুদেবের প্রতি ঐকান্তিক-নিষ্ঠায় একান্ত বিহ্বল, তিনিই আজ নিজের চিন্তার ধারাটিকে কাহারও প্রেরণায় যেন বলিয়া ফেলিলেন,—

"হ্যাঁগো প্রথমে তো শ্রদ্ধা তবে তো, তা শ্রদ্ধা তো গুরুবাক্যে, ভাব দেখি শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজের কথা, গুরুদেব কবিরাজকে ব'ল্লেন, সাপ্ সাপ্। অমনি কবিরাজও ভয়ে জড় সড়, তিনিও বল্লেন গুরুদেব! কী ভীষণ সাপ! একেবারে সত্য সত্য সাপের ভয়। তারপর গুরুদেব বল্লেন, না রাম! ও যে দড়ি, অমনি শিষ্যও বললেন হ্যাঁ প্রভু! ও তো সত্যই দড়ি; যথার্থই দড়ি জ্ঞান, এই হলো সুদৃঢ় গুরুভক্তি।"

শ্রীগুরুদেব এই কথা বলিতে বলিতে তদনুরূপ তন্ময়তায় "শ্রীগুরু শ্রীগুরু" বলিয়া ব্যাকুলভাবে কাহারও দিকে দৃষ্টি ফিরাইতে ফিরাইতে দেওয়ালে টাঙ্গানো শ্রীবড় বাবাজী মহাশয়ের একখানি চিত্রপটে স্থিরবদ্ধ নেত্রে চাহিয়া নিজ অনুভূতির পূর্ণ আস্বাদন করিতে

লাগিলেন, কিন্তু নিজ অনুগত জনের আচরণে সাধনোচিত ধারার বিপর্যয়ের কথা ভাবিয়াই যেন আবার খেদভরা কণ্ঠে বলিলেন—

"এখন আর গোড়ার কথা হয় না গো, একবারে রসের বিচার, আরে আগে তো শ্রদ্ধা, তবে তো বাকী সব ধীরে ধীরে, ওই যে তোমাদের দাদামহাশয় বলতেন 'অচিরে বিনাশ হয়' অর্থাৎ—

অধিকারী নহে ধর্ম্ম চাহে আচরিতে।
অচিরে বিনাশ পায় হাসিতে খেলিতে॥"

এইটুকু বলিতে বলিতে অনুগত জনের সাধনপথে অগ্রগতিতে বিঘ্নের আশঙ্কা করিয়াই যেন বড় অপ্রসন্ন হইয়া পড়িলেন।

## নাম রহস্য ভোগ ও অজ্ঞাত বৈভব দান ঃ

প্রিয়ের বিরহে তাহার নাম স্মরণ ও শ্রবণ মাত্রে যেমন বিরহীর নিদারুণ শারীরিক ও মানসিক বিকার জন্মে, তাহা দেখিয়া স্বজনগণেরও তেমনি বিষম কষ্ট অনুভব হয়। আবার সেই প্রিয় বস্তুর আলাপনই হয় বিরহীর সঞ্জীবন মন্ত্র ও রসায়ন। ঠিক সেই অবস্থাই আজ শ্রীগুরুদেবের মধ্যে প্রত্যক্ষ সত্য হইল; প্রসঙ্গ ক্রমে ঐ সময় কাটোয়ার মহাপ্রভুর কথা উঠিতেই তিনি লুব্ধ হইয়া বলিতে লাগিলেন—

"ওই দেখ, তোমরা বল সন্ন্যাসী গৌর, নাম তাঁর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, কি রহস্য ভাব দেখি! মহাভাব রসরাজের জড়ান মূর্ত্তি বংশীধারী রাইসম্পুটে। তা কিশোরী সম্পুটে তো শ্যামসুন্দর? তার পর এদিকে তো বাদী পক্ষ সর্ব্বদাই আছে, ধরে ফেলবে রাইর বরণ আর শ্যামের গঠন দেখে, অমনি বাসনা হল সন্ন্যাসী হই না কেন, তিনটী বাঞ্ছাও পূর্ণ হবে, আবার আমার ব্যবহার দেখে যারা নিন্দে করবে, এ বেশে তাদের উদ্ধারও হবে। ব্যস মনে সন্ন্যাসী সাজবার আশা জাগলো, এদিকে আবার সেবাশক্তিরও ক্ষোভ হোলো, অবসর পেয়ে সে স্বরূপ নিয়ে কাছে দাঁড়ালো, ভাল তুমি কেন সন্ন্যাসী সাজবে? তোমার সাজ তো আমি হবো, তোমায় আবরণ দিয়ে রাখবো, বেশতো সন্ন্যাসী বেশেই তোমায় ঢেকে রাখবো, তোমরা দুজনে (রাইকানু) আপন খেলায় মেতে থাক। শক্তির তখনই বিকাশ, যখন স্বপ্নে গৌররূপ দেখেছেন; গৌররূপ ধুলায় চলে পড়ছে, আমি অঙ্গে লাগতে দোবোনা, আমি ওপরে থাক্‌বো, কিশোরীর অঙ্গেই বা লাগতে দোবো কেন? তোমরা আশ মিটিয়ে খেল। ঐ সেবাশক্তিই তো নিতাই গো, সন্ন্যাসী গৌরতো নিতাইজড়িত গৌর না? এবার সন্ন্যাসী স্বরূপের ভেতরের কথা কেমন বল দেখি?" (ক)

---

(ক) শ্রীমন্মহাপ্রভু যে সন্ন্যাসী বেশ ধারণ করিয়াছিলেন শ্রীগুরুদেবের সিদ্ধান্তে তাহা শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুরই স্বরূপ। কারণ, ব্রজলীলায় যেমন সেব্য বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের পরিপূর্ণ সেবাশক্তি শ্রীরাধা, নদীয়া-

এই পর্য্যন্ত বলিয়া ভাবোচ্ছ্বাসে শ্রীগুরুদেব অধীর হইয়া পড়িলেন। কথা শেষ করিতে পারিলেন না। কণ্ঠস্বর ক্ষীণ হইয়া পড়িল। ওষ্ঠাধরের দুই পাশ দিয়া ফেনা বহিতে লাগিল। রোমাঞ্চিত মুখমণ্ডল রক্তাভ দেখাইল। প্রচণ্ড শীতেতেও তিনি অসহ্য তাপ বোধ করিলেন। শ্রীগুরুদেবের এরূপ ভাব বিহ্বল অবস্থা দেখিয়া উপস্থিত সকলেই চিন্তিত হইয়া পাড়লেন। সকলের চোখে অশ্রুধারা নামিয়া আসিল। এইভাবে কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইলে অস্ফুট কণ্ঠে "শ্রীগুরু শ্রীগুরু" বলিতে বলিতে শ্রীগুরুদেব শান্ত হইলেন। ইহা দেখিয়া সকলের হৃদয়ের চিন্তাভাব লঘু হইল।

## ত্রি-কাল সত্য লীলা ঃ

ইহার পর আবার শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর প্রসঙ্গ আরম্ভ হইলে, সেই প্রসঙ্গে শ্রীগুরুদেব আবার আবিষ্ট হইয়া বলিতে লাগিলেন—

"ওখানে কীর্ত্তন-প্রসঙ্গে ঐ কথা জাগলো, ( খড়দহে ) তোমার যে ত্রিকাল সত্য লীলা, তবে সে বস্তু কৈ? অঙ্গ আছে অঙ্গী কি নেই? ওই যে সব আছে ত্রিপুরাসুন্দরী ( যন্ত্র ), নীলকণ্ঠ ( শিবলিঙ্গ ) আর অনন্তদেব ( নারায়ণ শিলা ); তবে সে নিশ্চয় আছে ; তা কি হয়? অঙ্গ থাক্‌বে আর অঙ্গী থাক্‌বে না? আছে আছে, অঙ্গী আছে ওই যে শ্যামসুন্দর, আর রাধাকৃষ্ণমিলিত বপু তো সে, আর অভিন্ন চৈতন্য তনু নিতাই তো? তবে রয়েছে, নিশ্চয় আছে।"

বলিতে বলিতে গর্ব্বের হাসি শ্রীমুখে ফুটিয়া উঠিল, মনোভাবের আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন ঘটিল। শ্রীনিতাই-তত্ত্বের সহিত ইঁহার কি অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ! অল্পক্ষণ পূর্ব্বেই যাঁহার ক্রন্দন ও ব্যাকুলতার চেষ্টা প্রকাশ পাইয়াছিল, সেই পুরুষই আবার শ্রীনিতাই চাঁদের প্রসঙ্গে আনন্দে পুলকিত হইয়া উঠিলেন।

---

লীলায় তেমনি সেব্য বিগ্রহ শ্রীগৌরাঙ্গের পরিপূর্ণ সেবাশক্তি শ্রীনিত্যানন্দ। সেবাশক্তির কাজ হইল সেব্যকে সর্বতোভাবে সুখী করা এবং নিজে অশেষ ক্লেশ বরণ করিয়া সেব্যকে সকলপ্রকার ক্লেশ হইতে রক্ষা করা। তাই, যখন রাধাভাবে শ্রীগৌরাঙ্গ নিজে কৃষ্ণ হইয়াও কৃষ্ণনামে মত্ত হইয়া ভূতলে আছাড় খাইতে লাগিলেন, তখন তাহা দেখিয়া সেবাশক্তি নিতাইচাঁদের বড়ই কষ্ট হইল। সেজন্য তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের কাছে কাছেই থাকিলেন। যখন শ্রীগৌরাঙ্গ কৃষ্ণনাম করিতে করিতে আছাড় খাইতে যান তখন শ্রীনিতাই তাঁকে ধরিয়া রাখেন, ধরিতে ধরিতেও তিনি এক এক সময়ে মাটিতে পড়িয়া যান। এই কষ্ট লইয়া নিতাইসুন্দর মনে মনে থাকিতেন। যখন শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাসগ্রহণের বাসনা হইল তখন শ্রীনিতাই ভাবিলেন "এই ফাঁকে আমি আমার মনের সাধ পূর্ণ করিব। আমিই হইব আমার সেব্য শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাসীবেশ। তিনি যখন হা কৃষ্ণ বলিয়া মাটিতে আছাড় খাইবেন তখন সে আঘাত আর তাঁর গায়ে লাগবে না। লাগবেআমাতে।" তাই, শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাস বেশ শ্রীনিতাইর স্বরূপ।

## সেবা ও সেবক

এই ভাবেই মৃদু মধুর হাসিতেছেন এমনি সময়ে শ্রীযুক্ত নফর দাস আসিলেন বারুইপুর ( ২৪-পরগণা ) হইতে। ওখানে শ্রীগুরুদেবের একটী আশ্রম আছে। ইহা শ্রীমন্মহাপ্রভুর পদাঙ্কিত ভূমি শ্রীল অনন্তাচার্য্যের শ্রীপাট। সেখানে ঠাকুর সেবায় সামান্য বিঘ্ন হইতেছে, যিনি ভোগ প্রস্তুত করেন তাঁহার ইচ্ছা, ঠাকুরের প্রয়োজনের অতিরিক্ত আর রন্ধন করিবেন না। এই কথা নফর দাস শ্রীগুরুদেবকে জানাইলে তিনি সেবকের দৃষ্টি ভঙ্গীতে বলিলেন :—

"হ্যাঁ রে! সেবক আবার কি রকম? তিনি ( শ্রীবড় বাবাজী মহাশয় ) একবার পুরীতে থাকার সময় শ্রীহরিদাস ঠাকুরের সেবায় গোলমাল হচ্ছিলো, শেষটা তাঁর ( শ্রীবড় বাবাজীর ) আদেশ ব'লে নিয়ম কানুন লেখা হোলো, তাতে বলা হোলো, যে সেবক হবে তার সীমা ঘর থেকে পায়খানা পর্য্যন্ত, আর বলা হোলো যে আদেশ পালন না করবে সে আমার ত্যজ্য, তাই শুনে বল্লাম উঁহু ওটা ঠিক হ'লোনা, ত্যজ্য কি রকম? তার অভাব টুকু ঘুচিয়ে তুমি পূর্ণ করে যোগ্য ক'রে নাও, তবে তো?"

বলিয়া অলক্ষ্য দৃষ্টিতে মৌন হইলেন। একটু পরেই আবার হাসি মুখে বলিলেন :—

"ছাখ! এদের মনে জাগছে ( আশ্রম সেবকের প্রতি লক্ষ করিয়া ) আমি জানি ও জানে না, ওই আমিতেই তো খেয়েছে, তোমার ওই "আমি" ইতো ওর মধ্যে ঢুকেছে, সেও ব'লছে আমি জানি ও জানে না, এই বাঘে ধরার মত না? আমার মনের হিংসা বৃত্তিই তো বাঘের রূপ, সে তখন নিজের স্বজাতি মনে করে আলিঙ্গন ক'রে; আর তুমি বলো বাঘে ধ'রেছে, বাঘে কি করে ধ'রবে গো, তোমার হিংসাই তো তোমাকে ধ'রেছে, তাকে দেখেই তো তোমার বৃত্তি জেগে উঠেছে"

শ্রীগুরুদেব তাঁহার অনুগতদিগকে প্রত্যক্ষভাবে কোন আদেশ বা উপদেশ দিতে কুণ্ঠাবোধ করেন। কারণ, যদি কোন অনুগত তাঁহার বাক্য পালন করিতে না পারে তবে অপরাধভাগী হইবে। এইজন্য তিনি উপরোক্ত বিষয়টীর মধ্যে কর্ত্তব্যের ইঙ্গিত মাত্র করিলেন। তারপর "মূকং কোরতি বাচালং" সম্বন্ধে একটী ঘটনা বলিতে লাগিলেন—

"দেখ, একবার বহরমপুরে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্মিলনীর বিরাট আয়োজন হয়। সভায় বহু পণ্ডিত বক্তা এসেছেন, আমরাও গিয়েছি। "মুকং করোতি বাচালম্" ব্যাখ্যা আরম্ভ হোলো। দশ বার মিনিট করে বক্তৃতা, সে কি সম্ভব? অনেকেই বল্লেন—বোবার কথা হয়, অচলকে সচল করে। আমাদের কাছে ছিলেন রেবতীমোহন সেন। ইনি বোবা কালা স্কুলে পড়ান। আর ছিলেন সুন্দরীমোহন। ওদের বক্তৃতা শুনে আমার মনে হোলো তাই না কি? বোবার বোল ফুটে, অচল সচল হয়! তা হোলে ত এরা দুজন ঈশ্বর? না গো না, তা নয়। এসব এ রাজ্যের কথা নয়। তা হোলে এরাই সব হয়। ও হোলো

সেখানের কথা। যাকে বলান, তাকে দিয়ে অনেক করান, সে রাজ্যে এ রাজ্যে একেবারে উল্টো।"

বলিয়াই যেন ঐহিক জগতের প্রতি উপেক্ষা করার ভাবে মৌন হইলেন। নয়টা বাজিল। ভক্তবৃন্দ প্রণাম করিয়া উঠিতে লাগিলেন। শ্রীগুরুদেব আর কাহারও দিকে দৃষ্টি না দিয়া মৌন-গম্ভীরভাবে নাম করিতে লাগিলেন। আজ যেন এই সময়টুকু উপক্রম ও উপসংহারে গাম্ভীর্য্যের পরিবেশেই কাটিল।

## ১৩৫৪ সাল ১৩ই মাঘ সকাল ৬॥ হইতে পৌনে ৯টা।

আজ নিত্য দর্শন-প্রার্থীদের মধ্যে শ্রীনন্দলাল পাল, শ্রীমাখন সাহা, রায়সাহেব শ্রীযোগেন্দ্র মোহন দত্ত প্রভৃতি আমাদের বিশিষ্ট গুরু ভ্রাতারাও উপস্থিত আছেন।

মধ্যমণির মত তাঁহাদের পরিবেষ্টনে শ্রীগুরুদেব বসিয়া আছেন। তাঁহার অঙ্গে সুতি বৈষ্ণবীয় বেনিয়ন, এক জোড়া গরম চাদর, মস্তকে শীতকালীন বৈরাগীর টুপি, চরণ দুখানি পর্য্যন্ত শীতবস্ত্রে আবৃত, হাতে নাম মালা, ওষ্ঠাধরে নাম জপের কম্পন, শান্ত সৌম্য মূর্ত্তি, অপলক দৃষ্টি, আপনার আস্বাদ্য রসে মগ্ন হইয়া প্রথম কুসুমবিকাশ তুল্য মৃদু হাসির সহিত মৌন হইয়া রহিয়াছেন। আর বোধ হয় নিকটবর্ত্তী গৃহ হইতে নিত্য সঙ্গী সেবকগণের সুমধুর প্রভাতী কীর্ত্তনই বুঝি আস্বাদন করিতেছেন, অথবা ঐ কীর্ত্তনের ধ্বনিতে নূতন কোন অঙ্কুর উঠিয়াছে তাহারই আস্বাদনে বিভোর হইতেছেন।

কিছুক্ষণ এইভাবে থাকার পর মুক্তকণ্ঠে গাহিলেন—

"বেলা গেল তোলরে পসার
বেচা কেনা হোলো সার।
লাভ করিতে এলাম হাটে
এসে লাভে মূলে সব হারালাম
ফল কি হবে
এমন বেচা কেনা কেউ কি করে
ডুবে মরি রে মন
ঐ দেখ অকুল পারাবার॥"

গান খানি সমাপ্ত করিলেন কি অসমাপ্ত রাখিলেন বুঝা গেল না, আপনার আস্বাদ্য রসে আপনি মাতিয়া রহিলেন। তারপর হয়ত অনুগতগণের মধ্যে কাহারও কোন ত্রুটির প্রতি লক্ষ্য পড়াতে উদাসীর স্বরে বলিলেন—

## সাবধান বাণী ঃ

"সব তো স্বার্থ-মিশ্রিত পরমার্থ, বিশুদ্ধ পরমার্থ কৈ ? সে হোলে অল্পেই কাজ হয়, পাগলামি টাগলামি ক'রে সে তো [ শ্রীবড় বাবাজী মহাশয় ] চোখে আঙ্গুল দিয়ে ঐ সব দেখিয়েছে।"

বলিতে বলিতে গভীর নৈরাশ্যের দৃষ্টিতে মৌন হইলেন। যাঁহার শ্রীমুখখানি দেখিলে নব নব আশার সঞ্চার হয়, তাঁহার এই নৈরাশ্যপূর্ণ দৃষ্টিতে অনুগত জনের মন স্বভাবতঃ শঙ্কিত হইয়া উঠে। তারপর আরও যেন দুঃখিত হইয়া বলিলেন,—

"ওগো অস্থানে বস্তুর আরোপই অপরাধ, যে যা নয় তাকে তাই মনে করাই অপরাধ"—

"দেখ সেই একবার সাঁওতালরা এসে ব'ল্লে, যাদের নিয়ে ঘর কর তাঁদের মধ্যে তো ভূত, যে সরষে দিয়ে ভূত তাড়াবো সেই সরষেতেই তো ভূত দেখছি, ঝাড়বো কি দিয়ে ? বোঝো তা হোলে, ওই যে শুনেছিলাম "দশ ইন্দ্রিয়ে করে পাপ জীবের গলায় দড়ি"। ভারী পাকা কথা, না ?—"

"ওই যে সব তোমাদের বলে না—

আহারাৎ গাত্রসংস্পর্শাৎ নিঃশ্বাসাৎ সহ ভোজনাৎ
প্রসঙ্গাচ্চাপি ভাবাংশ্চপরস্পৃষ্টানুলেপনাৎ।
মনোবৃত্তিবিকল্পেন সংক্রামন্তি নরান্নরম্॥"*

তবে যাবে কোথায় ? ওই সব মনোভাবগুলি চোখে চোখেও তো সঞ্চার হয় ; নইলে এত সব গোলমাল হয় কেন ?

এইকথা বলিয়া বিশেষ দৃষ্টিদ্বারা যেন কাহারও উদ্দেশ্যে সংস্কার সাধন করিলেন। বোধ হয় সাময়িক ভাবে শ্রীগুরুদেবের সঙ্গছাড়া হইয়া অন্যত্র অবস্থিত কোন সংসারত্যাগী অনুগতের আচরণের প্রতি লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিলেন অথবা সংসার আশ্রম ত্যাগীর এইরূপ কর্ত্তব্য জানাইবার ছলে অনুগতের অনাগত দোষ সংশোধন করিলেন।

কথায় আছে—"পরিবারের পাপ কর্ত্তার মাথায়, রাজ্যের পাপ রাজার মাথায়, শিষ্যের পাপ গুরু চরণে।" শ্রীগুরুদেব সেই আবেশেই যেন আবার বলিলেন—

"হুঁ, খুনের দায়ে হুকুমদাতারও ফাঁসী হয়, আবার যারা তা করে তাদের জেল হয়, তবেই বোঝো কি হ'চ্ছে, কোথায় কে কি করলে আর ভোগ বেটা তুই। কি আর বলি,

---

* শ্লোকটির অর্থ—আহার, গাত্রসংস্পর্শ, নিঃশ্বাস, অপরের বস্ত্র ধারণ, অপরের গন্ধমাল্য প্রভৃতি ধারণ ও অনুলেপন করিলে অপরের মনোভাবগুলি এক হইতে অপর মনুষ্যে সংক্রামিত হয়।

স্পষ্ট ব'ললে ব'লবে কঠিন শাসন ক'রছে, আর পালন না হ'লে ব'লবে অপরাধী করলেন, আর না ব'ল্‌লেও বুঝবে না কি ক'রছি...............”

এই কথা বলিতে বলিতে চক্ষু বন্ধ করিলেন, পাশ দিয়া জল ঝরিয়া পড়িল, কর্ণ দুইটি লাল হইল; 'শ্রীগুরু শ্রীগুরু' বলিয়া মৃদুমুক্ত-কণ্ঠে কাঁদিতে লাগিলেন।

তাহার পর শ্রীগুরুদেব ভাবান্তরে আসিয়া গার্হস্থ্য ধর্ম্মে যে **অতিথি সৎকার** একটা বড় জিনিষ সে সম্বন্ধে বলিতে লাগিলেন—

**“ওগো বর্ণাশ্রম ধর্ম্মেও সব হয়। আশ্রম ধর্ম্মে** ( গার্হস্থ্য ধর্ম্মে ) **আতিথেয়তায় মহৎ কৃপালাভ হয়, কোন মহাপুরুষ দোরে এসে হয় তো ফিরে গেলেন, তাতেও করুণা লাভ হয়। তাঁরা বলেন আহা এরা** ( গৃহস্থেরা ভগবানকে ) **ভুলে আছে! ব্যস কার্য্যসিদ্ধি”**

## ভক্তি।

বলিতে বলিতে গৃহীর দ্বারে প্রত্যাখ্যাত অথচ কল্যাণকামী পুরুষের মতই চাহিতে লাগিলেন। আবার ভক্তির কথা উঠিলে বলিলেন,—

**“জান গা! ও হ'চ্ছে যেন সতী পতি। ওই তো নিষ্ঠা, না কি বল? কেউ যদি কেবল গুরু গুরু বলে, তাতে কি তার স্থিতি স্থান হবে না? নিশ্চয় হবে”**

বলিয়াই যেন পতিনিষ্ঠায় সরমভরা নয়নে চাহিতে চাহিতে 'শ্রীগুরু শ্রীগুরু' স্মরণে হুঙ্কার করিলেন। বিনীতস্বভাবা রমণীর কোমলতা শ্রীমুখে ভাসিয়া উঠিল। কি আশ্চর্য্য! যখন যে প্রসঙ্গটী হইতেছে, তাহার বিষয় বস্তু স্মরণ করিবা মাত্র সেই ভাবাপন্ন হইতেছেন।

## অবতার ও মহৎ কৃপা

ইতিমধ্যে আর কেহ কোন প্রসঙ্গের আরম্ভ করেন নাই, শ্রীগুরুদেব হাস্য গম্ভীর মুখে বসিয়া আছেন, মাঝে মাঝে বাম হস্তের তর্জ্জনীর অগ্রভাগ দ্বারা ভ্রূমধ্য স্থানটীকে স্পর্শ করিতেছেন; আর কঠিন-কোমল মুখে বসিবার আসনটীর দিকে চাহিতেছেন। মনে হইল শ্রীগুরুদেব যাহা বলিবেন, তাহাতে নিজ আচরণের প্রয়োজন আছে বলিয়া সুযোগের অপেক্ষা করিতেছেন; একটু পরেই কেমন করিয়া কৃপাতেই কৃপাভোগের আধার প্রস্তুত হয় এবং তাহার স্বভাব হয় কিরূপ দীন নম্র কাঙ্গালের, তাহা বুঝাইবার জন্য নিজে অধোবদনে থাকিয়া কাঙ্গালের স্বরে বলিলেন—

“এখন সব অবতার অবতার করে চেঁচাচ্ছে। আরে ওতে যে অনেক ফেরে পড়বি। ফেরে পড়বার দরকার কি বাবা, সোজা পথে চল এগিয়ে যাবি। বড়ো দুঃখ হয় এদের

দেখিলে, তবে হবেই হবে, যাবে কোথায়, বস্তু শক্তি যাবে কোথায়, তবে কি জান ? এই যে তোমাদের বিজ্ঞান, এ ওত সাধনা, দেখ দেখি বিজ্ঞানসাধকের আজ অবস্থা। কত শীগ্‌গীরী সব পৌঁছে দিচ্ছে। এমনি মহৎকৃপা, ওরা তাড়াতাড়ি পৌঁছে দেয়। মহৎকৃপার স্বভাবই হলো তাই।"

বলিয়াই যেমন অবস্থায় বসিয়া নাম করিতেছিলেন সেই ভাবেই রইলেন। কাহারও দিকে ফিরিয়াও চাহিলেন না। প্রায় ৯টা বাজে, এই মহা উদাসীর পরিবেশ হইতে ভক্তবৃন্দ একে একে প্রণাম করিয়া বাহিরে আসিলেন।

## সাধকের ভোগ সবার উপরে

১৩৫৪ সাল ১৬ই মাঘ। সকাল ৬টা হইতে ৯টা

প্রায় ৬টা বাজিয়া গিয়াছে। পূর্ব্ব দিনের মতই শ্রীগুরুদেবের শ্রীঅঙ্গে শীতকালোচিত অঙ্গাবরণ। বড় মধুর পরিবেশে শ্রীগুরুদেব অনুগতজনে বেষ্টিত হইয়া বসিয়াছেন। শ্রীমুখে মধুর হাসি, দৃষ্টি অর্দ্ধ নিমিলিত। সেই সুন্দর দৃষ্টিতে সম্মুখে উপবিষ্ট ভক্তগণের দিকে চাইতেই একজন প্রশ্ন করিলেন—

বাবা! শ্রীরাধা-রাধারমণের ভোগপরিণতি শ্রীগৌরাঙ্গে। তিন বাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাভাবদ্যুতিসুবলিত হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গ হইলেন। তারপর কি আবার আকাঙ্খা জাগা অসম্ভব ?

প্রশ্ন শুনিয়া শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখমণ্ডলে দিব্যজ্যোতি খেলিয়া গেল। অর্দ্ধ নিমিলিত চক্ষু দুইটী উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। মধুর হাসিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন—

"ওই তো তার (শ্রীবড় বাবাজী মহাশয়ের), কথা আছে—ওরে সাধকের ভোগ সর্ব্বোপরি। নিত্য নিত্য নব নব ভোগের আকাঙ্খা জাগে, ওর কি সমাপ্তি আছে? জীবের আর ভোগ কোথায়! ভোগ তো তার, তার আবার সাধকের ভোগে বাসনা জাগে; সে তো অনন্ত, আর অনন্ত কালও থাকবে, ওগো পেছনে মজা, রস আখ্যা সেখানে, ঐ যে দিনে দিনে বাঢ়ল অবধি না ভেল।"*

---

* শ্রীকৃষ্ণের আর একটি নাম অনন্ত। সকল দিক দিয়াই তাঁর কোন কিছুর অন্ত নাই! এই জন্য রসাস্বাদনের আকাঙ্খারও তাঁর অন্ত নাই। কারণ, তিনি রসিকশেখর। তাঁর মত রসভোক্তা আর দ্বিতীয় নাই। তিনি অশেষ বিশেষ রূপে রস আস্বদন করিতে চান, সুতরাং গৌর রূপে তাঁহার তিন বাঞ্ছা পূর্ণ হইলেও আবার সেই স্বরূপে আর কোন আকাঙ্খা জাগবে না, তা নয়। সুতরাং যাঁহারা গৌরের ভক্ত হইল তাঁহাদের আবার ভোগ কি প্রকার তাহাও আস্বাদনের জন্য গৌরের ইচ্ছা জাগিতে পারে।

বলিতে বলিতে থামিয়া গেলেন। চক্ষু দুইটী বন্ধ হইয়া গেল, গলায় ঘর্ ঘর্ ধ্বনি হইতে লাগিল, নির্ম্মল গণ্ড বহিয়া নয়নের জল ঝরিয়া পড়িল। দক্ষিণ করের নাম মালা জপ স্থির হইল, বামকরের অঙ্গুলি নাড়িয়া তাল দিতে লাগিলেন। যাঁহারা শ্রীগুরুদেবের সংকীর্ত্তন-কালীন অবস্থা দর্শন করিয়াছেন তাঁহারা বুঝিবেন—"প্রেমসিন্ধু গোরা রায়" কীর্ত্তনের "গৌর গুন্ গুন্ গুন্ গুন্ রবে" এই পদ্যাংশটুকু গাহিবার সময় যেভাবে বাম করে তাল সঞ্চালন করেন প্রায় ৩।৪ মিনিটকাল সেইরূপ করিয়া ভাবস্থ হইয়া রহিলেন।

## সাধনের ক্রম ও মহৎ কৃপা ঃ

আবার চক্ষু খুলিয়া সন্ধানী দৃষ্টিতে চাহিয়া নিজেই প্রসঙ্গ তুলিলেন—

**"শুন্‌ছো, যদি বল এই যে সাধনের ক্রম পদ্ধতি আছে, আর মহৎ কৃপায় তো একেবারে সব ডিঙ্গিয়ে সেখানে যায়, তবে ক্রম সাধনের মর্য্যাদা থাকে কোথায়? ছাখ, 'ছ'তালায় যদি লিফ্‌টে ওঠে একেবারে, তবে কি সে তালায় তালায় যায় না? যায়, ছোঁয়, তবে কি জান! তার ওতে অনুভূতি থাকে না, এও তাই, মহৎ কৃপায় একেবারে হয়, হলেও ক্রমে হয়, কিন্তু অনুভূতি থাকে না।"†**

## ভক্তিপথে প্রাথমিক পাঠ্য নির্ব্বাচন ঃ

ইহার পর শ্রীগুরুদেব ভাবান্তরে আরূঢ় হইয়া ভক্তিরাজ্যের যাঁহারা সবেমাত্র প্রবেশ করিতেছেন তাঁহাদের কোন গ্রন্থ অগ্রে অনুশীলনীয় তাহা বলিতে লাগিলেন—

---

সর্ব্বভক্ত-শিরোমণি শ্রীরাধার ভাব আস্বাদন করিতে শ্রীকৃষ্ণের যেমন ইচ্ছা জাগিয়াছিল শ্রীগৌরাঙ্গের পক্ষে তেমনি সর্ব্বভক্তশিরোমণি শ্রীশ্রীনিতাইর ভাব আস্বাদনে শ্রীগৌরাঙ্গের ইচ্ছা জাগিতে পারে।

আমাদের মত কলিহত মায়ামুগ্ধ জীবের ভোগাকাঙ্খা এবং মায়াতীত ভগবানের রসভোগ আকাঙ্খার মধ্যে তফাৎ আছে। জীবের ভোগাকাঙ্খা জীবকে লইয়া যায় দুখের অতলতলে। ভগবানের রসভোগের আকাঙ্খা আনন্দ স্বরূপ ভগবানকে আনন্দ রসে ডুবায়। আনুষঙ্গিক ভাবে জগতও কৃতার্থ হয়।

†শাস্ত্রকারগণ দুই প্রকার সিদ্ধির কথা বলিয়াছেন—"সাধনায় সিদ্ধি, কৃপায় সিদ্ধি।" আমরা ইহার অর্থ বুঝি—যাঁহারা সাধনে সিদ্ধি লাভ করেন তাঁহারা ক্রম পর্য্যায়ে সিদ্ধির পথে অগ্রসর হন। আর যাঁহারা মহতের কৃপায় সিদ্ধি লাভ করেন তাঁহাদের আর সাধন থাকে না বলিয়া সাধনের ক্রমপর্য্যায়ও থাকে না। তাঁহারা সোজা সোজি একেবারে ভগবৎ পাদপদ্ম লাভ করেন। কিন্তু শ্রীগুরুদেবের উপরোক্ত শ্রীমুখ উক্তিতে এখন জানা যাইতেছে—কৃপাসিদ্ধিতেও সাধন আছে, সাধনের ক্রম পর্য্যায়ও আছে। তবে মহতের কৃপার বলে সে সাধন এত তাড়াতাড়ি কাজ করে যে—সাধকের সাধনক্লেশ এবং সাধনের ক্রম পর্য্যায় অনুভূতির মধ্যে আসে না। তখন মনে হয় যেই মহতের কৃপা হইল অমনি ভগবৎ পাদপদ্ম লাভ হইল।

"ছাখ, সবাই ভগবানের কথা শুনছে, শ্রীমদ্‌ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্য-ভাগবত। আরে এতে তো তাঁর কথা আছে, আগে এসব শুনে কি কর্‌বে? তাতে তো তাঁর কথা আছে, তোমার কথা কৈ? তুমি কোথায় যাবে, কেমন করে যাবে, সেটা কোথায় আছে জান? ভক্তকথায়, ভক্তের কথা শোনো, প্রাপ্তির পথ বলা আছে, তোমার অবস্থা বলা আছে, তাতেই সব জানতে পারবে, ভক্ত ছাড়া তোমার অবস্থার কথা আর কে বলবে, আগে থেকে তাঁর অবস্থা জেনে কি ক'রবে?"

বলিয়া বক্র দৃষ্টিতে চাহিয়া হাসিলেন। মনে হইল যেন অধ্যাপক তাঁহার ছাত্রের পাঠ্য পুস্তক নির্ব্বাচন করিলেন, এবার ভক্তরূপী শ্রীগুরুদেবের চরণতলে বসিয়া তাহা অধ্যয়ন করিতে হইবে, তাহা না হইলে হৃদয়গ্রন্থি সকল ভিন্ন হইবে না সংশয় সমূহ ছিন্ন হইবে না আর কর্ম্ম বন্ধনেরও ক্ষয় হইবে না।

## স্বাধীনতা :

এইসময় কে, এন, দালাল ( নাথব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ) আসিলেন। ইনি দিল্লী যাইবেন সেই জন্য শ্রীগুরুদেবের আশিষ লইতে আসিয়াছেন। ভক্তবৃন্দের কানা-কানি কথায় শ্রীগুরুদেব বুঝিলেন, দিল্লী যে এখন কংগ্রেসের হেড অফিস্। দেশ এখন স্বাধীন, ভারতের কেন্দ্রীয় রাজধানী এখন দিল্লীতে। তাই মৃদু হাসিয়া বলিতেছেন—

"স্বাধীনতা কোথায়? যখন তাতে মতি থাকবে, স্ব অধীন হ'য়েও তাঁরই অধীন, তবে না স্বাধীন। কিগো তোমাদের পাঁজিপুঁথিতে 'স্ব' মানে তো তাই না?"

বলিতে বলিতে তাঁহার ভাবান্তর হইল; যিনি বৈষয়িক সামান্য কথা শুনিলেও কেবল মাত্র উদাসীর মত 'হুঁ' মাত্র করেন তিনি আজ অকস্মাৎ 'স্বদেশ স্বদেশ' বলিয়া হুঙ্কার করিলেন, বাহ্য আবেশ লুপ্ত হইল, মুক্ত মধুর কণ্ঠে গাহিতে লাগিলেন—

"এবার ভবে পথ ভুলে এসেছি।
নইলে কেন যতই চলি ততই চলেছি॥
মেলেনা পথের শেষ,
চল্‌তে গেলে কান্না আসে, কোথায় আমার দেশ,
বলেনা কেউ বলেনা,
খুঁজেতো পথ মেলেনা
চরণ তো আর চলেনা হতাশ হ'য়েছি॥"



গান বন্ধ হইল। শ্রীগুরুদেব আজ কি ভাবে মত্ত কে বলিবে? শুনিয়াছি যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা ইষ্টস্ফুর্ত্তি। বোধ হয় শ্রীগুরুদেব এইটি প্রত্যক্ষ করাইলেন। দেখাইলেন যে

শাস্ত্রবাণী মিথ্যা নয়, এ অবস্থা নিশ্চয় ঘটে। তাহা না হইলে স্বাধীনতা আর স্বদেশ শব্দটী শুনিবা মাত্র তাঁহার এইরূপ ইষ্টস্ফূর্ত্তির অনুভাবটি কি করিয়া হয় ?

## চিত্রপট দর্শন ঃ

এইবার যেন শ্রীগুরুদেব সহজ মানুষ হইলেন, উপস্থিত ভক্তবৃন্দ সাহস করিয়া দু'চারটি কথা আরম্ভ করিলেন, শ্রীগুরুদেবও কখন মস্তক দোলাইয়া কখনও মাত্র 'হুঁ' বলিয়া প্রসঙ্গ শুনিতে লাগিলেন। যাঁহার মনে যাহা নিবেদন করিবার ছিল সবই দ্রুত জানাইতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে আবার ভাবান্তরে আসিয়া শ্রীগুরুদেব বলিতে লাগিলেন—

**'দেখ' আজ মনে জাগ লো, ঐ যে দেখছ চিত্রপটটি, ওটি মোহিনীরূপ দর্শনে মহাদেবের মোহ। তাই না কি ? তাঁরও ঐ অবস্থা ?**

বলিয়া উচ্চকণ্ঠে হাসিলেন আবার বলিলেন—

**"ওকি আর তাই ? তবুও দেখ, বোঝা ভার।"**

এই বলিয়া—মৃদুকণ্ঠে আবার গান গাহিলেন

**"আজব দুনিয়া একি দেখি আজব কারখানা।**<br>**মরছে লোকে সর্ব্বদাই**<br>**শ্মশানেতে হচ্ছে ছাই**<br>**তবু লোকে ব'লছেরে মন**<br>**আমার মরণ হবে না।"**

এই পর্যন্ত গাহিয়া খুব হাসিতে লাগিলেন। মধুর হাসিতে মুখ ভরিয়া গেল।

## শ্রীগুরু তত্ত্ব ঃ

আবার আবিষ্টভাব, আজ ভাণ্ডারের দ্বার খুলিয়া গিয়াছে। ভোক্তাদের ক্ষুধা আছে কিনা জানিবার অবসর নাই। তাই, কোন দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া আবার বলিলেন—

"শোনো শোনো, গুরুতত্ত্ব হোলো নিতাইতত্ত্ব, তাকে গৌরই গুরুরূপে রেখে দিলেন, **এই কেমন জান, যেমন বুনোহাতীকে ধরতে হ'লে একটী কুটনী হাতী চাই, এও তাই, বুনোজীবকে ধরতে হ'লে ওকে চাই। ও ধরবে আর ধীরে ধীরে নামশক্তির প্যাঁচ দেবে ;** ব্যস্ তাতেই হবে ; গুরুস্বরূপই হোলো নিতাই স্বরূপ, ও ছাড়া আর কে গুরু হবে ; ওই ধ'রে ধ'রে বাঁধবে।"

মুখে বুকচাপা হাসি, যেন গোপন রহস্য ফাঁস করিয়া দিলেন, ঢাক্ ঢাক্ গুড় গুড় আর রাখিলেন না। আবার ঈষৎ আনতমস্তকে নিজ করের নাম মালার দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিতে লাগিলেন, শ্রীমুখে মধুর হাসির সহিত চতুর ভাবটী প্রকাশ পাইতে লাগিল।

## প্রণতির রীতি।

এমন সময় এক ব্রজবাসী আসিলেন, শ্রীগুরুদেব আসন হইতে উঠিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহার চরণে মস্তক স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলেন, সবিনয়ে মর্য্যাদা দান করিয়া আলাপ করিলেন, তারপর করযোড়ে অন্য একটি গৃহে বসিবার জন্য তাঁহাকে জানাইলেন। নিত্য সেবক কোন অনুগতকে ব্রজবাসীর জন্য বাল্য ভোগের ব্যবস্থা এবং যথা মর্য্যাদা দক্ষিণান্ত করিবার জন্য ঈঙ্গিত করিলেন। ইত্যবসরে ব্রজবাসীর চরণে শ্রীগুরুদেব মস্তক স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিনে বলিয়া কোন ভক্তের নিকট হইতে প্রশ্ন উঠিল—

বাবা! কেউ যদি পায়ে মাথা না ঠেকিয়ে প্রণাম করে, তবে তাতে কি কোন অপরাধ হয়? আপনি করেন, আমরা করি কৈ? পায়ে মাথা ঠেকানোটা বার বার হয় না ব'লে দূর থেকে প্রণাম করতে ইচ্ছে হয়।

**শ্রীগুদেব—"যতটা আসে মর্য্যাদা ক'রে যাওয়া ভাল, তারপর সময়ে হ'য়ে যাবে"**

এই বলিয়া নিজ আসনে বসিলেন। কয়েকটি কথা প্রসঙ্গের পর পুনশ্চ বলিলেন—

## বৈষ্ণব শরীরে হয় কৃষ্ণের বিলাস

"দেখ, এই: যে সব শোনা গেছে "বৈষ্ণব শরীরে হয় কৃষ্ণের বিলাস," কি বুঝলে,? রহস্যটা শোন, কোন বৈষ্ণব হয়ত খুব রেগেছেন, কৃষ্ণের বিলাস কি ক'রে ভাববে জান? এতে তখন নরসিংহভাবের খেলা আরম্ভ হ'য়েছে। আর হয়ত কোন বৈষ্ণবের লোভ দেখা দিয়েছে, তাতে ক'রে কিছু ঘটিয়েছেন, কি ভাববে? প্রভু-বামনের আবির্ভাব হ'য়েছে। এমনি হয়তো সেই বড় ব্যাপারটার কিছু লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে, অমনি তখন সেই নন্দকিশোরের খেলা ভাবতে হবে।"

এই বলিয়া কিছুক্ষণ মৌন হইলেন, প্রিয় নামটী উচ্চারণ করিয়াই যেন এ রাজ্যের সব ভুলিয়া গিয়া পরমানন্দময় শ্রীগুরুদেব পরমানন্দেই মগ্ন রহিলেন, ওদিকে ঠাকুরের বাল্যভোগ সমাপ্ত হইয়াছে, ৯টা বাজিল, এদিকে বিলম্ব হইলে পূর্বাহ্ন কৃত্য ও মধ্যাহ্ন কৃত্যের বিলম্ব হইবে। একেই তো ভোলানাথ স্বরূপকে মাতাইলে আর বাহ্য আবেশ থাকে না, তাহাতে আবার উপস্থিত অনুগত বৃন্দের সহিত অনুভাবিত প্রসঙ্গের আদান প্রদান ঘটিলে পাঠ, স্মরণ, বন্দনা প্রভৃতি নিত্যকৃত্য সমাপন করিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিতে ৩৷৷০ টা বাজিয়া যায়, সেই বুঝিয়া ভক্তবৃন্দ একে একে প্রণাম করিয়া বাহিরে আসিলেন।

---

১৩৫৪ সাল, ২০শে মাঘ ( সকাল ৬৷৷০—পৌনে ৯টা )

## সাপের ছোবল ঃ

আজ শ্রীগুরুদেবের দর্শনের জন্য তাঁহার চরণাশ্রিত বহু বিশিষ্ট ভক্ত উপস্থিত হইয়াছেন, শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখনিঃসৃত কথামৃত পান করিয়া আনন্দসাগরে ভাসিতেছেন। একটী একটী প্রশ্ন উঠিতেছে আর শ্রীগুরুদেব সহজ ভাষায় তাহার সমাধান করিয়া দিতেছেন। প্রসঙ্গক্রমে শ্রীগুরুদেব বলিলেন—

**"ওঃ আগে সব চারদিকে কী নামপ্রসঙ্গ হোতো, দিবারাত্রি যেন সব আনন্দে পাগল। আর আজকাল সে সব নাই ; কোথায় সব ফুঁঃ—"**

একজন প্রশ্ন করলেন—কেন এমন হোলো ?

**শ্রীগুরুদেব—"ওকি জান ? এই যে জাত্ সাপ্ নিয়ে খেলা, তুমি গান কর, সেও বেশ দুল্‌ছে, একটু বেচাল হও, ওমনি ছোবল। ব্যাপারটা বুঝ্‌লে ? অপরাধ, অপরাধে হ'চ্ছে।"**

এই বলিয়া শ্রীগুরুদেব ভীত-দৃষ্টিতে অসহায়ের মত চাহিয়া রহিলেন, চক্ষু দুইটী বিস্ফারিত হইল, অধর ওষ্ঠদ্বয় সঙ্কুচিত হইল, নাম জপের গতি স্তিমিত হইল, ক্রমশঃ সদা-স্নেহ-কোমল নয়ন দুইটীতে কারুণ্যবারি ঘনাইয়া আসিল, 'অপরাধ ভয়ের স্থান অন্যত্র থাকিলেও শ্রীগুরুচরণ সমীপে তাহা থাকে না' এই কারুণ্য ভাবটী তখন শ্রীগুরুদেবের মধ্যে প্রকটিত হইল।

## শান্ত রসই সকল রসের ভিত্তি ঃ

ইহার পর শ্রীগুরুদেবের এক অনুগতজনের কথা উঠিল, ইনি শ্রীগুরুদেবের সঙ্গে থাকিয়া ঠাকুর সেবা করেন। নাম শ্যামচরণ দাস। আজ তাঁহাকে শ্রীগুরুদেবের সমীপে দেখিতে না পাইয়া একজন তাঁহার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীগুরুদেব মুচকি হাসিয়া সহজভাবেই উত্তর দিলেন—

**"ও বড় চঞ্চল, অত চঞ্চলতায় কি বস্তু ভোগ হয়, এক বাবাজী বেশ বলতেন—"হরি বল ধীরে চল, আস্তে আস্তে চল" বড় সুন্দর কথাটী, নয় ? দেখ দৌড়ুতে দৌড়ুতে থামলেই শান্ত হয়, ওমনি কামনা বাসনার দৌড়ন থামলেই শান্ত ভাব, নিষ্কাম ভক্তেরই শান্তভাব হয়, শান্তভাবটী হোলো ভিত্তি, ওতেই তালায় তালায় বাড়ী উঠ্‌বে।"** (ক)

---

(ক) পঞ্চরসে ভগবানের উপাসনা—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্যে, মধুর। কেহ শান্তভাবে ভগবানের উপাসনা করেন। কেহ নিজেকে ভগবানের দাস ভাবিয়া, কেহ সখা, কেহ পিতা বা মাতা এবং কেহ বা নিজেকে তাঁহার কান্তা ভাবিয়া উপাসনা করেন। এই শেষটীর নাম মধুর রস এবং ইহাতে ভগবানকে সকলপ্রকার সুখ দেওয়ার সুযোগ থাকে বলিয়া ইহা সকল রসের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। যে যে রসে উপাসনা করুক না কেন সকল রসের মধ্যে শান্ত রস থাকিবেই। যদি শান্তি রসের অধিকারী না হওয়া যায় তবে কোন রসের উপাসনাতেও অধিকার পাওয়া যায় না। সেইজন্য শ্রীগুরুদেব বলিলেন শান্তভাবটী হলো,

এই বলিয়া হাসিতে লাগিলেন, বড় মিষ্ট হাসি,।

## বস্তু নির্দ্দেশ ঃ

এই অবসরে কি ভাবিয়া যেন কাহার দিকে লক্ষ্য করিলেন, মালাজপরত অবস্থায় তর্জ্জনী অঙ্গুলীদ্বারা বার বার নাসামূল স্পর্শ করিতে লাগিলেন, অস্ফুট বাক্যে কি বলিতে গিয়া আনন্দবিস্ফারিত নয়নেই চাহিয়া রহিলেন, অধরওষ্ঠ দুইটী বাতদোলিত কুসুমের মত কাঁপিতে লাগিল। তাহার পর শ্রীগুরুদেব যেন নিদ্রা ভঙ্গের পর স্বপ্নদৃষ্ট বিষয়ের কথা প্রকাশ করিবার ভঙ্গীতেই বলিতে লাগিলেন—

**"দেখ, বস্তু নির্দ্দেশ শক্তিই শ্রীঅদ্বৈত। ধরোনা এই, খেলোয়াড়কে না দেখলে খেলা কি জমে? জমেনা, এরা সব খেলতে এলো, তারপর খেলা জম্ছেনা, তাই শ্রীঅদ্বৈত ঐ বস্তু নির্দ্দেশ করলেন, খেলোয়াড়কে দেখালেন, ঘরে খেলা জমে গেল, এদিকে নিতাই তাই বাইরে প্রচার করে দিলেন, ওরা ভোগ করতে লাগলো। শ্রীনিতাই হোলো গৌরের ব্যাপক শক্তি, ওই আশ্রয়।" (খ)**

---

ভিত্তি। অর্থাৎ শান্তভাবের উপরই দাস্যসখ্যবাৎসল্য মধুর ভাব প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। যে শান্ত নয়, যাহার চিত্ত ভগবানের উপাসনা করিতে করিতে অন্য দিকে ধাবিত হয় সে কোন কালে ভগবানের যথার্থ উপাসনা করিতে পারে না, ভগবানের উপর তাহার দাস্য সখ্যাদি কোন সম্বন্ধের বোধ আসিতে পারে না। ভগবানেতে চিত্ত স্থির হওয়াই হইতেছে শান্ত ভক্তের লক্ষণ। তাহা না হইলে সে দাস্য সখ্যাদি রসের উপাসনার অধিকারী হইবে কি করিয়া? এই জন্য শ্রীগুরুদেব বলিলেন 'ওতেই তালায় তালায় বাড়ী উঠিবে'। অর্থাৎ শান্তরসের ভিত্তিতেই একতালা দাস্য, দুতালা সখ্য, তিন তালা বাৎসল্য, চারি তালা মধুর রসের উপাসনারূপ সৌধপ্রতিষ্ঠিত হইবে। আবার মন থেকে বৈষয়িক কামনা বাসনা দূর না হইলে শান্ত ভাব আসে না, ভগবানে চিত্ত স্থির হয় না।

(খ) অপ্রাকৃত দাস্য সখ্যাদি রসের খেলায় প্রধান নায়ক হইলেন শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীঅদ্বৈতাদি পরিকরবৃন্দ এ খেলা খেলিবার জন্য ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইলেন। অবতীর্ণ হইয়া দেখিলেন খেলার নায়ক নাই। তবু তাঁহারা নিজেরা নিজেরা খেলিতে লাগিলেন। এখানে ইহাদের খেলা হইতেছে সংকীর্ত্তন। বৃন্দাবনে গোপীরা নায়ক কৃষ্ণের সঙ্গে রাস খেলা খেলিয়া ছিলেন। ইহারা নদীয়ায় সংকীর্ত্তনরূপ রাস খেলা খেলিতে আসিলেন। রাস খেলাটী মধুর রসের খেলা। মধুর রসে দাস্যাদি অপরাপর রসের সমাবেশ থাকে। সংকীর্ত্তনেও তাহা আছে। তাই সংকীর্ত্তনকে রাস বলা হয়। তবু এই সংকীর্ত্তনরূপ রাসের বৈশিষ্ঠ্য আছে। বৃন্দাবনের রাসে ব্রজবাসীদের মধ্যে কেবল গোপীরাই অধিকার পাইয়া ছিল কিন্তু সংকীর্ত্তন রূপ রাসে ভূলোকবাসী সকলেরই অধিকার। এহেন খেলায় খেলার নায়ক না থাকিলেও অদ্বৈতাদি পরিকর গণ নিজেরা নিজেরা খেলিলেন, শ্রীবাসাদিভক্তবৃন্দকে লইয়া নিজেরা নিজেরা সংকীর্ত্তন করিলেন। কিন্তু সংকীর্ত্তন জমিল না। নানা দিক থেকে বাধা আসিতে লাগিল। তাই, শ্রীঅদ্বৈত নায়ক শ্রীকৃষ্ণকে গঙ্গাজল তুলসী দিয়া আহ্বান করলেন। সে আহ্বানে কৃষ্ণ সাড়া দিলেন। তাই পদে আছে—"যদি অদ্বৈত না হইত কেমনে হইত কেমনে ধরিতাম দে। হা কৃষ্ণ বলিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া গৌরাঙ্গ আনিত কে!" তাই, **বস্তু-নির্দ্দেশক** হইলেন শ্রীঅদ্বৈত।

বলিতে বলিতে শ্রীগুরুদেব মাতালের মত ঢলিয়া পড়িলেন। আসন্নবর্ষণোন্মুখ মেঘের মত চক্ষু দুইটী টল টল করিতে লাগিল। একবার পলক পড়িতেই সঞ্চিত জল দুই গণ্ড দিয়া ঝরিয়া পড়িল। মেঘমুক্ত স্বচ্ছআকাশে প্রতিভাত চন্দ্রের মত মুখখানি উজ্জ্বল হইল। এদিক ওদিক চাহিতে লাগিলেন; যেন "আবার বল আবার বল" এইরূপ মনোভাব।

## শ্রীনিতাই গৌর তত্ত্ব।

এমন সময়ে একজন প্রশ্ন করিলেন বাবা! শ্রীনিতাই তো ব্যাপকশক্তি, তা হ'লে শ্রীগৌর কি বাপ্যস্বরূপ?

**শ্রীগুরুদেব—"আরে গৌর তো বিভু, তার ব্যাপক শক্তি নিতাই, ওইতো গুরুতত্ত্ব, জগৎকে ধরে আছে, ভোগ করাচ্ছে, আর নিয়ে যাচ্ছে। আর ওর নামটীই তো বলে দেয় নিত্য-আনন্দ। আর তাঁর নাম শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীর সহিত কৃষ্ণ, তখনি তো চৈতন্য। (গ)**

বলিতে বলিতে পাঠে অভ্যাসরত বালকের মত দুলিতে লাগিলেন। শ্রীঅঙ্গে মাঝে মাঝে কম্পন ও শিহরণ হইতে লাগিল। শ্রীমুখমণ্ডলের কোমল ত্বকে স্নেহ যেন ঝরিয়া পড়িল, কিন্তু অল্প পরেই শরীরের কম্পন থামিয়া গেল। বড় গম্ভীর ভাবের বিকাশ হইল। চক্ষু দুইটী অর্দ্ধ প্রকাশিত, তাহারই মধ্যস্থান বহিয়া প্রণালীবাহী জল ধারার মত নয়নবারি গড়াইয়া পড়িল। কাহারও দিকে দৃষ্টি না দিয়া চক্ষু মুছিয়া প্রিয়তমের আহ্বানে যেন আকৃষ্ট হইলেন। এই সময় নিত্য সেবক নন্দ দাস কতকগুলি কুল আনিয়া বলিল "কুল যে ঠাকুরের ভোগ লাগ্‌বে বল্‌লেন, তা ওযে পাকে নাই আর পাকবেও না।"

শুনিয়া শ্রীগুরুদেবের মুখের গাম্ভীর্য্য আবার লুকাইল। হাসিয়া বলিলেন—

---

(গ) ব্যাপক অপেক্ষা ব্যাপ্য সাধারণতঃ হয় ছোট। ব্যাপ্য যেখানে থাকে ব্যাপক সেখানে থাকিবেই কিন্তু ব্যাপক যেখানে আছে ব্যাপ্য সেখানে নাও থাকিতে পারে। যেমন ধূম-বহ্নি। ধূম যেখানে যেখানে থাকে সেখানে বহ্নি অবশ্য থাকে। কিন্তু বহ্নি যেখানে যেখানে থাকে ধূম তার সবখানে থাকে না। যেমন বৈদ্যুতিক আলোকাদি। সেখানে বহ্নি আছে, ধূম নাই। সুতরাং ব্যাপকের স্থান বেশি জায়গায় থাকার দরুণ ব্যাপক বড়, ব্যাপ্য ছোট। সুতরাং নিতাইয়ের ব্যাপ্য যদি গৌর হন তবে তিনি ছোটই হন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তা নয়। সেইজন্য শ্রীগুরুদেব বলিলেন—গৌর বিভু অর্থাৎ ব্যাপক এবং তিনি যে শক্তিতে সকলকে ব্যাপিয়া আছেন সেই শক্তি হইলেন নিতাই। সুতরাং উভয়ের মধ্যে ব্যাপ্যব্যাপক ভাব নাই। নিতাই ব্যাপ্তিশক্তিস্বরূপ, গৌর ব্যাপ্তিশক্তির আধার স্বরূপ। সুতরাং সূর্য আর তার কিরণের মত অভিন্ন। কেউ কাউকে ছাড়িয়া কখন থাকে না।

"হ্যাঁ ও আবার পাকে না, যার জন্ম হয়েছে, তার কাঁচা পাকা দুইই হয়, তবে কেউ ধরা পড়ে কেউ পড়ে না।" (ঘ)

বলিয়া হাসিতে হাসিতে আসন হইতে উঠিয়া অগ্রসর হইলেন। যেন গম্ভীর সমুদ্রে ঢেউ ভাঙ্গিয়া উচ্ছল লহরী খেলিয়া গেল। কাঁচাপাকা আর ধরাপড়া না পড়ার ইঙ্গিতটী ব্যাপক অর্থেই প্রকাশ করিলেন।

## অপরাধের ভয়

ওদিকে তখনও প্রভাতী নাম কার্ত্তন সমাপ্ত হয় নাই। শ্রীগুরুদেব ঐ স্থানে প্রণাম করিতে যাইবার পূর্ব্বে পুনরায় নিজ আসনে ফিরিয়া আসিয়া বসিলেন। কীর্ত্তনস্থল ছাড়িয়া অনিবার্য্য কারণ ভিন্ন কেহ শ্রীগুরুদেবের নিকট আসিলে তিনি নিজেকে অপরাধী ভাবেন, সেই জন্য অনুগত-বৃন্দকে লক্ষ্য করিয়া যথারীতি আচরণ করিবার জন্য বলিলেন ঃ—

"দেখ, আজ ক'দিন ঐটী মনে জাগছে, আমার চারদিকে নামাপরাধ হচ্ছে, আমি ওখানে ( কীর্ত্তন স্থলে ) থাকতে পারছি না, আর যারা আসছে তারাও ওখানে না ব'সে এখানে চ'লে আসছে, আমিই তো রকম ফেরে তা দিকে নাম থেকে বঞ্চিত করছি।"

বলিতে বলিতে দীনতার সহিত যাচক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন, অনুগত বৃন্দের মধ্যে ভীতিশিহরণ ও চাঞ্চল্য আসিল। করুণাময় শ্রীগুরুদেব ইঙ্গিতে বুঝাইলেন যে প্রিয়তমকে দেখিয়া আত্মসুখী হওয়া অপেক্ষা প্রিয়তমেরও প্রিয়বস্তুর সেবা করা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন।

---

(ঘ) ভগবানেতে আত্মসমর্পণই এখানে 'জন্ম' কথাটীর অর্থ। ভগবৎ পাদপদ্মলাভই এখানে 'পাকা' কথাটীর অর্থ। ইহারই অপর নাম সিদ্ধাবস্থা। আত্মসমর্পণ ও ভগবৎ পাদপদ্ম লাভের মাঝখানে যে সাধনা তাহা কাঁচা অবস্থা। যে ব্যক্তি ভগবৎ পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করে সে নিশ্চয় একদিন ভগবৎ পাদপদ্ম লাভ করে, সাধনাক্রমে কাঁচা অবস্থা থেকে পাকা অবস্থায় উন্নীত হয়। যাহারা এইরূপ পাকা অবস্থারূপ সিদ্ধিলাভ করেন তাহারা সবাই জনসাধারণে নিজেকে ধরা দেন না। কেহ কেহ ধরা দেন। তাই সিদ্ধ পুরুষদের চিনিয়া লওয়া মোটেই সম্ভব নয়। তাহারা দয়া করিয়া যদি চেনা দেন তবেই লোকে চিনিতে পারে।

এখন ফুলগুলি যখন ঠাকুরের ভোগের উদ্দেশ্যে আত্মসমর্পণের মত সমর্পিত হইয়াছে তখন নিশ্চয় পাকিবে, ঠাকুরের ভোগে লাগিবে। তবে তাহাদের পাকা অবস্থাটী তোমরা ধরিতে পারিবে কি না সন্দেহ। আশাকরা যায় শ্রীগুরুদেব ঐ উদ্দেশ্যে ওকথা বলিয়াছেন।

## ব্রজবাসীর প্রীতি

এইভাবে কিছুক্ষণ কাটিয়া গেল, এই সময়ের মধ্যে শ্রীগুরুদেব কীর্ত্তনস্থলী হইতে প্রণাম বন্দনা সমাপন করিয়া নিজ আসনে ফিরিয়া আসিলেন।

অপেক্ষমান দৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন, এমনি সময় শ্রীবৃন্দাবনবাসী এক ত্যাগী বৈষ্ণব আসিলেন, পরস্পর সদৈন্য প্রণতি বিনিময়ের পর ব্রজবাসী বৈষ্ণবের নিকট জানা গেল, সম্প্রতি শ্রীপাদ শ্রীসনাতন গোস্বামীর সমাধি স্থানের উপর বৈষয়িক দ্বন্দ্বের পরীক্ষা চলিতেছে। সমস্ত শুনিয়া শ্রীগুরুদেব বলিলেন :—

"দেখ, একবার ঠাকুরাণী (শ্রীরাধা) বাঁশের ঝাড়, কঞ্চি এগুলিকে খুব গালাগাল করছেন, সব উপ্‌ড়ে ফেলে দেবেন। পদকর্ত্তা বল্‌ছেন্ সেখানে—ও ঠাকুরাণী! ওকে গালাগাল করে কি হবে? ওর কি স্বাধীনতা আছে? ওকি স্ববশে চলে? তাঁকে (কৃষ্ণকে) সায়েস্তা কর তাহ'লেই হবে। এদেরও তাই; এরা কি স্বাধীন? তোমাদের অবস্থা দেখে সে খেলা খেল্‌ছে, নিজেরা অপরাধ থেকে সাবধান হও, ও ঠিক হয়ে যাবে। দেখ্‌ছোনা ব্রজে সব ভাব সঙ্কোচ হ'য়ে গেছে। পরিক্রমায় গেছি, মাঠা দৈ নিয়ে ব্রজ-মাইরা দরজা আট্‌কে আছে, বাবাজীরা আস্‌বে, ঠেলে বাড়ী ঢুক্‌বে, তারা সরে দাঁড়াবে, আর তাঁকে (শ্রীনন্দনন্দনকে) মনে করে সে লীলা ভোগ করবে। বোঝো দেখি কেমন প্রীতি, শ্রীসনাতন গোস্বামীর ওপর তোমাদের চেয়ে তাদের কত প্রীতি জান? ওই পূর্ণিমাকে (আষাঢ়া পূর্ণিমা) তারা মুড়িয়া পূর্ণিমা বলে। তাঁরা (শ্রীগোস্বামীগণ) ঐ দিনে খুব ভাবাবিষ্ট হয়ে থাক্‌তেন; সেই থেকে মুড়িয়া পূর্ণিমা নাম। মুড়িয়া হোল বাবাজী। এখন ব্রজে গিয়ে আর……………"

বলিতে বলিতে শ্রীগুরুদেবের ভাবান্তর হইল। করুণাভরা চক্ষুদুইটীতে রক্তিম আভা আসিল। বামহস্তের অনামিকা অঙ্গুলি দ্বারা ভ্রূমধ্য-স্থানটীকে বার বার স্পর্শ করিলেন। যেন আজ বৈষ্ণব জগতে দুর্দ্দৈবের আঘাত আসিয়াছে সেইজন্য লোক ব্যবহার রীতিতে ললাটে আঘাতের ইসারা করিলেন।

## প্রীতির রীতি।

ঐ প্রসঙ্গেই ভক্তবৃন্দের মধ্যে কানাকানি হইতেছিল, এমন সময় একজন প্রীতির রীতি সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে শ্রীগুরুদেব বলিলেন—

"প্রীতির রীতি হোলো আত্মসমর্পণ, অভাবে দৃষ্টি থাক্‌বে, আর আমার যা আছে তোমায় দেবো, তুমিও তো অভাব রাখ না।"

বলিয়া যেন ভিক্ষা চাহিবার দৃষ্টিতে সকলের দিকে চাহিতে লাগিলেন। যেন ক্ষুধার্ত্ত অতিথি ভিক্ষুক, তাই খুন্নিবৃত্তি চাই আর সঞ্চয়ও চাই। আবার নিষ্ঠুর গৃহীর দ্বার হইতে বঞ্চিত হইয়া মহান্ অতিথি যেমন তাহার জন্য কল্যাণ প্রার্থনা করিতে করিতে ফিরিয়া আসেন, ঠিক সেইরূপ ভাবেই শ্রীগুরুদেব শ্রীগুরু শ্রীগুরু বলিয়া ক্রন্দনমুখর নয়নে পরম গম্ভীর হইলেন।

ব্রজবাসী বৈষ্ণব উঠিবার উপক্রম করিলে, শ্রীগুরুদেবের ঈঙ্গিতজ্ঞ সেবক তাঁহাকে বাল্য ভোগ গ্রহণ করিবার জন্য গৃহান্তরে লইয়া গেলেন।

## প্রতিকূলে কৃপা ভোগ :

পুনরায় ভাবানুকূল কথা প্রসঙ্গ আরম্ভ হইল। শ্রীগুরুদেব পরীক্ষকের ভঙ্গীতে বলিলেন—

**"এত যে নাম কীর্ত্তন প্রসঙ্গ হোলো, এত কথা, এত মাতামাতি, তবু বাজিয়ে দেখা হোলনা কেন? ওই যে "অকাল মৃত্যুহরণং..........." সবই বিরুদ্ধভাব এসে পড়্ছে, আর তার ওযুধ-পালারই ব্যবস্থা চল্‌ছে।"** (ঙ)

প্রশ্ন—কেন এমন হয়? নাম কীর্ত্তনও করা হয় আবার রোগ হ'লে ওযুধ খুঁজতেও যাওয়া হয়!

**শ্রীগুরুদেব—"ওসব প্রতিকূলে কৃপাদণ্ড ভোগ, তাদের (ভক্তদের) তো আর এতে (দেহে) আবেশ থাকেনা, সবই সে এসেছে মনে করে। বিশ্বরূপের কোন্ রূপটী নয়?"** (চ)

## বিপরীত পুত্র

এইপ্রসঙ্গেই পরিমিতভাষী শ্রীগুরুদেবের নিকট কেহ প্রশ্ন করিলেন—

বাবা! পিতা হয়তো পরম বৈষ্ণব কিন্তু তার পুত্র অনেক সময় অনুকূল হয় নাই। এর কারণ কি মনে করা যায়? সহজেই শ্রীগুরুদেব উত্তর দিলেন, বলিলেন—

---

(ঙ) অকালমৃত্যুহরণং সর্ব্বব্যাধিবিনাশনম্
বিষ্ণুপাদোদকং পিত্বা শিরসা ধারয়াম্যহম্।

অর্থ—যাহা অকালমৃত্যু হরণ করে, সর্ব্বব্যাধি বিনাশ করে এমন বিষ্ণুপাদোদক পান করিয়া মস্তকে ধারণ করিতেছি।

(চ) ভগবান্ যখন বিশ্বরূপ তখন ঔষধ রূপেও তিনি চরণামৃত রূপেও তিনি। সুতরাং সেইজন্য অসুখ করিলে ভক্তগণ চরণামৃতও পান করেন, ঔষধসেবনও করেন। ভক্তজনের রোগাক্রান্ত অবস্থায় ঔষধ সেবন দেখিয়া তাহাদের চরণামৃতে বা নামে বিশ্বাস নাই এরূপ মনে করা উচিত নয়। ভক্তের প্রতি ভগবানের

"হুঁ, কোথায় জাতসাপে ছোব্‌লে দেয়, তাইতো হয়, ভগবদ্‌ অপরাধ কোথায় ঘটে যায়, তাই ওই ছোবলানর যন্ত্রণা, বুঝ্‌লে? অবজ্ঞাই তো অপরাধ না? তা নিরন্তরই তো ঢুক্‌ছে, কোন দিক্‌ দিয়ে ঢোকে ধরা বড় কষ্ট।

বলিয়াই 'শ্রীগুরু শ্রীগুরু' উচ্চারণ করিয়া যেন জানাইলেন- -অপরাধের ফলেই ভক্তের পুত্র বিপরীত স্বভাবের হয়। অপরাধ এড়াইতে ইচ্ছা করিলে শ্রীগুরুচরণ আশ্রয়েই তাহা সম্ভব। ইত্যবসরে শ্রীগুরুদেবের গাম্ভীর্য্যভাব প্রকাশ পাইল, কিছুক্ষণের জন্য নিবিড় নিস্তব্ধতায় পরিবেশটী ভরিয়া উঠিল, শ্রীগুরুদেবের সদা নীলাভনয়ন দুইটীতে শুভ্র কার্পাসের মত বর্ণ বিকাশ হইল—অপরাধ যেন শ্রীগুরুচরণে স্থান না পাইয়া ক্রুদ্ধ হইয়া ফিরিয়া গেল।

৮৷৷টা বাজিয়া গিয়াছে, ভাবময় অবস্থায় শ্রীগুরুদেবকে দর্শন করিতে করিতে সকলে প্রণাম করিয়া বাহিরে আসিলেন। মধুময় সঙ্গ হইতে গোষ্ঠী ভঙ্গ হইল।

**১৩৫৪ সাল, ২২শে মাঘ, সকাল ৬৷৷০ হইতে ৯—১৫ মি.**

শ্রীগুরুদেবের-উজ্জ্বল শ্যামগৌর তনুর অনুপম লাবণ্য মাঘমাসের তীব্রশীতে উপযুক্ত বস্ত্রাবরণের ভিতর হইতেও নয়ন-লোভাকর হইয়াছে। কটিতে গ্রন্থিবদ্ধ বর্হির্বাস, শ্রীঅঙ্গে বক্ষোবদ্ধ বেনিয়ান, চরণলম্বিত ও কণ্ঠে দ্বিগুণায়িত শুভ্রসূক্ষ্ম গাঁতি, তাহার উপর ধূসর বর্ণের মলিদা। -মস্তকে, উদাসী বৈষ্ণবের কর্ণাচ্ছাদক শুভ্র খদ্দরের টুপী।

দক্ষিণ জানুর উপর হস্ত রাখিয়া মালা জপ করিতেছেন, পূর্ব্বদিনের রচিত তিলক উজ্জ্বল ললাটে এখনও সমুজ্জ্বল রহিয়াছে। আনন্দময় মুখমাধুরীর সহিত স্বচ্ছ-মুক্ত হাসি, কিশলয়-কোমল অধর-ওষ্ঠ দুটীতে নাম জপের মৃদু কম্পন, নীলাভ-তারকাসমন্বিত নয়নযুগলে ঈষৎ রক্তিমাভা ও শিশু-সরল দৃষ্টি। শ্রীগুরুদেবের এই মধুময় স্বরূপটী যেন স্বয়ম্ভূর, স্বতঃ প্রকাশ, চিত্তপটে আঁকিয়া রাখিলেও তৃপ্তি হয় না, মনে হয়, বিষয়পরিণামধর্ম্মী চিত্তের দোষে কি এই অপরূপ নব নব ভাবে উদ্ভাসিত স্বরূপটীকে অবিকৃত রাখা যাইবে?

এই নিত্য আনন্দময় শ্রীগুরুদেবকে ঘিরিয়া তাঁহার অনুগতগণ বসিয়াছেন, স্রোতের তরঙ্গের মত প্রসঙ্গের পর প্রসঙ্গ উঠিতেছে, আর শ্রীগুরুদেবও অন্নসত্রের অধিকারীর মত

---

দ্বিবিধ কৃপা প্রকটিত হয়—অনুকূল কৃপা আর প্রতিকূল কৃপা। অনুকূল কৃপায় ভক্তের ভজন সাধনে কোন বিঘ্ন উপস্থিত হয় না। প্রতিকূল কৃপায় বিঘ্ন উপস্থিত হয়। তথাপি সেই বিঘ্নের মধ্যেই অনুরাগ দ্বিগুণতর বাড়িয়া চলে ভজন সাধনের প্রতি ভক্তের। ভজন সাধনের মূল যন্ত্র স্বরূপ দেহে রোগ আক্রমণ করে। তাহাতে ভক্ত ঠিক মত সাধন ভজন করিতে পারে না। তখন বাধাপ্রাপ্ত নদীপ্রবাহের বেগের মত ভক্তের ভজনানুরাগ বর্দ্ধিত হয়। শ্রীগুরুদেব এই অবস্থাকে "প্রতিকূলে কৃপাদণ্ড ভোগ" বলিতেছেন। এই কৃপাতেও ভক্তের ঔষধেতেও ভগবৎ স্ফূর্ত্তি হয়।

বার বার আগন্তুক বুভুক্ষুদিগকে শ্রীমুখনিঃসৃত কথামৃত পরিবেশন করিতেছেন। ইহারই মধ্যে একজন জানাইলেন—

বাবা! আজকাল একটি আশ্চর্য্য ঘটনা হ'চ্ছে, রেডিয়োতে সকাল বিকেল নাম হয়। শুনিয়া শ্রীগুরুদেব বললেন—

"সে দেখলে এক স্বরূপে কাজ হবে না, তাই বহুশক্তিরূপে ডাক্‌ছে, আয় নাম করবি আয়, সে যে অন্তর্য্যামী আর বিশ্বরূপ কি না!"

বলিতে বলিতে শ্রীগুরুদেবের সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইল, গম্ভীর হুঙ্কার করিলেন, বিশ্বম্ভর বিশ্বরূপ নামের উচ্চারণ করিবামাত্র নদীয়াবিনোদের প্রকট বিহার স্মরণ হইল। আক্ষেপের হা হুতাশ ধ্বনিতে শ্রীমুখে গাম্ভীর্য্য আসিল। প্রায় দুই তিন মিনিট অধোদৃষ্টিতে থাকিয়া আবার বলিলেন—

## হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র

"একবার সনাতন কাকা * বললেন—হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র তো শ্রীগৌরের আগেই প্রকাশ, তবে কেন শ্রীচৈতন্য-মুখোদ্গীর্ণ ব'লে প্রচার? তাতে কথা হোলো,—ও হোলো দশমী-দশায় প্রিয়ার [ শ্রীরাধার ] উক্তি, ওগো পাঁজি পুথিতে ঢোকা বড় মুস্কিল, আবরণ ঢের, রহস্য ওই........।"

আহা! রহস্যেরও রহস্য গৌর কথায় শ্রীগুরুদেবের কি অপূর্ব্ব ভোগ! ব্রজনদীয়া-নিকুঞ্জবিহারী গৌরকিশোরের স্মরণে আনন্দিত শ্রীগুরুদেব ভাবতরঙ্গে আত্মহারা হইলেন। দুই নয়ন হইতে প্রেমাশ্রু ঝরিয়া পড়িল,

অধরওষ্ঠের পার্শ্ব বহিয়া লালামিশ্রিত ফেনা গড়াইল, যেন মদিরামত্ত পুরুষ অকস্মাৎ ঢলিয়া পড়িয়াছে। অল্প পরেই 'শ্রীগুরু শ্রীগুরু' বলিতে বলিতে যেন আত্মস্থ হইবার রক্ষামন্ত্র উচ্চারণ করিলেন। তবু আবেশের জড়তা কাটিল না, অর্দ্ধবাহ্য মত্ত-দশাতেই আবার বলিলেন—

## সিদ্ধপ্রণালী

"ছাখ, সিদ্ধপ্রণালী † চায়, বলি তাই, হ্যাঁগো, গৌরলীলা কি অসিদ্ধ? এযে সিদ্ধেরও সিদ্ধ, ভোগ কি সেখানে হয়েছে? ভোগ তো এখানে, সেখানে তো লালসা মাত্র, ওই যে তিনি [ শ্রীরূপ গোস্বামী ] স চৈতন্যঃ কিং মে.......বল্‌ছেন, তা কোথায় বসে? ব্রজের 'নিকুঞ্জে বসে, তাহ'লে ভোগ কোথায় বল দেখি? বলছেন তো শ্রীরূপমঞ্জরী, তবে...."

---

* ইনি পূজ্যপাদ শ্রীরামহরি দাস বাবাজী মহারাজের শিষ্য। শ্রীগোবর্দ্ধনে চাকলেশ্বরের মহান্ত। ইনি শ্রীগুরুদেবের গুরুসংপর্কে কাকাগুরু হন।

†শ্রীকৃষ্ণের নিত্য ধামে যে সকল সিদ্ধ পরিকরগণ আছেন তাঁহাদের মধ্যে সাধকগণের নিজ নিজ

এই অর্দ্ধ-সমাপ্ত ভাষা বলিয়াই শ্রীগুরুদেব যেন ক্ষণিকের জন্য লোকজগতের মধ্যে সপরিকর শ্রীগৌরাঙ্গের প্রকট বিহার দর্শনে আবিষ্ট হইলেন। তৃপ্তির আবেশে নয়নযুগলে ঢুলু ঢুলু ভাব পরিলক্ষিত হইল। এইভাবে কিছুক্ষণ গত হইলে শ্রীগুরুদেবের আবার ভাবান্তর আসিল। প্রতি জীবের হৃদয়ই যে শ্রীগৌরের বিলাস নিকেতন ইহা জানাইবার জন্যই যেন বলিতে লাগিলেন—

## প্রচ্ছন্ন অবতার

"এ হোলো প্রচ্ছন্ন অবতারের যুগ, সবই ঢাকা, তিনি [ শ্রীবড়বাবাজী মহাশয় ] বলতেন বাইরের খোসা দেখে ভুলিস্ নে ফাঁকে প'ড়বি। এই যে সব চারিদিকে নামকীর্ত্তন, এ কি তার ক্ষেত্র প্রস্তুত নয়? সে তো ব'লেছে [ শ্রীগৌরের উক্তি ] "সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম"। তোমরা ত হরে কৃষ্ণ নাম না হ'লে নাক সেঁট্কাবে, সে কি! তবে ষড়ভুজের প্রকাশ কেন? ওতেইতো হোলো, এখন পারক হয়ে তারপর তারকরূপে।"

বলিয়াই যেন সম্ভ্রম দৃষ্টিতে কাহার উদ্দেশ্যে মাথা নোয়াইলেন।

ইত্যবসরে আমাদের পূজনীয় কাকাগুরু শ্রীললনন্দকিশোর দাস বাবাজী মহারাজ মালা করিতে করিতে বড় প্রসন্নভাবে আসিয়া শ্রীগুরুদেবের পার্শ্ববর্ত্তী হইয়া বসিলেন, শ্রীগুরুদেবও একবার তাঁহার দিকে ঈসারা-দৃষ্টিতে চাহিয়া মৃদু হাসিলেন।

উভয়ে অব্যক্ত আনন্দে ক্ষণকাল থাকার পর শ্রীযুত কাকাজী হাসিমুখে উপস্থিত ভক্তদের লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—কি গো তোমরা তো সব মহা মহা পণ্ডিত, বল দেখি জীবে দয়া মানে কি? ভাত কাপড় দেওয়া না কি? আরে ওতো রোজই নাই নাই কোরবে? দিলে কি অভাব মিটবে?

কথাটী শুনিবামাত্র শ্রীগুরুদেব হাসি মুখে বলিলেন—

## দাতা শ্রীরামানুজ

"শোনো গো শোনো একটা কথা, শ্রীরামানুজ তো সব দান করে চলে যাচ্ছেন, চারদিকে খবর প'ড়ে গেল; বাড়ী ঘর সব দান করছেন, এদিকে তিনি ( শ্রীনারায়ণ ) ছদ্মবেশে এলেন "কি রামানুজ! কি সব দান কোরছো? আরে এমন দান করো যা

---

গুরুপরম্পরাক্রমে সিদ্ধপুরুষগণও আছেন। তাঁহাদের মধ্যে সাধকের নিজের শ্রীগুরুদেব যে ভাবে সিদ্ধ স্বরূপে আছেন তাঁহার আনুগত্যে সাধককে নিজের সিদ্ধ দেহ চিন্তা করিয়া সাধন ভজন করিতে হয় শ্রীগুরূপদিষ্ট যে স্বরূপকে নিজের সিদ্ধ স্বরূপ চিন্তা করা যায় সেই স্বরূপই সিদ্ধাবস্থায় প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহাকেই বলে সিদ্ধপ্রণালী।

মনে থাক্‌বে থেকে যাবে;" বলেই তো সরে পড়লেন; তাঁর (শ্রীরামানুজের) তখন মনে জাগ্‌লো গুরুদত্ত মন্ত্র, প্রেরণা এলো প্রচুর, অমনি চীৎকার করে বলতে লাগ্‌লেন —খেয়াল নাই যে গুরুদত্ত মন্ত্র গোপ্য, তবুও বল্‌ছেন। এমন সময় শ্রীগুরুদেব এলেন, তিনি বল্লেন—এ'কি কোরছো রামানুজ! রামানুজ বল্লেন, আমি যে থাকতে পার্‌ছি না, গুরুদেব ব'ল্লেন এ গোপ্য জিনিস [গুরুমন্ত্র] প্রকাশ করলে তোমার রৌরব নরক গতি হবে। তখন তিনি (শ্রীরামানুজ) বল্লেন আচ্ছা, গুরুদত্ত গোপ্য মন্ত্র দেওয়ার জন্যে আমারতো রৌরব নরক গতি হবে আর এই যে সব এরা, যারা ও মন্ত্র শুন্‌লে তাদের কি গতি হবে? তখন তিনি (শ্রীরামানুজের গুরুদেব)—বল্লেন ওরা বৈকুণ্ঠে যাবে। শুনেই তো রামানুজের আর আনন্দ ধরে না। বল্লেন—বেশ বেশ সবাই সবাই বৈকুণ্ঠে যাক্‌ আর আমি তাদের পাপ তাপের বোঝা নিয়ে নরকে যাব...."

বলিতে বলিতে শ্রীগুরুদেব আরও কি অস্ফুটভাবে বলিতে গিয়া শিশুর মত কাঁদিতে লাগিলেন,

তারপর আবিষ্ট ভাবে পুনরায় বলিলেন—

## ইষ্ট-গোষ্ঠী

"ইষ্টগোষ্ঠী তো তাইগো: রাধাকুণ্ডে সব গোঁসাইদের আসন আছে, ওদের মনে যখন যা ভাব আসতো এক জায়গায় মিলে সেগুলি প্রকাশ করতেন, আবার সেগুলিকে মার্জ্জনা করে যথার্থ সিদ্ধান্ত প্রকাশ করতেন, এইত হোলো ইষ্টগোষ্ঠী ইষ্টনিষ্ঠার অনুকূলে আলোচনা, অনুভূতি আর সিদ্ধান্ত, তারপর প্রকাশ।"

এই পর্য্যন্ত বলিতে বলিতে শ্রীগুরুদেবের শ্রীঅঙ্গখানি যেন আনন্দে স্ফীত হইল। গাম্ভীর্য্যের সুখময় মূর্ত্তিখানিতে ঔদার্য্যের অনাবিল তৃপ্তির বিকাশ হইল। ইহার পরই আবার কি ভাবিয়া মৌন হইলেন। সব বলিয়াও কি যেন বলিতে বাকী রহিয়া গেল। এত ভোগেও আবার অর্দ্ধমুদ্রিত নয়ন দুটীতে পরীক্ষকের দৃষ্টি আসিল; তাই, বলিলেন—

## পরীক্ষার রীতি

"ওগো মানুষেরাই যখন পরীক্ষা করে, তখন ঠাকুর যে পরীক্ষা করবে এ আর বিচিত্র কি? একবার বাজিয়ে দেখে নেয়, আমারই সেবক না স্বার্থের সেবক।

যেন অসমাপ্ত মনোভাব ব্যক্ত করিলেন। চক্ষু দুইটী বন্ধ হইয়া গেল, যেন কাহারো

কাছে প্রার্থনা করিতেছেন "হে প্রভো! করুণা করা ছাড়া এ যুগে পরীক্ষার স্থল কোথায় ?" সেইজন্য যেন আবার বলিলেন—

## দণ্ড-ভঙ্গ

"ওই যে কথা হয়েছে ( সন্ন্যাস কীর্ত্তন প্রসঙ্গে অক্ষর উঠিয়াছে ) এযে কেবল কৃপার যুগ, তাইতো তাঁর ( শ্রীগৌরের ) দণ্ড ভঙ্গ করে দিলেন না ? বাইরে তো তিনি ( শ্রীগৌর ) রুষ্ট হয়ে ছিলেন, কিন্তু ইনি তো ( শ্রীনিতাই ) তাতেও রাজী নন, দিলেন তিন খণ্ড করে। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরে তো দণ্ড বিধি ছিল, আবার এযুগে কেন।"

এইরূপ বলিতে বলিতে শ্রীগুরুদেবের দৈন্যভরা আবেশে বাহ্য-স্ফূর্ত্তি হইল। তাই, দৈন্যের একটা উদাহরণ বলিলেন—

## দৈন্যের স্বভাব

"বেনেটোলার প্রভুকে দেখবার সৌভাগ্য হয়েছিল, আহা! সে কি ভাব, কি দৈন্য, গোরা রসে গর গর, সর্ব্বদা মাতোয়ারা, কেউ যদি তাঁর সামনে এসে তাঁদের নাম না করে ( শ্রীনিতাই গৌরের নাম উচ্চারণ না ক'রে ) কথা কইতো, ত'াহলে তার সঙ্গে কথাই কইতেন না। এমনকি মাতা গোস্বামিনীর সঙ্গেও অনেক সময় এজন্যে কথা কইতেন না।

দৈন্যের কেমন স্বভাব দেখ, সেখানে ( শ্রীগুরুদের ) গেলে বল্‌তেন "পতিত যে একপাশে পড়ে আছে, নজর রেখো," দেখ দেখি কেমন দৈন্য, সর্ব্বদা আবেশ থাক্‌লে এমনি হয়, দৈন্য কি ঠোঁটস্থ করতে হয় ?"

বলিতে বলিতে ভাবস্ফূর্ত্তিতে হুঙ্কার করিলেন, চক্ষু দুইটীতে যেন রাত্রির নিদ্রাহীন অবস্থার জড়তা আসিল। একটু পরে আবার বলিলেন—

## শ্রীগৌর লীলার স্বাতন্ত্র্য

"আজ কাল এমনও শোনা যায় যে সেখানের ( ব্রজের ) আস্বাদন না ক'রে এখানের (নদীয়ার) লীলা আলোচনা করতেই চান না। হ্যাঁগা! এ লীলার কি স্বাতন্ত্র্য নেই ? এর জন্যে যখন তাদেরই লালসা, তখন এর ( শ্রীগৌরস্বরূপের ) স্বাতন্ত্র্যের আস্বাদ ভোলো কেন ?"

বলিতে বলিতে অসহায়ের মত চাহিয়া রহিলেন। এইভাবে কিছুক্ষণ থাকার পর প্রসঙ্গক্রমে শ্রীগুরুদেব পূর্ব্বেকার শ্রীশ্রীনিতাইসুন্দর পত্রিকার পুনঃ প্রকাশের জন্য ইঙ্গিত করিলেন।

## নিষ্কাম সাধুর উৎসব কৃত্য

দুই একটি কথা প্রসঙ্গের পর—আগামী ফাল্গুন শেষে আমাদের পরম গুরুদেব শ্রীশ্রীবড়বাবাজী মহাশয়ের স্মরণ উৎসব সম্বন্ধে কথা উঠিলে শ্রীগুরুদেব বলিলেন—

"হুঁ, উৎসব আস্‌ছে এরাতো (আমাদের ভ্রাতৃবৃন্দ) খুব আমোদে মাতবে। উৎসবে কি মাতামাতি হয়? সাতদিন তো উপবাসে কাট্‌বে, লোক এসে খাইয়ে যাবে, কেউ এসে ঠাকুর সেবা করে যাবে, এইতো উৎসব; আর এই যে সব আমোদের মাতামাতি, এ তো বড় লোকের বাড়ীতেও বিয়ে টিয়ে হলেও হয়, তবে তফাৎ কি? কেবল ঐ স্মরণটিই...."

বলিতে বলিতে শ্রীগুরুদেব উৎসবে উপস্থিত উদাসী উপবাসীর মতই চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার নাম মালার জপ তেমনি ভাবেই চলিতেছে। আজ আর এই মহাউদাসীকে কথা-প্রসঙ্গে অধিকক্ষণ আটকাইয়া তাঁহার নিত্যকৃত্যে বিলম্ব না ঘটাইবার ইচ্ছায় উপস্থিত ভক্তবৃন্দ অবসর বুঝিয়া ধীরে ধীরে প্রণতি নিবেদন করিয়া বাহিরে আসিতে লাগিলেন।

**১৩৫৪ সাল, ২৫শে মাঘ। সকাল ৬ টা হইতে ৯টা।**

শ্রীগুরুদেবের করুণাবৎসল মধুর রূপ, সদা শান্তিময় মৃদু মধুর হাসি, তাপজুড়ান বাণী, বিষয়ভোলান ও আনন্দময় সঙ্গলাভের আকর্ষণে যাঁহারা নিত্য আসেন তাঁহাদের মধ্যে আজ প্রায় সকলেই উপস্থিত। আজ শ্রীগুরুদেবের মুখমণ্ডলে বড় সুপ্রসন্নভাব। কথা প্রসঙ্গে শ্রীগুরুদেব বলিলেন—

## জীবের কর্ত্তৃত্ব কোথায়

"হ্যাঁ, জীবের আবার কর্ত্তৃত্ব আর স্বাধীনতা! ঐ যে গো সব বলা হয়—অন্নগ্রাস গ্রহণেও ক্ষমতা নেই, রান্না বান্না হয়েছে, আসন, জল, থালা, অন্নব্যঞ্জন সব সামনে ধ'রে দিলে, গ্রাস তুলবে এবার, এমন সময় হয়তো বাড়ীতে বিবাদ বাধলো কিম্বা যে পরিবেশন করছে তারই সঙ্গে সামান্য কারণে বেধে গেল, হাতের গ্রাস হাতে রইলো, মারলে লাথি গেল সব উল্টে। রাগে লাল হয়ে উঠে পড়লো; কি? পারলে না কেন? এইতো কর্ত্তৃত্ব। তা হলে বোঝো, যে সব সময়েই তার বশ্যতা চাই।"

## কৃপার অনুভূতি চাই

"দেখ, একবার তার (শ্রীবড় বাবাজী মহাশয়ের) কাছে কে বল্‌লে, কৈ নামের শক্তি কোথায়? কিছুইতো বোঝা গেলনা, এতদিন ধরে এত মাতামাতি, দৌড় ঝাঁপ্‌, কৈ কিছুই তো বুঝ্‌ছিনা। ওঁর যেন ভারী রাগ হোলো, বল্লে কী নামের শক্তি নাই? তোকে

এপথে আন্‌লে কে? তুই তো অলস হয়ে তাকে ভুলে পড়েছিলি, এই নাম করা, ভগবৎ প্রসাদ পাওয়া, ভগবৎ প্রসঙ্গে থাকা, এসবের কি সুকৃতি ছিলো তোর? কিসের দাবী করতে পারিস্? তোর দাবীটা কি বল্ দেখি? দাবী করার কিছু আছে কি তোর?"

বলিতে বলিতে শ্রীগুরুদেব যেন অভিমানের রোষে ফুলিয়া উঠিলেন—আর কিছু বলিতে পারিলেন না, অধোদৃষ্টি হইয়া মৌন হইলেন, মূহুর্ত্তের জন্য নাম জপ শান্ত হইল' ধীরে ধীরে আবার বাহ্যভাব ফিরিয়া আসিলে বলিলেন—

"ওগো নাম হোলো কল্পতরু, এখানে যা কামনা করবে সবেরই ফল, তাতে তোমার বিষয় কামনা জুটলেও রেহাই নাই।"

ঐ কথায় এই সময় কেহ প্রশ্ন করিল—বাবা! এখনও তো তিনি রয়েছেন তবে ফল পাচ্ছিনা কেন?

ইহা শুনিবামাত্র শ্রীগুরুদেব হো হো করিয়া হাসিলেন; কি সুন্দর হাসি। ওঁর এই হাসিতে যে সবারও এমন হাসি পায় তা কখনও ভাবা যায় নাই। কিন্তু কেন যে অমন হাসিলেন কে বলিবে? আহা বড় মিষ্টি হাসি, যেমন হাসি তেমন দৃষ্টি; ঐ হাসিভরা মুখেই বলিলেন—

## ফল লাভে ধৈর্য্য চাই

"সে কি গো; গাছের তলায় থাক্‌লে তো ফল পাবে, গাছের পানে মাত্র নজর দিয়ে সরে থাক্‌লে কি পাবে? তলায় ব'সে থাক্‌তে হবে, নজরও রাখ তলাতেও বোসো, তবে তো? ফল পড়বেই পড়বে, দেখো সরে যেয়োনা যেন, তুমিও সরে গেলে আর এদিকে ফল ও পড়লো, ব্যাস্, এই অবসরে অন্য কেউ এসে ফলটী কুড়িয়ে নিয়ে যাবে; তুমি ব'লবে পেলাম না। যদি তোমার দৃঢ়তা থাকে এই নাম কল্পতরুর ফল ছাড়া নেবো না, তবে তো পাবে। দেখনা, (চাতক) ফটিক জল ছাড়া অন্য জল খায়না......."

আবার শ্রীমুখে মুক্ত উদার হাসি, কমনীয় দৃষ্টি।

ইত্যবসরে দুইচার মিনিটের মধ্যে নামকীর্ত্তন স্থল হইতে প্রণাম করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। শ্রীমুখের ভাব দেখিয়া মনে হইল কি যেন বলিতে চান, কি যেন না ব'লিলে কীর্ত্তন স্থলের অনুভবটুকুই দান করা হয় না। ধীরে ধীরে পদচারণ করিলেন, ভক্তবৃন্দ সম্মুখ হইতে সরিয়া দাঁড়াইলেন। অল্প পরেই আবার নিজ আসনে বসিলেন ও বাহিরে কাহারও দিকে একবার চাহিলেন, কে আসিলেন দেখা গেল না, কিন্তু শ্রীগুরুদেব যেন কাহারও প্রতীক্ষার পর তাহার সহিত নয়ন বিনিময় করিলেন; তৃপ্তির হাসি হাসিলেন, তাহারপর নাম মালা জপের সংখ্যা রাখিয়া মৃদু গাম্ভীর্য্যের সহিত বলিলেন—

## পতিতপাবনের দৃষ্টি :

"তাঁকে বল, তিনি পতিতপাবন, তা সে কি মিছে কথা? পতিত কি ওপরে থাকে নাকি? পতিত মানেই তো পড়ে থাকে নীচে, যদি কেউ ওপরে মঞ্চ বেঁধে থাকে তবে পতিত হলো কি ক'রে? সে তো পতিত খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছে নীচের দিকে তাকিয়ে, তাকে তুলে ধরবে বলে; তুমি এখন অভিমান মঞ্চে উপরে বসে আছ, তখন সে কি করবে? পতিত-পাবন নাম ধরে তো আর তা পারে না, তখন অন্যরূপ ধরতে হবে। তার তো নিরন্তর চেষ্টা, কতরূপে, কত ভাবে আসছে, নাঃ পারছেনা......"

অসমাপ্ত ভাষা, একটু থামিয়া আবার বলিলেন—

"আহা! তার অস্তিত্ব না থাকলে কি তোমার অস্তিত্ব থাকতো?"

কি মনোরম সহজ সিদ্ধান্ত। যাঁহারা ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের বৃহদারণ্যক উপনিষদের "ঘটভাষ্য" পড়িয়াছেন তাঁহারা বুঝিবেন এই সিদ্ধান্তটী প্রকাশ কারতে আচার্য্য শ্রীশঙ্কর আট পৃষ্ঠা লিখিয়াছেন। শ্রীগুরুদেব অতি অল্প অক্ষরে সেই সিদ্ধান্তটুকু আজ পতিতপাবন শ্রীনিতাই তত্ত্বে পর্য্যবসিত করিলেন। নিতাইয়ের ব্যাপক তত্ত্ব বলিতে গিয়া লীলা স্মরণে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। উপস্থিত ভক্তবৃন্দের চোখেও জল আসিল।

এমন সময় শ্রীলাবণ্যপ্রভা দত্ত (বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের ভূতপূর্ব্বা সঃ সভানেত্রী) আসিলেন। তাঁহার সহিত উপস্থিত ভক্তবৃন্দের বর্ত্তমান পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা যে উর্দ্দু হইতে চলিয়াছে তাহারই আলোচনা হইতেছিল। কিন্তু উহা উপস্থিত ভক্তগণের মধ্যে একরূপ কানাকানি ভাবেই। তথাপি শ্রীগুরুদেব বোধ হয় তাহা শুনিতে পাইলেন, সেইজন্য হাসিতে হাসিতে বলিলেন—

## ভাষাতত্ত্ব

"উর্দ্দু ভাষা রাষ্ট্রভাষা হওয়ায় রাগটা কিসের? ওটা কি ভাষা নয়? জোরের ঝগড়া ছাড়া আর কি? আমার জেঠামশায় উর্দ্দু ভাষা জান্‌তেন, কতদিন সেরেস্তাদার ছিলেন। বাংলা ভাষায় তোমাদের কত দরদ, বড় বড় নাম করা পণ্ডিতদের (এখানে পণ্ডিত বলিতে স্কলার দিগকে লক্ষ্য করিয়া) মধ্যে অনেকেই ভাল বাংলা জানেন না। বাংলায় এম, এ, পাশ করা সুবিধে তাই বাংলা পড়ে, নইলে কি আর দরদ করে পড়ে? বেশতো আর একটা ভাষা শেখা হবে, ওটা ভাল না লাগে বাংলা ক'রে নিও। এই যে এতদিন ইংরেজী চল্‌ছে এওতো একটা শিক্ষা হোলো' এতেও তো বাংলা ভাষায় কেউ আটকায় নি। জুলুম বাজী ভাল কি? বলে মায়ে কত দরদ তার আবার ভাষায় দরদ!

ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে শ্রীগুরুদেবের-মুখে এইরূপ সিদ্ধান্ত শুনিয়া উপস্থিত ভক্তগণ চমৎকৃত

হইলেন। যিনি এ জাতীয় আলোচনা কখন করেন না তিনি কি করিয়া এরূপ সিদ্ধান্ত বলিলেন ভাবিয়া সকলে অবাক্ হইলেন।

ইহার পর শ্রীগুরুদেব ভাবান্তরে আবিষ্ট হইলে অকস্মাৎ চক্ষু দুইটীতে একটি অপরূপ ভাবের বিকাশ হইল, অধর-ওষ্ঠ দুইটীতে সঙ্কোচ, গণ্ডযুগলে উল্লাসের ঔজ্জ্বল্য, আর মুখমণ্ডলে তৃপ্তির গাম্ভীর্য্য দেখা দিল। সুকোমল চরণ দুটী মৃদু মৃদু ভাবে কম্পিত হইতে লাগিল; সমস্ত অঙ্গটী দুই পার্শ্ব হইতে দুলিতে লাগিল, পুনরায় বাম করে নাম জপের সংখ্যা রাখিয়া শ্রীগুরুদেব বলিলেন—

## গোরানাম অঙ্কনের মাধুরী ভোগ ঃ

"তারা (শ্রীখণ্ডবাসীরা) নিজের অঙ্গে গোরা গোরা নাম লিখে তাতেই ভোগ কর্‌ছে, নাম নামী তো অভিন্ন, তাইতো বাঁকা গৌরের ভোগ, ওদের নয়নে তো আঁকা আছে বাঁকা গৌরের ছবি, গোরা নাম লিখ্‌ছে দেখ্‌ছে আর বাঁকা গৌরের পানে চেয়ে আছে, ওখানে (শ্রীখণ্ডে) আরও কথা উঠেছে (কীর্ত্তনের অক্ষরে) ওকি কেবল লেখা নাম? না, শুধু তাই নয়, নামরূপে সে (গৌর) প্রকাশ পেয়েছে, তাদের বুকে তো দিনরাত গৌর ভোগ হ'চ্ছে, তাই সেও নাম রূপে প্রকাশ পেলে, নামের মূর্ত্তিতে ভোগ হ'চ্ছে........"

বলিতে বলিতে ভাবাবিষ্ট হইলেন, অত্যন্ত উদ্বেগ হইতে লাগিল, আবেগে আকুল হইয়া দুই চারবার অস্ফুটভাবে কি বলিয়া মৃদুভাবে হুঙ্কার করিলেন। তাহার পরই যেন "গোরা নামে পূজয়ে চোখের জলে........" এই ভাবেই দুইটী চক্ষু বহিয়া অবিরল জল ঝরিতে লাগিল, মৌন অথচ শান্তকোমল ভাব শ্রীমুখে বিকাশ পাইল।

প্রায় দশমিনিট পর এই ভাবটী শান্ত হইল। বাহ্যভাবে সহজ মানুষের মতই আবার কথা কহিতে লাগিলেন—

## সাধন স্মরণ লীলা ঃ

"ওইতো ভজন সাধন, স্মরণ করাই সাধন, কথায় বলেছেন না—সাধন স্মরণ লীলা; আমি তো বাপু কিছুই জানিনে, ওই নয় বছর বয়েস থেকে যাদের যাদের দর্শন পেয়েছি তাদেরই স্মরণ করি; এর বেশী তো সে (শ্রীবড় বাবাজী মহাশয়) শেখায় নি, সে ব'লেছে—এই প্রসঙ্গ (নাম প্রসঙ্গ) নিয়ে ঘুরে বেড়াতে, তাই বেড়াচ্ছি......."

বলিতে বলিতে অস্বাভাবিক রকমে শরীরের স্থূলতা বাড়িল, যেন তাঁহার প্রিয় অভিবাঞ্ছিত স্বরূপের স্মরণেই মত্ত হইলেন। চক্ষু দুইটী হইতে অবিরাম জল পড়িতে লাগিল, ক্রমে ক্রন্দন সংবরণ করিয়া আবার বলিলেন—

## মানুষ হ

"দেখ একবার তার কাছে কথা হোলো, আমি কিছু পেলাম না। ওঃ তখন তার সে কি অবস্থা! বল্লে কি জান? তোরা মানুষ হ, মণি মুক্তো দিয়ে মুড়ে দোবো।"

আবার ঐ কথা

তোরা মানুষ হ সোণা মুক্তো দিয়ে মুড়ে দোবো, বড় কথা নয়? কি কথা বল দেখি তোরা মানুষ হ, মণি মুক্তো দিয়ে মুড়ে দোবো।

এই বলিয়া শ্রীগুরুদেব ভক্তবৃন্দের প্রতি আজ যেন মুক্তকণ্ঠে আশীর্ব্বাদ করিলেন। মানুষ হইলেই কৃষ্ণদাস-স্বরূপ জাগে, তাহা না জাগিলে প্রকৃত মানুষ হয় না। আবার নন্দসুত কৃষ্ণই যখন ভুবনে প্রকাশ হন গুরুরূপ ধরি তখন আবার কি দিতে বাকী রাখিলেন গুরুরূপে।

১৩৫৪ সাল, ১লা ফাল্গুন (সকাল ৬॥ টা হইতে—৯টা)।

নিত্যদর্শনপ্রার্থী অনুগতবৃন্দ পূর্ব্বাহ্নেই উপস্থিত হইয়া শ্রীগুরুদেবের কথা মাধুরী ভোগ করিতেছেন।

আস্বাদনলোলুপ শ্রীগুরুদেব প্রসঙ্গের পর প্রসঙ্গে মত্ত হইতেছেন, এমন সময়ে প্রভুপাদ শ্রীশুকদেব গোস্বামীর পুত্র আসিলেন। শ্রীগুরুদেবও তাঁহাকে দেখিয়া বাহ্য আবেশে ফিরিয়া আসিয়া লোকরীতিতে স্বাগত প্রশ্ন করিলেন। আশ্চর্য! দাস-প্রভু সম্বন্ধে কিভাবে আচরণ করিতে হয় জানাইবার জন্যই যেন কমনীয় কোমল স্বভাবে গোস্বামী সন্তানকে নিজ হাতে আসন দিলেন, তিনিও বসিবেন না, শ্রীগুরুদেবও ছাড়িবেন না, অবশেষে নিজেই মাটীতে বসিলেন দেখিয়া গোস্বামী সন্তানও সলজ্জভাবে আসনে বসিলেন, শ্রীগুরুদেবও পুনরায় আসনে বসিলেন। সহজভাবেই কুশল প্রশ্ন করিয়া বলিলেন—

## ধান ভানা।

"দেখ আমার তো আর কিছু বিদ্যে নেই, ওই তোমাদের তাঁদের স্মরণই সব। দেখ আমাকে কেউ সম্প্রদায়ের কিছু জিগ্যেস্ করলে বল্‌তে পারবো না, শুন্‌বে কথা, এই যে সব সম্প্রদায়ের নানা কথা আছে না ওই যে গো.........আমি বাপু কিছু জানি না, ও এই ধান ভানা ছাড়া (নামকীর্ত্তন প্রসঙ্গ ছাড়া) আর তো কিছু করে বেড়াতে বলেনি, কি ক'রে জানবো বল? সে হয়তো এইই চেয়েছিলো আর চায়ও, হয়তো তাই......"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া শ্রীগুরুদেব আবিষ্ট হইলেন, গলায় ঘর্ ঘর্ ধ্বনি হইতে লাগিল। চক্ষু দুইটীতে জল ভরিয়া গেল, বাম হাতখানি কাঁপিতে লাগিল। বাম জানু মুড়িয়া দক্ষিণ জানু উঠাইয়া তাহার উপর দক্ষিণ হাতখানি রাখিয়া মালা করিলেন। প্রভু-

সন্তান বিস্ময়মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। তিনি অধোদৃষ্টিতে চাহিলেন। একটু পরেই আবার বাহ্যস্ফূর্তি হইলে শ্রীগুরুদেব সকলের দিকে চাহিয়া বলিলেন—

## কৃষ্ণদাসের স্বভাব জাগে কখন?

"জীবের স্বভাব জাগ্‌লেই কৃষ্ণদাসের স্বভাব জাগবে। এঁর পিতা প্রভু একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন "মানুষ হও"। ভারী সত্য কথা। আরে মানুষ হ'লেই কর্ত্তব্য আস্‌বে, আবরণে মানুষ চাপা প'ড়ে আছে, জীবইতো মানুষ; জীবের স্বভাব জাগলেই দাসের স্বভাব আপনা আপনি জাগ্‌বে। ওই যে গো কথা আছে—"জীব নিত্য কৃষ্ণদাস ইহা ভুলি গেল।" দাসের কাজ তো সেবা করা, দাস কৈ? মানুষ হ'লেই দাস হবে, বেশ বলেছিলেন না? মানুষ হও।"

ইহার পরই শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখে মৃদু হাসি দেখা দিল, আবার বলিলেন—

"হ্যাঁ মানুষ হও, ভিৎটাই মানুষ হওয়া, ওর ওপর বাড়ী তোলো, নইলে অল্প নাড়া দিলেই পড়ে যাবে, ভুমিকম্প হলে তো কথাই নাই।"

এইরূপ কথা হইতেছে এমন সময় একজন অত্রকার সংবাদ পত্রের একটি খবর শ্রীগুরুদেবের নিকট জানাইলেন, বিষয়টী এই—পুরীধামে শ্রীজগন্নাথের মন্দিরে হরিজনদের অবাধ প্রবেশাধিকার লাভ হওয়ায় তাঁহারা দলে দলে শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিতেছেন, ইহা শুনিয়া শ্রীগুরুদেবের কি হাসি, যেন অভিপ্রেত বস্তুটীকে কেহ প্রকাশ করিয়া দিল, তারপর বলিলেন—

## শ্রীজগন্নাথে মাতৃভাব :

"ওগো ওঁতে এখন মায়ের আবেশ, ছেলে ধুলো মাটী মেখে এলেও কোলে নিতে হবে তো? নাও এবার তাকে ধুয়ে মুছে নাও; বুঝলে? এই যে পিতা, তিনি তো যোগ্যাযোগ্য বিবেচনা ক'রে সম্পত্তি দেন, ত্যজ্য পুত্রও করেন, আবার বুঝে সুঝে সময়মত কোলেও নেন, আবার কখনও সরিয়েও দেন, মা কিন্তু তা করেনা, এলেই কোলে নিতে হবে, শুদ্ধাশুদ্ধি, পরিষ্কার অপরিস্কার বাছে না, ওদিকে আবার নিজস্ব সম্পত্তিও দেন, আর অযোগ্য হ'লে বেশী টান........"

কোলে পুত্র পাওয়ার দৃষ্টিতেই যেন শ্রীগুরুদেবও মাতৃআবেশে গদ্‌ গদ্‌ ভাবে বিভাবিত হইলেন। অস্ফুট ধ্বনিতে দুই একবার মা মা বলিলেন। ইহার পর প্রায় পাঁচ সাত মিনিট স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। এখন কাহারও সাহস নাই এই আনন্দময় গম্ভীর

পুরুষের নিকট কোন প্রসঙ্গ উত্থাপন করে। আপনার ভাবেই ধীরে ধীরে স্তব্ধভাব ত্যাগ করিয়া স্বচ্ছ দৃষ্টিতে এদিক ওদিক চাহিতে চাহিতে মালা করিতে লাগিলেন—কি ভাবিয়া আবার বলিলেন—

## সেব্য সেবক ঃ

**"ওরে সেব্য-সেবক সম্বন্ধ বড় কঠিন, সেবকের তো তাই ভজন, সর্ব্বদা তাঁর মুখের পানে চেয়ে থাক্‌বে,..........."**

এইটুকু মাত্র বলিয়া থামিয়া গেলেন। নাম মালার সংখ্যা রাখিলেন। নিত্য সেবকের ইঙ্গিত জানিয়াই প্রভুসন্তানকে পার্শ্বের গৃহে বাল্য ভোগ গ্রহণের জন্য লইয়া গেলেন, নিজে অনুচরের গতিতে অনুগামী হইলেন। পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া প্রসঙ্গের মধ্যে থাকিলে দিবসীয় অপরাপর-কৃত্যে বিলম্ব হইবে বুঝিয়া উপস্থিত ভক্তবৃন্দ একে একে প্রণতি জানাইয়া বাহিরে আসিলেন।

**১৩৫৪ সাল ১৮ই চৈত্র, সকাল ৬॥ টা হইতে ৯টা।**

গতকাল বেলা পৌনে ৩টায় শ্রীগুরুদেবের শুভ জন্মতিথি পালনের অনুষ্ঠানটী মহতী উদ্দীপনার পরিবেশে নিষ্পন্ন হইয়াছে। অপূর্ব্ব সেই সময়টুকু। "ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম, জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম" এই ভুবনপাবন নামসংকীর্ত্তনে আকাশ বাতাস জুড়িয়া আনন্দের পাথার বহিয়াছিল। পরমকরুণ শ্রীগুরুদেব বালকের মত হাসিতে হাসিতে সুসজ্জিত আসনোপরি পদ্মাসনে বসিয়াছিলেন অনুগতগণের আর্ত্তিপূর্ণ পূজা আরতি ভক্তি-পূর্ণ প্রসাদী মাল্য চন্দন, দৈন্যপূর্ণ পাদবন্দন এবং তাহাদের স্বহস্তে অর্পিত মহা প্রসাদের কণিকা অতি আদরে শ্রীগুরুদেব অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। তখনকার তাঁহার সেই অপার্থিব ভাবাবেশ, অনুপম সেই সুপবিত্র লাবণ্যছটা, অপরূপ সেই শ্রীমুখমাধুরী এখনও অনুগতগণের নয়নে মনে ভাসিতেছে।

শ্রীগুরুদেব এখনও গতদিবসের আবেশেই পরিপূর্ণ হইয়া আছেন। গত দিনের সৌভাগ্যে সৌভাগ্যান্বিত যাঁহারা তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই আজ তাঁহাকে ঘিরিয়া তাঁহার শ্রীমুখের পানে চাহিয়া মালা জপ করিতে করিতে তাঁহার কথামৃত পান করিতেছেন। কি জানি কিভাবিয়া শ্রীগুরুদেব কথা প্রসঙ্গে বলিতে লাগিলেন—

## সাধন স্মরণ ঃ

**"একবার কুঞ্জবাবু বাড়ীতে গেছি, খোঁজ খবর নেওয়ার পর পুরোণো কথা উঠলো,**

শেষে কুঞ্জবাবু বললেন—রামদাস! এত আগের কথা মনে আছে তোমার? বললাম—তা থাক্‌বেনা? ওইতো আমার স্মরণ, আরতো কিছুই নাই, যা দেখেছি তাইতো স্মরণ করি।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া পরম রমণীয় গম্ভীর ভাব ধারণ করিলেন, চক্ষু দুইটীর দৃষ্টি বার বার বক্র হইতে লাগিল, অল্প সময়ের মধ্যে আবার কি স্মরণ করিয়া ভাবাবিষ্ট হইয়া রহিলেন।

আবার কি ভাবিয়া সহসা আসন হইতে উঠিলেন। নামমালা জপ করিতে করিতে দুই চারিবার পায়চারি করিতে লাগিলেন; পুনশ্চ কি মনে করিয়া স্নিগ্ধ হাসিমাখা মুখে দাঁড়াইয়া বলিলেন—

## কোঽয়ং চৈতন্যঃ

"ওগো এখন সব বাংলার গৌর, আর ষড়্‌গোস্বামীর গৌরের স্বরূপ আলাদা ব'লে প্রচার হ'চ্ছে, বেশ বেশ, যে কোন দিকেই আলোচনার আবেশ আসুক্‌, শেষটায় সেই স চৈতন্যঃ..............শ্লোকে ঠেল্‌বে, তখন দেখ্‌বে, মনে জাগ্‌বে কোঽয়ং চৈতন্যঃ?"

বলিতে বলিতে আবেশে অবশভাবে স্থির হইয়াই প্রায় দুই তিন মিনিট দাঁড়াইয়া রহিলেন। আবার দুই চারিবার পায়চারি করিয়া নিজ আসনে বসিলেন। পুনরায় ভক্তবৃন্দ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া বসিলেন। ইত্যবসরে একজন এমন এক প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন যাহাতে শ্রীগুরুদেব ব্যথা-ভরা আবেগের কণ্ঠে বলিলেন—

## রাধাভাব-কান্তিসুত গৌর

"এও শুনতে হয়,—"শ্রীগৌর তো শ্রীরাধার ভাব কান্তি নিয়ে এসেছিলেন এবারে, সে লীলায় ভাবস্থ হ'লে হস্ত পদাদির সংকোচ বিকাশ সহ্য করতে পারতেন না, শ্রীরাধার যথার্থ স্বরূপে এলে সহ্য করতে পারতেন; যেমন সহ্য করতেন শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্যের প্রেম বিকারে, তাঁর অঙ্গাদি শিথিল হতো না।"

ইহা বলিতে বলিতে শ্রীগুরুদেবের ভাবান্তর হইল, উপরোক্ত কথার উপর প্রতিবাদ করিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিলেন—

"নানা কক্‌খনো না, ভাব আর কান্তি ছাড়া তার আর পৃথক্‌ তত্ত্ব কোথায়? জীবের তো অঙ্গাঙ্গী পৃথক্‌, তা ব'লে তাঁরও কি পৃথক্‌? ভাব আর কান্তি এলে কি থাক্‌লো? তবে এঁরা বল্লেন কেন,—"মহাভাবস্বরূপিণী রাধা ঠাকুরাণী," ওঁরা প্রমাণ করলেন—

রাধা কৃষ্ণ-প্রণয়-বিকৃতি হ্লাদিনী শক্তি রস্মা
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ং চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্ ॥*"

বলিতে বলিতে রোষের আবেশে রক্তচক্ষু হইলেন। বাক্য রুদ্ধ হইল, সর্ব্বাঙ্গে ঘাম ঝরিতে লাগিল, গভীর হুঙ্কার করিলেন, আরও কিছু বলিতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু বলিতে পারিলেন না, প্রায় দুই তিন মিনিট এইভাবে স্তব্ধ মূর্ত্তিতে বসিয়া রহিলেন---রোষ প্রশমনের জন্য ভক্তবৃন্দের মধ্যে কেহ কেহ মৃদু স্বরে জয় নিতাই জয় নিতাই ধ্বনি করিলেন, ক্রমশঃ শ্রীগুরুদেবের স্বাভাবিক অবস্থা আসিলে উদ্বেগ উৎকণ্ঠা ধীরে ধীরে কমিতে লাগিল। তারপর বলিলেন—

## শাস্ত্র ব্যাখ্যা

**"দেখ তার (বড় বাবাজীর) আদেশ ছিল, ব্যাখ্যা ট্যাখ্যা পড়ো না, গ্রন্থকর্ত্তাকে স্মরণ ক'রে গ্রন্থ বুকে ধরে কাঁদো, অর্থবোধ আপনি বিকাশ পাবে।"**

এই সময় নবাগত একটি যুবক (নাম দিলীপ রায়,) শ্রীগুরুদেবকে প্রশ্ন করিলেন,—আচ্ছা সংসারে থেকে কি ক'রে ভজন সাধন করা যায়?

প্রশ্নটি শুনিয়া শ্রীগুরুদেব বড় আনন্দ প্রকাশ করিলেন, বড় তৃপ্তির হাসি তাঁহার শ্রীমুখে ফুটিয়া উঠিল, যুবকের দিকে উজ্জ্বল দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন—

## সংসারী লোকের ভজন সাধন

**"ওরে বাবা! এ সংসার সমুদ্রের ঢেউ থাম্‌বেনা, তারই মাঝে ডুব দিতে হবে, তবে নোলিয়াকে সঙ্গে নিতে হবে, নইলে সামনাসামনি গেলেই ধড়াস্। ঢেউ কি কমবে? ওরই মাঝে থেকে তাদের হাত ধরে ডুব্‌তে হবে তবে স্নান হবে........†**

---

*অর্থ—হ্লাদিনী শক্তি শ্রীরাধা হইতেছেন কৃষ্ণপ্রেমের চরম পরিণতি। সেই জন্য উঁহারা একআত্মা হইয়াও দুই দেহ ধারণ করিয়াছেন—এক রাধা ও এক কৃষ্ণ। এখন নদীয়া লীলায় সেই দুই দেহ আবার এক হইয়া যে স্বরূপ দাঁড়াইল তাঁহার নাম হইল চৈতন্য এবং তিনি রাধাভাব ও রাধাদ্যুতি সম্বলিত। আমি সেই কৃষ্ণস্বরূপকে প্রনাম করি।

† পুরীধামে সমুদ্রে যাত্রীদিগকে নামাইয়া নিজে সাঁতার দিতে দিতে যাহারা যাত্রীদিগকে সমুদ্রের স্নানের আনন্দ দেয়, তাহাদিগকেই উৎকল ভাষায় নোলিয়া বলে।

অতুল প্রভু বেশ ব'লতেন—সংসারটা খোঁয়াড়, দুষ্টু গরুকে শাস্তি দেবার জন্যে খোঁয়াড়ে পুরে রাখে, খোঁয়াড় বোঝো ? দোফালা বাঁশের ঘেরা দিয়ে খোঁয়াড় হয় ; এদিকে ঘাস থাকে ওরই ফাঁক দিয়ে মাঝে মাঝে মাথা নাড়ে আর একটু একটু ঘাস খায়, এও তেমনি।"

বলিতে বলিতে যেন দুঃখীর প্রতি করুণা প্রকাশের দৃষ্টিতেই চাইলেন।

সেই যুবকটি আবার প্রশ্ন করিলেন—মন ঠাণ্ডা ক'রে নাম ক'রবো মনে ক'রলেও পারি না, বড় ঝঞ্ঝাট আসে, খুব বাধা পড়ে।

শুনিবামাত্র শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখে উজ্জ্বল হাসি দেখা দিল, তাঁহার শিশুসরল দৃষ্টির সহিত সেই লাবণ্যে ভরা হাসিতে সকলের মনে কি এক অপূর্ব্ব আনন্দের শিহরণ জাগিল, এই প্রশ্নে শ্রীগুরুদেব কি বলেন শুনিবার জন্য সকলে উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। শ্রীগুরুদেব বলিলেন—

"বাঃ, বেশ কথা তো, গাই খাবে কম, নাদবে বেশী, দুধ দেবে ঢের, একি হয় ? তাকে খাওয়াও সব অভাব পূর্ণ হবে, তাকে সুখ দাও। এরাজ্যেও ওই কথা, লাথি খাবনা, তাকি হয় ? তাকে সুখ দিলে সব হয়, মাঝে মাঝে লাথিটাও খেতে হবে বৈকী।"

বলিয়া মুচকি হাসিলেন ; নাম মালায় সংখ্যা রাখিয়া অপর পার্শ্বে ভর দিয়া বসিলেন।

যুবক আবার প্রশ্ন করিলেন—আচ্ছা ! নিজেকে এত ভাল ক'রতে চেষ্টা করেও পারছিনা তো ?

শ্রীগুরুদেব—সর্ব্বদা নিজের দোষ চিন্তা ক'রতে হয়, তিনি ( শ্রীবড় বাবাজী ) আমাকে বলেছিলেন, তুমি একটি দোষের খনি। এবার মিল করে দেখ দেখি কি পাও।

যুবক—এমনি বেশ আছি, কিন্তু নাম ধ্যান করলেই সংসারের উৎকট জ্বালা যেন বেড়ে উঠে।

শুনিয়া শ্রীগুরুদেব সম্মুখে উপবিষ্ট এক অনুগত কবিরাজের দিকে চাহিয়া বলিলেন—

## ভবরোগের চিকিৎসা

"তোমাদের চিকিৎসার তো দুটো পথ ; বাড়িয়ে সারান, আর কমিয়ে সারান ; বাড়লে অনেক সময় রোগী ঘাবড়ে যায়, তখন অন্য চিকিৎসক ডাকে, সে হয়তো খেই পায় না, শেষটা চিকিৎসা সঙ্কট, তারপর বিপদে পড়ে ; এ রাজ্যেও তাই, অনেক সময় বাড়িয়ে দেয় অশান্তি যেমনি আসে অমনি সরে পড়ে ;"

এই বলিয়া উদাসীর মত নিরপেক্ষভাবে মৌন হইলেন। এই সময় কোন গোস্বামীর আশ্রম সম্বন্ধে কথা উঠিল, তাই বলিলেন—

## ত্যাগীর আশ্রমের রীতি

"দেখ, বৈরাগীর আশ্রমে গুরু ভাই পরম্পরাই ভাল, নইলে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া আসন নিয়ে বিবাদ হয়। সব তাপ জুড়াবার ঠাঁই যেখানে সেখানে ব্যবহারিক অশান্তি ঘটা বড় দুঃখের!"

কিছুক্ষণের জন্য প্রসঙ্গ বিরতি হইল, আটটা বাজিয়াছে, শ্রীঠাকুরের বাল্য ভোগ প্রসাদ গ্রহণের জন্য ভক্তবৃন্দ বাহিরে আসিলেন; প্রায় পাঁচ ছয় মিনিট পরেই আবার সকলে আসিয়া বসিলেন। তখন শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখ খানি বেশ প্রফুল্ল দেখাইতেছিল। বড় শান্ত হইয়া বসিয়া থাকিলেন। গতকাল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্র নাথ মিত্র মহাশয় আসিয়াছিলেন, তাঁহার সহিত বড় বিচিত্র প্রসঙ্গ হয়, সেই সম্বন্ধে এখন শ্রীগুরুদেব বলিতে লাগিলেন—

## কুলোচিত আদর্শ চিন্তা

"ওগো, স্বজাতির আদর্শ টাও ভাববার, এতেও বড় কাজ হয়, যে কুলে জন্মেছ, সে কুলের আদর্শ ভাবলে কি সোজা কাজ হয়? নিজের কুল ভুলোনা, ব্রাহ্মণ কুলে জন্মেছ, তাতে তো রূপ সনাতন, জীব এসেছিলেন, এদের কথা কও অভিমানও যাবে, সেখানের দৃষ্টিও পড়বে। বৈদ্যকুল? বেশ বেশ ভুলবো কেন? মুরারি গুপ্ত, কর্ণপূর, সরকার ঠাকুর, কবিরাজ এঁরা রয়েছেন না, বড় গরবের জিনিষ নয় কি? কায়স্থ কুলে জন্ম, তা দাস গোস্বামীর কথা ভাব, তারপর বণিক কুল? সেখানে উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর, ওঁর ভাণ্ডারে কি কম রেখে গেছেন? কুলের আদর্শ ভাবলে গৌরগণের নজর পড়বে গো, তোমার তখন মনে আসবে কবে এমন দশা হবে........"

এই অসমাপ্ত কথার মাঝেই অন্যান্যকে লক্ষ্য করিয়া আমাদের গুরুভ্রাতা নন্দলাল পাল বলিলেন—এসব শাসন ভাই!

শুনিয়া শ্রীগুরুদেব একটু হাসিয়া থামিলেন, তারপর বেশ উৎফুল্ল ভাবে বলিলেন—

"হ্যাঁগো হ্যাঁ, ঝিকে মেরে বৌকে শেখান, দেখনা কর্ত্তার (শ্রীগৌরের) নিজের কথা, "আপনাকে করে প্রভু জীব অভিমান" তাই নাকি? একি তাঁর স্বভাবের কথা? না তোমার কক্ষায় দাঁড়িয়ে?

ঠাকুর নরোত্তম যে এত বলেছেন, "কাম ক্রোধ রিপুগণে........" একি তাঁর কথা? তাঁরা তো প্রেমের অবতার, এ তোমার কক্ষায় দাঁড়িয়ে বলা, তোমরা নিজেদের অবস্থা জাননা,

জানলেও ব'ল্‌তে পার না, তাই সব ব'লে গেছেন, তোমরা তোমাদের অবস্থা দেখ, আর বল, তা হলেই হবে।"

বলিতে বলিতে শ্রীগুরুদেব আপন মনেই হাসিতে লাগিলেন, বড় প্রফুল্লতার হাসি। এই হাসি দেখিলে সংসারের আর কোন জ্বালাযন্ত্রণা স্পর্শ করে না। যাঁহারা শ্রীগুরুদেবের শ্রীপাদপদ্ম দর্শন ও তাঁহার শ্রীমুখের কথা শ্রবণের সৌভাগ্য লাভ করেন সেই শ্রীগুরুচরণাশ্রিত গণের আর কিছুই করা লাগেনা।

তাই গোস্বামী তুলসী দাসের একটি কথা মনে হয়—

**শ্রীগুরু পদ নখ মণি গণ জ্যোতি। সুমিরত দিব্য দৃষ্টি হিয় হোতি॥**
**দলন মোহতম সো সুপ্রকাশু। বড়ে ভাগ উর আবই জাসু॥**

অর্থাৎ শ্রীগুরুর চরণ-নখরূপী মণিসমুহের জ্যোতির স্মরণ করিলেই হৃদয়ে দিব্য দৃষ্টি হইয়া থাকে। তাঁহার ভাগ্য খুবই প্রসন্ন যাঁহার হৃদয়ে অজ্ঞানান্ধকারহারী এই শ্রীগুরুমূর্ত্তিখানি বসিয়া আছেন।

আজ এই মহামহিমময় শ্রীগুরুমূর্ত্তি দর্শন করিতে করিতে ভক্তবৃন্দ একে একে বাহিরে আসিলেন।

## ১৩১৪ সাল ২২শে চৈত্র সকাল ৬॥ টা হইতে—৯।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব দিনের মত নিত্য-দর্শনপ্রার্থী ভক্তবৃন্দ শ্রীগুরুদেবের চরণপ্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। শ্রীগুরুদেব "শ্রীগুরু-কৃপার দান" নামক শ্রীখণ্ডের কীর্ত্তনের পদাবলী ও তাহাতে সন্নিবেশিত তাঁহার স্বতস্ফূর্ত্ত অক্ষর সমূহের পাঠ শুনিতেছেন, আর কখনও গম্ভীর হুঁঙ্কার করিতেছেন, কখনও হাসিতেছেন, কখনও কাঁদিতেছেন, কখনও তৃপ্তিভরা মুখে ফুৎকার করিতেছেন, কখনও দাসের মত, কখনও দাসীর মত অলক্ষ্যে প্রভুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন, কখনও আবার শ্রীখণ্ডের ভাবময় স্মৃতিতে আবিষ্ট হইতেছেন, আবার গৌরভাবিনী খণ্ডবাসিনী রমণীর ভাবে কটাক্ষে চাহিতেছেন। আহা! আস্বাদনমুগ্ধ শ্রীগুরুদেবের কি অপূর্ব্ব আবেশ! পাঠ শেষ হইল। পাঠ শুনিয়া সেই ক্ষণের আনন্দকে যেন বন্দনা করিয়া কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন; বাম হাত খানি পার্শ্বের ঠেস্ দেওয়ার স্থানটীতে প্রসারিত করিলেন, দক্ষিণ জানুর উপর মালা রাখিয়া পিছনের একদিকে হেলিয়া পড়িলেন। পাঠ শ্রবণ কালে সেই আনন্দের হাসি এখনও শ্রীমুখে লাগিয়া আছে, সেই দৃষ্টির উজ্জ্বলতা এখনও সমবেত ভক্ত বৃন্দের উপর ছড়াইয়া পড়িতেছে, সেই অর্দ্ধমুক্ত অধরওষ্ঠ দুইটির ফাঁকে এখনও অবিরাম নামজপরত জিহ্বার কম্পন দেখা যাইতেছে, আবার বক্রদৃষ্টির ভঙ্গীতে চাহিয়া কি ভাবিয়া বলিতে লাগিলেন—

"ওগো, সে আর এখন নেই, ওই যে হাতী কিন্‌ছিলো। বুঝলে না? হরিহর-ছত্রের মেলায় অনেক রকম জিনিষের কেনা বেচা হয়, হাতী ঘোড়া। একজন ব'ল্লে হম্ হাতী লেগা, দর দস্তুর হোলো, যার হাতী সে ভাব্‌লে যাক্ একটা খ'দ্দের পেলাম, এ'ত আর যে সে কেনে না। তারপর যার হাতী সে পরে এসে বল্লে "ক্যা বাবু! আপ্ হাতী লে লিজিয়ে ঔর রুপেয়া দে দিজিয়ে।" যে নেবে ব'লে ছিল, সে কি বল্লে জান? সে ভারিক্কী চালে ব'ল্লে আরে যে হাতী নেবে বলেছিলো, সে চলে গেছে, তোমার ওখানে যে গিছলো সে তো এখন নেই।"

বলিয়া হাসিতে লাগিলেন, আবার বলিলেন—

"এক মাতাল হাতী কিন্‌ছিলো, ওই যে ক্ষণের পূজা আছে না, ক্ষণদা চিন্তামণি, চিন্তামণি ক্ষণে দেয়, তাইতো ক্ষণটীকে বন্দনা করেছেন, শব্দব্রহ্ম প্রতিক্ষণে আস্‌ছে আর ঐ হৃদয়ে ব'সে জানাচ্ছে"

বলিতে বলিতে আবার ভাবমত্ত অবস্থায় স্থির হইলেন। কিছুক্ষণ পরে নিজের সেবকদের কথা বলিলেন—

"কাল নন্দ, নিতাই, শ্যামচরণ এরা সব প্রদর্শনী দেখতে যাচ্ছিল ব'ল্লাম, উঁহু প্রদর্শনী ই। বুঝ্‌লে? ও হোলো প্রদর্শন ই ই; হবে তো? এতদিন যে সব নিতাই জগতময় ক'রে দেশে দেশে ঘুরে বেড়ালে সে দৃষ্টি আছেতো? কিগো! তোমাদের প্রদর্শনী মানে কি বলে? প্রদর্শনীই তো? ভাল ক'রে দেখা তো? ব্যাকরণে কি তাই ব'লে তো? ভাল ক'রে দেখ্‌লে আর কি বাকী থাকে? সেখানে সবই সুন্দর হ'য়ে আছে কেবল নাকি গৌরসুন্দরের রূপ নাই' সেকি কম রহস্যের কথা গা? সে লুকিয়ে আছে, সে সুন্দরকে দেখ্‌লে আর কি কিছু ভাল লাগবে? সেও ভাবছে এত সৃষ্টি ক'র্‌লাম এদিকে আবার আনতে হবে তো? তাই সুন্দরের আকর্ষণের প্যাঁচ ক'ষছে। আর আরও সুন্দরের আকাঙ্ক্ষা জাগাচ্ছে চরমে সে আস্‌বে, তবে এ সুন্দরে আট্‌কাস্‌নে যেন।"

"তাইতো কথা, প্রদর্শনীতে সব আছে, গৌর রূপ লুকিয়ে আছে, আট কে যাবি, যা আছে ছড়িয়ে দিয়ে আস্‌বি কেন, এখানে ভোগ করনা, প্রাকৃত আকর্ষণ ভুল করিয়ে দেবে। ওই যে গো উনি আসছিলেন (সম্ভব পরমহংস রামকৃষ্ণ) মেছো বাজার দিয়ে, আর ওই পথে একটি বাবুও আসছিলেন, বাবুটি ওপরদিকে নজর ক'রেই থেমে গেলেন। তাই না দেখে উনি ভাবলেন, হঠাৎ বাবুটী থামলেন কেন? তারপর নিজেও ওপরদিকে তাকিয়ে সমাধিলাভ ক'রলেন, ভাবলেন ও প্রাকৃত মায়ের এত আকর্ষণ তাহ'লে প্রকৃত মায়ের না জানি কি আকর্ষণ। বুঝলে গো… …"

বলিতে বলিতে শ্রীগুরুদেবও বাহ্য আবেশশূন্য হইয়া কিছুক্ষণ আবিষ্ট হইয়া রহিলেন, অস্ফুট ধ্বনিতে নিতাই নিতাই বলিয়া ফুৎকার করিলেন, যেন বালকের চপলতা হঠাৎ থামিয়া গেল। আবার বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে জড়তার সহিত শ্রীগুরু শ্রীগুরু বলিয়া কথার সূত্র-হারাণর মত প্রশ্নজড়িত দৃষ্টিতে এদিক ওদিক চাহিতে লাগিলেন, উদ্বেগ হইতে লাগিল, মুখ ও কপাল ঘামিয়া গেল। চক্ষু দুইটী কাঁদিয়া কাঁদিয়া শুভ্র কার্পাসের মত হইল, মুখমণ্ডলের উজ্জ্বলতায় কিসের আবরণ পড়িয়াগেল, বাহু যুগলের লোমাবলি কণ্টকিত হইল, যেন অসাবধান জড়তায় মুখের দুই পার্শ্ব হইতে ফেন মিশ্রিত লালা বাহির হইল, সর্ব্বাঙ্গ শিথিল হইল, এই সময় আমাদের কোন গুরুভাই জয় নিতাই জয় নিতাই ধ্বনি করিলেন। ধীরে ধীরে শ্রীগুরুদেবের বাহ্য আবেশ হইতে লাগিল।

তাহার পর এই পরমানন্দ স্বরূপকে এই অবস্থায় দর্শন করিতে করিতে প্রণাম করিয়া ভক্তবৃন্দ একে একে চলিয়া আসিলেন।

## ১৩৫৪ সাল ২৩শে চৈত্র সকাল ৬॥ হইতে ৯॥ টা

প্রভাতের নামকীর্ত্তন পূর্ণ হইল। শ্রীগুরুদেব নামকীর্ত্তন স্থল হইতে প্রণাম করিয়া ফিরিয়া আসিয়া একখানি কম্বলের আসনে বসিলেন। হাতে নামমালা, শ্রীমুখে অপেক্ষাহীন ভাব, নয়নে বিস্ময় কোমল দৃষ্টি। এই কয়দিন শ্রীগুরুদেব যেন আনন্দ-বিমর্ষভাবে রহিয়াছেন। কখনও স্বতঃ প্রণোদিত হইয়া কিছু বলিতেছেন, কখন আবার কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিলেও উত্তর দিতেছেন না। এখন দুই তিন মিনিট মৌনভাবে থাকিয়া এক অনুগতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। ইনি শ্রীগুরুদেবকে অবলম্বন করিয়া সংস্কৃতে এক অষ্টক রচনা করিয়াছেন। অষ্টকটীর নাম—'শ্রীরামদাসাষ্টক'। ইহা শ্রীগুরুদেবকে শুনাইবেন বলিয়া ইনি পূর্ব্বে নিবেদন করিয়াছিলেন। এখন শ্রীগুরুদেব ইঁহার দিকে অনুজ্ঞাদৃষ্টিতে চাইতেই ইনি সেই অষ্টকটী পাঠ করিতে লাগিলেন, শ্রীগুরুদেব শ্রবণ করিতে লাগিলেন। শ্রবণ করিতে করিতে কম্প অশ্রু পুলকাদি অপূর্ব্ব সাত্বিকভাবে বিভূষিত হইয়া হুঙ্কার করিতে লাগিলেন। সে দৃশ্য দর্শন করিয়া উপস্থিত ভক্তবৃন্দও নয়ননীরে ভাসিতে লাগিলেন।

শ্রীগুরুদেবের নিকট নিজের বলিয়া কিছু নাই। নিজের শ্রীগুরুচরণেই যথাসর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া দিয়াছেন এইরূপ তাঁহার মনোভাব। এমন কি নিজের দেহটী পর্য্যন্ত তাঁহার নয়, তাঁহার শ্রীগুরুদেবের, এইরূপ মনোভাব তিনি গভীর আন্তরিকতা সহ পোষণ করেন। পরমপ্রিয় শ্রীগুরুদেবের যাহা কিছু, সবই তাঁহার অতি আদরের অতি সম্মানের ইহা তিনি মনে প্রাণে ধরিয়া লইয়াছেন। তাই তিনি সহস্র সহস্র নরনারীকে মন্ত্রদান

করিলেও তাহাদের মধ্যে কাহার পরিচয় দিতে অমুক আমার শিষ্য এরূপ বাক্য প্রয়োগ করেন না। তাঁহার শ্রীগুরুদেবের সম্বন্ধ উল্লেখ করিয়াই তাহাদের পরিচয় প্রদান করেন এবং বৈষ্ণব জ্ঞানে অলক্ষ্যে তাহাদের পদধূলিও গ্রহণ করেন। নিজের চিত্রপটকেও আদর সম্মান করিয়া প্রণাম করেন, বলিলে বলেন—ওকি আমার, উহা শ্রীগুরুদেবের।

তাই এখন নিজ নামিত অষ্টকের মধ্যে নিজের গুণ শুনিয়া তাহা নিজের শ্রীগুরুদেবেরই গুণ বলিয়া মনে করিতেছেন। নিজের পাপীতাপী উদ্ধারলীলাকে নিজের শ্রীগুরুদেবের লীলা বলিয়া মনে করিতেছেন। তাই তাহা শ্রবণ করিয়া ভাবাবিষ্ট হইয়া ব্যাকুল হইয়া কাঁদিতেছেন। এমন সময়ে আবার সংশোধন দৃষ্টিতে লেখকের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"ওতে তোমার একথা প্রকাশ পায়নি কেন, শ্রীগুরুদেব যে গৌর গোবিন্দের বিলাস ক্ষেত্র।"

অষ্টক পাঠ শেষ হইল, শ্রীগুরুদেব বহুক্ষণ যাবৎ ভাবাবিষ্ট অবস্থায় মৌন রহিলেন। তারপর অনুগত গণের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন—

## ত্যাগীর মহোৎসব রীতি

"দেখ, কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে কাজ করা ভাল, লোকে কি ভাববে এ ভেবো না, ভারী গোলমালে প'ড়বে। একটা কথা জাগে—তোমরা তো তাঁর (শ্রীরামহরি দাস বাবাজী মহাশয়ের) প্রণোতি শিষ্যের অভিমান রাখ, তাঁর কথা নিজে শুনেছি, তিনি অনেকদিন তো ব্রজে বাস করলেন, সেখানে গৌরমন্ত্র নিয়ে বিরোধ উপস্থিত হ'য়েছিল; তিনি নবদ্বীপে চলে এলেন; ব্রজে যখন থাকৃতেন তখনতো ওই কালাবাবুর কুঞ্জে; ঐদিকের নিম গাছটার কাছে, কোনার দিকের ঘরখানাতে থাকৃতেন; সেখানের ব্রজবাসী বাবাজীরা বল্লেন—এতদিন ব্রজে বাস ক'রে চ'লে যাচ্ছেন? তাতে তিনি বল্লেন—দূর তোর ব্রজে বাস, গৌর-বাদী দেশে থাকৃতে নাই। আসবার সময় অনুগতদিগে ব'লেছিলেন---ওরে দেহ-সম্বন্ধে যদি কিছু হয়, তাহ'লে কিছু ক'রবি তো? দেখ বৈরাগী কারও অপেক্ষা করে না, উৎসব ক'রলে তারা তিন রকমের করে; এক নম্বর উৎসব হোলো, ঠাকুরের ভোগ দিয়ে আর এক মূর্ত্তির আয়োজন; দুনম্বর করলে ঠাকুরের ভোগ দিয়ে প্রসাদ পেও, আর তিন নম্বর হোলো মহা মহোৎসব...যমুনার ধারে গিয়ে তিন লক্ষ নাম করবে ব্যস্। শুন্‌লে তো, তাই ভাল নয় কি?"

শ্রীগুরুদেবের এই আবেশ কেন যে প্রকাশ পাইল, তাহার আভাস কিছু যেন পাওয়া গেল, তারপর একটু থামিয়া বলিলেন—

"এরা সব চারদিকে নিমন্ত্রণ ক'রছে,* একি বৈরাগীর কর্ত্তব্য! এত যে নিমন্ত্রণ তাতে

---

* অর্থাৎ আগামী দিনে বরাহনগরে শ্রীপাঠ বাড়ীর উৎসবের আয়োজনে ভ্রাতৃবৃন্দ চার দিকে নিমন্ত্রণ করছেন।

মর্য্যাদা রাখতে পারবে কেন? এতে যে অপেক্ষা এসে পড়ে, তাতে নানারকম কটাক্ষ আসে…………”

বলিতে বলিতে থামিয়া গেলেন, অনুগতবৃন্দের প্রতি নিজ মনোভাবমাত্র ব্যক্ত করিলেন।

## ব্রজ দর্শন

এই সময় শ্রীবৃন্দাবনের কোন মোহান্ত বৈষ্ণব আসিলেন, শ্রীগুরুদেবও তাহাকে বসিতে প্রার্থনা জানাইয়া সদৈন্যে প্রণতি জ্ঞাপন করিলেন, এই অবসরে আর একটি ভাবের সঞ্চার হইলে সহজ স্বচ্ছন্দ ভাষায় বলিতে লাগিলেন—

“ওগো ব্রজে গিয়ে নানা কিছু দেখে আসে, আর ব্রজবাসীর ত্রুটি বিচ্যুতি লক্ষ্য করে, ওর কারণ কি জা'ন? কারোর কৃপা নিয়ে যাওয়া হয় কি? তা নিয়ে গেলে কৃপা অনেক কিছু ভোগ করায়, আরে সে যে ব্রজবিহারী, বিহার ছেড়ে কি বিহারী হয়? আগে বিহার তারপর বিহারী, ভক্তের হৃদর হোলো বিহার ভূমি, তাদের কৃপা তাদের স্মৃতি এসব ছেড়ে কি ভোগ হয়? তারা না জানালে কি কেউ জান্‌তো? আমরা আর কি বুঝি, সবই তো তাদের জানান। জানান জিনিষ যখন তখন কৃতজ্ঞতাও স্মৃতি, তাতেও হবে। ব্রজে গেলে 'তাদের জানান ব্রজভূমি' এই স্মৃতি নিয়ে গেলেও কম কাজ হবে না, তাতে কি আর বিপরীত দৃষ্টি আসে?”

এই বলিয়া থামিলেন। এমন সময় কোন এক ভক্ত দু একটি প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন, শ্রীগুরুদেবও অবুঝ বালকের মত ফিরিয়া ফিরিয়া চাহিলেন; খোলা দৃষ্টি, স্বচ্ছন্দ ভঙ্গী, কোন উত্তর দিলেন না; ইহারই মধ্যে কথাপ্রসঙ্গে প্রশ্ন উঠিল—নাম জপ বা কীর্ত্তন করিতে করিতে মনে নানা বিষয় কথা উদিত হয় কেন? শ্রীগুরুদেব এই প্রশ্নে বাধা দিয়া বলিলেন—

## নাম ও মনের বাসনা বেগ :

“হুঁ, হুঁ বাবা, 'শুনিয়া গোবিন্দ রব আপনি পলাবে সব, সিংহরবে যেন করিগণ' নাম ক'রে যাও যত নাম ক'রবে মনের বনে যে সব কামনা বাসনারূপী হাতী ঘোড়া আছে নাম-সিংহের রবে সব বেরিয়ে পড়বে, বেরোচ্ছে বেরোক্, নাম ক'রে যাও—”

বলিয়া একবার অপলক দৃষ্টির সহিত কম্পিত হইয়া হুঙ্কার করিলেন, যেন স্বয়ং নাম মূর্ত্তিমান্ হইয়া হুঙ্কার করিলেন, সে হুঙ্কারে যেন সকলের হৃদয়েই ক্ষণিকের জন্য অলৌকিক বস্তুর স্পর্শ হইল।

আবার দুই একটি কথাপ্রসঙ্গ আরম্ভ হইল। এই সময় একটি যুবক আসিলেন, সম্ভব আমাদেরই গুরুভাই, কোথায় অষ্ট প্রহর নাম কীর্ত্তন করিবার আয়োজন করিয়াছেন। তার ইচ্ছা সেই নাম যজ্ঞের সুষ্ঠু সমাধানের জন্য শ্রীগুরুদেব যেন তাঁহার সেবকদিগকে পাঠান্। শুনিয়া শ্রীগুরুদেব নিরপেক্ষভাবেই উত্তর দিলেন—

## নিরপেক্ষভাবে কীর্ত্তন ঃ

"কে যাবে বল, কাকেও তো দেখছিনা, তাইত সে আমাকে বলেছিল (শ্রীবড় বাবজী) রাম পার তো করতাল বাজিয়ে নাম কোরো, কীর্ত্তনের দল কোরো না। আর ঐ ভাবেই তো চব্বিশটী বৎসর ছত্রিশটী জেলায় ঘুরিয়ে বেড়ালে কত দিয়েছি………"

বলিতে বলিতে শিহরিয়াই আবিষ্ট হইলেন, কিছুক্ষণ মৌন হইয়া রহিলেন; অকস্মাৎ কি ভাবিয়া দুলিতে লাগিলেন, কিছু বলিতে পারিলেন না, কিসে যেন আটকাইয়া গেলেন, তাহার পরই যেন উত্থিত বেগকে সংযত রাখিতে না পারিয়া অবশভাবেই বলিলেন—

## পতিতের প্রতি করুণা-গৌরব ঃ

"ওগো ওই যে পয়ারটী—"মদিরা যবনী যদি ধরে নিত্যানন্দ।
তথাপি ব্রহ্মার বন্দ্য কহে গৌরচন্দ্র॥"

ও হোলো ভবিষ্যৎ-বাণী, আর বস্তুর ইঙ্গিত, বুঝলে? এই ধরনা তোমাদের বিধি-শাস্ত্রের আইন কানুনে কেউকি পতিতদের কাছে যেতে পারে? ওই যে গো, কলকাতায় আছে না, অমুক গাছি, অমুক বাগান, সেখানে কেউ যায়? যায় না; কেউ মেশে? না, তোমাদের বিধি শাস্ত্রের মতে পতিত পাড়ায় গেলে ভয় হয়। আমাকে পতিত ক'রবে, ঠেকো ক'রবে, তাছাড়া ওদের অর্থে তো কিছুই চলেনা; আচ্ছা বল দেখি বুক ঠুকে কে যায়? কে আত্মসাৎ ক'রে নেয়? আয় আয় পতিত ব'লে কে বুকে নেয়? সে আমার অভিন্ন চৈতন্য-তনু ঠাকুর অবধূত নিতাই…."

বলিতে বলিতে অসাবধানী পুরুষের মত কি যেন জড়াইয়া ধরিয়া আত্মহারা হইলেন, আবার কি ভাবিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া আপন মনেই মৃদু ভাষায় বলিতে বলিতে স্পষ্ট করিয়া বলিলেন—

## সিদ্ধ কৃপা ঃ

"ওগো তোমাদের পুঁথিতে তো সিদ্ধের কথা আছে, নিত্যসিদ্ধ, সাধনসিদ্ধ, আর কৃপাসিদ্ধ, হ্যাঁগা কোন সিদ্ধের প্রাণকাঁদা স্বভাব? কোন সিদ্ধের অল্প কৃপায় কাজ হয়? আমার মনে নেয় কি জান? কৃপাসিদ্ধেরই প্রাণকাঁদা স্বভাব, ওদের দিয়ে সে প্রচার করায় আর তার অহৈতুকী করুণা দিয়ে পতিতকে কোলে নেয়, ভোগ তো এরাই করায়........"

বলিতে বলিতে কম্পিত হইলেন, চক্ষু বন্ধ করিয়া রহিলেন, আবার প্রসঙ্গান্তরের আরম্ভ হইলে আবার করুণাময় শ্রীগুরুদেব আবেগপূর্ণ অবস্থায় বলিলেন—

## রাগের উপাসনা ঃ

**"হ্যাঁগা রাগের কথা কইছো তোমরা, আর এদিকে তো পাল্যপালক সম্বন্ধ ওল্টাচ্ছেনা, এ আবার কি? যেখানেই যাচ্ছ সবই তো ঠাকুর, এ আবার কি রাগ গো? ঠাকুরবোধে রাগ হয়।"**

বলিতে বলিতে দরদীচোখে চাহিয়া রহিলেন, ৯৷৷০টা বাজিয়া গেল, তাই আর কোন প্রসঙ্গের অবতারণা না করিয়া শ্রীগুরুদেবের সেই সুমধুর আবিষ্টমূর্ত্তি দর্শন করিতে করিতে ভক্তবৃন্দ প্রণতি জানাইয়া বাহিরে আসিলেন।

**১৩৫৪ সাল ২৮শে চৈত্র,। সকাল ৭—৯৷৷ টা; কলিকাতা।**

আজ প্রভাতে শ্রীগুরুদেবের সদানন্দময় মূর্ত্তিখানি বড় অপূর্ব্বভাবে আবিষ্ট হইয়া আছেন, ভক্তবৃন্দ তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিয়া আছেন, বোধহয় কিছুক্ষণ পূর্ব্বে কলিকাতা আমড়াতলার কোন অনুগত ভক্তের পুত্রবিয়োগের সংবাদ জানান হইয়াছে, সেই সম্বন্ধেই ভক্তবৃন্দ এখনও আলোচনা করিতেছেন। কারণ, ঐ ভক্তের এখনকার অবস্থাটী নাকি খুবই উদ্‌ভ্রান্তকর। শ্রীগুরুদেবও যেন সবই জানিয়া আবার না-জানি না-শুনি ভাবেই মাঝে মাঝে ইঁহাদের দিকে ফিরিয়া ফিরিয়া চাহিতেছেন, আর লক্ষ্যহীন দৃষ্টিতে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছেন; হাতে নাম মালা।

শ্রীগুরুদেবের সম্মুখে ও পার্শ্বে উপাবিষ্ট ভক্তবৃন্দ সমুদ্রের মুখে নদনদীর প্রবেশের মত আত্মলয় করিয়া আছেন, সকলেই শ্রীগুরুদেবের ভাবতরঙ্গের কম্পনে কম্পিত হইতেছেন, আর তাঁহার শ্রীমুখ হইতে যে বাণীগুলি ক্ষণে ক্ষণে প্রকাশ পাইতেছে তাহারই উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত হইতেছেন। সম্মুখের দরজাটী খোলা, সেই দিক হইতে প্রভাতের সোণালী সূর্য্যকিরণ গৃহে

প্রবেশ করিয়া শ্রীগুরুদেবের উপর পড়িয়া উজ্জ্বল শ্যাম-গৌর অঙ্গের ছটাকে আরও অনুপম ভাবে আকর্ষণীয় করিয়াছে ;

শ্রীগুরুদেব ঐ মালাজপের অবস্থাতেই ক্ষণে ক্ষণে ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িতেছেন, আবার বাহ্যভাবে স্নিগ্ধ হাসিয়া চাহিতেছেন। পূর্ব্বের প্রসঙ্গটিরই যেন উত্তর দেওয়ার মত বলিলেন—

## একই কর্ম্মের দুই ফল

"দেখ এক কাজে দুই ফল, পাপ আর অপরাধ, এ দুটিরই নাম ভেদ হয় ফলে, আসলে একই কাজ, কিন্তু ফল দু'রকমের। না জেনে করলে পাপ ; আর জেনে করলে অপরাধ, এই কেমন জান ? গবর্ণমেণ্টের অফিসার আর সাধারণ লোক। হয়তো একই অন্যায় করেছে, কিন্তু শাসন কি এক রকমের হবে ? না, তা কেন হবে, অফিসারের ওপর শাসন হবে কড়া, এ রাজ্যেও তাই, আইন কি আর ভাবগত ছাড়া হবে ? ও তরফের প্রেরণা না থাক্‌লে কি আইন হয় গা ?"

বলিতে বলিতে স্থিরনেত্রে চাহিয়া রহিলেন, বোধহয় নিজজনের প্রতি তাঁহার শাসন কিরূপ হয় তাহারই ইঙ্গিত করিলেন। কিছুক্ষণ পরে আবার বলিলেন—

## ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি

"কর্ম্ম আর তার ফল কি ছাড়াছাড়ি থাক্‌বে ? দেহে স্বার্থবুদ্ধিতে কর্ম্ম করলেই অমনি ফল কাছেই থাক্‌বে ! আমার কাছে এস, নতুন খেলা দেখবে, এখানে কর্ম্মও নেই ফলও নেই…………*"

## স্বার্থবুদ্ধিতে ঈশ্বরের প্রতি দোষারোপ

প্রায় তিন চার মিনিট মৌনভাবে বসিয়া থাকার পর কলিকাতার আমড়াতলার ঐ

---

*শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখোক্তি এখানে অস্পষ্ট। তবু তাঁহার কৃপায় ইহাই বুঝা যাইতেছে যে, নিজের দেহের উপর আত্মবুদ্ধি করিয়া সেই দেহকে সুখে রাখিবার জন্য মানুষ যে কর্ম করে তাহা কাম্য কর্ম। তাহার ফল বন্ধন। আর ভগবানকে সুখী করিবার জন্য যে কর্ম করা যায় তাহা ভক্তি। তাহার ফল বন্ধন নয়। তাহার ফল ভগবৎ পাদপদ্মলাভরূপ মুক্তি। তাই ভগবান্ জীবদিগকে ডাকিতেছেন এস আমার কাছে এস। আমার উদ্দেশ্যে যে কর্ম করিবে তাহা বন্ধনাত্মক কর্ম নয়। তাহা ভক্ত্যাত্মক পরমানন্দ স্বরূপ।

ভক্তের বর্ত্তমান অবস্থাটির কথা তুলিলেন। তিনি নাকি তাঁহার পুত্র বিয়োগে ঈশ্বরের উপর রাগ করিতেছেন, সেইজন্য শ্রীগুরুদেব বলিলেন—

"সে কি কথা গো! ঠাকুরের ওপর আবার রাগ কিসের? এতো ভাল নয়, হিসেবের কথায় এসে দেখি, আচ্ছা তোমার মমত্ব বোধ ছিল কিনা দেখতো, নইলে কি রাগ হয়? স্বার্থ বুদ্ধি না থাকলে কি' তার ওপর রাগ হয়? যদি তাতেই টান থাক্‌বে তবে তো ভাল, দাতা দিয়েছিল নিয়েছে, আর যদি তোমরা এতে তাকে ভক্তের বিরহে এমনি হ'য়েছে বল, তবে ভাল কথা, তা'হলে তাকে শোকপাগল বলছো কেন? প্রেমোন্মাদ বলনা কেন; হ্যাঁগো হ্যাঁ, কারণ না থাকলে কি কার্য্য হয়, (লেখকের প্রতি) কি গো তোমাদের ন্যায় শাস্ত্রে নাকি "ধুমাৎ বহ্নি" বলে?"

বলিয়া হো হো করিয়া হাসিলেন, যেন উন্মাদের হাসি, এই হাসিটী দেখিয়া মনে হয়, ইনি এই হাসিতেই মানুষের সংসারের পথ ভুলাইয়াছেন।

এই সময় হাওড়া রামকৃষ্ণপুরের একজন ভদ্রলোক আসিলেন, তাঁহাকে দেখিয়া শ্রীগুরুদেব আর একটি নবভাবে আবিষ্ট হইলেন। তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিতে করিতে বলিলেন—

"তখন শীল-বাড়ীতে (কলকাতায় কলুটোলায় মোতিলাল শীল বাড়ী) থাকা হয়, একবার এদের বাড়ীতে এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটে, একদিন হঠাৎ পরেশ দাদা † এসে হাজির, তিনি আসতেই বল্লাম কী ব্যাপার!

পরেশদা বল্লেন— হ্যাঁ বাবা! এবার আর চালাকি নয়. মাথা ভাঙ্গবে, রামদাদা! ন্যাড়া মাথা ভাঙ্গবে, ওখানে নাম হ'চ্ছে (রামকৃষ্ণপুরে মণ্ডল মহাশয়ের বাড়ীতে) চলনা তুমি আর আমি, আর কাউকে বলবোনা।

তাই হোলো, আমিও ওঁর সঙ্গে গেলাম, তখন ভবতোষ মণ্ডলের ডবল নিমোনিয়া, ভুল বকা আছে, আমি তো পাশে দাঁড়ালাম, পরেশদা বল্লেন— দাঁড়িয়ে কেন বস' না।

আমার তো বুক ঢিপ্‌ ঢিপ্‌ ক'রছে, তিনি এক পাশে আর আমি ডান পাশে, রোগীর দু'হাত দু'জনের হাতে; খুব নাম হ'চ্ছে। কি যে হোলো তিন কোয়াটারের মধ্যে রোগী যেন প্রলাপের মত কত কি বকতে লাগালো, আমি তো আরও ঘাবড়ে গেলাম, তারপর রোগী কি বল্লে জান? বলে কদিন আমার সন্ধ্যা-আহ্নিক হয় নাই কাপড় ছাড়বো, সন্ধ্যা আহ্নিক কোরবো, ক্ষিদে পেয়েছে, খেতে দাও।

পরেশদা বল্লেন—কৈ কি আছে দাও।

---

† ইনি আমাদের মাষ্টার কাকা নামেই পরিচিত, শ্রীবড়বাবাজী মহাশয়ের ঐকান্তিক অন্তগতবৃন্দের অন্যতম, নিবাস হাওড়া জেলায়, ওকালতি করিতেন।

"খবর হো'লো সকালের দুধ প্রসাদ আছে, কিন্তু সে তো ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।

পরেশদা বল্লেন—প্রসাদ আবার ঠাণ্ডা হয়? দাও দাও। আশ্চর্য্য, সে খেলে, তারপর নাম আরম্ভ ক'রলে, একেবারে সহজ কণ্ঠ, কী তার ধ্বনি উঠতে লাগলো, এই অবসরে আমরাও চুপ ক'রে আস্তে আস্তে বেরিয়ে পড়লাম… …" ]

বলিতে বলিতে শ্রীগুরুদেব অকস্মাৎ থামিয়া গেলেন। পরম করুণাময় শ্রীগুরুদেব ভক্ত ভবতোষকে কৃপা করার ছলে নামের ঐশ্বর্য্য কত, সকলকে জানাইলেন। এদিকে-সেদিন নামের অবতারের যে প্রকট বিহার হইয়াছিল তাহাও যেন অব্যক্তভাবে ঢাকা দিলেন। আবার অস্পষ্টভাবে আবেশ-জড়ান কণ্ঠে কি বলিলেন, অল্প পরেই একদিন নিজ প্রাণ-সর্ব্বস্ব শ্রীরাধারমণ-সঙ্গে এই কলিকাতা মহানগরীতে ভয়াবহ সংক্রামক প্লেগ রোগের আক্রমণে প্রপীড়িত ও মৃত্যুভয়ে ভীত জীবের রক্ষার জন্য হরিনাম সংকীর্ত্তনে "অপ্রকটে নামরূপে সাক্ষাৎ শ্রীভগবানের" যে লীলা ঘটিয়াছিল তাহা আন-মনে বলিয়া ফেলিলেন—

"সেবার প্লেগ এসেছিল কলকাতায়, নাম তাকে নামিয়ে এনে-ছিলো, বৃন্দাবনের মহাত্মারা অনুভব করেছিলেন, দেখ, বলতে আমার লজ্জা নাই। নামের অবতার প্রকট হয়েছিল অনেকে দেখেছে। চোখে দেখেছি……"

আবেশভরে বলতে বলতে থর থর করিয়া কাঁপিলেন, অকস্মাৎ উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করিলেন, এমন গভীর হুঙ্কার করিলেন যে সকলের বুক কাঁপিয়া উঠিল। কিছু সময়ের জন্য বাহ্য-স্মৃতি লুপ্ত হইয়া গেল। প্রেমমূর্ত্তিমন্ত সহজ সুন্দর শ্রীগুরুদেবের সৌম্যমূর্ত্তিখানিতে যেন কোমলতার চিহ্নও নাই, শরীরের অবস্থাটী অস্বাভাবিক রকমের হইয়াছে, সদা অমৃত-নিস্যন্দী নয়ন যুগলে তীব্র আলোক ফুটিয়া উঠিয়াছে। স্নেহচিক্কণ গণ্ডদ্বয় অভাবনীয় কর্কশতা সহ সঙ্কুচিত হইয়াছে, যে লালসাময়ী জিহ্বাতে সর্ব্বদা নাম উচ্চারণের কম্পন থাকে, তাহাতে গভীর ব্যাকুলতা বিকাশ পাইয়াছে, সমগ্র মুখমণ্ডল সন্দর্শনে ভয়বিহ্বলতা আসে, ভাবাবেশে তাঁহার কণ্ঠ রোধ হইয়াছে। এইভাবে কিছুক্ষণ মৌন হইয়া নাম-আস্বাদনে রত হইয়াছেন। কেহ কোন কথা বলিতে সাহসী হইতেছেন না, দেখিতে দেখিতে কোন স্মরণীয় আকর্ষণে মুগ্ধ-চঞ্চল বালকের মত হইলেন অথচ কোন কথাই বলিতে পারিলেন না। তৎপরে শ্রীগুদেবের সাম্যাবস্থা দেখিয়া ভ্রাতৃবৃন্দের মনে তৃপ্তির আনন্দ আসিল। সমাগত, অন্তরঙ্গ, ভ্রাতৃবৃন্দ ভাব-অনুকুল-কথা-প্রসঙ্গের উত্থাপন করিলেন। যে প্রসঙ্গটীর স্মরণমাত্র শ্রীগুরুদেবের এইরূপ আবেশ হইল সেই বড় বাবাজী মহারাজ (শ্রীরাধারমণ চরণ দাস দেব) প্লেগের সময় কি ভাবে নামকীর্ত্তন আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহার সেই লীলাকথা "চরিত সুধা" হইতে পাঠ হইল। রসপিপাসু শ্রীগুরুদেবও সেই লীলাকথা শুনিতেছেন, মধ্যে মধ্যে

প্রেমপুলকিত গাত্রে কম্পিত হইয়া নয়ন-জলে ভাসিতেছেন। ভ্রাতৃবৃন্দও শ্রীগুরুদেবের সে-লীলা দেখিয়া ভাবভরে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে। এমনি লীলার আকর্ষণী মোহিনী-শক্তি আজ সকলকেই প্রেমে পাগল করিয়াছে। নিতাই গৌর প্রেমের পাগল, প্রাণের প্রাণ শ্রীরাধারমণ প্রেমাবেশে কীর্ত্তনের অমৃতপ্লাবনে প্লেগরোগাক্রান্ত, আর্ত্ত, ও সদা মৃত্যুভয়ে ভীত কলিকাতা মহানগরীর জনগণের চিত্তদর্পণের কলুষরাশি ধৌত করিয়া, নির্ম্মল করিয়া ও তাহাতে নব নব লীলাসূচক শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ-মূর্ত্তি প্রতিফলিত করিয়া অপ্রকটে পতিতপাবনী লীলায় পতিতকে বুকে ধরিয়া প্রেমদাতা পতিতপাবনের প্রেমানন্দে নৃত্যরঙ্গ আজ জগজীবকে সাক্ষাৎ দেখাইলেন, প্রেমমাধুরী ভোগ করালেন, আবার প্রেমে মত্ত হ'য়ে প্রেমকণ্ঠে গাহিলেন—"অশেষ-বিশেষে রস-আস্বাদনে লোলুপ,বড় ভোগী গৌর আমার আজও লীলা করিতেছেন।" সাক্ষাৎ লীলাদ্রষ্টা মহাজন শ্রীচৈতন্যভাগবত-রচয়িতা শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর অনুভবে গাহিয়াছেন—

"অদ্যাপিহ সেই লীলা করে গোরা রায়।
কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥"

পাঠ শ্রবণরত শ্রীগুরুদেব এই প্লেগের সময়ের ঘটনা উল্লেখ করিয়া প্রেমাবিষ্টচিত্তে সিংহনাদে বলিলেন—"কে বলে নামের কোনও মাহাত্ম্য নাই! আমি প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি ও উপলব্ধি করিয়াছি—শ্রীহরিনামের প্রভাবে সেই প্লেগের প্রবল প্রভাব দূর হইয়াছিল। আমি দেখিয়াছি নরনারী আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া, সংসার ধর্ম্মে উদাসীন হইয়া পথে পথে উচ্চ-কণ্ঠে হরিনাম করিতে লাগিল। হাজার হাজার হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন দল গঠিত হইল। নগরের নরনারী নাম কীর্ত্তনে মাতিয়া উঠিল। ব্রাহ্ম, বৌদ্ধ, হিন্দু, খৃষ্টান এমন কি মুসলমানেরাও হরিনাম-কীর্ত্তনে যোগ দিল। তখন কোন মুসলমান খোল-করতালের উচ্চ-ধ্বনিতে ব্যথিত বা বিরক্ত হইত না। নামের প্রভাবে নিদারুণ ব্যাধির প্রবল আক্রমণ মন্দীভূত হইল, নগরবাসী আশ্বস্ত হইল। পুনরায় নগরের শান্তি ও শ্রীবৃদ্ধি হইল। "সেই সময় ধনী মাড়োয়াড়ীরা হরিনাম-সংকীর্ত্তনের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিল, তদবধি তাঁহাদের মধ্যে নামে রুচি হইল। তাঁহাদেরই উৎসাহে নবদ্বীপে নিত্য নাম করিবার আখড়া স্থাপিত হইল, বারমাস বা শতাব্দী ব্যাপী হরিনাম করিবার ব্যবস্থা এই মাড়োয়ারীরা করিয়া আসিতেছেন এই কলিকাতায়।"

তাই পদকর্ত্তা ঠাকুর নরনানন্দ বলিয়াছেন—"অসাধনে চিন্তামণি, বিধি মিলাইল আনি; গোরা বড় দয়ার ঠাকুর.........

এইরূপভাবে আস্বাদনের পরিসমাপ্তি হইল বটে কিন্তু অযাচিত কৃপাকারী শ্রীগুরুদেবের করুণাময় শ্রীভগবানের করুণার কথা বলিয়া আর আশ মিটিতেছে না। সময়ে সময়ে শ্রীভগবান এ জগতে স্বয়ং প্রকট হইয়া "আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়" এইভাবে

জীবকে কৃপা করিয়া থাকেন। তাই কলিযুগে জীবের মায়াবন্ধন ঘুচাইতে, নিজ-প্রেমধনে ধনী করিতে স্বয়ং ভগবান্ শব্দব্রহ্ম-স্বরূপে "শ্রীমদ্ভাগবত" শাস্ত্র-রূপে প্রকট হইয়াছেন। এক সময়ে এই শাস্ত্রের প্রতি অবজ্ঞা বুদ্ধি দেখিয়া ইহার যথার্থ স্বরূপ ও মহিমা জগতে প্রকট করিতে হরি স্বেচ্ছায় নিজ ভক্তরূপ ধরিয়া "শ্রীমদ্ভাগবত" শাস্ত্রের মর্য্যাদা স্থাপন করেন। ভক্তবৃন্দকে সেই মহীয়সী লীলাকথা শ্রবণোৎসুক দেখিয়া শ্রীগুরুদেব বলিলেন—

## ভাগবত পড় গিয়া বৈষ্ণবের স্থানে।

"একবার ভাগবত মাহাত্ম্য শুনেছিলাম—এক দরিদ্র ভক্ত ব্রাহ্মণ ছিলেন, তার সংসারটী বড়ই কষ্টের, সংসারের অবস্থা ক্রমেই যখন খুব দুঃখের হোলো তখন একদিন তাঁর ব্রাহ্মণী বল্লেন—দেখ আমাদের সংসারের অবস্থা তো বড় দুঃখের এখন দিন চলা ভার হয়েছে, এক কাজ কর না, রাজার কাছে গিয়ে একটু পাঠ শুনিয়ে এস না কেন, অনেকটা লাঘব হবে। তাই শুনে ব্রাহ্মণ গেলেন রাজার কাছে।

রাজা বল্‌লেন—কি ঠাকুর, কি উদ্দেশ্য? ব্রাহ্মণ বল্‌লেন—একটু ভাগবত শোনাব মনে ক'রে এসেছি। রাজা বল্‌লেন—ভাগবত শুনে কি হবে? ব্রাহ্মণ বল্লেন—ভাগবত শুনে বিষয় বাসনা দূর হবে। রাজা বল্লেন—বেশ বেশ বিষয়ের জ্বালায় আমিও জ্বলছি, যদি ভাগবত শুনে ওটা দূর হয় তবে ভাল হয়, আচ্ছা, এর বিনিময়ে আপনাকে কি দিতে হবে? রাজা তখন নিজেই বল্লেন—আমার যখন বিষয় বাসনা দূর হবে তখন আর কেন জিজ্ঞেস করি, আচ্ছা ঠাকুর অর্দ্ধেক রাজ্য আপনাকে দেবো। তাই শুনে ব্রাহ্মণের ভারী আনন্দ হোলো, সেই থেকে ওই যে মাথায় ঢুকলো অর্দ্ধেক রাজ্য পাওয়া যাবে, তাতেই তার মন মেতে গেল। তারপর পাঠ আরম্ভ করলেন, রোজই পাঠ করেন, আর মনে সেই অর্দ্ধেক রাজ্য পাবার লোভ জাগে, এদিকে পাঠকের মনের প্রভাবও রাজার মনের ভিতর নূতন করে বাসনা জাগায়, তিনি ভাবেন আরও কিসে রাজ্যটা বাড়ে, এ রাজ্যটা ও রাজ্যটা আমার হোক, এইসব ভাব রোজ মনে জাগে। পাঠ চলে—তারপর একদিন রাজা বল্‌লেন—কৈ ঠাকুর! আপনি যে বল্‌লেন ভাগবত শুনে বিষয় বাসনা কমবে, কৈ কমছে না তো, বরং বেড়েই চলেছে যে, মিথ্যে কথা আপনার। তারপর রাজা ত ব্রাহ্মণকে কারাগারে পুরলেন।

এদিকে ঠাকুরের (শ্রীভগবানের) টনক নড়লো। ভাগবতের মাহাত্ম্যও বাড়াতে হবে আর ভক্ত ব্রাহ্মণকেও মুক্ত করতে হবে, তাই তিনি ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশ ধরে পাঠকের বাড়ীতে এসে ডাকলেন, তাঁর পত্নীতো তাঁকে যথোচিৎ সৎকার করলেন, আর সব ঘটনা খুলে বল্লেন। ঠাকুর তখন নিজেই ব্রাহ্মণের বেশেই রাজবাড়ী গেলেন। তাঁকে দেখে রাজা আবার জিগ্যেস করলেন—কি ঠাকুর আপনার কি উদ্দেশ্য? ছদ্মবেশী ঠাকুর বল্লেন—ভাগবত

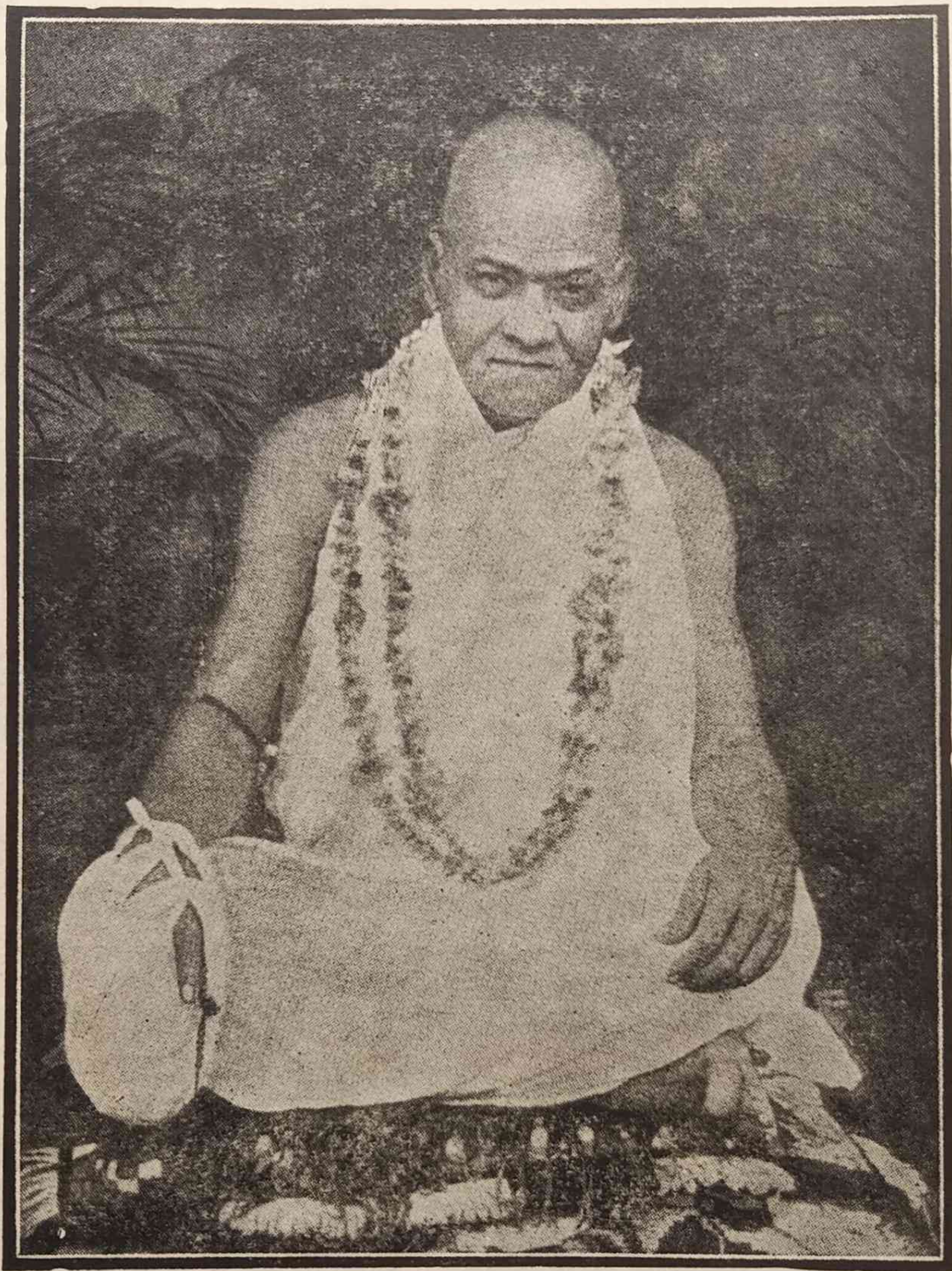
পাঠ শোনাতে চাই। রাজা বল্লেন—এই তো কয়দিন শুনলাম। ব্রাহ্মণ বলেছিলেন, ভাগবত শুনে বিষয় বাসনা দূর হবে, কৈ গেল নাতো? ঠাকুর বল্লেন—আচ্ছা, আবার শুনুন। রাজা বল্লেন—বেশ, এতে আপনাকে কি দিতে হবে? ঠাকুর বল্লেন—কিছু দিতে হবে না।

বোঝো তা হোলে, ব্যস্ যেই "জন্মাদ্যস্য" শ্লোক মাত্র শোনা, অমনি রাজার অন্তর থেকে সব বাসনা ঘুচে গেল, রাজা ঘর বাড়ী ছেড়ে চলে যাচ্ছেন, ঠাকুর বল্লেন—কোথায় যাচ্ছেন? আসুন এখনও আপনার কৃত্য আছে। রাজা বল্লেন কি কৃত্য? তখন ঠাকুর বল্লেন—কারাগার থেকে ব্রাহ্মণকে মুক্ত করুণ। তাই হোলো। তারপর ঠাকুরের আদেশে রাজাকে আর ব্রাহ্মণকে দড়ি দিয়ে বাঁধা হোলো সামনা সামনি দুজনকে বেঁধে রাখা হোলো, যাতে পরস্পরের বন্ধন দুজনেই দেখতে পায়। ঠাকুর তখন রাজাকে বল্লেন—এর বাঁধন খুলে দিন, রাজা বল্লেন ভালরে ভাল আমিতো বাঁধা, আমি আবার ওর বাঁধন খুলবো কি করে! তারপর ব্রাহ্মণকে বল্লেন—আপনি রাজার বন্ধন খুলে দিন, ব্রাহ্মণ বল্লেন—বেশ ঠাকুর! আমিও তো বাঁধা তাতে ও'র বাঁধন খুলবো কি করে? বুঝলে তো? এমনি বাঁধন থাকলে কি অপরের বন্ধন ঘোচান যায়? তাইতো বলেছেন ভাগবত পড় গিয়ে বৈষ্ণবের স্থানে, যাঁদের বন্ধন নেই আর অপরের বন্ধন খোলবার জন্যে মন কাঁদে, কিসে তার বাঁধন খুলবে; তাদের কথাতেই বন্ধন যায়, নইলে নিজের মনোভাবই পরের ওপর পড়ে। যাদের চিত্ত ভগবানে, তাদের কাছে শুনলে ভাগবতের কাজ হবে, তবেই"......

বলিয়াই শ্রীগুরুদেব কেন যেন মুখ ফিরাইলেন। আমাদের প্রসঙ্গের মীমাংসা হইল। ভ্রাতৃবৃন্দ বুঝিলেন নিকিঞ্চন মুক্ত পুরুষের সঙ্গ ত্যাগ ক'রে সাধুকথা, শ্রীমদ্ভাগবত কথা শুনিলেও হিতলাভ করা বড়ই কষ্টের হয়। একটু পরেই করুণাময় শ্রীগুরুদেব আমাদের ভক্তবৃন্দের মধ্যে ভাগ্যবান কোন ভাগবত পাঠকের সম্বন্ধে বলিলেন—

"ওগো, পাঁচজনের কাছে পাঠ ক'রে শোনাতে হ'লে আগে চাপরাস নিতে হয়, তাতে সব শুধ্রে যাবে। দেখ, ছেলে রোজকার ক'রে মা বাপকে এনে দিলে মা বাপ বড় খুসী হন্, আর তাতেই পথের বাধা কেটে যায়, যার দৌলতে সব প্রকাশ পাচ্ছে রোজকারের মত তাকে দিলে, সে খুসী হবে বৈকী, তা-হ'লেই দেখবে কোন বাধা আর নাই!"

নাই বলিয়া দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ছাড়িলেন, আর "শ্রীগুরু" "শ্রীগুরু" বলিয়া উঠিতে গেলেন, টলিয়া গেলেন, আবার বসিয়া পড়িলেন, প্রণয়রসে বিগলিত মনটী যেন নিজগণের সঙ্গ ছাড়া ভাল লাগে না, এইভাবে চাহিতে লাগিলেন। "ওত চাহনি নয়" যেন চাহিয়া আকর্ষণে প্রাণ কেড়ে নিয়ে মরমে মরমে প্রণয় ডোরে বাঁধে। তাই পদকর্ত্তা মহাজন প্রেমে বাঁধাপড়ে গাহিয়াছেন—"মধুর চাহনি আকর্ষণ"। ভক্তবৃন্দ শ্রীগুরুদেবের প্রসঙ্গ-সঙ্গে মত্ত হ'য়ে "এমনি কৃপা নিতুই ক'রো" এইভাবে মনে মনে কাতর প্রার্থনা জানাইয়া নিজদিগকে কৃতার্থ মনে করিয়া ধন্য হইলেন।



বৈষ্ণবাচার্য্য ১০৮ শ্রীশ্রীপাদ রামদাস বাবাজী মহারাজ

বেলা ৯৷৷ বাজিল, নিত্যকৃত্যের সময় হইয়াছে বুঝিয়া শ্রীগুরুদেবও এইবার উঠিবার ইচ্ছায় পশ্চাতের আসনটীতে উঠিয়া বসিলেন। ভক্তবৃন্দ ভাবে ভোরা, রসভরা শ্রীগুরুদেবের মধুর মূরতি হৃদয়ে ধারণ করিয়া একে একে প্রণাম করিয়া বাহিরে আসিতে লাগিলেন।

---

**শ্রীগুরুমুখ পদ্ম বাক্য হৃদয়ে করিয়া ঐক্য**
**আর না করিহ মনে আশা।**

[ প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা ]

**১২ বৈশাখ, ১৩৫৫ সাল। সকাল ৬৷৷ হইতে ৯-২০, কলিকাতা।**

আনুগত্যই ভক্তিপথের জীবন। কোনও রূপ স্বতন্ত্রতা আসিলেই আর সে স্থানে ভক্তিদেবী অবস্থান করিতে পারেন না। পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে কলিযুগপাবনাবতার স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভু-প্রবর্ত্তিত নামপ্রেম-মহাধর্ম্ম প্রচারের জন্য অনুগত অভিন্নচৈতন্যতনু শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু শ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তনরূপী মহাযজ্ঞানুষ্ঠানে ব্রতী হইয়া গৌড়দেশের গ্রামে গ্রামে পল্লীতে পল্লীতে গৌরভক্তগণ সঙ্গে যে মহারঙ্গ করিয়াছিলেন এখনও তার স্রোত চলিতেছে; সেই অধমতারণ পতিতপাবন গৌরপ্রেমের পাগল শ্রীনিত্যানন্দ রায় যে এখনও লীলা করিতেছেন তাহার প্রমাণ পাই যিনি শ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গ-চরণ-পূতরজঃ কৃপাপ্রার্থী, বৈষ্ণব-প্রাণ ও শ্রীগুরুবৈষ্ণব-ভগবানের মহিমা কীর্ত্তনে পরম অনুরাগী সেই শ্রীশ্রীনামসিদ্ধ—পরমভাগবত, শ্রীশ্রীনিতাই-গৌর-প্রেমের কাঙ্গাল শ্রীপাদ রামদাস বাবাজী মহারাজের জীবনে। শ্রীগুরুপ্রণালী-পরম্পরায় শ্রীনিতাই গৌর রাধে শ্যামের কৃপা স্রোত আজও ভারতবর্ষ তথা বাঙ্গালাদেশের শুষ্ক বালুচরের নীচেও অন্তঃসলিলা ফল্গু-নদীর ন্যায় চিরপ্রবাহমানা। স্বভাব করুণ, গৌর-প্রেম-মূর্ত্তিমন্ত শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুতে মহাভাবাবিষ্ট হইয়াই প্রেমদাতা শ্রীশ্রীরাধারমণ-চরণদাস বাবাজী মহারাজ "ভজ নিতাই-গৌর রাধে শ্যাম "জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম"—এই মন্ত্র সাধনের সঙ্গে নাম প্রেমের বন্যায় গেড়ীয় জন মণ্ডলীকে ভাসাইয়া গেলেন। তিনি যাহা অপূর্ণ রাখিয়া গেলেন তাহাই পূর্ণ করিবার জন্য তাঁহার অভিন্ন হৃদয় অনুগত দাস, নামনিষ্ঠ শ্রীরামদাস বাবাজী মহারাজের অন্তরে শক্তি-সঞ্চার করিয়া যান; যে শক্তির অচিন্ত্য-প্রভাবে শ্রীপাদ বাবাজী মহারাজ মধুর কণ্ঠে নাম সংকীর্ত্তন করিয়া প্রেমভক্তি কল্পবল্লরীর বীজ সর্ব্বত্র বপণ করিয়া গিয়াছেন।

নাম সর্ব্বশক্তিমান এ কথা সুসত্য ; কিন্তু আমার বিশ্বাস, কাচের গুণে আলোকের উজ্জ্বলতার ন্যায় আধারের গুণেই আধারের শক্তি, সমধিক ক্রিয়া করিয়া থাকে। শ্রীপাদ বাবাজী মহারাজ, শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণকমল হৃদয়ে ধারণ করিয়া, তদীয় আদিষ্ট পন্থানুসারেই প্রাতঃকালে নামৈকনিষ্ঠ ভজনানুরাগী অনুগত ভক্তগণ সঙ্গে, খোল করতাল যোগে "নিতাই গৌরাঙ্গ, নিতাই গৌরাঙ্গ, নিতাই গৌরাঙ্গ গদাধর। জয় শচীনন্দন, জগজীব তারণ, কলিকলুষনাশন অবতার॥"—এই পদ কীর্ত্তন করিতেছেন। একে প্রভাত কাল ; সকলেরই মন নির্ম্মল, তাহাতে আবার সুমধুর কণ্ঠে মধুময় নাম সংকীর্ত্তন জন সমূহকে অতিশয় উন্মত্ত করিয়া তুলিতেছে। ক্রমে বহুলোক আসিয়া কীর্ত্তনে যোগ দিতে লাগিল। সংকীর্ত্তনটী বেশ জমাট বাঁধিয়া আসিল। সকলেই ভাবে মাতোয়ারা হইয়া ভুবন মঙ্গল নামের পদ উচ্চৈঃস্বরে গাহিতে লাগিল। নামের অপূর্ব্ব এক রোল উঠিল। শ্রীপাদ বাবাজী মহারাজের দুইটি নয়ন হইতে অবিরত শ্রাবণের ধারা বহিতে লাগিল। সর্ব্বাঙ্গ পুলক কদম্বে ছাইয়া গিয়াছে। সকলেই অপূর্ব্ব ভাবাবলী দর্শনে পরম অশ্চর্য্যান্বিত। ক্ষণে হাস্য, ক্ষণে রোদন, ক্ষণে কম্প, ক্ষণে পুলক প্রভৃতি দর্শনে পরস্পর বলাবলি করিতেছেন যে "মনুষ্যদেহে এরূপ অদ্ভুত ভাববিকার হয়, ইহা দেখা ত দূরের কথা আমরা কখনও শুনি নাই।" শ্রীপাদ বাবাজী মহারাজ এইভাবে কীর্ত্তনান্তে "গৌরহরিবোল" দিয়া কীর্ত্তন সমাপ্ত করিলেন। কীর্ত্তনের পরে হরিরলুঠ ও দেওয়া হইল। শ্রীপাদ বাবাজী মহারাজ প্রণাম করিয়া আসিয়া নিজ ভজন গৃহে আসিয়া বসিয়াছেন। নিত্যদর্শনপ্রার্থী ভক্তবৃন্দ ও শ্রীগুরুদেবকে বেষ্টন করিয়া উপবিষ্ট, মধুলুব্ধ ভ্রমরের মত মধুপানে মত্ত হইয়া আগন্তুক ভক্তবৃন্দকে শ্রীগুরুমুখ-পদ্ম-বাক্য-মধু পান করাইয়া পরম আনন্দে মাতাইয়া দিতেছেন।

শ্রীগুরুদেব দিব্যভাবে বিভোর। তাঁহার কোমল চিক্কণ অঙ্গের উপর সুকোমাল শুভ্র উত্তরীয়, গত দিবসের সমুজ্জল "তিলক" এখনও দর্পণের মত প্রশস্ত উজ্জ্বল ললাটে থাকিয়া যেন জীবের জাতি অভিমানাদির মূলোচ্ছেদন করিবার জন্য নিশিত অসিপত্র ধারের আশ্চর্য্য জ্যোতি বিকীরণ করিতেছে, শ্রীমুখে মধুময় হাসি, আর ভগবন্নামজপের মৃদু কম্পন, অরুণ নয়ন দুইটী ভাবময় হইয়া টলটল করিতেছে। আজ যেমন গৃহ তার অধীশ্বর ও সেইরূপ। শ্রীগুরুদেবের চরণ-পূত এই গৃহে আসিলে সংসার পথে যাতায়াতে ক্লান্ত পদদ্বয় বিশ্রাম লাভ করে। ভক্তবৃন্দ শ্রীগুরুদেবের প্রেমময় স্বরূপটি দর্শন করিতেছেন আর তদীয় মুখোদগীর্ণ পরম কল্যাণময়ী বাণী শ্রবণ করিতেছেন। কথা প্রসঙ্গে সর্ব্বদা আবিষ্ট থাকিয়া শ্রীগুরুদেব তাঁহার সহজ করুণা বিকাশ করিতেছেন। ভক্তি-অঙ্গ যাজনে দৃঢ়তা-সম্পাদনে প্রসঙ্গ ক্রমে বলিলেন—

"ওগো! মহাত্মারা কি বলেন জান? "হরিষে লাগি রহরে ভাই, বনত্ বনত্ বনি যাই। তেরা বিগাড়ী বাত্ভি বনি যাই। সব অসম্ভব সম্ভব হ'য়ে যাবে, সর্ব্বদা লেগে থাকতে হবে।"...

শ্রীপাদ বাবাজী মহারাজ বলিলেন—কলিহত পতিত জীবের "নামই" একমাত্র সম্বল। নামের কৃপায় সব অসম্ভব সম্ভব হ'য়ে যাবে, সর্ব্বদা লেগে থাকতে হবে। ভক্তের কোন কার্য্যই তাহার নিজের জন্য নহে। তাহার সকল কার্য্যই ভগবৎ-সেবার নিমিত্ত। সর্ব্বভূতে শ্রীভগবানের সেবার জন্য এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বভূতের সেবার জন্যই তাঁহার কার্য্যানুষ্ঠান্। সেবারূপ কার্য্যই ভক্তিরই অঙ্গ।

শ্রীপাদ বাবাজী মহারাজ "মহাজ্ঞানী মহাজন যে পথে করে গমন
হয়েছেন প্রাতঃস্মরণীয়।
সেই পথ লক্ষ্য করি স্বীয় কীর্ত্তি ধ্বজা ধরি
আমরাও হব বরণীয়॥"

তাই শাস্ত্র বলেন—"মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা"
এইরূপে মহৎকৃপায় ভক্তিপথে অগ্রসর হইবার কথা বলিতেছেন—এমন সময় কোন গোস্বামীর নিকট হইতে একটী বাঁশের চেঙ্গারী-ভরা প্রসাদ আসিল, উহা দেখিবামাত্র অসাধারণভাবে কাঁপিতে লাগিলেন, এ কম্পনের বৈশিষ্টও মধুর; যেন মুগ্ধা নায়িকা তাহার গোপনের মিলন সাথীকে লোক প্রকাশ্যে দেখিয়া সঙ্কোচও বিহ্বলতায় কাঁপিতে থাকে সেইরূপ। আবার লোকবাহ্য-স্বভাবে কাঁদিয়া ফেলিলেন। নিজ আসন হইতে উঠিয়া প্রসাদভরা পেটিকাটীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। পুনরায় করযোড়ে দাঁড়াইয়া প্রসাদ-দর্শনে কৃপালাভের কথা বলিলেন—

## প্রসাদ দর্শন

কি গো! তোমাদের পুঁথিতে (চমৎকার চন্দ্রিকা) আছে
না পেটিকা মিলন? এও তো পেটিকা
থামিয়া একটু পরে ভোগ ভোগ.........
আবার একটু থামিয়া

"যাদের সেখানে মন আছে, তাদের তো লীলাস্মরণে উদ্দীপনার ক্ষতি নাই, তাই নেচে ওঠে। দেখ, একবার শ্রীবৃন্দাবন যাওয়া হয়; অনেক দিন আগে মুসী সঙ্গে থাকে (সেবাধিকারী)। কানপুরের বাড়ীতে থাকা হয়, সেখানে বড় অদ্ভুত ব্যাপার হো লো। কোথ থেকে মহাপ্রসাদ গিয়ে হাজির, অমনি জাগল, গৌর তুমি নিশ্চয় এসেছ, নইলে প্রসাদ রূপে কেন? সে কথা অক্রুর ঘাটের কীর্ত্তনে প্রকাশ পায়। সেই তিনি তখন শ্রীবৃন্দাবনে আর প্রতাপ রুদ্র প্রসাদ পাঠালেন।"

শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলাকথা-স্মরণে আবেশভরে জড়ান কণ্ঠে এই অল্পমাত্র বলিয়া আর বলিতে পারিলেন না। অকস্মাৎ এই দীর্ঘ উন্নত দেহখানি শান্ত স্তব্ধ হইল, অঙ্গের উত্তরীয়খানি খসিয়া পড়িল। মালা হস্তে রাখিয়াই প্রশান্ত মূর্ত্তিতে জোড়-করে প্রসাদ পেটিকার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছেন, নয়ন দুইটীতে অবিরল ধারে জল ঝরিয়া পড়িতেছে, মাঝে মাঝে হুঙ্কার করিতেছেন। এইভাবে ভোগাবেশে পাঁচ ছয় মিনিটকাল দাঁড়াইয়া আছেন, শ্রীগুরুদেবের পুনরায় বাহ্যাবেশ ফিরিয়া আসিল। প্রসাদ উদ্দেশে প্রণাম করিয়া নিজ আসনে আসিয়া বসিলেন, কিন্তু পূর্ব্বভাবটীতে এখনও বিহ্বল হইয়াছেন, কিছুক্ষণ মৌন ও আধো দৃষ্টিতে থাকিয়া ধীরে ধীরে আবার আমাদের ভ্রাতৃবন্দের প্রসঙ্গের সহিত আস্বাদন রত হইলেন।

ইত্যবসরে সেই প্রসাদের বিশ্বাস প্রসঙ্গই আলোচনা হইতেছিল,

**"মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নাম ব্রহ্মণি বৈষ্ণবে।**
**স্বল্পপুণ্যবতাং রাজন্ বিশ্বাসো নৈব জায়তে॥"**

হে রাজন্! যাহারা স্বল্পপুণ্যবান তাহাদিগের মহাপ্রসাদে নামে, বৈষ্ণবে এবং শ্রীকৃষ্ণে বিশ্বাস জন্মে না।

বিশ্বাস না হইলে বস্তুভোগ হয় না বস্তুভোগ না হইলে সুখভোগ হয় না। পরমকরুণাময় শ্রীগুরুদেব জীব-হৃদয়ে কৃপাশক্তি সঞ্চার করিয়া বিশ্বাস জন্মাইয়া দেন। এই বিশ্বাসই ধর্ম্মের মূল ভিত্তি। প্রসঙ্গ-ক্রমে কেহ বিনীতভাবে করযোড়ে প্রশ্ন করিলেন—বাবা! ধর্ম্ম কি? শ্রীগুরুদেব সহজ ভাষায় মৃদুভাবে বলিলেন—

### ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম

**"ওগো আত্মানুশীলনই ধর্ম্ম আর পরানুশীলনই অধর্ম্ম।"**

এইভাবে উত্তর শুনিয়া সকলের মনে বেশ চমৎকার শান্তি আসিল। কারণ যাঁহারা উপবিষ্ট ছিলেন তাঁহারা প্রায় সকলেই উপযুক্ত শিক্ষিত ও সাধক, ধর্ম্মশাস্ত্রের এই ব্যক্তব্যটী সর্ব্বাপেক্ষা জটিল, কিন্তু মূর্ত্তিমান ধর্ম্মের নিকট ধর্ম্মশাস্ত্রের যথার্থ উত্তর নিশ্চয়ই লাভ হইল।

এই সময় আমাদের কোন গুরুভাই যিনি বাবার নিত্য সঙ্গে থাকিয়াও নিজ দুর্দ্দৈববশে ভৈরবী মায়ার কবলে পড়িয়া সাময়িক ভাবে বিপত্তি ভোগ করিতেছেন, তিনি আসিয়াই দীনভাবে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন, তাঁহাকে দেখিয়াই শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখমণ্ডল গম্ভীর হইল, সেই ভাইটীর দিকে একবার চাহিয়াই দৃষ্টি ফিরাইলেন। আমাদের ভাইটীও ভীত-মনে ধীরে ধীরে গৃহ হইতে বাহিরে আসিলেন। শ্রীগুরুদেব মৌন হইয়া একটু পরেই বলিলেন—

"দেখ পরে যদি ছেলের গায়ে একটু টোকা মারে, মা তখন তেড়ে যায়, আর যদি ছেলের ফোঁড়া হয় তবে গলাটী টিপে ধ'রে ফোঁড়াটী গেলে দেয়; সেই যাই করুক, তবুও কি সে ছাড়তে পারে? বাইরে শত্রুর ব্যবহার ক'রলেও কি অন্তরে তাই হয়? না তাই পারে? ফোঁড়াই টিপুক আর গলাই টিপুক সেও তার আর ভারও তো সেই.........

বলিতে বলিতে ক্ষণে বজ্র হইতে কঠিন আবার ক্ষণে কুসুম হইতে সুকোমল হইতে লাগিলেন; এইরূপে শ্রীগুরুদেব কঠোর-কোমল-শান্তভাবে বসিয়া আছেন, তারপর একটু পরেই আপনার ভাবে আপনি ঢুলিতে লাগিলেন, আবার কি স্মরণ করিয়া যেন আবেশভরে মাথা দোলাইতেছেন এবং কি ভাবিয়া চুপ করিলেন, অল্পপরেই মনের চিন্তাটীকে যথা সত্বর আবরণ দিয়া বলিলেন—

## পথের কাঁটা

"ওগো, পথ বড় ঘোরাল হয়, অভিমান এসে এ-পথে বড় কাঁটা দেয়, ও কাউকে ছেড়ে কথা কয় না, গুরুর আসনে ব'সে শিষ্যদিগকে শাসন ক'রলে তৃণাদপি-আসন থাকে না। সূক্ষ্ম-দৃষ্টি, বড় প্যাঁচ, আবার অভিমান এসে সবেতেই পরিণাম দৃষ্টি আনে, এতে এই হবে, ওতে তাই হতে পারে, অতএব এই করা ভাল। ঐ যে গো সাধুতে এলো পিতৃ দৃষ্টি, তিনি এসে পাতার আড়াল দিয়ে গেলেন, পেছনের সাধু এসে পাতার আবরণ ফেলে দিলেন, তিনি ভয় পেলেন যে, পাতার ঘরে আগুন লাগায় বিপদ হবে ভেবে".........

এই পর্য্যন্ত বলিয়াই পূর্ব্ব প্রসঙ্গের অর্থাৎ আমাদের গুরুভাইয়ের প্রতি শাসন-কৌশলের সমন্বয় করিলেন, পাছে কেহ ভাবিয়া বসে ইনি নিজেকে গুরুবুদ্ধি করিয়া শিষ্যকে শাসন করিতেছেন, তাহাতে বৈষ্ণবীয়-মর্য্যাদার আসনকে ক্ষুণ্ণ করা হইতে পারে। শ্রীগুরুদেব "পথের কাঁটা" সম্বন্ধে যেটুকু ইঙ্গিত করিলেন, তাহার পরই ভ্রাতৃবৃন্দের মধ্যে আলোচনা উঠিল—"বাউল" বলিলেই যেন বৈষ্ণব-জগতে কেমন কেমন লাগে, শ্রীগুরুদেব ইহা শুনিয়াছেন। কিন্তু এইরূপ বিরুদ্ধ ধারণা অনুগতজনের হৃদয়ে থাকিলে বিষম অনর্থ হইবে এবং শ্রীরাধারমণের (বড় বাবাজী মহাশয়ের) আচরিত পথে, অপর পক্ষে নিজেরও দেখান উজ্জ্বল আদর্শ-পথে কলঙ্ক আরোপিত হইবে ভাবিয়া বাউল বৈষ্ণব সম্বন্ধে বলিলেন—

## বাউল-বৈষ্ণব

"দেখ মূল স্বরূপটী প্রচ্ছন্ন, নিজেও প্রচ্ছন্ন, তার সবই প্রচ্ছন্ন; সেই দৃষ্টিতে ওঁদের (বাউল) দেখতে হবে, তাঁদের সঙ্গে গৌর-কথা ক'য়ে দেখ কি আবেশ, আবার বিরুদ্ধ কিছু কথা কও দেখি, একেবারে ক্ষেপে যাবে। বৈষ্ণব-দর্শন করবে প্রচ্ছন্ন স্বরূপে আছেন এই দৃষ্টি নিয়ে।"

এমনি ভাবে প্রসঙ্গের পর প্রসঙ্গ হইতেছে আর মাঝে মাঝে শ্রীগুরুদেব উত্তর দিয়া সহজ মর্ম্মার্থের সঙ্গতি দান করিতেছেন। আবার একটি প্রসঙ্গ উঠিল—শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে কর্ম্মকর্ত্তার বাক্য ও আচরণ পৃথক হইলে ফল কিরূপে হয়? ইহারই উত্তর হিসাবে শ্রীগুরুদেব "ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন, ভক্তের ভাব বুঝিয়াই ফল দেন" এই ভাবে বলিলেন—

## আশয় অনুযায়ী ফল-লাভ

**"ওগো! ঠাকুর আশয় বুঝে ফল দেন, "বিষ্ণবে" আর "বিষ্ণায়" ব'লেই বা লক্ষ্য স্থির রাখুন না, তিনি কিন্তু সমান ফল দেন, দেখ দিনান্তে একবার কৃষ্ণ-নাম করে সে বৈষ্ণব, সাংসারিক কাজে হয়তো পারে না কিন্তু দিনান্তে করে।**

**সূক্ষ্ম-গতি বৈষ্ণব রাজ্যে। মর্য্যাদা কত বড়, অক্ষর যদি ধরা দেয় তবে তো একেবারেই হ'য়ে গেল।"**

বলিতে বলিতে কেমন যেন আবিষ্ট হইলেন, তারপর বাহ্যদশা ফিরিয়া পাইয়া আবার বৈষ্ণব-জনোচিত দীনতা-সুলভ স্বভাবের কথা বলিলেন—

## বৈষ্ণবের স্বভাব

**"বৈষ্ণবের স্বভাব কেমন হয় জান, তাঁরা ভাবেন সবাই যোগ্য, কেবল আমিই অযোগ্য, বিধি, নিষেধ আমারই জন্যে।"**

বলিয়াই বৈষ্ণব আচরণ-প্রিয় শ্রীগুরুদেব দৈন্যের সহিত সঙ্কুচিত হইলেন। আবার কি ভাবিয়া যেন বলিবার ইচ্ছায় আপনভাবেই কি স্মরণ করিলেন। এমনি সময় আমাদের ভ্রাতৃবৃন্দ শ্রীগুরুদেবের মুখের দিকে তাকাইয়া ভাব-অনুকূল একটি প্রসঙ্গের অবতারণা করিলেন—"কোন ভক্ত তাঁহার শ্রীগুরুদেবের আশ্রম ছাড়া অন্য কোন মহাপুরুষের আশ্রমে গেলে কি ভাবিতে পারেন"—ইহা শুনিবামাত্র শ্রীগুরুদেব মৃদু হাসিয়া বলিলেন—

## শ্রীগুরুরূপের বহুত্ব এবং একত্ব

**„দেখ ভবানীপুরে ওঁদের মঠে** (মহানির্ব্বাণ মঠে) **গিছলাম, সে দিন ছিল ওঁদের শ্রীগুরুদেবের তিরোভাব তিথি। ভাবলাম মনে, এখানে আনলে কেন? তারপর মনে প্রেরণা জাগলো, ঠিক তো গুরুতত্ত্ব কি দুটো গা? একটাই তো, তা, জগদ্‌গুরু নিত্যানন্দ, প্রেমানন্দ, জ্ঞানানন্দ যাই ভাব, সবই তাতে উৎপত্তি, স্থিতি। তাই তো গুরুতত্ত্ব না-কি আর কিছু বলো?**

বলতে বলতে অদ্ভুতভাবে জড়-সড় হইয়া পড়িলেন। অলক্ষ্যে কাহার মুখে বুকে যেন আত্ম সমর্পণ করিয়া ঢলিয়া পড়িলেন। করুণাবর্ষি নয়ন দুটি হইতে দরদর-ধারে

ধারা পড়িতে লাগিল। স্নিগ্ধ সিক্ত গণ্ড দুইটীতে ভাব-হিল্লোলের স্ফীতি দেখা দিল, বাম অঙ্গটী পার্শ্বের অল্প-উচ্চ স্থানটীতে হেলিয়া গেল, অর্দ্ধ-শায়িত অবস্থায় অপলক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। আহা! কি মধুর ভাবময় অবস্থা। সকলেরই মন প্রাণ আকর্ষণ করিতেছেন,

এইভাবে অল্পক্ষণ আবিষ্ট অবস্থায় থাকিয়া আবার ভ্রাতৃবৃন্দের দিকে সহজভাবে চাহিলেন। এতক্ষণ তাহারা আকর্ষণীয় মধুর-ভাব দরশনে মগ্ন ছিল; এইবার ইঁহার চাহনিতে আনন্দে পুলকিত হইল। করুণাময়ের এই অবস্থাটী ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল, ধীরে ধীরে অন্য এক রাজ্যের অধীশ্বর-রূপেই যেন দেখা দিলেন; এবার শিক্ষাদাতার দৃঢ়-সংযত গাম্ভীর্য্য, পরিমিত ভাষা, অন্তরভেদী দৃষ্টি ও ত্রুটী লক্ষকারীর মুর্ত্তিতে পদ্মাসন বদ্ধ হইয়া অল্পক্ষণ মৌন থাকিয়াই বলিলেন—

## শ্রীগুরু-কৃপাহীনের দুর্দ্দশা

"একবার নবাবগঞ্জে কীর্ত্তন প্রসঙ্গে যাওয়া হয়, পথে একটু জ্বর হ'ল। সেখানে উপস্থিত হ'য়ে দেখলাম, চমৎকার স্থান, ঠাকুর সেবার কি সুবন্দোবস্ত। তারপর শ্রীনিবাস মণ্ডলের ছেলেরা বললে, "আপনি কি করে কীর্ত্তন করবেন? আপনার যে জ্বর"। আমি বললাম, ব'ল-না, ব্যথা পাবে ওরা. (উপস্থিত ভক্তবৃন্দ) ও যে এসেছে সেও ভোগ করবে।

তারপর কীর্ত্তন আরম্ভ হ'ল। আনন্দও দিলে. তবে টানা হ্যাঁচড়া ক'রে। সে দিন রাত্রে এল খুব জ্বর, বোধ হয় ৪।৫ হবে। সকালে উঠেছি, একটি ব্রাহ্মণ ছোকরা এলেন, এঁর পরিচয়টা শোন, ইনি তখন ওখানে (ঠাকুর বাড়ীতে) পাঠ করেন শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও অন্যান্য গ্রন্থ। অনুরাগ হ'য়েছে নবদ্বীপ যেতে হবে, সাহেবের কাছে ছুটি চাইলে, দিলে না, গেল চ'লে চাকুরীতে ইস্তফা দিয়ে সেখানে।

তখন ওখানে (নবদ্বীপে) যেতে হ'লে গোয়াড়ী হ'য়ে যেতে হতো। বড়াল ঘাটে নামল, একজন বাবাজী সরাই বাড়ীতে ওঠালেন। যুবকটিও তাঁর ওখানে নিষ্ঠার সহিত গেলেন, কিন্তু ভারি মুস্কিল হ'ল, যুবকটি এর আগে ছোট হরিদাস-বর্জ্জন পর্য্যন্ত পাঠ ক'রে গেছেন। দৃষ্টিও তেমনি আছে। ওখানে বাবাজীকে দেখলেন, তাঁর কাছে একটি রমণী আছে, বাবাজীর সঙ্গে তার মেলামেশাও খুব। দেখে ভারি রাগ হ'ল, তারপর সেই মনে শ্রীধামে গিয়েও কেবল ঐ কটাক্ষ—তারপর নিন্দা। এল ফিরে। এসে আমাদের উপরেও ঐ ভাব। বলে, বাবাজী একা বটে, কিন্তু সঙ্গিনীটি রেখে এসেছে। তখন আমাকে দিয়ে সে বলালে। তোমার সব বলা হয়েছে? কিছু বাকী রাখনি-তো? সে বললে হ্যাঁ। তারপর এর (নিজের দিকে দৃষ্টি দিয়ে) বলা হ'ল। দেখ, তুমি তো কারণাভাস-সত্বে বর্জ্জন দেখেছ, কিন্তু পূর্ণ

কারণ থাকতেও "শ্রীরামানন্দ রায়কে গ্রহণ" পড়নি? আচ্ছা, তোমার অমন অবস্থায় তুমি কি করতে পারতে? রামানন্দ রায়ের অবস্থা পেলে কি ঐ দৃষ্টি আসতো? তা'হলে বোঝো ও হোলো তোমার মনের ভাবের বিক্রিয়া অনুযায়ী দেখেছ, আরও আছে"………

এই পর্য্যন্ত বলিয়াই গম্ভীর হইলেন; পুনরায়·অনুগত-জন-দিগের প্রতি কৃপা করিয়া আজ নিগূঢ় কথা বলিলেন—

"না জানালে জানা যায় না গো। শ্রীগুরুরূপে না জানালে বড় কষ্ট সাধ্য। এই যে ব্রজে যাওয়া হয় এও তো তাই। তিনি দৃষ্টি না দিলে, ব্রজেও তাঁদের উপর কটাক্ষ আসে।

হ্যাঁ দেখ সেই যে ব্রাহ্মণ, আবার কতদিন পরে এখানে এসে হাজির, তখন তার কি কান্না। বলে, রক্ষা করেছেন আপনি নইলে সর্ব্বনাশ হত।"

এইকথা বলিয়াই স্থির দৃষ্টিতে স্তব্ধ হইলেন। অলক্ষ্যভাবে কিসে যেন আত্মহারা হইলেন। সর্ব্বাঙ্গে পুলক, কম্প, পাণ্ডু বর্ণ মুখ। তারপর আবার বলিলেন—

"বড় কঠিন, বড় কঠিন, না দিলে হয় না, হয় না। না জানালে জানা যায় না, যায় না।"

বল্‌তে বল্‌তে এমন ভাবে কাঁদিতে লাগিলেন যেন মনে হয়, "যাহা চাহি নাই তাহা তো দিয়াছ, তাহা ছাড়া যাহা দিয়াছ তাহা যেন না হারাই" এই ভাবটি। হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিলেন—

"ওগো! আদর, স্নেহ, উপেক্ষা, এ-সব স্বভাবতো ছেড়ে থাকে না সে।"

শ্রীগুরু-স্বরূপের স্বভাব তো বলা যায় না। কখনও শিষ্যকে উপেক্ষা করিয়া শাসন করেন হিতের জন্য, আবার কখনও সেবা-প্রীতি দেখিয়া আদরে স্নেহ করেন।

প্রায় ৯টা বাজিয়া গেল, স্নানের সময় হইয়াছে, নিত্য সেবক রাজুভাই, নন্দভাই প্রভৃতি তাহারই আয়োজন করিতেছে; সমাগত ভ্রাতৃবৃন্দ ইহা বুঝিয়া বাহিরে আসিবেন-- এমনি সময় আবার শ্রীগুরুদেব কি ভাবিয়া "অধিকারীর" বিষয় বলিলেন—

## অধিকার ও কৃত্য

"দেখ, ভদ্রকে ভাগবত বাবুর বাড়ী গিছি, তাঁর টেবিলে অনেক গ্রন্থ আছে, দাঁড়িয়ে দেখ্‌তে দেখ্‌তে সেই সব গ্রন্থের ওপর নজর গেল, আনমনে একখানি পৃষ্ঠা উল্টচ্ছি (শ্রীচরিতামৃত) অমনি তাতে দেখলাম, "দিনে নৃত্য-কীর্ত্তন রাত্রে রস আস্বাদন" ভাবলাম, দেহ অভিমানে যারা থাকে তাদের দিনের কাজ ক'রতে হয় ওই স্মরণে (নৃত্য-কীর্ত্তনে), রাত্রে রস আস্বাদন, ব্যাস, এরপর অধিকার বুঝে হাত দাও। এতে সব বলা হোলো। অধিকারও বল্লেন, কৃত্যও বল্লেন। অধিকার না আসা পর্য্যন্ত দর্শন, কীর্ত্তন, নৃত্য কর, অধিকার এলে আর বোঝাতে হবে না।"

ব'ললে ব'লতে ভাবে বিহ্বল হইলেন। ভ্রাতৃবৃন্দও ভাবাবিষ্ট শ্রীগুরুদেবের সৌম্য মূর্ত্তিখানি হৃদয়ে ধারণ করিয়া করুণার কথা ভাবিতে ভাবিতে মনে মনে কৃপা প্রার্থনা করিয়া শ্রীচরণে প্রণামান্তে বাহিরে আসিলেন। পরম করুণাময় শ্রীগুরুদেব প্রণয়রস-বিগলিত মমতাময়ী দৃষ্টিতে অনুগত ভ্রাতৃবৃন্দের দিকে অবলোকন করিয়া নিজ নিত্য-কৃত্যে চলিয়া গেলেন। ভক্তবৃন্দও দৃষ্টিপাতে চলার পথে "পাথেয়" সংগ্রহ করিয়া ভাবিতে ভাবিতে নিজ নিজ গন্তব্য স্থানে যাত্রা করিলেন।

---

**১৪ বৈশাখ, ১৩৫৫ সাল। সকাল—৬-৪৫টা হইতে ৮৷৷০, কলিকাতা।**

আজ কয়েকদিন এরূপভাবে যাইতেছে যে শ্রীগুরুদেবের নিকট ভক্তবৃন্দ বসিতেছেন বটে, কিন্তু কেমন যেন একটা ফাঁকা ফাঁকা ও অস্থিরতার ভাব। শ্রীগুরুদেব কখনও অস্থিরভাবে থাকিতেছেন আবার কখনও শান্ত গম্ভীর হইতেছেন আবার মুহুর্মুহু আক্ষেপ করার ভাবও যেমন তেমনি তাহার পরক্ষণেই ব্যাকুলতার অবস্থা, কোন সময় নিজেই যেন অগ্রসর হইয়া কাহারও নিকট কিছু বলিতে চাহিতেছেন, আবার কোন সময় তাঁহার কাছে কেহ কিছু নিবেদন করিলেও উপেক্ষার ভাব, আবার কাহারও কিছু শুনিতে শুনিতে চম্‌কিয়া উঠিতেছেন। ক্ষণকাল পরেই আপনি বিস্মিতভাবে চাহিতেছেন, আবার আপনার মনেই খুব মৃদুস্বরে গান করিতেছেন, আবার মালাজপ করিতেছেন। প্রভাতের নিত্য-কৃত্য সমাপন করিতে করিতে কখনও আনমনা হইয়া পড়িতেছেন। এই বিচিত্র ভাবাবেশ অবস্থায় শ্রীগুরুদেবের নিকট নিত্য দর্শনপ্রার্থী ভক্তবৃন্দ আজ আসিয়াও কোন আলোচনার সুযোগ পাইতেছেন না, তথাপি শ্রীগুরুদেবের নিকট বসিয়া আছেন, শ্রীগুরুদেবও শান্ত-মনে সদা হাসিমাখা মুখে বসিয়া মালা জপ করিতেছেন আর এক একবার আশে-পাশে কি যেন চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছেন। সামান্য বাহ্য আবেশ হইয়াছে বুঝিয়া এই অবসরে কাহারও প্রস্তাবক্রমে "হাওড়া নদের নিমাইয়ে" যে কীর্ত্তন হয় সেই কীর্ত্তন-গ্রন্থখানি সেবক আনিয়া অনুগতজনের হাতে দিয়া বলা হইল— "দাদা! এ-খানি একটু বাবাকে শোনাবেন?" তিনিও পরম তৃপ্তির সহিত বাবার মুখের দিকে চাহিলেন, বাবা ইহাদের মনের অবস্থা বুঝিয়া মৃদু হাসিলেন। পাঠ আরম্ভ হইল শ্রীগুরুদেবও বিভাবিত হইলেন, ক্রমশঃ ভাবান্তর আসিতে লাগিল, কীর্ত্তন গ্রন্থে যেখানে **("অস্মি) সাজ এসে দাঁড়াল সম্মুখে"! "অভিন্নতনু নিত্যানন্দ, সাজ এসে দাঁড়াল সম্মুখে"।**

যখন এই পাঠ আরম্ভ হইল, সেই সময় শ্রীগুরুদেব অবশ হইয়া পিছন দিকে ঢলিয়া পড়িলেন, আবার স্থির হইয়া বসিবার চেষ্টা করিলেন, পারিলেন না, থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন, দুই চক্ষু দিয়া অবিরল জলধারা ঝরিতে লাগিল, দুই পার্শ্বে মস্তক সঞ্চালনে চোখের জল সর্ব্বাঙ্গে ছিট্‌কাইয়া পড়িতে লাগিল।

ঐ অবস্থায় ভাবে গভীর হুঙ্কার করিতেছেন, আবার মাঝে মাঝে খল খল করিয়া উচ্চ-হাস্য করিতেছেন ; শ্রীমুখের দুইপার্শ্ব দিয়া লালা মিশ্রিত ফেন বাহির হইতেছে, সমগ্র মুখমণ্ডলে ঘর্ম্ম ও অশ্রু দেখা দিয়াছে, অশ্রু ঝরিয়া পড়িয়া বক্ষের উত্তরীয়খানি ভিজাইয়া দিতেছে।

এইভাবে সমগ্র আখর-সমন্বিত "নদের নিমাইয়ের" কীর্ত্তনখানি শুনিলেন ; দশ পনর মিনিট পর্য্যন্ত সেই ভাবটীর পরিবর্ত্তন হইল না। তাহার পরে ক্রমশঃ সেই শান্ত সৌম্যমূর্ত্তির প্রকাশ হইল।

এই সময় সেই ব্রজের মহান্ত মহাশয় আসিলেন, পরস্পর দৈন্য-প্রণতি বিনিময়ের পর মহান্ত মহাশয় শ্রীগুরুদেবের নিকট জানাইলেন, "এখনও শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীপাদ শ্রীসনাতন গোস্বামীর সমাধি মন্দিরের উপর বিষয়-বিড়ম্বনার অন্ত হয় নাই", এই ঘটনায় শ্রীগুরুদেব ভক্তবৃন্দের দিকে চাহিয়া বলিলেন —

## প্রিয়তমে অভিমান

**দেখ, আমার মনে নেয় কি জান? সেখানে হুমড়ি খেয়ে পড়লে নিশ্চয় কাজ হয়; টাকাতে কাজ হবে কি? পৌরুষ চেষ্টার কি জিনিষ গা? ব্রজধাম কি চেষ্টায় প্রকাশ পেয়েছেন? তারা তো** ( শ্রীরূপ সনাতন ) **আজ্ঞা পেয়ে** ( শ্রীগৌরের আজ্ঞা পেয়ে ) **কেঁদে কেঁদে ব্যাকুল প্রাণে ছুটে গিয়ে, আর ইঙ্গিতে দর্শন করেছেন, তবে না স্থানের প্রকাশ। এ-তো তা হলো না,** ( বর্ত্তমান সমাধি মন্দিরের ব্যাপারে ) **টাকায় রক্ষা পাবে? টাকা দিয়ে কি স্থান প্রকাশ পেয়েছেন? তাঁরা তো টাকা কড়ি ছেড়ে দিয়ে কাঙ্গাল হয়ে কেঁদেছিলেন......**

বলিতে বলিতে ব্যাকুলভাবে কাঁদিয়া ফেলিলেন। আশ্বস্ত হইয়া উদাহরণের সহিত প্রত্যক্ষ দেখাইয়া আবার বলিলেন—

**ও হয় না গো হয় না; দেখ না, সাক্ষী রেখেছে তো একে,** ( ইঙ্গিতে নিজের দিকে চাহিয়া ) **শ্রীহরিদাস ঠাকুরের সমাধি মন্দিরের জন্যে** ( শ্রীধাম পুরীর শ্রীহরিদাস ঠাকুরের মঠের জন্য ) **কত কথা বলালে, ছ-টা কাগজে কথা ছড়ালে, নাঃ হল না, রাস্তায় দেখা হ'লে তাদের কত উৎসাহ** ( অনেক ব্যক্তির ) **বাড়ী গেলে দেখাই হয় না, মনে বড্ডো লাগলো, ব্যস সঙ্কল্প হলো, আর কোথাও যাব না, তোমার হরিদাস, এবার তুমি কর, সকাল ৭টায় সঙ্কল্প হলো সবাই ইঙ্গিত দাও, খাব না নইলে; অমনি বেলা দুটোতে নিমন্ত্রণ এলো বড়লোকের বাড়ীতে ব্যস কাজ হয়ে গেল......**

বলিতে বলিতে ভাব-বিহ্বল অবস্থায় আলু-থালু হইয়া ব্যতিব্যস্ত হইতে লাগিলেন, দুইটী চক্ষুতে জল ভরিয়া উঠিল ; অল্পক্ষণের জন্য মৌন হইয়া রহিলেন, একটু পরেই আবার বলিলেন—

**ওই যে গো এখনকার ভাষা সত্যাগ্রহ, তাই কর না ; বল না, "বিরুদ্ধ পক্ষের মনটী বদলে দাও, এ'তো তোমারই খেলা, আমাদের আত্ম-গৌরব-প্রতিষ্ঠার পরীক্ষা আর কোরো না।" একদিনে কাজ হবে গো......**

আবার ভাবে বিভাবিত হইয়া রহিলেন ; বাহ্যজ্ঞানের কোন বিকাশই রহিল না।

ব্রজের মহান্ত মহাশয় শ্রীগুরুদেবের এইরূপ ব্রজপ্রীতিতে ভাববিহ্বল-অবস্থা দেখিয়া তাঁহারও মন কেমন হইয়া গেল, সমাধি মন্দির সম্বন্ধে বৈষয়িক আনুকূল্য-কামনা জানাইতে আসিয়া ইহার এইরূপ অবস্থা দেখিয়া আর কিছু বলিতে পারিলেন না। বিস্ময়-মুগ্ধ হইয়া দৈন্যের সহিত সঙ্কুচিত হইয়া বসিয়া রহিলেন, আর মাঝে মাঝে 'জয় গৌর নিত্যানন্দ' ধ্বনি করিতে লাগিলেন। ভক্তিপথে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া পড়িয়া থাকিলে নিশ্চয়ই কাজ হয়, তাহা দেখাইলেন ; আজ তাহার ব্যতিক্রম দেখিয়া দুঃখিত হইয়াই বলিলেন—

## পথের বাধা

**দেখ ফরিদপুরের বৃন্দাবন দাদা** ( ইনি জগদ্বন্ধু প্রভুরও প্রিয় ছিলেন এবং বড় বাবাজী মহাশয়ের অনুগত ছিলেন ; ফরিদপুরে ইঁহার প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌর-গোপাল বিগ্রহ ও বিশাল মন্দির আছে ) **বেশ বলতেন,—রাম দাদা ! পথ পাওয়া যাবে কি করে, পথে তিনটে চাপা প'ড়েছে, একটা সংস্কার চাপা, আর বিধিনিষেধের, আর শ্লোক চাপা, এতেই সেরেছে।**

বলিয়াই অত্যন্ত গম্ভীর হইলেন, শ্রীগুরুদেবের এইরূপ উক্তি ও অবস্থা দেখিয়া ব্রজের মহান্ত মহাশয়ও ভাব বুঝিয়া ফেলিলেন। শ্রীগুরুদেব একটু পরেই অনুগতগণের দিকে চাহিয়া বলিলেন—

## ভক্তি-পথে অনন্যা গতি

**ওগো, সে বাজিয়ে দেখে নেয়, টানটা কোথায় ? নিজের লাভ পূজা প্রতিষ্ঠায়, না তা'র ওপর, ওমনি ক'রেই তো নিজের জনকে খাঁটি সোনা করে রাখে, আর তাই দেখেই তো পরশমনির সন্ধানে সব যায়, আসল কথা, কার মুখ চেয়ে আছ, টাকা পয়সার, না তার মালিকের ? না তা ছাড়া আর কেউ দাতা আছে ? সে সব নাটের গুরু। "যারে যৈছে নাচায় সে তৈছে করে নৃত্য"......**

এই পর্য্যন্ত বলিয়া শ্রীগুরুদেব নীরব হইলেন। অনুগতগণের মধ্যে বিশেষভাবে আলোচনা হইতে লাগিল শ্রীগুরুদেবের ভাষা "নাটের গুরু" এই কথাটি লইয়া। শ্রীগুরুদেবও

এই আলোচনার মধ্যে যেন কৌতুকভরা দৃষ্টি লইয়া মুচকি হাসিলেন। এই হাসিতেই মনোভাব সমর্থন করিয়া মনোরম ভঙ্গীতে বাহ্য-আবেশে পূর্ব্ব পূর্ব্ব দিনের মত বড় সহজ ভাবে সকলের দিকে চাহিয়া বলিলেন--

## ন গুরোরধিকম্

**ওগো গুরুস্বরূপে যখন হাত ধরেছে, তখন চাওয়া-পাওয়া সব হয়ে গেছে, তবে যদি বল তা হলে নাম-প্রসঙ্গ, বিগ্রহ-সেবা প্রভৃতির প্রয়োজন কি? সে কোন হেতুতে নয়, কোন জন্যে নয়, সে কেবল তার** ( শ্রীগুরু-স্বরূপের ) **মুখ পানে চেয়ে, সে ভালবাসে তাই, নইলে আমাদের আর কি প্রয়োজন আছে?**

বলিতে বলিতে নিজের প্রাণ-প্রিয়তম শ্রীগুরুদেবের কথা স্মরণ করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, হাতের নামের মালা শিথিল হইয়া গেল, খুব জড়-সড়ভাবে যেন আড়াল হইবার চেষ্টা করিলেন, মুখখানি রাঙা হইয়া গেল, সম্মুখ-দৃষ্টিতে উদাসী হইয়া চাহিয়া রহিলেন, যেন প্রাণের কথা সব বলা হইয়াছে।

এইভাবে আবিষ্ট অবস্থায় কিছুক্ষণ থাকিরা "শ্রীগুরু" "শ্রীগুরু" বলিয়া আবার তন্ময় হইয়া রহিলেন; অনেকক্ষণ পরেই বৈরাগী-বৈষ্ণবের ত্যাগ বাসনা কি ভাবে হওয়া উচিত সেই প্রসঙ্গে শ্রীগুরুদেব বলিলেন—

## বৈষ্ণবের দৈন্য দৃষ্টি

**দেখ, শ্রীকেদার দত্ত মহাশয়** ( ভক্তিবিনোদ ) **কল্যাণ-কল্পতরু লিখেছেন, তাতে বেশ বলেছেন—ওই যে ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনায় আছে না "কবে এ সংসার বামে ঠেলে যাব"; তাতে তিনি কি বলেছেন জান? তুমি সংসার ঠেলবে কি রকম? ও কথায় ভক্তিপথে আঘাত লাগে! আমায় অযোগ্য জেনে সংসার ঠেলে ফেলবে। বেশ কথাটি নয়, মীরারও ভজনেও তো ওই কথা......**

বলিতে বলিতে অবসন্নভাবে স্থির হইলেন, ক্রমশঃ চক্ষু দুইটী বন্ধ হইতে লাগিল হঠাৎ জাগিয়া ওঠার মত বলিলেন—

**দেখ একটি কথা আমার মনে জাগছে, ওখানেগুরু শিষ্য অভিমান থাকে না।** ( ভাব অনুকুল হইলে ) **দেখছো না শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু অচ্যুতকে বাপ বলছেন। থাকে না থাকে না......**

হঠাৎ এমনভাবে শ্রীগুরুদেব এই কথা কয়টী বলিলেন, ইঁহার এইরূপ অবস্থা দেখিয়া বৃন্দাবনের মহান্ত মহাশয় আজিকার মত বিদায় গ্রহণ করিয়া আবার আসিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া উঠিয়া গেলেন। সমবেত সকলে প্রণাম করিলেন।

ইত্যবসরে শ্রীগুরুদেবের নিত্যসহচর কোন অনুগত সেবক আসিয়া, তাঁহার নিত্যসেব্য শ্রীগুরুদত্ত "নাম"ব্রহ্মের প্রসাদটী রাখিয়া শ্রীগুরুদেবের নিকট শ্রীনবদ্বীপ যাইবার প্রার্থনা

জানাইলেন, তাঁহার মাতৃদেবী অসুস্থা। শ্রীগুরুদেবও তাঁহার প্রতি প্রসন্ন দৃষ্টিতে অনুমতি দিলেন। তিনিও চলিয়া গেলেন আর সেই মাতৃনামের স্মরণে শ্রীগুরুদেবও মাতৃস্নেহের আবেশে আবিষ্ট হইয়া নিজের মাতৃ-সেবার কথা বলিলেন। পারমার্থিক রাজ্যে থেকে বৈরাগী হয়েও "মাতৃসেবা একান্ত কর্ত্তব্য" তাহাই প্রসঙ্গক্রমে বলিলেন—

## মাতাপিতার সেবা বিমুখের ভজন প্রত্যবায়

**এই এ'কে দিয়ে** ( নিজের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া ) **বোঝো, তখন বৃন্দাবনে** ( যৌবনে শ্রীগুরুদেব যখন বৃন্দাবনে ছিলেন ) **ও বল্লে** ( শ্রীজগদ্বন্ধু প্রভু ব'লেছিলেন ) **চৌরাশী ক্রোশের বাইরে যাবে না, এক লক্ষ নামকীর্ত্তন ক'রবে, ব্যস্, তাইতো হচ্ছিলো, এদিকে বুড়োবুড়ী ওখানে ত্রিপুরা-রাজার কুঞ্জে এসে হাজির।** ( বুড়ো হ'চ্ছেন শ্রীগুরুদেবের পিতৃদেব দুর্গাচরণ গুপ্ত, বুড়ী মাতৃদেবী সত্যভামা দেবী, ইঁহারা কাশ্যপ গোত্রীয় ) **অনেক দিন থাক্‌লেন। আমিও যাব না, তারাও ছাড়ে না, তারপর সেখানের বৈষ্ণবগণ ব'ল্লেন** (ব্রজের গৃহস্থ বৈষ্ণবগণ) **ওঁ-রাও তো মা বাবা গুরু, ওদের মনে ব্যথা দিও না যাও! তারপর কাশী আসা হ'লো। দেখলে তো, বুড়ী ১৯টা বছর সেবা নিলে।**

বলিতে বলিতে মাতৃপিতৃহারা বালকের মত গদগদভাবে কাঁদিয়া ফেলিলেন। আবার বলিলেন—

**কর্ত্তা নিজেও** ( শ্রীবড়বাবাজী মহাশয় ) **কাশীতে তাই আদেশ দিলেন। ওকি সোজা গা? মাতৃপিতৃ-ঋণ-শোধ সোজা নয়। এদিকে প্রত্যবায় হ'লেই ভজনেও প্রত্যবায় হবে। তাইতো বলি সবাইকে** ( শ্রীকিশোরীদাদা, শ্রীউদ্ধবদাদা প্রভৃতিকে ) **ওগো যেও, যতদিন থাকে দেখো, তোমাদের ব্যবহারে তাদের মনে ব্যথা যেন না লাগে।**

বলিয়া শান্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। একটু পরেই সমবেত ভক্তবৃন্দের মনের আসক্তি সম্বন্ধে প্রসঙ্গ হইলে শ্রীগুরুদেব বলিলেন—

## সেখানে মন বাঁধা আছে

**দেখ তিনি বলতেন** ( সিদ্ধ শ্রীচৈতন্যদাস বাবাজী মহাশয় )—**"জানি-গো জানি, "ত্রিকাল সত্য লীলা", এ আছে ও আছে সব জানি; কিন্তু আমার মন যে আটকে আছে কি করি, তাইতো তিনি ব'লতেন—**

**যার মনে যা লেগেছে যা বলুক্‌গা তারা।**
**আমার মনে লেগে আছে শচীর দুলাল গোরা॥**
**ভজন হোলো সারা আমার সাধন হোলো সারা।**
**নদের চাঁদের কান্তা আমি, কান্ত আমার গোরা॥**

কথাতো তাই, আমার মন যে সেখানে পড়ে আছে করি কি, সে ( শ্রীললিতা সখী মা ) যেতো না. তাই ভোলাবার জন্যে এখানে ( শ্রীনবদ্বীপে ) চন্দন যাত্রার উৎসব ক'রে গিছলো, আসলে তো মন প'ড়ে থাকৃতো সেখানে।

বলিয়া থামিয়া গেলেন, সেইভাবে আবিষ্ট অবস্থায় রহিলেন। এই সময় শ্রীগুরুদেবের এক প্রিয়ভক্ত ( নাম শ্রীনগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী, ইনি ক্যালকাটা সেণ্ট্রাল কলেজের প্রফেসার ) আসিলেন। প্রণাম করিয়া বসিলেন—তাঁহাকে দেখিয়া শ্রীগুরুদেব তাঁহার কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি শ্রীগুরুদেবের করুণায় সর্ব্বত্র কুশল জানাইয়া একটু পরে বলিলেন —আজ্ঞে একটি কথা জানতে ইচ্ছা হয়, আজকাল অনেক গ্রন্থে বড় প্রক্ষিপ্ত পাঠের উৎপত্তি হয়েছে দেখা যাচ্ছে, সব সময় সেগুলিকে কি ভাবে নেওয়া যায়? শুনিয়া শ্রীগুরুদেব বলিলেন—

হুঁ, ও যাঁর হাতে যখন যা পড়েছে অমনি তাতে একটু "আমি" ঢেলে দিয়েছেন। অমনি ক'রে আসল লুকিয়ে থাকছে, দেখনা ওখানে মন্দিরে ( শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে ) কোন সময় হয়তো "শ্রী" সম্প্রদায়ের কোন আচার্য্যের হাতে পড়েছিলেন, অমনি তাঁর ছাপ পড়ে গেছে মন্দিরের চূড়ায়, তাই শ্রীসম্প্রদায়ের তিলক লেখা আছে। তারপর কত বৈষ্ণব-গ্রন্থে পয়ারের কত পাঠ বদলে গেছে। হয়তো তিনি পয়ারের ভাষা বুঝতে পারেন নি, অমনি নিজের মনোমত একটি ব্যাখ্যা জুড়ে দিয়ে পাঠটা বদলে দিলেন।

বলিয়া শ্রীগুরুদেব আক্ষেপ করার দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। ভক্তবৃন্দের মধ্যে আবার নানাবিধ প্রসঙ্গ আলোচনা হইতে লাগিল, শ্রীগুরুদেবও শুনিতেছেন, আর মাঝে মাঝে চাহিতেছেন, তারপর একটি প্রশ্ন উঠিল "শ্রীগুরুদেব যেদিন হইতে হাত ধরেন সেই দিন হইতে অনুগতের মনের সংকল্প কি ভাবে ভোগ হইবে।" শুনিয়া শ্রীগুরুদেব হাসিয়া বলিলেন—

## শ্রীগুরু কল্পতরু

হুঁ হুঁ বাবা, বড় মজার ঠাঁই, ওই যে গো পদটী বলনা—"জয় জয় শ্রীগুরু"......ওতেই উত্তর পাবে, ভাল আর মন্দ ব'লে যাকে বলবে কোনটাই বাদ পড়বে না, দুইয়ের ফলই লাভ হবে, দাতা তো সেই, কল্পতরুর আশ্রয়ে দানের বিচার থাকে কি ?

বলিয়া হাসিমুখে আবিষ্ট হইয়া রহিলেন।

আজ আর ইহাকে অধিক আলোচনায় না মাতাইয়া ৮।০ বাজিতেই ভক্তবৃন্দ প্রণাম করিয়া বাহিরে আসিলেন।

১৫ই বৈশাখ, ১৩৫৫ সাল। সকাল—৭ টা হইতে ৯।০ টা, কলিকাতা।

শ্রীগুরুদেবের চরণ-সরোজের মধুকররূপ ভক্তগণ যেমন যেমন প্রশ্ন লইয়া শ্রীগুরুদেবের সমীপে আগমন করেন, ঠিক সেই প্রসঙ্গেরই অবতারণা ঘটে এবং শ্রীগুরুদেবও সেই উত্তরগুলি দিবার জন্যই যেন নিজের পরিবেশটিকে সেই ভাবে সজ্জিত করিয়া রাখেন। আজ ভক্তবৃন্দের মধ্যে এইরূপ আলোচনা হইতেছিল যে অনেক সময় কেহ তাঁহার করুণা অনুভব করে পীড়নের ভিতর দিয়া, কেহ বা নিজেকে অনুপযুক্ত ভাবিয়া সরিয়া দাঁড়ায়, এরূপ হয় কেন? এই প্রশ্নের সমাধানের জন্যই শ্রীগুরুদেব বলিলেন—

## শ্রীগুরুর পরীক্ষা

ওগো, আগে বাজিয়ে দেখে তারপর প্রেরণা ওঠে, তখন ছেড়ে দেয়, ব্যস, ওতেই স্থিতি। কর্ত্তা কি ( শ্রীবড় বাবাজী মহাশয় ) দিদিকে ( শ্রীসখীমাকে ) অল্প বাজিয়েছিল? ওরা তো ( শ্রীকিশোরী মা, শ্রীকরুণা মা, শ্রীললিতা সখী মা প্রভৃতি ) তখন রাত্রে লীলা অভিনয় করতো; আবার সকাল হ'লেই যে যার সরে পড়তো। একদিন কুঞ্জভঙ্গের আবেশে সকলে ভরপূর ছিল, তারপর সবাই যে যার চলে গেল, কিন্তু দিদির ( শ্রীললিতাসখী মা ) আর সে ভাবটি গেলনা, ওই বেশেই ( সখীবেশে ) থেকে গেল। কত শাসন কত পরীক্ষা, তিনদিন ধরে চললো সে আর বেরোলো না। তারপর প্রেরণা এল—কত পরীক্ষা তো হয়েছে, পীড়ন ভং'সনাও তো কম হয় নাই, আর কেন? ব্যস চুপ্। ওতেই রয়ে গেল।

বলিয়া পূর্ব্বকথার স্মরণে শ্রীগুরুদেব নিজগণের প্রতি কিছু যেন ইঙ্গিত করিলেন। মুখে গদগদ ভাব, চক্ষুতে সজল সকরুণ দৃষ্টি প্রকাশিত হইল। কথা-প্রসঙ্গে শ্রীজগদ্বন্ধু প্রভুর ও শ্রীবড় বাবাজী মহাশয়ের প্রসঙ্গ এবং শ্রীগুরুদেবের কীর্ত্তনের অক্ষরসমূহ ও তাহার মধুময় ভাষা সম্বন্ধে কথা উঠিল—

## শ্রীজগদ্বন্ধু ও শ্রীবড়-বাবাজী মহাশয়ের স্মৃতি

আমি তো লেখা পড়া শিখি নাই, সেই ন বছরে ওরা ঘর ছাড়া ক'রেছে। ওদের তো অন্তরে অন্তরে বড় মাখামাখি ছিল। কীর্ত্তনও করতেন ( বড় বাবাজী মহাশয় ) "ওই শ্যাম রায়"। তা এক স্বরূপে তো ওই বয়েসে ঘর ছাড়িয়েছে, লেখাপড়া তো হোলো না; যা বলায় তাই বলি, আমার কি ভাষা আছে না পাণ্ডিত্য আছে .....বলিয়া খল খল করিয়া হাসিলেন। তারপর বলিলেন—তোমরা যখন শোনো, তখন এসব কথা বেশ সরল বোধ হয়, তা সে-তো সবই প্যাচানও বটে সরলও বটে। যখন যখন সরল হয় তখন ধরা দেয়......

বলিয়া আবার আত্মভোলার মত হাসিলেন। যখন "সরল আর প্যাচান" শব্দ দুটি বলিলেন তখন সেদুটীতে জোর দিয়া বলিলেন। আবার "সে তো সবই" বলার পর

শ্রীগুরুদেব কেমন যেন সর্ব্বময় স্বরূপে দৃষ্টি দিয়া সর্ব্বাত্মক শ্রীগুরু-স্বরূপের ইঙ্গিত করিলেন।

সর্ব্ববেদগুহ্য ভগবৎ-কারুণ্যঘণ-বিগ্রহ শ্রীগুরুদেবে এইরূপ বিকাশ থাকিলেও আমাদের সহজাত এমন একটি তমোময়ী আবরণী শক্তি আছে যাহা সর্ব্বদা কাছে থাকিয়া কোন কিছুরই উজ্জ্বলতা ভোগ করিতে না দিয়া স্বভাবপ্রিয় তমোময় বস্তুগুলিতে আসক্ত করিতে বাধ্য করে—সেইজন্যই শ্রীগুরুদেব প্রসঙ্গক্রমে বলিলেন—

**ওগো অবিশ্বাসেই সব ফাঁক্ করে।**

এই সময় এক ভক্ত বলিলেন—"তা হ'লে বস্তুর মহিমা কোথায়? তিনি তো স্বপ্রকাশ।" শুনিয়া শ্রীগুরুদেব বলিলেন—

## আবরণী শক্তি ও বস্তুর প্রকাশ

**হাঁ, প্রকাশ তো সর্ব্বদাই, বস্তুর শক্তি যাবে কোথায়, অবিশ্বাসে ভোগ হয় না, কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, ভক্তি, চশমার মত, যেমন চশমা তেমনি দৃষ্টি, ভাব নিয়ে ভোগ তো; মথুরা-রাজসভায় কৃষ্ণকে সবাই দেখছে, সবাই ভোগ করছে, আবার ভাব আস্বাদিতে দু'হে মিলে এক ঠাঁই, ভোগী কিনা, স্বভাব বরাবর আছে, সবাইকে সব দিয়ে রাধার ভাব কান্তিটি নিজে নিলে, তা-ছাড়া রাধারও আর কিছু রইলো না। সে হোলো স্বভাবে মৌজী,**

বলিয়াই ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। শ্রীগুরুদেব স্বরূপের আবেশে তাঁহাকে মৌজী বলিলেন; নিজেও আস্বাদন-মুগ্ধ-স্বভাবে মৌজী হইয়া আছেন। ভক্তবৃন্দ শ্রীগুরুদেবের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আবার কথাবিশেষের উত্থাপন করিলেন—"নাম-নামী" অভিন্ন যখন তাহা হইলে শ্রীমূর্ত্তির প্রকাশ হয় নিশ্চয়......

প্রসঙ্গটি শুনিয়া শ্রীগুরুদেব বলিলেন—

## আহ্বান ও অবস্থা

**ওগো শ্রীভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থপাঠের আগে তো বলা হয় শুনেছো তো "তত্র সন্নিহিতো হরিঃ, আর ডাকিলে আসিব আমি" এ সব তো শোনা গেছে, কিন্তু কৈ বস্‌বার জায়গা দেওয়া হয় না তো? দাতার তো দান হলো রসগোল্লা, কিন্তু তা খেতে হয় কি মাখ্‌তে হয়, তা তো জানা হয় নাই; তাও তো তাকে এসে আর একরূপে (শ্রীগুরুরূপে) জানিয়ে দিতে হয়, সে তখন বলে ওর ব্যবহার এমনি করে কর্‌তে হয়, তাই তাকে (শ্রীগুরুকে) নিজে আচরণ করে জানাতে হয়, তবুও যদি না জানতে পারে তবে? তাই না বলেছেন—"স আত্মহা"......**

"নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভং প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারকং।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং, পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা ॥"*

বলিয়াই শ্রীগুরুদেব একটি অতৃপ্তির গভীর নিশ্বাস ফেলিলেন।

এইভাবেই থাকিয়া শ্রীগুরুদেব কিছুক্ষণ মৌন হইয়া আন-মনাভাবে চাহিতে চাহিতে মালা জপ করিতে লাগিলেন; একটু পরেই বলিলেন—

## পাঠকের মনোবৃত্তির প্রভাব

কথা কি জান? কথা হচ্ছিল না যে "তত্র সন্নিহিতো হরিঃ" তা উপলব্ধি করতে কে দেয় না? পাঠকের মনোবৃত্তি তো শ্রোতাদের মনে আসবে আগে, একে তো ব্যবহারিক জীবনের আধার তৈরী আছে, তাতে আবার ঐ জাতীয় মনোবৃত্তি পড়লে কি রক্ষে আছে? সব চাপা পড়ে যায়। তাই তো বলা হচ্ছিল (নিজের কথায়) আসে যায় বসে না। তবে, বসে শুদ্ধ চিত্তের যোগ্য আধার পেলেই বসে, আর ওমনি লক্ষণে ধরা যায় সে এসেছে, পুলক অশ্রু প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পেলেই তার আসা জানিয়ে দেয়, আবার চলে যায়।

বলিয়াই কি ভাবিয়া গভীর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন, কিন্তু কেমন যেন আলু থালু ভাব, বাহ্য-আসক্তি যেন একেবারেই নাই।

এইভাবে পরমকরুণাময় শ্রীগুরুদেব এক অপূর্ব্ব ভাবাবেশে বিভোর হইয়া আছেন. চক্ষু দুইটির দৃষ্টি যেন অন্য কোন দিকেই আসক্তি নাই, আছে কেবল নিজ-ইষ্টের দিকে। এইভাবে কিছুক্ষণ থাকিয়া আবার কিছু বলিবার অবস্থা আসিলে বলিলেন—

## পথের শত্রু

তোমাদের সিঙ্গুরের দাদা মশায় (শ্রীভৈরব গোস্বামী, ইনি শ্রীগুরুদেবের অন্যতম শিক্ষাগুরু) বেশ বল্‌তেন, দেখ নাম কর্‌তে কর্‌তে এরা দেখা দেবে, তাতে ভরা ডুবি হয়ে যায়, এরা তিন জন আসে, কখনও একসঙ্গে আসে, কখনও আলাদা আলাদা আসে, এরা কে জান? প্রতিষ্ঠা, গৌরব আর অভিমান; ওই যে গো তোমাদের কি শ্লোকটি বল না, "প্রতিষ্ঠা শূকরী বিষ্ঠা, গৌরবং রৌরবং সমম্। অভিমানং সুরাপানং ত্রয়ং ত্যক্ত্বা হরিং ভজেৎ ॥" বড্ডো সাবধান থাক্‌তে হয়, সর্ব্বদা নজর রাখতে হয়। একেবারে তৈলধারাবৎ অবিচ্ছিন্ন-ভাবে ভজন কর্‌তে হবে। একটু ছাড়াছাড়ি হলেই মুস্কিল। কথা কি জান? পথ তো দু'টো, কৃষ্ণের দিকে আর মায়ার দিকে, এ মুখো (কৃষ্ণের দিকে) হলে ও-টা (মায়া) পেছনে থাকে, ও-মুখো হলে এ' পেছনে থাকে।

---

* শ্লোকটির অর্থ—সমস্ত বাঞ্ছিত ফলের মূলস্বরূপ, কোটি কোটি চেষ্টা দ্বারা এই মনুষ্য-দেহ লাভ করা যায় না; কিন্তু কোন অপূর্ব্ব ভাগ্যবশতঃ অনায়াসে প্রাপ্ত, ভগবৎ-প্রাপ্তি বিষয়ে পটুতর, গুরুরূপে কর্ণধার সমন্বিত, মৎকর্ত্তৃক অনুকূল বায়ু দ্বারা চালিত, সংসার-সমুদ্র-উত্তরণের নৌকা স্বরূপ মনুষ্যদেহ প্রাপ্ত হইয়া যে পুরুষ ভব-সমুদ্র পার হইতে চেষ্টা করে না; তাহাকে আত্মঘাতী বলিয়া জানিবে।

বলিয়াই একটু চুপ করিলেন, নাম-মালার সংখ্যা রাখিয়া দক্ষিণে ঠেস দিয়া বাম জানুর উপর বাম বাহু রাখিয়া বসিলেন, এমনভাবে চাহিয়া রহিলেন যেন এতক্ষণ কোন আলাপই হয় নাই, উপস্থিত ব্যক্তিবৃন্দ কেবল ইঁহাকে দর্শন মাত্র জড়-সড় হইয়া বসিলেন। প্রায় তিন-চার মিনিট-কাল এইভাবে থাকার পর বলিলেন—

## জীবের শুভ লগ্ন

ওগো, এক এক সময় এক একজন আসৃছেন আর অনেক কিছু দিয়ে যাচ্ছেন। জিনিষ তো ঠাকুর অনেক কিছু ছড়াচ্ছে নেয় কৈ, অনেক ভাগ্যে লগ্‌ন লেগে যায়। আর তার ভেতরও কলিরাজ প্রবেশ কর্‌তে চায়. দেখ না, নাম-কীর্ত্তন কর্‌তে বসে আর কেবলই সুর পাল্টায়, ওতেই আবেশ আন্‌তে চেষ্টা করে সুরের মধ্যেই ভেল্‌কি দেখায়, কলিরাজ নিজের মতলব সিদ্ধি কর্‌তে চায়; শেষটায় সুরেই আবেশ এসে যায়, তাই মনে হয় নামের সুর সহজ সরল ভাল, তাতে স্মরণ আনায়, স্বভাব জাগায় ("নিত্য কৃষ্ণদাস" এই জীবের স্বভাব জাগায়, তারপর তার চরম দশা আনে)!

বলিয়া নিজেই সেই স্মরণেই অবশ হইলেন, ক্রমশঃ এমন ভাবান্তর হইল যে ঐরূপ অবশ অবস্থায় থাকিয়া কিছু বলিতে ইচ্ছা করিলেও ভাষায় প্রকাশ হইল না, আধ আধ অস্পষ্ট ভাষায় জিহ্বাতেই রহিয়া গেল, স্বর-মাত্র শোনা গেল। কিছুক্ষণ পরে কি ভাবিয়া যেন চমকিয়া উঠিলেন.আর অমনি বাহ্য-আবেশে সহজ-স্বরূপে চাহিতে চাহিতে "দেহে যাহা কিছু অপ্রাকৃত-ভাবের বিকাশ পায় তাহাতে 'আমার সাধনার' এইরূপ ফল লাভ হইয়াছে—এমন যেন কেহ না ভাবেন," এ অবস্থাটি নিজ-অনুগতবৃন্দকে জানাইবার জন্যই বলিলেন—

## অপ্রাকৃত বিকাশে অনুভূতি

তখন তো দাঁড়িয়ে নাম হোতো ৮ ঘণ্টা, সেই সময় একবার জাঙ্গিপাড়া থেকে কাশিমবাজারে এলাম, বিরাট বৈষ্ণব-সম্মিলনী, তার সঙ্গে লীলা-কীর্ত্তনের ব্যবস্থা, দলে দলে বড় বড় দল। তখন আমার খেতুরীর কথা স্মরণ হোলো। একদিন নিশান্ত-লীলা কীর্ত্তন হোলো, সে এক অপূর্ব্ব। অমনি ভাবছি এরপর তো এর (নিজের দিকে চাহিয়া) পালা. নাম-কীর্ত্তন লোকের কাণে লাগ্‌বে তো? তখন তো কোথাও নাম কীর্ত্তন প্রসঙ্গ বড় একটা হোতো না। যাক্ তারপর তো নাম আরম্ভ হোলো, প্রসঙ্গ এল পঞ্চতত্ত্বের পর্য্যায়ে, সে এক অদ্ভুত ব্যাপার, আনন্দের পাথার ব'য়ে গেল,

তারপর ভাবছি হুঁ হুঁ এবার ঠ্যালা আস্‌ছে, খুব বাহবা আস্‌বে, তখন? ওমা, পাশের খাড়ি গঙ্গায় স্নান করতে যাওয়া হোলো, ব্যস্, গলা একেবারেই চুপ, একটি আওয়াজও আর

আসে না। ভারী মজা, তাতে মনে হোলো, বেশ চমৎকার ব্যবস্থা হোয়েছে, বাঁচিয়ে দিলে, ঠাকুরের খেলা দেখ কেমন, লোকে তো এবার বাহবা দেবে, উহুঁ, তা হোতে দেবে না, তাইতো জানালেন, নাম তো আমি ( স্বয়ং নামী ) করলাম, তোমাদের তাতে কি, তোমাদের কণ্ঠের ওই হোলো আসল স্বরূপ ; তাইতো তার রোধ দেখছো। বল দেখি কী ব্যাপার, তারপর আবার শেষ দিনে দিলে খুলে, ধুলোটের দিন সেদিন প্রায় ৪।।০ ক্রোশ পথে কীর্ত্তন হোলো, দরকার ছিল তার, তাই নিজের ব্যবস্থা নিজে করে নিলে, ব্যস তারপর ফাঁকে বেরিয়ে আস হোলো……

কৃপার কথা বলিতে বলিতে স্মরণে আবার কণ্ঠ রোধ হইল, মুখখানি ভাবে নীচু হইল, চক্ষের জল ঝরিয়া পড়িল, এইভাবে কিছুক্ষণ থাকিয়া আবার বলিলেন –

ওগো, তার প্রকাশ সবই অদ্ভুত, অনুকূলেও যেমনি, প্রতিকূলেও তেমনি, তা অনুকূলেই ধরা যায় না, প্রতিকূলে তো কথাই নাই, সেকি কেউ ধরতে পারে না দিলে ? তার অপেক্ষা উপেক্ষা দুই-ই সমান, তবে উপেক্ষার মত হোলে ঘাবড়ে যায়, আসলে তা পরীক্ষা………

শ্রীগুরুদেব নিজেই বলিলেন, সেই কথাতেই নিজে যেন বাঁধা পড়িলেন, "ধরা না দিলে ধরা যায় না," । করুণাময় নিজে না বুঝাইলে, কি-ভাবে বুঝিতে পারে ?

এইভাবে প্রসঙ্গের পর প্রসঙ্গের উত্থাপন হইতেছে আর শ্রীগুরুদেবও লুব্ধমনে যেমন আস্বাদন করিতেছেন তেমনি আবার অনুগতগণকে প্রলুব্ধকারীর মত আস্বাদন করাইতেছেন। তারপর কি ভাবিয়া উৎসুক-চিত্তে নিজের শ্রীগুরুদেবের সঙ্গে "শ্রীনাম-প্রসঙ্গে" এক অলৌকিক ঘটনার কথা বলিলেন—

## শ্রীনাম প্রসঙ্গে পূর্ব্ব-স্মৃতি

তখন একবার সিউড়ীতে যাওয়া হয়, সেখানে রামদাস পাঠক মশায় শ্রীচরিতামৃত পাঠে ব্রতী হ'য়েছিলেন, আরম্ভ হোলো সনাতন-শিক্ষা, তাতে কেবলই সুদুর্ল্লভ কেবলই সুদুর্ল্লভ। সঙ্গের এঁদের মনে কেমন একটা অস্বস্তি-বোধ হ'চ্ছিল। একটু নাম-প্রসঙ্গ হোলে প্রাণটা জুড়োয়, কিন্তু তা আর হয় না। শেষে একদিন একটা ঘরে ক'জন মিলে বসা হোলো, কর্ত্তা তো ( শ্রীবড় বাবাজী মহাশয় ) নাম আরম্ভ ক'রলেন, ঘরটার দরজা জানালা বন্ধ করে দেওয়া হোলো, খুব মাতামাতি নাম হোলো। তারপর সে এক অদ্ভুত কাণ্ড, দেওয়াল আর ঘরে কে যেন কলসী কলসী জল ঢেলে দিলে। আমাদের তো মনে খুব আনন্দ হোলো, নামের এমন প্রত্যক্ষ প্রভাব দেখে সকলেরই মনে খুব আনন্দের জোয়ার এল। তারপর তাতে যা মন্তব্য এল সবারই মাথা ঘুরে গেল। দালানে বসে তিনি ( সম্ভব পাঠক মহাশয় ) বল্লেন, অমন হয় ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করলে, বাতাসের অভাবে অমন ঘামে। মনে ঘ্যাঁচ করে লেগে গেল, এইরে সর্ব্বনাশ করলে। তাই না শুনে সকলেরই মন ভেঙ্গে পড়লো, কেউ ব'ল্লে আমি অমুক জায়গায় যাব, কেউ বল্লে আমি বৃন্দাবন যাব, এই রকম করে সব বলতে লাগলো। আমার তো

মনে খুব অভিমান হোলো। তখন তো সেই "নিতাই অনঙ্গ মঞ্জরী" নিয়ে সমালোচনা চল্‌ছিল্লো, তার ওপর আবার এই। আমি গিয়ে একটা ঘরে শুয়ে পড়্‌লাম। কর্ত্তা ( বড় বাবাজী ) জানতে পারলে, একে তাকে জিগ্যেস্ করলো, সবাইকে বলেছিলাম, আমার শরীর খারাপ, কিছু খাব না। কর্ত্তার মনে ঠিক লেগে-ছিলো। এসে ডাক্‌লে রাম! শুনেই তো আমার অভিমান আরও বেড়ে গেল্ল। বল্লে কি হয়েছে, বল্লাম শরীর ভাল নেই। সব বুঝতে পারলে, বল্লে—কি করবো বল, তারা আবার কিছু মনে করবে, বড় পাঠক, আর লোকেরও মনে বিরূপ ধারণা হবে। তুমি কিছু মনে কোরো-না। আমার অভিমান আরও ফুলে উঠ্‌লো, বলে ফেললাম, কি কর্ত্তে আসা তবে ঘরবাড়ী ছেড়ে, যদি দুটো "নাম-প্রসঙ্গই" না হবে তবে আর কেন, আপনি ঐ কর্ত্তে থাকুন আমরাও চল্লাম। কর্ত্তা শুনে চুপ করে রইলো; তারপর তিনি কপর্দ্দক-শূন্য হয়ে দুম্‌কা যাত্রা করলেন; পথে বল্লেন দেখ তা বলে ওর ওপর ( পাঠকের ওপর ) কটাক্ষ কোরো-না, তবু ত আশ্রয় করে আছেন। ওই চরিত-আশ্রয়ের ফল যাবে কোথায়, দেখো উনিই একদিন ঐ চরিতামৃতেই "নাম-মাহাত্ম্য" বল্‌তে পঞ্চমুখ হয়ে যাবেন। তারপর সেই দুম্‌কার পথে এক অপূর্ব্ব আনন্দ। গ্রামের মুসলমানেরা, পর্য্যন্ত নামকীর্ত্তনে যোগ দিয়েছিলো। নামের অবতার প্রকট হয়েছিল। সে সব তো "চরিত সুধায়" পড়েছো তোমরা। তারপর কিছুদিন পরে কলকাতায় দেখি না,—সেই পাঠক মহাশয় পাঠ করছেন, আর কথায় কথায় "নাম-মাহাত্ম্য" বলছেন, এমন কি প্রসঙ্গ নাই তবুও প্রসঙ্গ এনেও "দুর্ব্বার", নাম-মাহাত্ম্য বলছেন, আমাদের মনে ছিল সেই কথা, ঐ যে তিনি বলেছিলেন চরিতামৃত-আশ্রয় করেছেন ওতেই হবে, নইলে বস্তু যে মিথ্যা হয়ে যায়।

বলিতে বলিতে যে অপূর্ব্ব আনন্দের কথা স্মরণ করিতে করিতে নাম-প্রসঙ্গে গুরুদেবের অপূর্ব্ব উন্মত্ত ভাব, তাহাতে আবার শ্রীবড় বাবাজী মহাশয়ের প্রকট-প্রসঙ্গের সহিত নাম-মাহাত্ম্যের স্মরণ-মাধুর্য্যে মহাভাবাবেশে এমনভাবে আলুলায়িত হইলেন যে, মনে হইল যেন আমাদের নিতাই-গৌর প্রেমের পাগল প্রভু শ্রীরাধারমণও লুব্ধ হইয়া আজ নিজের কথা বলিবার জন্য আমাদের শ্রীগুরুদেবকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া মধুময় সঙ্গ সুখ ভোগ করিতেছেন।

তারপর ক্রমশঃ অন্যান্য প্রসঙ্গের দ্বারা সদানন্দময় শ্রীগুরুদেব পৌনে ন'টা পর্য্যন্ত অনুগতবৃন্দের মধ্যে থাকিয়া যথাসময়ে নিত্যসেবকের প্রার্থনায় স্নানাদির জন্য উঠিলেন। ভক্তবৃন্দ মধুময় সঙ্গে পরমানন্দে মত্ত হইয়া আবার বাহিরের আকর্ষণে নিজ নিজ গৃহে ফিরিবার জন্য একে একে প্রণাম করিয়া অনিচ্ছাসত্ত্বেও বাহিরে আসিতে লাগিলেন।

---

১৬ই বৈশাখ, ১৩৫৫ সাল।　　　　সকাল—৭ টা হইতে ৯।২০ মিঃ, কলিকাতা।

নিত্য যেমন মধুময় পরিবেশের মধ্যে থাকিয়া শ্রীগুরুদেব মালা জপ করিতে করিতে প্রিয় অনুগতদিগের প্রতি চাহিয়া নিজ আস্বাদনের অবস্থাটীকে বাণীর দ্বারা প্রকাশ করেন আজও সেই ভাবেই আবিষ্ট অবস্থায় থাকিয়া কথা প্রসঙ্গে বলিলেন,

## দাস ক'রে দেহ মোরে প্রেমধন

জান, পুরোণো চাকর, অনেক দিন থেকে বাড়ীতে আছে, ছেলেমেয়েদের মানুষ ক'রেছে, তাদের ওপর জোর জুলুম ধমক্ সবই ক'রছে, ক'রতে ক'রতে মমতা প'ড়ে গেছে; এদিকে মুনিবেরও খাস পেয়ারের হ'য়ে গেছে। শেষটায় ক্যাসের চাবিও তার হাতে প'ড়লো। সে এখন আর চাকরের মত পর-পর-ভাবে নেই, আপন হ'য়ে গেছে, তবুও তো চাকর, তা-হলে কি হবে, সে যে মুনিবের খাসের লোক, মুনিব কি করে, কোথায় থাকে, সে সব জানে। মুনিব কোথায় আছে জেনে সেখানে যখন যাবে তখন সব বোঝাবুঝ হ'য়ে যায়। তারপর তারও তো লোভ জাত হয়, শেষটায় কি হয়? কি আর হয়, বাকী থাকে কি। দাস পুষ্ট না হ'লে কি হবে? গুড় খেতে খেতে ওলা এসে গেছে, এও ছাড়তে পারে না, আরও, ও ভুলতে পারে না। তাইতো মনে হয় ওটী আগে বেশ করে খেয়ে নাও তারপর এটীর অধিকার এলে ভোগ হবে। তবে লোভ চাই; কিন্তু অনধিকারী হ'য়ে ভোগ ক'রতে যেও না।

বলিতে বলিতে আনমনা হইয়া পড়িলেন যেন আপনার চির দাসকে গোষ্ঠীর গোপন কথা বলা হইল, এর পর বুঝে নাও তুমি। আবার একটু-ক্ষণ মৌন হইয়া রহিলেন। ভক্তবৃন্দ তাঁহার কথা মাধুরীতে এমন ডুবিয়া গিয়াছেন যে শ্রীগুরুদেবের অঙ্গে যে প্রচুর ঘাম হইতেছে সেদিকে কারও খেয়াল নাই। আজিকার গরমও বড্ডো বেশী মনে হইতেছে, যদিও ঘরের দরজা জানালাগুলি সম্পূর্ণভাবে খোলা আছে কিন্তু বাতাস বড় কম, তাই গরমও খুব মনে হইতেছে, শ্রীগুরুদেবের কিন্তু এদিকে কোন আবেশ নাই, আপন ভাবেই বিভোর। ভক্তবৃন্দও এতক্ষণ যেন মগ্ন হইয়া ছিলেন অকস্মাৎ শ্রীগুরুদেবের শ্রীঅঙ্গের দিকে চাহিতেই প্রচুর ঘাম হইতেছে দেখিয়া কেহ ব্যস্ত হইয়া পাখার বাতাস করিবার জন্য অগ্রসর হইয়া শ্রীগুরুদেবকে পাখা করিতে লাগিলেন। এই অবসরের মধ্যে অনুগতজনের দৃষ্টি শ্রীগুরুদেবের বাম জানুর উপর পড়িয়াছে দেখিয়া শ্রীগুরুদেব মুচকি হাসিলেন, একটু পরেই ভক্তগণকে বলিলেন,—

"তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষ্যমাণঃ" অর্থাৎ

**সবই তোমার কৃপা এই দৃষ্টি থাকা চাই**

ও-কি দেখছো, ওই যে তোমাদের পাঁজি-পুঁথিতে আছে প্রারব্ধ কর্ম্ম, আর তা না-কি নাম করলে সেটার বেগটা কম পড়ে। ব্যাধি হোলো কৃপাদণ্ড, দণ্ড দিয়ে কৃপা ভোগ করায়। সেই যে গো বাঁদরের কামড়ান, তার ওই দাগ, আমি দাগী কিনা...............

বলিয়া কৃপাদণ্ডভোগে উচ্চহাস্য করিলেন এবং কেবলই "দাগী" "দাগী" বলিতেছেন আর সকলের দিকে ফিরিয়া ফিরিয়া চাহিতেছেন, নিজেকে দাগী বলিয়া কি যে বুঝাইতে চান সে সন্ধান পাওয়া কি সম্ভব? এইরূপ রসিকতার মধ্যে নিজের তৃপ্তিটুকু ভাষায় ঢালিয়া দিতে দিতে হঠাৎ শিহরিয়া উঠিয়া অনুগতবৃন্দের শুনিতে অতি আগ্রহ দেখিয়া "দাগী" হ'য়ে ভোগে কত সুখ সেই স্মরণে আবিষ্ট থাকিয়া বলিলেন,—

তখন শ্রীবৃন্দাবনে, পুলিনে থাকা হয়, প্রসাদ পেতাম পুরাণ সহরে শ্রীরঘুনন্দন-প্রভুর ওখানে। একদিন বৈরাগ্য চেপে গেল, না অত ভাল ভাল প্রসাদ, রাজভোগ আর পাব না; ব্যস্ সেইদিনই বন্ধ করলাম। আমার ওপর ভার ছিল রাধাবাগের তুলসী চয়ন ক'রে ওখানে (শ্রীরঘুনন্দনপ্রভুর ওখানে) দেবার। মনে লাগলো বাঃ এ যে সেবায় অপরাধ হয়। সেদিন তুলসী নিয়ে গিয়ে পূজারীর হাতে দিলাম, প্রভু নীচেই ছিলেন, পূজারীকে বল্‌ছেন শুনলাম, রামদাসজীকে প্রসাদ পাইও। তিনি আমাকে রামদাসজী বলতেন, আমার তো বৈরাগ্য চেপেছে, ওকথা মনে জোর করলে না, তাই পূজারীকে ব'ল্লাম, আমাকে প্রসাদ-কণা দাও, চ'লে যাই। শুনে তাঁর মনে বোধ হয় আঘাত লেগেছিলো, এদিকে আর এক জায়গায় ব্রজমায়ীর ওখানে রুটী পেতাম, তাও সেদিন বন্ধ করলাম। ব্যস্ মাধুকরী ক'রে ফিরছি.....................

বলিয়াই সেই কথার মধ্যে আস্বাদনীয় কথার ভোগ-মাধুর্য্যে একটী প্রসঙ্গ তুলিয়া বলিলেন—

দেখ, তাঁদের কেমন ভাষা, মাধুকরী, ভ্রমর, চাতক, মধুকর এদের বৃত্তির মত বৃত্তি না এলে কি এসব ভাষায় নিজের বৃত্তি জাগে? এসব শুদ্ধা-ভক্তির ভাষা। সব জায়গা থেকে ভজনের অনুকূল মধুসংগ্রহ তাই মধুকরের বৃত্তি বলেছেন, তাতে হ'য়েছে মাধুকরী, অন্য জল খায় না তেমনি তার দেওয়ার উপর নির্ভর থাকবে বলেই চাতকের বৃত্তি নিয়ে ভাষা চাতকী-বৃত্তি। এসব গিয়ে যদি উদর পোষণ হ'য়ে দাঁড়ায় তবে সেই হ'য়ে যাবে সার। তাদের যেমন মধুতে দৃষ্টি থাকে আর বাইরে কি আছে খেয়াল থাকে না, তেমনি দৃষ্টি এলে অনুকূল মধুতেই লোভ থাকবে তবে হ'বে মাধুকরী। ওদিকে কথা আছে না "কি কাজ সন্ন্যাসে মোর প্রেম প্রয়োজন।" হ্যাঁ, তারপর মাধুকরী ক'রে ফিরছি, এক ঝাঁক বাঁদর, সেইদিনেই হয়তো পূর্ণ হোতো। তারপর মাধুকরীর ঝোলাটা ফেলে দিলাম, এলাম পাটনা বাড়ীর কুঞ্জে। তখন এই হাঁটুটায় তো একেবারে রক্তারক্তি, একটাতেই কামড়েছিল কিনা, ভাবলাম, আরও হোতো, কিছু কম হোলো, যতটা হওয়া উচিৎ ছিল ততটা হোলো না, এই

মনে জাগ্‌লো। তারপর ১ মাস ৬ দিন সেখানে থাকা। সে যে কত সঙ্গ, কত ভোগ, বলার কথা নয়। বোঝো কেমন কৃপা-দণ্ড।

শ্রীগুরুদেব ব্যাধির ছলে দণ্ড দিয়ে কৃপাভোগ করার ভাবে নিমগ্ন হয়ে সেই ব্রজে পরিপূর্ণ কৃপা-লাভের মনোরম স্মৃতি ভোগ করিতেছেন, এই সময় একভক্ত বলিলেন—শ্রীনবদ্বীপের সমাজবাটীর কোন এক সংসার ত্যাগী সেবকের পায়ে গুরুতর পীড়া হইয়াছে, কেহ বলিতেছেন বাতের যন্ত্রণা, আবার কেহ বলিতেছেন ফোঁড়া উঠিতে পারে, শুনিয়া শ্রীগুরুদেব আবার হাসিলেন, মালায় সংখ্যা রাখিয়া বলিলেন—

## পীড়াকে হেতু করিয়া কৃপাদান ও জীবের অহংজ্ঞানের উপযুক্ত দণ্ড

**ব্যাধি বড় বান্ধব গো, তাইতো এতক্ষণ ব'লছিলাম। ও যখন আসে কিছু কিছু দিয়ে যায়, আবার প্রতিকূল কৃপার স্বরূপও ভোগ করায়, এদিকে আবার "আমি" জ্ঞান এলেই তার স্বরূপটি দেখিয়ে দেয়, দেখ এই হোলো তোমার স্বরূপ।**

বলিয়া কেমন যেন গম্ভীর হইলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই আবার যেন জাগিয়া ওঠার মত চাহিয়া দেখিলেন এবং জাগ্রত অবস্থাতেই ভোগবিলাসের স্মৃতিটীকে ভাষায় প্রকাশ করিয়া বলিলেন,—

## ব্রজগোপীর ভোগ লালসা

**তোমাদের পাঁজিপুঁথিতে কথা আছে—গোপীদের নাকি স্বতন্ত্র কৃষ্ণভোগ নাই? আচ্ছা সত্যিই কি তাই? তাদের ভোগচেষ্টা নাই, না প্রয়োজন নাই? দিদির সঙ্গে একবার ওখানে ওই কথা হ'য়েছিল,** (শ্রীনবদ্বীপের সমাজবাড়ীতে শ্রীদখীমার কথা) **আমার মুখ দিয়ে সে বের করালে কি জান! বড় অদ্ভুত কথা ......................**

বলিতে বলিতেই আবার কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া গেল, আহা! আহা! করিয়া ব্রজগোপীর কথা স্মরণে বিভাবিত হইয়া আবার বলিলেন,—

**নাই কেন? তবে এদের তো** (ব্রজগোপীগণের) **আর অভাব নেই, আর দরকারও নেই, যদি তাই হোলো তবে আবার তারা করবে কেন?** (শ্রীকৃষ্ণের ভোগসুখের আনুকূল্য করবে কেন?) **না না তা কি হয়? এরা তো কায়ব্যূহ* একা সেবায় সুখ হয় না, এক একটী তো তার** (শ্রীরাধিকার) **মনোবৃত্তি, এক একটী অঙ্গ তো, অঙ্গস্পর্শেই অঙ্গী সুখী; তা'হলে মনে নেয় এই যে নাই বলে চায় না তা নয়, আছে ব'লে তাই চায়। শুনে দিদি তো অস্থির...**

---

* "কায়ব্যূহ" শব্দের অর্থ দেহগত-ভেদ কিন্তু ক্রিয়াগত এক। সেব্যের সুখ-বিধানে তৎপর হইয়া বিভিন্ন দেহে বা রূপে আত্মপ্রকটনই হইল "কায়ব্যূহ" শব্দের তাৎপর্য্য।

মধুর ব্রজলীলায় সেব্য-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের পরিপূর্ণ সেবা-শক্তি শ্রীরাধা। সেব্যকে অশেষ-বিশেষে রস আস্বাদনে সুখী করাই সেবা-শক্তির চতুরতা। ব্রজদেবীগণ শ্রীরাধিকার "কায়ব্যূহ-রূপ। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী "শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে" আদিলীলায় ৪র্থ পরিচ্ছেদে বলিয়াছেন—

বলিয়া একেবারে আলু থালু হইয়া পড়িলেন। একেই ব্রজের রসিক ভাবুকের নিগূঢ় ভোগের কথা, তাহাতে আবার শ্রীসখীমার সহিত তাহার ভোগ, আর ঘটিতেছে স্মৃতি জড়িত অবস্থায়, সেইজন্য শ্রীগুরুদেবের এইরূপ অবস্থা, এইভাবে ভাবমগ্ন অবস্থায়, শ্রীগুরুদেব বসিয়া আছেন, ইত্যবসরে অনুগতজনের মধ্যে আগামী সপ্তাহে "চন্দ্রগ্রহণ" উপলক্ষে কোথায় নামপ্রসঙ্গে রাত্রিযাপন করা যাইবে সেই আলোচনা হইতেছিল। শ্রীগুরুদেব মাথা দোলাইতে দোলাইতে ঐ "গ্রহণ" শব্দটী শুনিয়া কিছু বলিবেন ইচ্ছা করিলেন, অনুগতগণ চুপ করিয়া রহিলেন, শ্রীগুরুদেবও অবসর পাইয়া 'গ্রহণ' শব্দটিতে কেমন ভোগ করেন অর্থাৎ শব্দব্রহ্মের মহিমময় আসনে থাকিয়া আচার্য্যরূপে কেমন আস্বাদন করা যায় তাহাই জানাইলেন,—

## গ্রহণেই তো ভাবকান্তি গ্রহণ

দেখ গ্রহণেই তো ভাব আর কান্তি গ্রহণ হ'য়েছে, এখানে বিবর্ত্তরাহু গ্রাস ক'রলে চাঁদকে, এদের কেমন অবস্থা দেখ দেখি। এদের সব উল্টো, রাইতো চাঁদ আর রাহু কাল রঙের, শ্যামও কাল, তাকে গ্রাস করলে কেমন? তারপর আকাশের চাঁদ তো চাঁদই থাকে আর রাহু রাহুই থাকে, এতে আলাদা রীতি হ'য়ে গেল, গৌর হ'য়ে গেল, সব বিপরীত। গ্রহণে অনেক কিছু আছে গো, নাও না কত নেবে, ভাব গ্রহণ ক'রে স্বভাবও উল্টে গেল, আর থাক্‌লো কি? রাধার ভোগ না থাক্‌লে পূর্ণকৃষ্ণ কিসে? পুরুষ তো কৃষ্ণ, তাতে অভাব থাকে না, কিন্তু রাধা-অভাব থাক্‌লে পূর্ণ কোথায়? "আপনি প্রকৃতি আমা পুরুষ আচরায়।"

---

"আকার-স্বভাব-ভেদে ব্রজ দেবীগণ।
কায়ব্যূহ-রূপ তাঁর রসের কারণ॥"

এ স্থলে "কায়ব্যূহ" শব্দ-প্রয়োগের তাৎপর্য্য এই যে শ্রীরাধিকার কায়—মহাভাব, ব্যূহ—বহুত্ব রচনা। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে পরিপূর্ণ শৃঙ্গার-রসানন্দ-বৈচিত্রী আস্বাদন করাইবার জন্যই মহাভাবের ব্যূহ রচনা করিয়া আপনি স্বয়ং সখী-মঞ্জর্য্যাদি বহুকান্তা-রূপে কায়ব্যূহ বিস্তার করিতেছেন। যখন যে জাতীয় শৃঙ্গার-রস আস্বাদনের সঙ্কল্প শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়ে উত্থিত হয়, তখন শ্রীরাধিকা নিজে সেই সঙ্কল্পানুরূপ আস্বাদ-দানে এবং কায়ব্যূহ-রূপা ব্রজাঙ্গনা দ্বারা তাহা আস্বাদন করাইয়া তাঁহাকে সুখী করেন, এমন কি যে আস্বাদনের সঙ্কল্প তাঁহার হৃদয়েও উঠে না, সেই সঙ্কল্পাতিরিক্ত আস্বাদন-দানে তাঁহাকে সতত উন্মত্ত করিয়া রাখেন। ইহাই হইল মহাভাবস্বরূপিণী শ্রীরাধিকার স্বভাব।

শ্রীপাদের বাণীর তাৎপর্য্য এই মনে হয় যে, শ্রীরাধার প্রতি অঙ্গ শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গ লুব্ধ, সেই রাধার প্রতি অঙ্গের মূর্ত্তি যদি সখীগণ হন তবে তাহাদেরও শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গ লালসা থাকিবার কথা। তাই শ্রীপাদের বাণী অতীব সুসিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছে যে, "নাই বলে চায় না, তা নয়, আছে বলে তাই চায়।"

পুরুষে যদি প্রকৃতি ভোগ হয় তবেই তো পূর্ণ, তা সে পূর্ণতা গৌরেই তো। অভাব থাক্‌লে কি বিরাটত্ব হয়। কোন অভাব থাক্‌বে না তবে তো ভগবান্, গৌরে দেখ, মহারাসবিলাস থেকে উঠেছে, ভোগ হয়নি সেখানে, এখানে পূর্ণভোগ।*

---

* পরমকরুণাময় শ্রীগুরুদেব মধুর লীলা-কথা-রসে নিমগ্ন হইয়া পরমানন্দ-বিলাস-স্মরণে উল্লাসবশে মধুর ব্রজ ও নদীয়ালীলার উদ্দীপনায় "গ্রহণ ও বিবর্ত্ত" এই দুইটী কথা বলিলেন—

এখানে "গ্রহণ" শব্দে পরস্পর পরস্পরকে গ্রহণ বুঝায়, অর্থাৎ রাইচাঁদকে শ্যামের গ্রহণ এবং শ্যামচাঁদকে রাইয়ের গ্রহণ। ইহাই তাৎপর্য্য। বিবর্ত্ত শব্দে—রাই কানুকে ভাবিতে ভাবে কানু হইয়া এবং কানু রাইকে ভাবিতে ভাবে রাই হইয়া অর্থাৎ শ্রীরাধিকার ভাব-গ্রহণে শ্রীকৃষ্ণের স্বভাবের বৈপরীত্য এবং শ্রীকৃষ্ণের ভাব-গ্রহণে শ্রীরাধিকার স্বভাবের বৈপরীত্যে পরস্পর মিলনেই যে অপরূপ গৌর মূর্ত্তির আবির্ভাব, ইহাই হইল এখানে বিবর্ত্ত শব্দের তাৎপর্য্য। এই অভিনব গৌর স্বরূপেই উভয়ের ব্রজের অপূর্ণ বাসনার পরিপূর্ত্তি লীলা। শ্রীব্রজরাজ-নন্দ-নন্দন ও শ্রীবৃষভানু-রাজনন্দিনী পরস্পর পরস্পরে ভাবের বিনিময়ে বিবর্ত্তে বিলাসরঙ্গে নব-মাধুরী ভোগ করিতে উভয়ে মিলে গৌর হইলেন।

শ্রীগুরুদেব বলিলেন—"কোন অভাব থাক্‌বে না, তবে তো ভগবান্, গৌরে দেখ, মহারাস বিলাস থেকে উঠেছে, ভোগ হয়নি সেখানে, এখানে পূর্ণভোগ।"

মধুরব্রজলীলায় শৃঙ্গাররসরাজ মূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণই প্রেমের বিষয় ও তাঁহার অন্তরঙ্গা শক্তি, মহাভাব-স্বরূপিনী শ্রীরাধাঠাকুরাণীই প্রেমের আশ্রয় স্বরূপা। এই শ্রীরাধিকাই শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের বিলাসরূপা হ্লাদিনী শক্তি। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীপাদ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিলীলায় চতুর্থ পরিচ্ছেদে বলিয়াছেন—

"রাধা কৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি।
অন্যোহন্যে বিলসে রস আস্বাদন করি॥"
"হ্লাদিনী করায় কৃষ্ণে রস আস্বাদন।"
"রাধিকা করেন কৃষ্ণের বাঞ্ছিত পূরণ॥"
"রাধা পূর্ণশক্তি কৃষ্ণপূর্ণ শক্তিমান।
দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্রের প্রমাণ॥"

অখণ্ড পরমানন্দ-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তির অনন্তবিভেদ থাকিলেও স্বরূপানন্দ আস্বাদন করিবার ক্ষমতা-রূপ হ্লাদিনী শক্তিরই পরম মুখ্যতা। এই হ্লাদিনী শক্তি, স্বরূপ হইতে অভিন্না এবং স্বরূপ হইতে আবির্ভাব ভেদে দুই প্রকার। তন্মধ্যে স্বরূপের সঙ্গে তাদাত্ম্যরূপে অবস্থান করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে স্বরূপের আনন্দ-আস্বাদন বিশিষ্ট করেন। আর স্বরূপ হইতে আবির্ভূতা হইয়া অধিষ্ঠাত্রীরূপে মূর্ত্তিমতী হইয়া বিবিধ অদ্ভুত রসময় লীলাবিশেষের দ্বারা মধুর রস আস্বাদন করান। তাই শাস্ত্রে বলিয়াছেন—শক্তি ও শক্তিমানে "অচিন্ত্য-ভেদাভেদ সম্বন্ধ।" [ পর পৃষ্ঠায় ]

বলিয়া নীরব হইলেন। আজ সেই শ্রীগুরুদেবের এই অযাচিত করুণার দানের অবস্থা দেখিয়া ভক্তবৃন্দও কাঁদিতে লাগিলেন। শ্রীগুরুদেবও সদানন্দময় অবস্থায় বহুক্ষণ থাকিয়া আবার বড় করুণ দৃষ্টিতে ভক্তগণের উপর চাহিলেন। আজিকার প্রসঙ্গের মধ্যে অনেক কিছু ও আস্বাদনের বিষয় থাকায় ভক্তবৃন্দের মধ্যে ঐ-সম্বন্ধে মৃদুস্বরে আলোচনা হইতেছিল, শ্রীগুরুদেব ইহা যেন শুনিয়া অনুগতবৃন্দের আরও ভোগ আকাঙ্ক্ষা দেখিয়া বলিলেন,—

---

রাসরসবিহারী শ্রীকৃষ্ণ বরজযুবতিগণে পরিবেষ্টিত হইয়া রাসরসে খেলিতে খেলিতে প্রেমময়ী শ্রীরাধিকার প্রেম মাধুর্য্যাধিক্য দেখে আশ্রয় জাতীয় সুখ আস্বাদনে লুব্ধ হয়ে "শ্রীরাধিকার প্রেম কেমন, প্রেমের মাধুরী কেমন, সেই প্রেমে কিবা সুখ"—এই তিন বাঞ্ছা পূরণে অভিলাষী হন। রসিক-শেখর নাগরেন্দ্র-শিরোমণী বাঞ্ছা পূরণে অন্য উপায় না দেখিয়া আপনি আপনায় আস্বাদিতে প্রেমময়ীর মাধুরীতে নাগরালি ভুলে রাধাভাবে ভোরা হ'য়ে রাধাভাব-কান্তি অঙ্গীকার করিয়া দোঁহে মিলে গৌর হইলেন। তাই কবিরাজ গোস্বামী-পাদ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বলিলেন "রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিতং নৌমি কৃষ্ণ স্বরূপম্"। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীজীব গোস্বামী-পাদ বলিলেন—"অন্তঃকৃষ্ণং বহির্গৌরং।" এই গৌর স্বরূপে কেবল শ্রীকৃষ্ণের বাসনাই পূরণ হ'ল তাহা নহে সঙ্গে সঙ্গে প্রেমময়ী গরবিণী রাধাঠাকুরাণীরও রসপিপাসু নাগরকে রস-দানে সুখী করিতে "নারী না করিত বিধি, তুয়া হেন গুণনিধি, লইয়া ফিরিতাম দেশে দেশে" এই বাসনা পূরণ হল। অতএব মহাভাব স্বরূপিণী শ্রীরাধা ঠাকুরাণীর গ্রহণেই সর্ব্বশক্তিমান স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণভোগ। তাহার অভাবে শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ হইয়াও মানে অভাব অর্থাৎ সদাই অপূর্ণ। ব্রজে দোঁহার মিলনের নাই নিত্যত্ব। গৌর হয়ে মধুর নদীয়া লীলাতেই মিলনের নিত্যত্বে উভয়ের বাসনার পরিপূরণে পূর্ণত্ব অভিব্যক্ত হইয়াছে। তাই **শ্রীপাদ বলিলেন—"এখানে পূর্ণভোগ"**। শ্রীপাদ কীর্ত্তন প্রসঙ্গে বলিলেন—"যেখানে নিরন্তর জড়াজড়ি, সেখানে পূর্ণ ব্রজপুরী। যেখানে একাধারে যুগল মাধুরী, পূর্ণব্রজ নদীয়াপুরী।" শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রকট লীলায় কৃপা-প্রসূত পদকর্ত্তা মহাজন শ্রীল-বৃন্দাবন-দাস-ঠাকুর প্রেমাবেশে বলিয়াছেন—"নিতাই বলিয়া, দুবাহু তুলিয়া, চলিব বরজপুরে।" শ্রীগুরুদেব ভাববেশে কীর্ত্তন রঙ্গে তাই বলিয়াছেন—"যেখানে রাইসম্পুটে বংশীধারী, সেই ত পূর্ণ ব্রজপুরী।"

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীজীব গোস্বামী পাদ "শ্রীগোপালচম্পূ" গ্রন্থে এই যুগল-রহস্য সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"ইমৌ গৌরীশ্যামৌ মনসি বিপরীতৌ" অর্থাৎ কোন এক অনির্ব্বচনীয় প্রেম, মূর্ত্তী-ভাব ধারণ করিয়া বিষয়রূপে শ্রীকৃষ্ণ এবং আশ্রয়রূপে শ্রীরাধা, অথচ রাধার হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণকে স্ফূর্ত্তি এবং শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়ে রাধাকে স্ফূর্ত্তি করাইয়া রাখিয়াছেন। এইরূপে প্রেম হইতে মূর্ত্তির ভেদত্ব ও অভেদত্ব প্রকাশ করিয়া আবির্ভূত হইয়াছেন। এই প্রেমের আশ্রয়রূপে ভেদ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধিকার যে প্রেম, সেই প্রেমের আশ্রয় শ্রীরাধা এবং বিষয় শ্রীকৃষ্ণ; আবার শ্রীরাধার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের যে প্রেম, সেই প্রেমের বিষয় **শ্রীরাধা ও আশ্রয় শ্রীকৃষ্ণ। এইরূপ প্রেমের বিবর্ত্তস্বরূপ হইল** শ্রীগৌরাঙ্গ, দোঁহর অপরূপ মিলনে মূরতিমন্ত

## মুক্তাগর্ভ

কি গো, মুক্তোর জন্ম কোথায় ? ঝিনুকে তো, সে হাঁ করে থাকে, যেমনি স্বাতী নক্ষত্রের জল পড়লো আর ওমনি হাঁ বন্ধ হ'য়ে গেল, ব্যস্ এবার মুক্তো হ'তে থাকলো।

"স্বাতীনক্ষত্রের জল রূপ - শ্রীগুরু-কৃপাবারি-সিঞ্চনেই পরিপূর্ণ-ভোগে মুক্তাফল জন্মে।" এই ভাবে প্রসঙ্গটী বলিয়া শ্রীগুরুদেব মৃদুমধুর হাসিতে লাগিলেন, সকলেই বুঝিলেন শ্রীগুরু-বাক্য শুনিয়া আর কিছু শুনিবার প্রয়োজন নাই। শ্রীগুরুদেবও পরম তৃপ্তির সহিত তাহাদের বুঝিয়ানেওয়ার ভাবটী অনুমোদন করিয়া বলিলেন,—

## আবেশের গতি

হ্যাঁ, আবেশ তো একটাতেই ভাল, তা যাতেই হোক, তারপর যার ওপর ভার আছে সে ফিরিয়ে দেবে।

বলিয়াই শিহরিয়া উঠিলেন, তারপর আবার বলিলেন,—

তাই তো ঠাকুর মহাশয় বলেছেন—"কাম কৃষ্ণ সেবার্পণে, ক্রোধ ভক্ত-দ্বেষি জনে।" আবেশটা অনিত্যে আছে নিত্যে ফিরিয়ে দিলেই হোলো। তোমাদের হিসেবে এলেই ধরা পড়ে যাবে; ওজন তো চাই, ওজন করলেই জানতে পারবে কতটা এগোনো হো'লো। নিজেরা ওজনের সামনে না আস্‌তে চাইলেও যার ওপর (জগদ্‌গুরু শ্রীনিত্যানন্দের উপর) ভার দিয়েছে, সে একবার ক'রে ওজন করিয়ে দেয়, দেখ তোমার বল্ হোলো এই। কোন্‌দিকে আবেশ প'ড়ছে, এক একবার ঝাঁকি দেয়। তাই তো মনে হয় সংসার প্রতিকূল হ'লে ভাল হয়, অনুকূলে ভারী জ্বালা, তখন বেঁধে মার। অনুকূল হ'লেই কর্ত্তা সাজতে হবে, ব্যস্ কর্ত্তা সেজে থাক্‌লেই আর রক্ষে নেই বাবা.........................................

এই পর্য্যন্ত বলিয়াই কি যেন ভাবিলেন,—কর্ত্তা তোমরা কেউই নও, কর্তৃত্ব না রাখিয়া দাসত্ব ভুলিও না, চির-নিত্য গুরুপিতাই সংসারের কর্ত্তা, তিনিও চির-সত্য যখন, তখন কোন দিনই পিতার বর্ত্তমানে পুত্র সংসারের কর্ত্তা হয় না, পুত্রের কর্ত্তব্য পিতাকে

---

প্রেমবৈচিত্ত্য স্বরূপ, নিত্যমিলনে নিত্যবিরহ ভোগ। তাই শ্রীগুরুদেব কীর্ত্তন প্রসঙ্গে বলিয়াছেন "নাগর নাগরী হল, বিবর্ত্ত দেখ গো।"

"আজ নাগরালী ভুলে হল রাধা ভাবে ভোরা।
(ঐ দেখ) হা কৃষ্ণ! হা কৃষ্ণ! ব'লে দুনয়নে ধারা॥"
প্রাণভরে গাও সবে গোরা গোরা গোরা॥

অতএব ব্রজে মহারাস-বিলাসের পরিণতিতে যে স্বরূপ (গৌর) বনেছিল সেই পরিণতির স্বরূপের খেলার ভূমি হইল মধুর নদীয়া।

সুখী করা, আর পিতার যাহাতে সুখ হয় তাহা পুত্রকে পিতা প্রতিক্ষণেই জানাইতেছেন, আচরণ করিয়া দেখাইতেছেন, অন্তরে প্রেরণা দিতেছেন। তাই শ্রীগুরুদেব এই ভাবটী প্রাণে প্রাণে সঞ্চার করিবার জন্য মৌন হইয়া রহিলেন। ৯।১৫ মিনিট বাজিল।

শ্রীগুরুদেবের মনোরম রূপখানি দর্শন করিতে করিতে ভক্তবৃন্দ প্রণাম করিয়া বাহিরে আসিতে লাগিলেন।

---

শ্রীগুরুমুখ-পদ্মবাক্য হৃদয়ে করিয়া ঐক্য
আর না করিহ মনে আশা।
[ প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা ]

**১৮ই বৈশাখ, ১৩৫৫ সাল। সকাল ৭—৯।৩০ মিঃ; কলিকাতা।**

বৈশাখের উষ্ণতাপ প্রতিদিন যেন বাড়িয়া যাইতেছে, রাত্রেই তাহার হ্রাস হয়, ইহার সহিত প্রত্যেকের শরীর ও মনের তাপেরও হ্রাস বৃদ্ধি হইতেছে, কিন্তু পরমানন্দময় শ্রীগুরুদেবের এ বিষয়ে কোনও অভিনিবেশ নাই, রাত্রি ৩।০ টায় শয্যাত্যাগ করিয়া অবধি প্রতি-মুহূর্ত্তটী অব্যর্থকালত্ব প্রতিপন্ন হইয়া নিত্যকৃত্য-সমাপনান্তে প্রায় ৭॥০ টায় বসিয়া আছেন, হাতে নামমালা, আবেশে চক্ষু দুইটী ঢুলু ঢুলু, সহজেই সেই দুইটীতে রক্তিম আভা, তাহার উপর প্রভাতীয় স্মরণের আবেশ, মসৃণ-সুকোমল গণ্ড দুইটী মাঝে মাঝে নাম জপের মৃদু উচ্ছ্বাসে কাঁপিতেছে, মধুবর্ষী অধর-ওষ্ঠ দুইটীও জিহ্বার স্পন্দনের সহিত সমভাবে স্ফুরিত হইতেছে। নিত্যদর্শন-প্রার্থী ভক্তবৃন্দ আসিয়া শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখমণ্ডল দেখিয়াই দিব্যসুখ ভোগ করিতেছেন। শ্রীঅঙ্গে বিন্দু বিন্দু ঘাম ঝরিতেছে দেখিয়া এক ভক্ত শ্রীগুরুদেবকে পাখা করিতে লাগিলেন। প্রসন্ন-মুখে শ্রীগুরুদেব সকলের দিকে একবার চাহিয়া মালা জপ করিতেছেন —এই সময় কেহ বলিলেন বাবা ! পল্লীগ্রামে এখনও এমন রীতি আছে যে খুব গরম পড়্‌লে বুড়োশিবের মাথায় জল ঢালে—তাতে খুব বৃষ্টি হয়—তা আজ যে রকম গরম প'ড়েছে তাতে জল ঢাললে কেমন হয় ? "সর্ব্বদেবময়ো"... তো ? কথাটীতে ভক্তগণ হাসিয়া ফেলিলেন, শ্রীগুরুদেবও মুচকী হাসিয়া সেইভাবে বলিলেন,—

## সর্ব্বেশ্বর প্রসন্ন হইলে সকলেই প্রসন্ন হন

হাঁ, তিনি তো সর্ব্বেশ্বর, তখন একমাত্র তাঁরই সন্তোষ হ'লে সকলেরই সন্তোষ হয়। গাছের গোড়ায় জল ঢাললে গাছের ডাল-পাতা সবই মুঞ্জরে ওঠে, ওই যে গো, প্রাণকে আহার দিলে সব ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি হয়। সর্ব্বেশ্বরই তো জীবের প্রাণ। তোমাদের পাঁজিপুঁথিতে ওকথা আছে না? "যথা তরোর্মূলনিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ। প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা॥"* মহারাজাধিরাজ যার ওপর সন্তুষ্ট হন, মন্ত্রী কর্ম্মচারীরাও তার ওপর সন্তুষ্ট হন। তিনি তো "সর্ব্বকারণকারণম্।"†

বলিয়াই আবার মুচকী হাসিয়া অনুগতজনের দিকে বক্রকটাক্ষ করিলেন। শ্রীগুরুদেবের এইরূপ নিগূঢ় অর্থমূলক কথা শুনিয়া ভক্তবৃন্দের মধ্যে একজন বলিলেন— বাবা! আপনি যে ব'ল্লেন মহারাজাধিরাজের আরাধনা ক'রলে সকলে সন্তুষ্ট হন। কিন্তু সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তো অনেকে মহারাজাধিরাজের কাছে যাবার যোগ্যতা পায় না, তারা তো তাঁর কর্ম্মচারীদেরই সন্তুষ্টি ক'রতে চায়? তারপর এমন অনেক আছেন যে নিজের নিজের আরাধ্যকে পরিপূর্ণ স্বীকার ক'রে তাঁরই সন্তুষ্টি সাধন কর্‌তে চান সেখানে কি ব'লবেন? কথাটী শুনিয়া শ্রীগুরুদেব গম্ভীর স্বরে বলিলেন,—

ওগো তিনি এমনি কৃপাময়। যিনি যে পথ দিয়েই যাঁকে ধরুন না, তিনি করুণা ক'রে বোঝেন যে এ আমারই সেবা ক'রছে। সকলেই যে তাঁর আশ্রিত। যে গানই গাও না কেন কানু ছাড়া গীত নাই। তবে কি জান! অন্য পথে গেলে সম্বন্ধের বাঁধনে ধরা দেয় না। আর সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যাবার বাধা রেখেছে কোথায়? নামরূপে যে সদাই প্রকট। যোগ্যাযোগ্য নাই, ছোট বড় নাই, সাক্ষাৎ সম্বন্ধের দ্বার সর্ব্বদাই খোলা আছে, তবে দৃষ্টি রাখতে হবে কারুর ওপর অবজ্ঞা না আসে, তাতে সে দণ্ড দেবে, তিনি তো সর্ব্বদাই ব'ল্‌তেন (শ্রীশ্রীবড়বাবাজী মহাশয়) "ব্রাহ্মণ চণ্ডাল আর কুক্কুরান্ত করি। দণ্ডবৎ করিবে বহুমান্য করি॥ এই সে বৈষ্ণব ধর্ম্ম সবারে প্রণতি। সেই ধর্ম্মধ্বজী যার ইথে নাহি মতি।"

---

* শ্লোকার্থ—যেমন বৃক্ষের মূলে জলসেচন করিলে সেই বৃক্ষের ভুজ, উপশাখা প্রভৃতি সকল অঙ্গই তৃপ্তি-লাভ করিয়া থাকে, অথবা প্রাণে উপহার প্রদান করিলে অর্থাৎ পাকস্থলিতে আহার্য্য বস্তু দিলে যেমন সকল ইন্দ্রিয়গণের পরিতৃপ্তি ঘটিয়া থাকে, তেমনি একমাত্র অচ্যুত-নামা শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করিলেই সমস্ত দেবগণের আরাধনা হইয়া থাকে। আর স্বতন্ত্ররূপে দেবতান্তরের আরাধনার কোন আবশ্যকতা নাই। (ভাঃ—৪।৩১।১৭)

† "ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্ব-কারণ-কারণম্॥"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া উদাসীর মত চাহিয়া রহিলেন, নামজপের সঙ্গে সঙ্গে অধর ওষ্ঠ দুইটী কাঁপিতে লাগিল, তেমনি স্থির সুখাসনেই বসিয়া আছেন, বেলা ৮॥ টা বাজিয়া গেল, নিত্যসেবক একবার আসিয়া জানাইয়া গেল আপনারা একবার বাইরে যান। শ্রীগুরুদেব যেন প্রসঙ্গের আবেশে মত্ত হইয়াই আছেন, তাই তিনি সেবকের প্রীতি-সেবার কথাটী শুনিয়াও কোনরূপ উঠিবার ইচ্ছা করিলেন না, ডান দিকে হলঘরের দরজায় সেবক দাঁড়াইয়া ছিল, তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন,—

**"হাঁ, হাঁ! সাড়ে আটটা বাজ্‌ছে তা বাজ্‌তে দে' কতদিন এমনি বাজ্‌ছে, তোদের কি, কাজ সারলেই হোলো, তোরাও কাজ সারছিস আর আমারও কাজ সেরে দিচ্ছিস্।"**

বলিয়াই কৌতুক ও বিরক্তিপূর্ণ হাসি, হাসিয়া বলিলেন,—

## বৈরাগীর জীবিকা

**পথের দৃষ্টিই ভুল হয়ে যাচ্ছে সব, যে উদ্দেশ্যে থাকা সেটার পুষ্টি হচ্ছে কিনা সেদিকে নজর নাই। ঘড়ি ধরে খাও আর ঘুমোও, ব্যস, সব সারা, "কভি ক্ষীর ছানা, কভি মুঠি চানা' কভি ওভি মানা," এই তো বৈরাগীর থাকার দশা।**

বলিয়াই স্নিগ্ধদৃষ্টিতে নিত্যসেবক নন্দদাসের দিকে চাহিতেই সে যেন সেবার আকুতিতে আহতের মত মনোভাব লইয়া সরিয়া গেল। শ্রীগুরুদেবও উঠিবার জন্য নামমালা হাতে করিয়া আসন পরিত্যাগ করিলেন। ভক্তবৃন্দও বাহিরে আসিলেন, দরজা বন্ধ হইল শ্রীগুরুদেব বাল্যভোগের কিছু গ্রহণ করিতে বসিলেন। একটু পরেই এক সেবক শ্রীগুরুদেব-দত্ত নামব্রহ্মের কিছু মিষ্টি প্রসাদ শ্রীগুরুদেবকে দিতে আসিলেন, তাহার কণিকা মাত্র গ্রহণ করিয়া শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখের কোমলতায় যেন গাম্ভীর্য্য আসিল, আবার নামমালা হাতে লইয়াই ঘরে পায়চারি করিতে লাগিলেন, বাহিরে অপেক্ষ্যমান ভক্তবৃন্দ আবার গৃহে আসিলেন। শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখে আর যেন সে প্রসন্নতা নাই, গম্ভীরমূর্ত্তি। অবশেষে, গম্ভীর সমুদ্রে যেন একটু চঞ্চলতা দেখা দিল, শ্রীগুরুদেব সহসা উপক্রমশূন্যভাবেই অন্তরের ভাবটীকে নিরপেক্ষতার সহজ আবরণে ঢাকিয়া, সেবকের আচরণকে পরিশুদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যেই যেন বলিলেন,—

## আনুগত্যই ভজন পথের রীতি

**পথের আনুগত্য গেলে থাকলো কি? কিছুই হবে না। এ রাজ্যে ও রাজ্যে সর্ব্বত্র আনুগত্য চাই; এ রাজ্যে বরং পুরুষকারের কিছু সাক্ষাৎ মেলে, তবে তাতেও বিষম ধাক্কা খেতে হয়, তারপর আনুগত্যের পথে এলে ইষ্টলাভ হয়, আর পরমার্থ-রাজ্যে তো কথাই নাই, গোড়া থেকেই আনুগত্য, ওখানে আমার ঠাঁই নাই, সব তোমার।**

বলিয়াই যেন আরও কিছু বলিতে চাহিলেন, একবার কি বলিলেন, ও শোনা গেল না, একটু পরেই বলিলেন,—

**কি গো, তোমাদের কবিরাজী সম্প্রদায়ে আনুগত্য না এলে বিদ্যালাভ হয়? ঘরোয়ানা লাভ না হ'লে চিকিৎসায় ইষ্টসিদ্ধি হয়? না চিকিৎসার রীতি নীতি শেখা যায়? সবই তো আনুগত্যে মেলে, যে পথেই যাও ওটী চাই................**

বলিয়া দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ছাড়িলেন, একটু থামিয়া "বিশ্বাসে মিলয়ে বস্তু, তর্কে বহুদূর" এইভাবে বলিলেন,—

**বিশ্বাস মশাইর দেখা মিল্‌লে কিছুই আটকায় না, আমাদের কেবল ওঁর সঙ্গেই আলাপ হোলো না।**

বলিয়া যেন শ্লেষের হাসি হাসিলেন। মালায় সংখ্যা রাখিলেন। ক্রমশঃ বেলা বাড়িতেছে শ্রীগুরুদেব এইভাবে একটির পর একটি প্রসঙ্গে আবিষ্ট হইতেছেন, স্নান আহ্নিকে বিলম্ব হইবে ভাবিয়া পার্শ্বের গৃহ যইতে নিত্যসেবকের ইঙ্গিতে ভক্তবৃন্দ একে একে উঠিবার চেষ্টা করিলেন; শ্রীগুরুদেব ইহা বুঝিতে পারিয়াছেন সেইজন্য রসিকতা করিয়াই যেন বলিলেন,—

**বেলা বাড়ে না গো বেলা কমে, লোকে বলে বেলা বাড়ছে, যত দিন যাবে জীবনের বেলা কমেই যাবে, খালি মন বোঝান বেলা বাড়ছে, ওদের কি, ওরা কাজ সেরে খালাস, বেলা বাড়ছে শরীর খারাপ হবে, আরে শরীর পুষ্ট হয় কি কেবল বেলা ধ'রে চল্‌লে?**

এইরূপ বক্রোক্তির দ্বারা ইষ্টসাধনার কার্য্য-কারণ সূত্রের ইঙ্গিত করিরা যেন অনিচ্ছার সহিত নিজেও উঠিলেন। ভক্তবৃন্দের মধ্যে অনেকে আজ শ্রীগুরুদেবের চরণ-স্পর্শে প্রণাম করিয়া বাহিরে আসিলেন।

**১৩৫৬ সাল, ৩রা জ্যৈষ্ঠ সন্ধ্যা ৭॥—৯টা। কলিকাতা।**

এই কয়দিন শ্রীগুরুদেব ভাবগম্ভীর হইয়াছিলেন। অন্য প্রসঙ্গ হয় নাই। নিজ অনুগতবৃন্দ কয়েকজন আজ উপস্থিত হইয়াছেন, শ্রীগুরুদেবও বাহিরের দালানে একটি চেয়ারে বসিয়া আছেন, কটিতে মাত্র বহির্ব্বাসটুকু, উজ্জ্বল শ্যামলাবণ্যে ভরা উন্নত দেহের প্রতি-অঙ্গ হইতে যেন আনন্দকণা ঝরিয়া পড়িতেছে। আবিষ্ট স্বভাবে থাকিয়াও মুখে মৃদু করুণার হাসি, করে নামমালা। সুকোমল চরণ দু'খানি একটু ছড়াইয়া যেন ক্লান্তি দূর করার ছলে সামনের আসনের উপর রাখিয়া প্রণতজনের প্রতি কল্যাণ দান করিতেছেন। সন্ধ্যার আঁধার ছাদে নামিয়াছে, হলঘরে তখনও সন্ধ্যা-আরতি-কীর্ত্তন চলিতেছে। শ্রীগুরুদেব আবিষ্ট

থাকিয়া শিহরিয়া উঠিতেছেন এবং সেই উদ্দেশে প্রণাম করিতেছেন। একটু পরে শ্রীগুরুদেবকে এক ভক্ত বলিল—বাবা! আপনি গম্ভীর হ'লে কেমন কেমন লাগে, আমাদের দুর্দ্দৈবেরও অন্ত নাই, আপনার ক্ষমারও সীমা নাই, তবুও আপনি গম্ভীর হ'লে নানা শঙ্কা হয়—

শ্রীগুরুদেব সহজ চাহনিতে চাহিয়া রহিলেন, রাঙ্গা-আভার চক্ষুতে উজ্জ্বলতা দেখা দিল; বলিলেন—

### অন্তর্য্যামী

**হুঁ, দশ-ইন্দ্রিয়ে করে পাপ জীবের গলায় দড়ি, ইনি ওখানে অমুক করলেন, তিনি ঐ ক'রে এলেন, নে এবার, ভোগ বেটা তুই, যে আসনে বসিয়ে গেছে, বিষম পঞ্চম-তালের আসন, বাপ বুড়ো হ'লে ছেলেরা তার হাতের কাজ কেড়ে নিয়ে নিজেরা সামলে নেয়, আমার ভাগ্যে তা আর হচ্ছে কৈ?**

বলিয়াই আপন খেয়ালে আরও কি বলিলেন, শোনা গেল না। এমন সন্তান-স্নেহ কেউ কি দেখেছে কোথাও? সন্তানই তো পিতার কাছে বাঁধা থাকে, এ যে বিপরীত, সন্তানের দুঃখভার নিজেই বহন করিতেছেন, নিজেই তাহাদের কাছে আট্‌কাইয়া গিয়াছেন। শ্রীগুরুদেবের এই জাতীয় কথায় এক ভক্ত প্রশ্ন করিল—বাবা! যাঁরা আজ উপস্থিত হয়েছেন তাঁরা কিন্তু আপনার কথায় বুঝে ফেল্‌লেন যে, আপনার চোখের আড়ালে কেউ কিছু কর্‌লে আপনি সব জানতে পারেন, কেউ কিছু বল্‌লে আপনি শুন্‌তে পান। শ্রীগুরুদেব যেন কি বলিতে কি কথা বলা হইয়াছে সেই ভাবেই চমকাইয়া উঠিলেন। গম্ভীর মুখচ্ছবিতে প্রসন্নতার আলোক মিশ্রিত হইয়া অধিকতর উজ্জ্বলতা প্রকাশ পাইয়াছে। প্রায় ২।৩ মিনিট চুপ করিয়া থাকিলেন, নাম-মালার সংখ্যা রাখিলেন, যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন সকলের মুখেই আনন্দের ছায়াপাত হইল। শ্রীগুরুদেব নিজ অনুগতদিগকে করুণা করিয়া শ্রীগুরু-স্বরূপের কথা বলিলেন—

### দান ও গ্রহণ

**ওগো সে স্বরূপের (শ্রীগুরু স্বরূপের) মাধুরীই তো তাই, সব দিতে হবে, সব নিতেও হবে, নইলে ভোগ কিসে? শজ্‌নে ফুলের মালা গাঁথ্‌লে হবে না, শজ্‌নে ফুলের মালা গাঁথলাম, নাগর এলে গলায় পরিয়ে দেবো, নইলে ভেজে খেয়ে ফেলবো,... .........**

বলিয়াই মুচকী হাসিলেন, কিন্তু আবেশভরা চক্ষু দুইটীতে কি যেন বলিতে চাওয়ার ভাব তখনও সুস্পষ্ট; সন্ধ্যায় আঁধার-ঘেরা আলোছায়াতে ঐ চক্ষু দুইটীর আকর্ষণ আরও যেন প্রীতিময় হইয়া উঠিল। কথাপ্রসঙ্গে গত কয়েকদিনের পূর্ব্বে গোয়াবাগানে নাম কীর্ত্তনের প্রসঙ্গ উঠিল, তাহাতে কেহ বলিলেন, কলকাতায় আর আগের মত নামপ্রসঙ্গ হয় না। **এই কথায় শ্রীগুরুদেব বলিলেন,—**

## ছলে প্রয়োজন উন্মেষ

হ্যাঁ তখন তিনি তো ( শ্রীবড়বাবাজী মহাশয় ) পাগল সেজে আছেন, কেউ এসে ব'লে গেলেন, ইনি আসল পাগল নন, তাঁকে তো তখুনি সরান হ'ল। শেষটায় কিন্তু তিনিই বল্লেন "দেখলে তো কলকাতার লোক কি চায়, তোমাদের নাম-প্রেম কেউ চায় না।

বলিতে বলিতে শ্রীবড়বাবাজী মহাশয়ের স্মরণমাত্রই যেন মহাবিক্রমের স্বভাব সারাদেহে পরিস্ফুট হইল। চক্ষু দুইটী ঈষৎ আরক্তিম হইল। ভাববিহ্বলতা মুখমণ্ডলে ব্যক্ত হইল। একেই স্বভাব-উন্মাদী পুরুষ তাহাতে আবার শ্রীবড়বাবাজী মহাশয়ের কথা স্মরণে যেন অধিক উন্মাদের উদ্দীপনা জাগাইল। একবার দক্ষিণ ও বাম দিকে একটু দুলিয়া উঠিলেন।

এই সময়ে এক সংবাদ আসিল—আমাদের কোন আশ্রমে সেখানকার সেবকদের মধ্যে একটু বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছে, শ্রীগুরুদেবের কাছে নানাকথা আসছে, এখন আমাদের কর্ত্তব্য কি ? কথাগুলি শুনিয়া শ্রীগুরুদেব একটু হাসিয়া বলিলেন,—

## কাহাকেও তাপ দিও না

দেখ তোমাদের হিসেবের কথা কি জান তো ? প্রাণীমাত্রে কোনমতে উদ্বেগ না দিবে। তা গুরু-শিষ্য ব'লে কোন কথা নেই, তাপ দিলেই তাপ পেতে হবে, তোমাদের সাংসারিক হিসেবে বলে না যে উঃ কি তাপ যেন বিষ ফোঁড়া হ'য়েছে, উদ্বেগ দেওয়ার ঐ হোলো প্রকটরূপ।

বলিয়াই গম্ভীর হইলেন। শ্রীগুরুদেব এইভাবে চুপ করিয়া আছেন, ভ্রাতৃবৃন্দও তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া আছেন। সামান্যভাবে দু' একটি প্রসঙ্গ হইল, ইত্যবসরে রথযাত্রায় যাওয়ার প্রসঙ্গ হইল। শ্রীগুরুদেব যেন একটু শিহরিয়া উঠিলেন। শ্রীগুরুদেব যে যে প্রসঙ্গের মধ্যে থাকেন এবং স্মরণ করেন, কোন কথায় তাহার আভাষমাত্র শুনিলেই এমনিভাবে শিহরিয়া উঠেন। "রথযাত্রা" কথাটীমাত্র শুনিতেই সেইভাবে লীলার উদ্দীপনায় আবিষ্ট হইয়া শ্রীগুরুদেব দ্রুত বলিলেন।

## রথযাত্রার ক্রমপ্রসঙ্গ

হ্যাঁ-হ্যাঁ, আমাদের যাওয়া তো প্রসঙ্গ ধরেই হয়, রথযাত্রার ক্রমপর্য্যায়ে ভোগ করার জন্যে ঠিক সেইভাবেই তো সূত্র বাঁধা হয়েছে। ত্রয়োদশীতে রওনা, তারপর ভক্ত-সম্মিলন, ঝালি সমর্পণ, গুণ্ডিচা-মার্জ্জন, তারপর রথযাত্রা, শ্রীমন্মহাপ্রভুও আসছেন আলালনাথ থেকে, শুনেছেন ভক্তবৃন্দ আসছেন।

বলিতে বলিতে স্মরণ-বিভোর-মনে ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। শ্রীগুরুদেব কখনও দৃঢ়, কখনও আলুথালু, এই সহজ ভাবে কথা কহিতেছেন তৎক্ষণাৎ হয়তো অনুগত জনকে বিনীতভাবে শাসন করিতেছেন, আবার তার পর মুহূর্ত্তেই কোনও কথা শুনিয়া উদাসীর মত আবিষ্ট হইতেছেন। শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থে আমাদের অভীষ্ট চরিত্রের কথা স্মরণ হয়। এইভাবে ভাববিহ্বল অবস্থায় দেখিয়া কেহ বলিলেন শীঘ্রই নদের-নিমাই অভিনয় শুনছি, হয়তো ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউটে হবে। "নদের-নিমাই" অভিনয় কথাটী শুনিয়া বলিলেন—কবে ? তারিখটী কেহ বলিতে পারিলেন না। শ্রীগুরুদেব একটু চুপ করিয়া থাকিলেন, তারপর বলিলেন,—

## অভিনয় নয়

**ও অভিনয় নয়। সত্যিই তো, দেখ এই ৫৩ বছর নামকীর্ত্তন প্রসঙ্গ হোলো, যাদের নামে রুচি তারা আকৃষ্ট, কিন্তু অভিনয়ের ভেতর দেখ দেখি কি আকর্ষণ। তাইতো ঠিক, চন্দ্রশেখর আচার্য্যের বাড়ীতে যেদিন অভিনয় হয়, সেদিন থেকেই তো প্রচার। হ্যাঁ গা তোমাদের নীলদর্পণের কথা মনে পড়ে? বিদ্যাসাগর মহাশয় তো চটি ছুঁড়ে মারলেন। দেখ দেখি কী অদ্ভুত খেলা। সত্যি কথা কি জান, আমার বাল্যকালে ওতে ভারি·········না থাক্ সে বল্‌বো একদিন।**

বলিয়াই কি ভাবিয়া যেন স্নিগ্ধ-গম্ভীর হাসিমুখে কি ভাবিতে লাগিলেন। এদিকে সন্ধ্যা আরতির শেষ কীর্ত্তন ধ্বনিও স্তব্ধ হইল, শ্রীগুরুদেব কানে ঐ ধ্বনি শুনিয়া প্রণাম করিয়া বলিলেন,—

## আ-রতি কীর্ত্তন

**তোমাদের দাদামশাই প্রকট থাক্‌তে আরতি-কীর্ত্তন আরম্ভ হয় নাই, ঠিক্ তার পরেই সিঁথি থেকে আরতি-কীর্ত্তন আরম্ভ হ'য়েছে। আ-রতি এই কথাতেই আরতি-কীর্ত্তনের অর্থ পাওয়া যাবে। আর্ত্তিই তো আরতি নাকি গো, অভাব জাগলে আর্ত্তি হয়, তাতে তার কথা গান করলে আর্ত্তি মেটে, তাই ত্রিসন্ধ্যা আর্ত্তি জানান। আবার আ-রতি। রতিও বটে·····**

বলিয়াই কেমন এক অদ্ভুতভাবে চাহিয়া রহিলেন। এইবার উঠিবার চেষ্টা করিতেছেন, সময়ের ঘণ্টা যেন যথাকালে আসিয়া সেবা-প্রার্থনার ইচ্ছায় ঠিক্ ঠিক্ বলিয়া যায়, শ্রীগুরুদেবও অমনি বলিলেন—"সাড়ে সাতটা বাজলো বোধ হয়" বলিয়াই উঠিবেন, এমন সময় কেহ বলিল—বাবা! এখন আমাদের নামযজ্ঞে অখণ্ডভাবে "নিতাই গৌর রাধে শ্যাম" নামকীর্ত্তন হয়, এটী কতদিন থেকে ? শ্রীগুরুদেব কথাটী শুনিয়াই আবার আসনে বসিলেন—

## অখণ্ড নামযজ্ঞের প্রবর্ত্তন

**ওঃ সে একদিন তখন তো অহোরাত্র নামযজ্ঞে ওই চলতো, বাংলাদেশে সবাই দলে দলে এসে লীলাকীর্ত্তন করতেন, বোধ হয় মেঘলালের বাড়ীতেই** ( ময়মনসিংহের আলসাকান্দা গ্রামের মেঘলালদাদা আমাদের অন্যতম জ্যেষ্ঠ গুরুভ্রাতা, শ্রীগুরুকৃপার প্রকট মূর্ত্তি, শ্রীগুরুসেবার অকৃত্রিম আদর্শ ছিলেন। তাঁহার সঙ্গ আকর্ষণে বহুব্যক্তি শ্রীগুরুপাদনিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। আমাদের শ্রীগুরুদেবের কঠোর বৈরাগ্য-বেশের বাহ্য সম্বরণ তাঁহার ভিতর দিয়াই প্রকাশ পাইয়াছে ) **আরম্ভ। ওঃ সে কি দিন গেছে। মেঘলালের ভাইপো হরিপদর কি আবেশ তখন। নবদ্বীপে তখন সাগার স্কুল, সে তো কেবলই আবিষ্ট হোতো। তারপর একবার ঐ আবেশ নগর কীর্ত্তনে হয়, তাকে তো সমাজের** ( শ্রীবড়বাবাজী মহাশয়ের ) **সামনে ফেলে দিলাম, নাম চলতে লাগলো, ১২টা বাজলো, ছেলেরা তাকে নিয়ে নাম করতে লাগলো, আবেশ আর কাটে না। সে** ( শ্রীবড়বাবাজী মহাশয় ) **নিজের প্রকট খেলা দেখালে।**

বলিয়াই আরও কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। নিত্যসেবক নন্দদাস আসিয়া সামনে দাঁড়াইল, তাহাকে দেখিয়া শ্রীগুরুদেব যেন কেমন এক উদাসীর দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। শ্রীগুরুদেব সান্ধ্য-কৃত্য সমাপন করিতে বিলম্ব হইতেছে তাহাই জানাইবার জন্য যে সে বিনীতভাবে মৌন প্রার্থনা করিতেছিল, সেদিকে খেয়াল হইল প্রায় ৪।৫ মিনিট পর। শ্রীগুরুদেব ধীরে ধীরে উঠিলেন, স্বচ্ছন্দগতিতে গৃহে প্রবেশ করিলেন। ভক্তবৃন্দ শ্রীগুরুদেবের এই সন্ধ্যাকালীন সৌম্য আবেশমূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে প্রণাম করিয়া বাহিরে আসিলেন।

**কলিকাতা ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৬ সাল। সকাল ৭—৯॥ টা পর্য্যন্ত।**

গতকাল হইতে শ্রীগুরুদেবের ভাবসমৃদ্ধি যেন কি এক স্তরে রহিয়াছে, কখনও অস্থিরভাব, কখনও শান্ত, কখনও উদাস, কখনও উৎকণ্ঠায় পূর্ণ, আবার তখনই শিশুর মত খল খল করিয়া হাসিতে হাসিতে প্রসঙ্গ সঙ্গে কাটাইতেছেন। একবার বলিলেন **তিনি থাকতে** ( শ্রীবড় বাবাজী মহাশয়ের প্রকটকালে ) **গোপীই প্রথম এল,** আবার সেই প্রসঙ্গটির সমাপ্তি হইতে না হইতে সিঁথিতে শ্রীবড় বাবাজী মহাশয়ের লীলা-প্রসঙ্গের কথা। সে কথা অসম্পূর্ণ, হইয়া রহিল। আবার বলিলেন **মশাই একজনকে সাপে কামড়ালে আর একজনকে ঝাড়লে বিষ নামে? আমার চোখে হাত বুলোলে......**

প্রতিবারই কথা আরম্ভ হইতেছে, অসমাপ্ত অবস্থায় তাহা বন্ধ হইতেছে, "ন্যাড়ার মার বৈষ্ণবপ্রীতি, তাঁহার বাৎসল্যভাব" প্রসঙ্গটী যেই আরম্ভ হইল অমনি তাহা ভুলিয়া গিয়া কলিকাতার রামতনু বোসের লেনে সাপ খেলানোর কথা, তাহাও আবার রহিয়া গেল, নবদ্বীপের হরিবোল ঠাকুরের কথা, **...ওগো তার কাছেই তো গৌরহরিবোল শোনা,**

ওই ছাখো ভুলে যাচ্ছি। আবার সিঁথির প্রসঙ্গ, এইভাবে কিছুক্ষণ থাকিয়া হঠাৎ যেন আবিষ্ট হইয়া পড়িলেন, তাহার পরই অতি দ্রুত বলিতে লাগিলেন,—

## নিষ্ঠার চরম পরিণতি

নিষ্ঠা বস্তুতে তোমরা একপেশে করে নিয়েছো কেন? ইষ্ট বস্তুতে পরতত্ত্ব বোধই তো নিষ্ঠা গো, দেখনা, ওই যে গঙ্গায় ভেসে যাচ্ছিল পদ্মফুল ওমনি মনে জাগলো বড় চমৎকার তো, ওই এনে দিই; তখন তাঁর মনে আর কিছু জাগছে না, শুধু মায়ের রূপই মনে জাগছে, দিলেন ঝাঁপ, ফুলটী তুলে আনলেন, মায়ের চরণে দিতে গেলেন, ভেবে দেখা-নেই যে এফুল করও প্রসাদী কিনা, তারপর ভারী চিন্তিত হ'য়ে পড়লেন, একি এত ক'রে আনলাম আর সে নেই? আরও ব্যাকুলতা বাড়লো, ছট্‌ফট্ ক'রছেন দেখে সামনে এলেন, তিনিও ওমনি চরণে ফুল দিতে গেলেন, মা সে-ফুল হাতে ক'রে তুলে নিলেন, অবাক্, বল্লেন একি! তুমি এফুল হাতে নিলে কেন? মা বল্লেন ও ফুল যে আমার প্রভুর প্রসাদী, চণ্ডীদাস তো অবাক্ হ'লেন, বল্লেন, সে আবার কি! তোমার প্রভু কে?

এই বলিয়া শ্রীগুরুদেব আবিষ্টভাবেই ঢুলিতে লাগিলেন। শ্রীমুখের দুই ফাঁক দিয়া অল্প লালা ঝরিয়া পড়িল, উজ্জ্বল ঢুলু ঢুলু চক্ষু দুইটীতে এক আশ্চর্য্য জ্যোতি খেলিতে লাগিল। তদপেক্ষা উজ্জ্বল-স্নিগ্ধ কোমল হাসি সারা মুখমণ্ডলে ছড়াইয়া পড়িল। ঈষৎ অরুণ রঙের আভামণ্ডিত সহজ মুখচ্ছবিতে গাঢ় রাঙ্গা আবিরের চূর্ণ যেন কেহ ছড়াইয়া দিল। শ্রীগুরুদেবের বাহ্য আবেশ ধীরে ধীরে স্তব্ধ হইল। শ্রীগুরু-অনুগত এক প্রিয় ভক্ত ডাকিল—বাবা! উত্তর নাই, প্রায় ২।৩ মিনিট পর নিঃশ্বাস ঘন বহিতে লাগিল। উদাসীর চক্ষু দুইটী বাক্‌ভঙ্গীর আকার ধারণ করিল শ্রীগুরুদেব বলিলেন,—

হ্যাঁ, তারপর ''দেখ কি বলতে কি ভুলে যাচ্ছি। "যার মন্ত্রে বৈসে সকল মূর্ত্তির প্রাণ। সেই প্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চন্দ্র নাম॥" যার বস্তু বোধ হবে, তার আপনার জিনিষ চট্ ক'রে বোধ হবে, বাঃ বেশ খেলছো তো, এমনি ভোগ হবে। হ্যাঁ, মা বল্লেন, হ্যাঁ আছে; ব্যস তারপরে ধীরে ধীরে দোর খুলে দিলেন, বুঝলে তো? ইষ্টে পরতত্ত্ব নিষ্ঠা হলেই ঠিক্ হবে।

আরও বাহ্য আবেশ আসিল।

তোমাদের এখন হয়েছে ও ওমুক নিষ্ঠ, সে তমুক নিষ্ঠ, ও কেন গো, নিষ্ঠা শব্দটাই দেখ না, আর কিছু মনে জাগবে না, তবেই তো।

বলিতে বলিতে সমবেত অনুগতগণের প্রতি যেন একটা শক্তি সঞ্চার করিলেন।

এইভাবে একটি প্রসঙ্গের পূর্ণ সমাপ্তি হইল। এই সময় কেহ প্রশ্ন করিল, বাবা! এ যুগে ভগবৎ-সেবা খুব স্বচ্ছন্দে হয় কি? শ্রীগুরুদেব হাসিয়া একটু পরেই বলিলেন—

## বিগ্রহ সেবা ও সহজ রীতি

দ্যাখ, কথাটা তোমাদের কেমন কেমন ঠেক্‌বে। দামোদর গোস্বামীর কথা (শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীগোপাল ভট্টগোস্বামী শিষ্যবংশীয়) তিনি একদিন এই বিগ্রহ সেবা সম্বন্ধে ব'লেছিলেন, কেন তোমরা সেবা সেবা ক'রে ছট্‌ফট্‌ ক'রছো, ওতো দ্বাপর যুগের পরিচর্য্যা। বাবা, নাম সেবা কর, বিরোধ থাক্‌বে না। নামের ছাপা শরীরে রাখ, ঝোলায় রাখ, স্নান করাও, ভোগ দাও, চল যেখানে যাবে কোন ঝঞ্ঝাট নেই। আর ওই দ্বাপরের কাজে এলে কত বিঘ্ন, দুদিন পরই সেবা নিয়ে কেমন হয় দেখ দেখি···

বলিয়া খুব সাবধানী দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন।

এই সময় শ্রীগুরুদেবের সন্নিকটে অনুগত কয়েকজন আসিয়া শ্রীগুরুদেবকে প্রণাম করিয়া সম্মুখে ও পার্শ্বে বসিলেন। শ্রীগুরুদেবও তাঁহাদের দিকে ফিরিয়া চাহিলেন—সাধারণভাবে দু' একটি প্রসঙ্গ আলোচনার পর কথাপ্রসঙ্গে শ্রীগুরুদেব বলিলেন—"এরাজ্যে সবই প্রচ্ছন্ন, তাঁর আসাও প্রচ্ছন্নভাবে।" বলিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন। কেহ প্রশ্ন করিলেন—প্রাচীন মহাজনগণ সব যেন ঢাকাঢাকি চাপাচাপি ক'রে গেছেন, এতে কি বুঝবো? শ্রীগুরুদেব প্রশ্নের উত্তরে চাপা হাসিতে বলিলেন,—

## লীলায় আবরণ ও বিকাশ

ঢাকা থাকা দূরে থাক্‌, কাজ কি কম হ'য়েছে না হ'চ্ছে, ভোগের পরিণতি আর স্বরূপে তার দৃষ্টিতেই তো ভোগ হয়। যত ঢাকা পড়ছে তত বেড়েই যাচ্ছে, লীলা তো থামছে না, বেড়েই যাচ্ছে। বল দেখি দৃষ্টিশক্তি কত বড়। "প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁন্দে প্রতি অঙ্গ মোর।" ও যে নিত্যস্থিতি গো, নাম নামী যখন অভেদ তখন নামের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সে তো আর ঢাকা থাকে না। নামের স্বভাবেই তৃষ্ণা বাড়ে, আরও আরও বেড়েই চলেছে, বল দেখি ঢেকে কি রাখলে? রাধাকৃষ্ণ নামের ও তো জড়ান মূর্ত্তি, তা হলে গৌর নামেতে তো আরও। এ স্বরূপে যে দুটী স্বভাব আছে, ভোগ আর দাতৃত্ব। কৃষ্ণে ভোগ আছে, দাতৃত্বের বিকাশ নাই...........

এই পর্য্যন্ত বলিয়া আবিষ্ট হইয়া মুখখানি নীচু করিলেন। শ্রীগুরুদেব মালা জপ করিতেছেন আর বারবার সেই নামের আস্বাদনে মুগ্ধের ন্যায় হাসিতেছেন। একটু পরেই বলিলেন—"এ তো কৃপায় হয় গো।" আবার উচ্ছ্বাসভরে বলিলেন –

## লঙ্কার গাড়ী ও ঝাঁজ

শোনো গো শোন, ওই যে বদান্য বলা হয় তাকে, তা বদান্য কি নিজে না কেউ অন্য আছে, যে দেয়। ওকথা একবার কানে আসে, এখানে একদিন ওটী জাগলো,

নন্দকে বল্লাম—ওরে ওই যে সেখানে শ্লোকের ব্যাখ্যায় শোনা গেল "বদান্য" তার মীমাংসা হ'য়ে গেছে.........

বলিয়া বালকের মত সরল চাহনিতে চাহিয়া বলিলেন—

কী ব্যাপার জান? এই পোস্তা থেকে লঙ্কা বোঝাই একটা গাড়ী যাচ্ছিল। সে তো চলে যাচ্ছে, এদিকে তার ঝাঁজে চোখে নাকে জল আর হাঁচি। বোঝো দেখি, ভোগী ত ভোগ ক'রে গেল আর সবাইকার অজ্ঞাতে ভোগ দিয়ে গেল, দেখলে তো ভোগী জানে না কী হ'চ্ছে, কিন্তু সব হ'য়ে যাচ্ছে, দাতাকে তাই মহা-বদান্য বলে, তার কোন খবর থাকে না, দাতা নিতাই তার দ্বারা হয়...........

অজ্ঞাতভাবে অযাচিত-করুণায় দাতার দানের কথা বলিয়া আবার স্বচ্ছ হাসিতে সকলকে ডুবাইয়া দিতে লাগিলেন। এই সময় কেহ প্রশ্ন করিল—বাবা! দাতার অজ্ঞাতে যা হয় তা তো মহিমা বলা যেতে পারে, তাহলে মহিমায়······এক করি জ্ঞান,—এই প্রাচীনপদের সার্থকতা তো গুরুরূপে প্রকট বিহার?

সঙ্কোচের সহিত মুচকী হাসিয়া ঘাড় নাড়িয়া স্বীকার করিলেন—হাঁ। উপস্থিত ভক্তগণ সকলেই আনন্দে নিমগ্ন। আবার প্রসঙ্গক্রমে এক প্রিয় ভক্ত প্রশ্ন করিল বাবা! শ্রীগুরুস্বরূপের বৈশিষ্ট কি? আজ্ঞে সে স্বরূপে ছিল "ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকং।" এবার কি? শ্রীগুরুদেব প্রশ্ন শুনিয়া আনন্দে খল খল করিয়া হাসিয়া বলিলেন—এবার প্রীতির আগে "অ" লাগিয়ে দাও। অপ্রীতিতেই হবে, এবার গরজ বড় বালাই কিনা। আবার মধুময় খল খল হাসি, পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল—বাবা! এবার আমরাও তাহলে নিশ্চিন্তেঘুমোই। উপস্থিত ভক্তবৃন্দ আনন্দে হাসিলেন। তারপর শ্রীগুরুদেব বলিলেন—

—হ্যাঁগো হ্যাঁ, ঘুমোলেও রেহায় নাই, ভোগী দিনরাত ভোগ ক'রছে, আর আশপাশে যারা আছে তাদিকে কি ঘুমিয়ে থাক্‌তে দেবে? ওই লঙ্কার গাড়ীর স্বভাব দেখাবে, এবারকার বৈশিষ্ট্যই ওই...........

বলিয়াই হাসিলেন। একটু পরেই আবার যেন ভাণ্ডারের আর একটি দরজা খুলিয়া দিতে দিতে করুণাময় শ্রীগুরুদেব বলিলেন—

## ধান, চাল, ভাত।

দেখ, গোবিন্দ কুণ্ডের শ্রীকৃষ্ণদাস বাবাজীর ভোগের সিদ্ধান্ত কেমন—তিনি তো কোথাও যেতেন না, কেবল শ্রীচরিতামৃত পাঠ করতেন আর কেউ গেলে বল্‌তেন—ধান, চাল, ভাত, রাম, কৃষ্ণ, গৌর ওখানে ছড়ান, ওখানে সিদ্ধ; এখানে তৈরী।

শ্রীগুরুদেবের মধুময় কথা শ্রবণ করিয়া তাঁর এক প্রিয় ভক্ত প্রশ্ন করিল—আচ্ছা বাবা! মধুর গৌরলীলা কেমন করে ভোগ করা যায়?

## নামে ভোগ করান।

কেন শুধু নাম নিলেই তো হয়, ওতেই অধিকার, ওতেই প্রাপ্তি। সে তো স্বাধীন হয়েও স্বাধীন নয়, ভোগ করান তাঁর গরজ, কৃপায় আশা তো তার। মধুসূদন গোস্বামী ব'ল্তেন, পতিত পাবন তো, তা পতিতের মত থাক সে পাবন।

এই পর্য্যন্ত বলিয়া কি যেন বলা বাকি রহিল, বলিবার জন্য ব্যাকুলতা আসিল, দ্রুত বলিয়াও ফেলিলেন—

## সব পাওয়ার সেরা।

এ পাব, সে পাব, এ নজর কেন? আমার কিছু দরকার নাই, ব্যস, চুপচাপ থাক, যাকে গুরুরূপে পেয়েছি ওই তো সব। দেখ না, যা পাওয়া গেছে তা চাওয়ার সঙ্কল্পও কি স্বপ্নে ছিল, তবে?...নিজের অবস্থা ভাবলেই ঢের হবে, যা পাওয়া গেছে তা কি পাবার দাবী করার মত কিছু করা হয়েছে?

বলিতে বলিতে নিজ পরমারাধ্য শ্রীগুরুদেবের অযাচিত করুণার কথা স্মরণ করিয়া প্রেমাবেশে বিহ্বল হইলেন। ভক্তবৃন্দ শ্রীগুরুদেবের এই কথাগুলি শুনিতে শুনিতে কাঁপিতে লাগিলেন। সকলের উপরেই যেন প্রকট শ্রীগুরুস্বরূপের অফুরন্ত করুণার ধারা ঝরিতে লাগিল। নয়টা বাজিয়া গেল। শ্রীগুরুদেবের স্নান, আহ্নিকের সময় হইল ভাবিয়া ভক্তবৃন্দ একে একে প্রণাম করিয়া বাহিরে আসিলেন।

---

**কলিকাতা ৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৬ সাল।** **সকাল ৭—৯॥ টা পর্য্যন্ত।**

প্রভাতীয় কীর্ত্তন সমাপ্ত হইয়াছে, নামের স্থানে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া শ্রীগুরুদেব এইমাত্র আসিয়া বসিলেন। অনুগতবৃন্দ এতক্ষণ শ্রীগুরুদেবের পিছনে থাকিয়া তাঁহার অনুগমন করিয়া প্রণামাদি করিতেছিলেন, পরে তাঁহারাও শ্রীগুরুদেবকে ঘিরিয়া বসিলেন। এক্ষণে শ্রীগুরুদেব সর্ব্বদাই ভাবাবিষ্ট থাকেন। উষার পূর্ব্বে নিদ্রা ভঙ্গ হইতে রাত্রে শয়ন পর্য্যন্ত আনমনা, একা একা থাকিতে চান, কেহ কাছে আসিলে উদাসীর মত থাকেন। কেহ কথা কহিলে বিস্মিতভাবে চাহিয়া থাকেন, কেহ কিছু নিবেদন করিবার জন্য দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে চম্‌কিয়া উঠেন, থতমতভাবে আধ আধ ভাষায় অথবা অসম্পূর্ণভাবে, কিংবা অন্তরের ভোগপূর্ণ অবস্থায় উত্তর দেন। কোন কোন দিন বাহ্য

আবেশে কথা বলেন, যেমনটী আজ ঘটিয়াছে, কেহ প্রশ্ন করিল—বাবা! নাম করার নিয়ম কি? সব ভুলে গিয়ে ক'রতে হবে, না, যা আছে তাই নিয়ে ক'রতে হবে? একটু গম্ভীর ভাবেই উত্তর দিলেন—

## নাম গ্রহণ ও নিয়ম

**যে অবস্থায় থাকা যায় সেই অবস্থাতেই নাম করা হয়। দেখ তিনি তখন ওখানে,** ( শ্রীবড়বাবাজী মহাশয়ের প্রকটকালে ) **প্রেমদাস পাঠ ক'রছে, সে ব'লছে নাম ক'রতে হ'লে আগে যোগ্যতা চাই, তবে নাম ক'রবে, একথা কেউ এসে তাঁকে ব'ল্লে, শুনেইতো বল্লেন ডাক্ তাকে, হ্যাঁরে জলে না নেমে আগেই সাঁতার শিখবেতো নাকি রে?**

সর্ব্বশক্তিমান "নাম" পতিত-জীবে করুণায় যোগ্যতা দিয়া নাম করাইয়া লইবে; এই ভাবে বলিয়াই আবার একবার উদাসীর মত সকলের দিকে চাহিয়া একটু পরেই বলিলেন--

**দেখ জড় জিভ কি পারে? তিনি তো নিজের শক্তি দিয়ে করান্, তাইতো কোন মহৎ কৃপা চাই, তাও কোন কৃপাসিন্ধের কৃপা চাই।**

বলিয়া আবেশভরা চক্ষু দুইটীতে ঢুলুঢুলুভাবে চাহিয়া রহিলেন; একটু পরেই বলিতে আরম্ভ করিলেন—

## নাম ও ভক্তির পরামর্শ-সভা

**শোন শোন, তাঁদেরও এমনি পরামর্শ-সভা ব'সেছিল, বিচারে কি হয় গো? এঁরা সবাই ব'সেছেন, শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু ব'ল্লেন—এমনি ক'রে ভক্তি ক'রলে তবে হ'বে, তারপর শ্রীবাস পণ্ডিত আর এক ব্যবস্থা দিলেন। এমনি আরও অনেকে অনেক রকম ব্যবস্থা দিলেন—শেষে অবধূত ব'ল্লেন, হ'লো আপনাদের জীব উদ্ধারের ব্যবস্থা? শেষে নিজে ব'ল্লেন, ওই সব বিধি নিষেধের গণ্ডীতে জীব উদ্ধার হয়েছে আর কি! ওসব কি এই কলিতে পারে? আগে দিতে হবে যেচে গিয়ে, তারপর তোমরা গিয়ে শুধরে নিও।**

জীবের দুর্দ্দশা দেখিয়াই পরমকরুণাময় শ্রীমন্‌মহাপ্রভু সর্ব্বথা অসমর্থ কলিজীবে নিজ করুণা শক্তি দান করিয়াছেন; সেই করুণা শক্তিতে শক্তিমান হইয়াই জীব নাম-গ্রহণে সমর্থ হইয়াছে ও নামগ্রহণে এবার বিধি-নিষেধ দেন নাই। "সর্ব্বশক্তি নামে দিলা করিয়া বিভাগ" এইভাবে প্রসঙ্গটী বলিয়াই চুপ করিয়া রহিলেন। ভাবে মুখখানি নীচু হইল। নামমালায় সংখ্যা রাখিলেন, সর্ব্বাঙ্গ পুলকে ভরিয়া উঠিল। একটু পরেই করুণাময় প্রভু আবার ভক্তবৃন্দকে বলিলেন—

## খাইতে শুইতে নাম।

ছাখ তাঁদের সব কেমন ব্যবস্থা, নাম ছাড়া থাকা হয় না, খাইতে শুইতে নাম, যেমন নিত্য নাম-কীর্ত্তন, প্রসাদ পাওয়ার সময়ও তেমনি নাম-কীর্ত্তন ধ্বনি করা হয়। কথা এই যে, নামপ্রসঙ্গ ছাড়া খাব না।

এইভাবে মহৎকৃপায় নিয়ত নাম-প্রসঙ্গে অবস্থিতির কথা বলিতেছেন, এমন সময় আমাদের আশ্রমবাসী কোন ভ্রাতা কোন ভাইয়ের প্রতি অভিযোগ করিলেন। শ্রীগুরুদেব নিরপেক্ষভাবে উত্তর দিলেন—

## ত্যাগীর ত্রুটী লোকনিন্দা।

হ্যাঁ, আসন তো ব্রহ্মচারীর. 'সন্ন্যাসীর অল্প ছিদ্র সর্ব্বলোকে গায়' শাসন মহাপ্রভুর ওপরেও হ'য়েছিল, ওই যে ছেলেটিকে ভালবাসতেন, তাইতো বলা হয়, সর্ব্বদা মুখের পানে চেয়ে থাকবে।

বলিয়া আবার শ্রীগুদেব আশ্রমবাসীর রীতি-নীতির কথা প্রসঙ্গে বলিলেন।

## অনুশীলনের স্থান আশ্রম।

আশ্রম তো অনুশীলনের স্থান, তা যদি না হয় তবে ঘর বাড়ী ছেড়ে আসা কেন? এ বড় বিষম ঠাঁই, এ সংসার প্রভুর সংসার। এখানে সকলেই প্রভুর সেবক, তুমি এলে প্রভুর আকর্ষণে; তা'হলে দৃষ্টিটা কোথায় রাখতে হবে? নিজের স্বরূপকে কি ভাবতে হবে? যা পাওয়া গেল এটা তো কারও দান, যে দান করলে দাতার স্বভাব কি? দাতার সংসারে সবাই তাঁর সেবক। তাহলে দাতা আর সেবকের সঙ্গে কি সম্বন্ধ রাখতে হবে? এই সব অনুশীলন করা সংসারে বড় কঠিন, তাই না তিনি কৃপা ক'রে এনেছেন। তা হ'লে আমার স্থান কোথায়? আশ্রমে বাস ক'রতে ক'রতে এই সব নজরে না এলে বিপরীত ফল, তখন দণ্ড কঠিন হয়।

আশ্রমে নিয়ত সেব্যের সুখবিধানে তৎপর হইয়া সেবকের অবস্থিতির কথা বলিয়াই শ্রীমুখে করুণার চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল, একটু উদাসীর হাসি হাসিয়া বলিলেন—

## নকল ও মঙ্গল

সে ব'লে গেল ( শ্রীবড়বাবাজী মহাশয়ের উক্তি ) কাকেও কিছু বলিস্ না, নিজে পারিস্ তো করিস্। নকলও যদি কেউ করে তবু মঙ্গল হবে। সে তো ভাই বলেই সব বোলতো! পরে সব স্বভাবে দাঁড়ায়........

অস্পষ্টভাবে বাকীটুকু বলিলেন।

কেহ জিজ্ঞাসা করিলেন বাবা! সাধন কি জিনিষ? তদুত্তরে শ্রীগুরুদেব বলিলেন—

## সাধন বেড়া

গাছ পুঁতে বেড়া দিতে হয়, পুষ্ট হ'লে ব্যস্! সাধন তো বেড়া, আলগা হ'লেই গাছ নষ্ট হয়।

বলিয়াই আবার করুণা করিয়া একটি প্রসঙ্গে অক্ষুণ্ণভাবে ভক্তি-যাজনে নিয়ম-শৃঙ্খলার বেড়ার স্থৈর্য্যে নিজের সাধন-অবস্থায় শাসনরূপ পাহারার দ্বারা ভজনে উন্মুখতার কথা বলিলেন,—

## বন্ধু প্রসঙ্গে শাসনস্মৃতি

জান, তার সঙ্গে তো ঢের দিন থাকা হয়েছিল, (প্রভু জগদ্বন্ধুর সহিত) তখন সেখানে (শ্রীবৃন্দাবন) প্রসাদ আনা হো'লো। অমনি ব'ল্লে মেয়েমানুষ ছুঁয়েছিস্? রাখ, প্রণাম কর, ব্যস তাই করলাম। দেখ দেখি কি শাসন! আর তার সঙ্গে সঙ্গে মর্য্যাদা বোধ। তখন যদি চর্ব্ব্য চোষ্য ক'রে সেগুলি পেত, তা'হলে আমরাও শিথিল হ'য়ে পড়তাম। শাসন ছাড়া হ'লেই স্বভাব বেরিয়ে পড়ে। তাই কথা হ'চ্ছিল, সাধন হো'লো বেড়া, শাসন হো'লো পাহারা। প্রথম প্রথম বেড়া দিতে হয়, তারপর পাহারাও দিতে হয়। এ, ও না এ'সে নষ্ট ক'রে দেয়। পুষ্ট হ'য়ে গেলে তখন দেখবে যাদের ভয়ে বেড়া তারাই আশ্রয় পাবে। গাছও ঠিক্ থাকবে, তবুও নজর চাই প্রবল শত্রু না এসে নষ্ট ক'রে দেয়। তখন আবার কঠিন বেড়া, কঠিন পাহারা।

বলিয়াই মৃদু হাসিলেন। সর্ব্বাঙ্গে উজ্জ্বলতা আরও বাড়িয়াছে। সময়ে শ্রীগুরু-কৃপা-প্রদত্ত নিজ আচরণ আজ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। ব্রহ্মচর্য্য ও সাধনা প্রকটরূপ পাইয়াছে। উচ্ছ্বাসভরা মনের ভাষা বাহিরে প্রকাশ হইল—

## সাধারণের কল্যাণ ও গোপন এবং ক্লেশ স্বীকার

শোনো শোনো, ওই জন্যে সিদ্ধপুরুষরা নিজের আচরণ গোপন ক'রে গেছেন। কী অদ্ভুত অবস্থা দেখ দেখি। বাইরে সাধক দেহ, অন্তরে তো সিদ্ধ দেহ। দেখ দেখি কী বিরহ ভোগ করেছেন তাঁরা; সামনে এলেন শ্রীকৃষ্ণ অধরামৃত, কিন্তু নিজের আচরণে চাই সাধারণের কল্যাণ, বিধিনিষেধের বেড়া। কেবল সাধারণকে রক্ষার জন্যে এত ক্লেশ স্বীকার, অনধিকারী পাছে বিপন্ন হয়। কৃষ্ণ আর কৃষ্ণ-প্রসাদ তো অভিন্ন, তাও হয় তো ব্রজে আছেন, তবুও বিরহ ভোগ ক'রছেন। এত কঠোর হ'য়ে সে বিরহ প্রবলভাবে ভোগ ক'রছেন। এদিকে দেখ আর আর একটি দশা—পুরীতে শ্রীসার্ব্বভৌমের শালা, গৌড়-ভূমি থেকে সকলে গৌর দর্শন ক'রতে গেছেন, প্রসাদ সঙ্গে গেলেন, সার্ব্বভৌম বল্‌ছেন—তীর্থে এসে আগে তীর্থের কাজ উপবাস। তারপর ক্ষৌরকর্ম্ম, আচ্ছা! যা কিছু সব এঁদের কেন? গোপীনাথ বল্লেন, হ্যাঁ ও হো'লো কৃষ্ণের পরোক্ষ আজ্ঞা শাস্ত্ররূপে, এঁরা ছাড়বেন কেন? শ্রীগৌরের নিজ হাতে দেওয়া কৃষ্ণ-প্রসাদ। তবুও…… ..

বলিতে বলিতে ভাবমুগ্ধাবস্থায় স্থির হইয়া রহিলেন। গণ্ড দুইটী আবেশে ফুলিয়া উঠিল। সর্ব্বাঙ্গে পুলকে ভরিয়া উঠিল, চক্ষু দুইটী ভারি হইল। ধীরে ধীরে বলেলেন—

## নকলের সহজ ও কঠিন দিক

**মহতের সহজ কাজটির নকল হ'য়ে যায়, কঠোরতার দিকে মনে সঙ্কোচ, সে কি গো আপন ব'লে সম্বন্ধ হ'লে কী সহজ কঠিন মনে থাকে?**

বলিয়াই চুপ করিয়া রহিলেন, এমন সময় কেহ বলিলেন—ওমুক দাদা (ইনি দাদা না হইলেও আমরা অনেকেই দাদা বলি, তিনি গোস্বামী বলিয়া সাধারণতঃ পরিচিত।) দর্জ্জিপাড়ায় রাসব্যাখ্যা করছেন। শুনিয়াই বলিলেন—

## রাসলীলা শোনা

**হুঁ, রাস ব্যাখ্যা, তা রাসে তুমি সেখানে কে? দেখ আগে আগে নীলকান্ত গোস্বামীর রাসব্যাখ্যায় আধ্যাত্মিকভাব থাকতো, সে ভাল করতেন, রাসের ব্যাখ্যা কে বুঝবে? রাস কি জিনিষ, তোমায় সেখানে অধিকার দিলে কে যেতে? বাবা! অনায়াসে যা হজম হয় তা কেউ রাজী নয়। আরে গুরুদ্রব্য খেলে যে রোগে মরবে, ও রাজ্যের জিনিষ হজম করা সহজ নয়।**

বলিয়া গম্ভীর হইলেন। এমন সময় ঘড়িতে ৯॥ টা বাজিল সকলে বুঝিলেন আর প্রসঙ্গে থাকিলে বাবার স্নান আহ্নিকে বিলম্ব হইবে—উঁহার তো খেয়ালই নাই। পরে প্রসাদ পাইতে অনেক দেরী হইবে, বাধ্য হইয়াই অতৃপ্ত-মনে সকলেই প্রণাম করিয়া বাহিরে আসিলেন।

---

**১০ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৬ সাল।** **কলিকাতা, সকাল ৭টা—৯॥ পর্য্যন্ত।**

প্রভাতের নিত্যকৃত্য একরূপ সমাপ্ত হইয়াছে, কিন্তু শ্রীগুরুদেব বসিতেছেন না, একবার হলঘরে, একবার নিজের বসিবার ঘরে পায়চারি করিতেছেন, কি বলিতে চান বলিতেছেন না, কি করিতে চান জানাইতেছেন না, ছাদের দিকে এক এক বার চাহিতেছেন, হাতে নামমালা, কাঁধে দোপাট্টা সাদা গাঁতিচাদর, শ্রীমুখে মৃদুহাসি, চক্ষু দু'টীতে আগ্রহ ও প্রতীক্ষা। একটু পরেই বুঝা গেল শ্রীগুরুদেব কেন এইভাবে রহিয়াছেন। একটি বৃদ্ধ

ভদ্রলোক অত্যন্ত ব্যগ্রতার সহিত উপরে আসিলেন, করযোড়ে শ্রীগুরুদেবের সম্মুখে দাঁড়াইলেন, শ্রীগুরুদেব তাঁহাকে দেখিয়াই ঘরের কোণের দিকে সরিয়া গেলেন। যেখানে একটি টেবিল ও তাহার উপর বহু ভগবৎ চিত্রপট এবং দেওয়ালেও নানারূপ আলেখ্য। শ্রীগুরুদেব একবার এদিক ওদিক চাহিলেন, কোন সেবক কাছে নাই, দূরে নিত্যদর্শনার্থী অনুগতবৃন্দ। শ্রীগুরুদেব অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সহিত টেবিলের উপরের আসনটীর তলায় বাম হাতটী দিয়াই কিছু অর্থ বাহির করিলেন, ৩ খানি দশ টাকার নোট; তেমনি ক্ষিপ্রতার সহিতই আগাইয়া আসিয়াই সেই ভদ্রলোকটীর হাতে দিয়াই ডানদিকের হলঘরের দরজা দিয়া বাহির হইয়া সেখানে অত্যন্ত চঞ্চলভাবে পায়চারি করিতে লাগিলেন যেন কি অভীষ্ট কার্য্যই না গোপনে সারিয়াছেন, অস্পষ্টভাবে বলিলেন—"**তারই জিনিষ সেই** আসে, **দেয়ও মারফতে, আমির ঠাঁই নাই।**" বলিয়াই নিজের বসিবার আসনের দিকে আসিলেন। এইরূপ গোপনেই অর্থ ও পরমার্থ দান নিত্যই হয়। এইবার নিশ্চিন্ত মনে ঘরে আসিয়াছেন, দু'একবার ঘুরিয়া ফিরিয়া আসনে বসিলেন, অনুগতবৃন্দও শ্রীগুরুদেবকে ঘিরিয়া বসিলেন প্রসন্নমনে প্রসঙ্গ সঙ্গ দান করিতে লাগিলেন, দু'একটী কথার পর বলিলেন—

## আঁখর-স্ফূর্ত্তি

**খিদিরপুরের ঘাটে ভাদাবলীর বাবাজী মহাশয়ের দর্শনে যাওয়া হয়** (শ্রীগোপাল দাস বাবাজী মহাশয়) **সেখানেই শ্রীরূপের হৃৎকেতন এই সব আঁখরের স্ফূর্ত্তি হয়**.........

বলিয়াই আরও দু'একবার তাঁরই নাম উচ্চারণ করিলেন, ব্রজের ঘটনাগুলি অতি দ্রুত বলিলেন, তাঁরই কথার আবেশে ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন, একটু পরেই বলিলেন—

## এ বারের বিপরীত খেলা

**দাতার স্বভাব দান করা, হেতু নাই, যুক্তি নাই, পাত্রাপাত্র বিচার নাই, প্রচ্ছন্ন স্বভাবে আসা, প্রচ্ছন্নভাবেই সব কাজ সারা। স্বরূপে, আবরণে, কাজে, সবই প্রচ্ছন্ন, রূপে মিল করতে গেলে ঠকে যাবে। কাজে মিল করে নাও ঘরে বসে সব পাবে। যেগুলো ঘটে যাচ্ছে সেগুলো কি সোজা? কলির জীব সর্ব্বদাই ভুলে থাকা স্বভাব। খাওয়া পরা নিয়ে ব্যস্ত, তাদের কি এ রাজ্যে আসা সোজা? তাই প্রচ্ছন্নভাবে আসা, ওই ওর ভেতর দিয়ে ঢুকে সম্বন্ধ করিয়ে নিতে হবে, যেচে দিতে হবে, তবে কাজ হবে। এবারের খেলা সবই বিপরীত। কর্ম্মকাণ্ড জ্ঞান-কাণ্ডের বিধি নিষেধ, অধিকারী অনধিকারী কিছু দেখলে চলবে না, দেখতে গেলে পাবে না, দাতার করুণার ঠাঁই হবে না**.........

অযাচিত করুণায় দাতার দানের কথা বলিয়াই কেমন এক বিস্ময়করভাবে চুপ করিয়া রহিলেন। কথাপ্রসঙ্গে সূচক-কীর্ত্তনের কথা উঠিল, শ্রীগুরুদেব বলিলেন—

## সূচক-কীর্ত্তনে শক্তিলাভ

সূচক-কীর্ত্তন তো স্মরণ করা, তোমাদের ব্যবহার রাজ্যে শোচক বা শোক প্রকাশ। ভক্তের বিরহই তো সবচেয়ে দুঃখের, তাইতো শোচক! ওই সব দিন স্মরণ ক'রে কীর্ত্তন করলে তজ্জাতীয় শক্তিলাভ হয়। যদি কেউ অন্য ব্রত নাও পারে কিন্তু শোচক-কীর্ত্তন স্মরণ বা পাঠ করা দরকার, তাতে ঢের পাওয়া যায়।

এইভাবে সূচক কীর্ত্তনে শক্তিলাভের কথা হইতেছে নিত্যসেবক আসিয়া বলিয়া গেল বৃন্দাবনের সেই মহান্ত মহারাজ আসছেন। শ্রীগুরুদেবের ইঙ্গিতে তাঁর সম্মুখে একটী আসন পাতা হইল, এইক্ষণেই এই ঘটনাটীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—

## বৈষ্ণবের আগমনে

বৈষ্ণবের আগমন, অল্প ভাগ্যে হয় না। "বৈষ্ণব সঙ্গেতে মন আনন্দিত অনুক্ষণ," তাঁদের আগমনে তো সেই প্রসঙ্গে দিন যাবে, মনে ক'রতে হবে—আমার স্বভাব তো ভুলে থাকা, তাঁরা এলেই কৃষ্ণকথা হবে, এক্ষুনি শুনতে পাব। আজকাল হয়েছে আর ফ্যাসাদ, এলেই চালডালের হাওয়া। কি ব'লবে অন্য জায়গা দেখ? কেন দাও না, কণা দাও, খবরদার "আমার" ঠাঁই রেখ না, এখানে "আমার" স্বাধীনতা রেখ না, বিপদে পড়বে, এই যে সব হচ্ছে, (উৎসব প্রভৃতি) এগুলো কি তোমার চাল-ডালের জন্যে?

বলিয়াই হাসিলেন

স্নেহ-করুণাভাজনদের উপর সপ্রণয় চাহনিতে আবার একটী প্রসঙ্গ বলিলেন—

## শ্রীধাম কলিকাতা

হ্যাঁগো, সেইজন্যেই তো ক'লকাতায় থাকা, তিনি ব'লতেন ক'লকাতা হোলো শ্রীধাম, সেজেগুজে কে আমার সঙ্গে ভাব ক'রতে আসবে। সেইজন্যেই এখানে আটকে গেছে, নইলে এই ৫৩ বছরটা কাল এখানে থাকা কেন?

কেহ জিজ্ঞাসা করিলেন—সংসারে থেকে এরাজ্যের পথে আসা বড়ো ঝামেলা, নানা বিঘ্ন। তদুত্তরে শ্রীগুরুদেব বলিলেন—

## সংসারের ওজন

দেখ সংসারের বাইরে যারা থাকে তারা সংসারের ওজন বোঝে, ওর ভেতরে থাকলে কি হয়? হয় না, সে আমায় ব'লতো (সখীমার কথা) রেলের প্রেম, ছুঁ ছুঁ বাবা! বলগে যাও, ও কিছু বিচার এলেই স'রে পড়তাম, শেষটা কি ওপরের দিকে বিচার আসবে? সেই ভাকে নিয়ে ওটা খুব ভোগ হোয়েছে (শ্রীজগদ্বন্ধুর প্রতি)।

এই পর্য্যন্ত বলিয়া একবার হাতের নামমালা রাখিয়া উঠিলেন। তারপর আবার নিজ আসনে আসিয়া বসিলেন। এবার কেবল বহির্বাসখানি পরিয়া বসিলেন। উজ্জ্বল শ্যামচিক্কণ লাবণ্যেভরা প্রশস্ত সুকোমল বক্ষখানিতে সকলেরই দৃষ্টি পড়িল। গৃহে এক দিব্য গন্ধের বাতাস বহিতেছে। শ্রীগুরুদেব আবার মালা হাতে লইয়া প্রসন্নমনে অনুগতবৃন্দের সহিত প্রসঙ্গ করিতে লাগিলেন।

## কলিরাজের সুযোগ

দেখ একটা কথা মনে জাগছে। কলিরাজ কেবলই সুযোগ খুঁজছেন, এক ফাঁক পেলেই ঢুক্‌বেন। নামপ্রসঙ্গ ছাড়া অন্য কথা অন্য সুরে মত্ত হ'লে কলিরাজের কি দোষ? তাঁকে তো সন্ধান দেওয়া হোলো, তিনি তো আসবেনই, তিনি তো আর জোর ক'রে আসছেন না, তুমিই তো তাঁকে ডাকছো। এই দেখ না, অষ্ট প্রহর, চব্বিশ প্রহর নাম-সংকীর্ত্তন হয় তাতেও কত সুরের ল্যাঠা। এই এখুনি এক সুর আবার তখুনি আর এক সুর, নামে আবেশ নাই সুরে আবেশ, তারপর আছে আর এক ফাঁক, কারু কওয়া কথা কওরে বাপু, তাতেও তো কওয়া লোকের ওপর আবেশ আসে। তার অবস্থা নজরে আসে, তা নয় নাম পড়ে রইলেন, সুরের নাচন এলো, তার ওপর প্রতিষ্ঠাবশে আঁখর ছড়ান। কলিরাজের দোষ দিয়ে কি হবে? দুর্দ্দৈব কি তিনি ঘটাচ্ছেন? তুমিই তো তাঁর আসবার পথ ক'রে ডাকছো। কি বলি বল।

নামে আবেশ নাই সুরে আবেশ, এই সুযোগে কলিরাজের প্রবেশ; এই ভাবে প্রসঙ্গ বলিয়াই কোমল-কঠোর চাহনিতে সকলের মুখপানে আর একবার চাহিলেন। নাম গ্রহণের অন্তর-বাহিরের রীতি জানাইলেন। আর একটু কড়া শাসনের ভাষায় বলিলেন—

## উল্টো চাপ

তোমার কাজে বাধা দিলেই তুমি উল্টো হ'লে, ওমনি তাঁকে চেপে ধরলে, শেষটা আপন স্বভাব তার ওপর চাপিয়ে তাই-ই দেখতে লাগলে (অর্থাৎ নিজের বিকৃত স্বভাব শ্রীগুরুর উপর আরোপ করিয়া তাহার বিক্রিয়ালক্ষেই আসিতে লাগিল) এদিকে পাঠ করছো ········বিক্রিয়া যদি দেখহ কখন, সে কি গো? নন্দসুত হরির আবার বিক্রিয়া কি? এই দেখ কেমন ক'রে আসে। এই তো কাজের হিসেব নাকি বল? মনে এখন জাগছে কল্যাণের রাস্তাটায় চাপা প'ড়বে নাকি?······

তাই মহাজন বলেন—

"গুরুর বিক্রিয়া যদি দেখহ কখন।
তথাপি অবজ্ঞা নাহি কর কদাচন॥"

"শ্রীগুরুদেবে বিক্রিয়া নাই", আপন দোষে কখনও ভুল দেখিলে কল্যাণের রাস্তা চাপা পড়ে—এই কথা বলিয়াই উদাসীর দৃষ্টিতে সম্মুখের খোলা দরজার দিকে চাহিলেন। এই সময় এক প্রিয়জন শ্রীগুরুদেবকে বলিল—বাবা! আমাদের ওমুককে কেউ এসে খুঁজছেন, শুনিয়া খুব গম্ভীর ভাবে উত্তর দিলেন—

## কার্য্য কারণ

**বীজ ছাড়া গাছ হয়? কারণ ছাড়া কি কার্য্য হয়? সে বীজ ছিল তাই এখন তার গাছ হ'য়েছে, গোপনে সে বীজ রোপন করা হ'য়েছে, আহার ব্যভার চোখাচুখিতে তাকে বাড়ান হ'য়েছে, সে সব যাবে কোথায়? যার বেশী, সে গ্রাস করে, যার কম, সে ভোগে, শেষটা এখন মর বেটা তুই। আমায় কোন কথা জিগ্যেস ক'রো না।**

বলিয়াই চুপ করিলেন। আজ্ঞে বীজে গাছ হ'য়েছে ঠিকই, তবে তাতে ফুল ফল যাতে না হয় তা'তো ক'রবেন? তারপর সে গাছ যাতে শিকড় শুদ্ধু উপ্‌ড়ে যায় তাও আপনি করবেন। শুনিয়াই শ্রীগুরুদেব বলিলেন—

## দায়ে প'ড়েছেন

**হ্যাঁ আমার দায় প'ড়েছে, হুঁ, দশ ইন্দ্রিয়ে করে পাপ জীবের গলায় দড়ি, কি সম্বন্ধ রেখেছে সে, কি করেছি তার, কি দায়ে প'ড়েছি যে আমায় ভুগতে হবে?**

বলিয়াই অন্তর কাঁদার ভাবে মুখ ফিরাইলেন বাহ্যতঃ দৃঢ় ভাব। আজ্ঞে আপনিই তো দায়ে প'ড়েছেন, দায়ে না প'ড়লে আমাদের এত আঘাত স'য়েও কেন আপনি বুকে ধ'রে রেখেছেন? দায়ে পড়ার গরজ তো আপনারই। শ্রীগুরুদেবের চোখে জল, সে রাঙা রঙ নাই, করুণার ঝরণা নামিয়াছে। শ্রীগুরুদেবের অপলক-দৃষ্টি, সারা শরীরে মৃদু কম্পন ও পুলক, আশ্রিতের দুর্দ্দৈবে আঘাত হানিয়াছেন, প্রারব্ধের মূল ধরিয়া নাড়া দিয়াছেন; অভিমানে মুখ বুক কাঁপিল, স্নিগ্ধ, অতি করুণ-কোমল কণ্ঠে বলিলেন—"বল এদিক ওদিক কোথায় র'য়েছে" বলিয়াই উঠিয়া পড়িলেন, নাম মালা রাখিলেন। শ্রীগুরুদেব শান্ত, কোমল, গম্ভীর হইলেন। সকলে ক্ষুব্ধ মনে বাহিরে আসিলেন। কেহ নিকটে যাইয়া প্রণাম করিতে সাহস করিলেন না। দূর হইতে প্রণাম করিয়া বাহিরে আসিলেন।

---

৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৬ সাল।　　　　কলিকাতা, সকাল ৭টা—৯-৪০ পর্য্যন্ত।

শ্রীগুরু স্বরূপের নিত্য ও অপ্রাকৃত দেহের উপর যেটুকু আবরণ, বিকার হয় উহা জীবের প্রতি করুণার জন্য, এই আর একটি দিক, কেহ হয়ত বিষ ফোঁড়ায় কষ্ট পাইতেছে, দেহের আবেশে ইষ্ট-স্মরণে তাহার বাধা হইতেছে, যন্ত্রণায় কাতর হইয়া পড়িয়াছে, তাহা স্মরণ করিয়া কিংবা প্রত্যক্ষ করিয়া করুণাময়ের দেহের উপর আবরণ, বিকার পড়িয়াছে, তাই হইয়াছে ফোঁড়া, তবুও শ্রীগুরুদেবের অবিচল স্বভাব, শান্ত করুণাময় মূর্ত্তি, মৃদু হাসি, নিত্যকৃত্যে নিয়মিত ধারায় অটুট, এতটুকু পরিবর্ত্তন হয় নাই। প্রভাতের সমস্ত কৃত্যই সমাপ্ত হইয়াছে, তারপর অনুগতবৃন্দের প্রভাতী কীর্ত্তন শুনিতেছেন, মাঝে মাঝে বিহ্বল হইয়া পড়িতেছেন, কীর্ত্তনান্তে যথা-স্থানে প্রণাম বন্দনা সমাপন করিয়া আসিলেন। ভক্তবৃন্দ দেখিতেছেন—শ্রীগুরুদেবের হাতে নাম মালা কিন্তু ঝোলা নাই, অঙ্গে মাত্র ক্ষীণ বহির্বাসটুকু, দক্ষিণ হাতটি বড় ক্লান্ত, ধীরে ধীরে মালার গ্রন্থিতে অঙ্গুলী স্পর্শ পাইতেছে। শ্রীগুরুদেব সকলের দিকে প্রফুল্ল দৃষ্টিতে চাহিয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন—

## এবার রাসস্থলী পথে ঘাটে মাঠে

দেখ মালার ঝোলা তো রাসস্থলী, তা আর সীমাবদ্ধ নেই, কেবল কি যমুনা পুলিনে? না, তা হলে তো তোর বিশেষ সীমা থেকে যায়, এবার যে হাটে মাঠে পথে, নামের রাসস্থল, তা হ'লে আর ঝোলাই বা হয় কি ক'রে? নাম নামী তো অভিন্ন, নামী তো আনন্দময়, সদাই মৌজী, মহারাস বিলাস তো সেই নামীরই, নামীর রাসবিলাসের স্থলইতো রাসস্থল, সেইখানেই তো ওই দশমী দশা, সেইখানেই তো নামের প্রকাশ, তাতেই তো তার প্রকট, তা সেই নামের বিলাস তো এবার সংকীর্ত্তনে, সে যে প্রতি দেশে গ্রামে তবে?

গতি চঞ্চল ভঙ্গীতে, ভাসা ভাসা, বাঁকা বাঁকা চাহনিতে চাহিয়া রহিলেন। বাহ্যভাব আরও শিথীল হইল, মৃদু মৃদু কম্পনও দেহে দেখা দিল, আধ আধ ভাষায় কি বলিলেন। যে প্রসঙ্গে আবিষ্ট ছিলেন তাহারই সম্পর্কিত ভাষা। তারপর স্পষ্ট স্বরে শোনা গেল—

## তিনটি অবস্থা

তিনি বলিতেন— তিনটি অবস্থা, আসক্ত বিরক্ত অনাসক্ত; ভোগও সেই অবস্থামত হয়।

বলিয়াই চুপ করিলেন, আবার বলিলেন—

সে রাজ্যে এ রাজ্যে তফাতও যত মিলও তত, কেবল অনুভূতির ফের, কৃপাশক্তিতে যার অনুভূতি এসেছে সে কি আর বন চায়? না নির্জ্জন চায়? যা দেখে যা শোনে তাতেই তার মাতন, তিনি (শ্রীরামহরি দাস বাবাজী মহাশয়) মর্কট মর্কটির সে অবস্থা দেখলেন আর স্ফূর্ত্তি হোলো সেখানের (মহারাসের)

বলিয়াই কেন যেন সঙ্কোচের সহিত হঠাৎ কথা বন্ধ করিলেন, কিছুক্ষণ ঐ ভাবেই মৌনী হইয়া রহিলেন। কোলের উপর মালাটি আসিয়া নামিতে লাগিল, আজ আর ঝোলা নাই; এক একবার অনেকের অলক্ষ্যেই নিজের অঙ্গেই দাগ দিয়া সংখ্যা রাখিতেছেন। এই সময় কেহ জিজ্ঞাসা করিল, বাবা! বৈষ্ণব কি তুলসীর মালা ছাড়া জপই করেন না? শুনিয়া মুখ তুলিয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন—

## নিরপেক্ষের মালা নির্ম্মাণ

শ্রীগৌর কিশোর দাস বাবাজি মহাশয়ের আচরণে শোনা গেছে, তিনি বৈষ্ণবের প্রসাদী কাপড় দিয়ে ১০৮টি গাঁট বেঁধে নাম ক'রতেন। উদ্দেশ্য তো "নাম" করা আর সংখ্যা রাখা, তা কোথায় বা তুলসী খোঁজা আর কোথায় বা ঝোলা খোঁজা, নিরপেক্ষ ভাবে থাকতেন, তাই ওই ব্যবহার। সব ছেড়ে এসে আবার কিছু খুঁজতে যেতে হবে কি?

এই সময় শ্রীনবদ্বীপের হরিবোল কুটীরের শ্রীহরিদাস বাবাজী মহাশয় আসিয়া প্রণাম করিয়া বসিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া শ্রীগুরুদেবের মুখখানি বড়ই প্রফুল্ল হইল! আজিকার এই অবস্থায় শ্রীগুরুদেবকে দেখিয়া তিনি বিস্মিত ভাবেই চাহিয়া রহিলেন! শ্রীগুরুদেবও তাহা বুঝিয়াছেন। শ্রীহরিদাস দাদার দ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার পার্ষদবৃন্দের রচিত অপ্রকাশিত গ্রন্থরাজি যে ভাবে প্রকাশ করিতেছেন তাহা খুবই উদ্দীপনার! শ্রীগুরুদেব তাঁহাকে দেখিয়া যেন প্রকাশ করিবার আধারের যোগ্য ইনি এই ভাবেই প্রসঙ্গ তুলিয়া বলিলেন--

## ভূমি, ধাম ও স্ফূর্ত্তি

তাঁরা তো (শ্রীষড় গোস্বামীগণ) ইঙ্গিত মাত্রেই তা মাথায় ক'রে হা গৌর, প্রাণ গৌর, হা কৃষ্ণ, প্রাণ কৃষ্ণ ব'লে কেঁদে কেঁদে চ'লে গেলেন (মথুরা মণ্ডলে)। সেখানে গিয়ে যখনই যেখানে যে লীলা স্ফূর্ত্তি হোলো অমনি বুঝলেন এই সেই স্থল, নইলে এ স্ফূর্ত্তি এল কেন? ঐ অনুভূতি আসছে কেন? এই ভাবেই তো ব্রজের প্রকাশ, আর লীলাস্থলীর প্রকাশ, ভূমির তো নিত্যতা আছে, তিনিই নিজেকে প্রকাশ করেন। তবে যোগ্য আধার পেলেই হয়, তা লীলা-সহচর লীলাপার্ষদের তো কথাই নাই। সে স্রোত কি বন্ধ হ'য়েছে না হবে? তা হ'লে মূলেই উল্টে যাবে।

বলিয়া আদরভরা দৃষ্টিতে সকলকে মুগ্ধ করিলেন। একটু পরেই আবার বলিলেন—

## ব্রজে যাওয়া ও কথা না কওয়া

ব্রজ-প্রকাশের স্বরূপের দিকে দৃষ্টি হলে তবে সেখানে বাস, নইলে ভারী বিপদ, শীলু দিদি কখনও ব্রজে যায়নি। আমার একবার মনে এসেছিল, ব'ল্লাম, দেখ বৃন্দাবনে গিয়ে যারা কথা কয় না—এই শ্রীবিগ্রহ আর গোস্বামীদের সমাধি, তাদের সঙ্গে কথা কও, নিবেদন কর, কাঁদো, আর যারা চ'লে ফিরে বেড়ায় কথা কয় তাদের দেখে দণ্ডবৎ প্রণাম কোরো কথা কোয়ো-না, মনে মনে প্রার্থনা কোরো চ'লে এস, নইলে সর্ব্বনাশ হবে। সে হোলো উপাস্যের উপাস্য স্থান ; বাস করা কি সোজা কথা ? কেউ না নিয়ে গিয়ে ঐ চেয়ে দেখ, ব'লে না ব'ল্লে, ব্রজ বাস হয় না।

সেই প্রসঙ্গের আবেশে আবার বলিলেন—

## সাইন বোর্ডের কাজ দেখা

দেখ, ব্রজে গেছি সঙ্গে ফণে ছোঁড়া (ইনি আমাদের কাকা গুরু) দয়াল দাস বাবাজী মহারাজকে প্রণাম ক'রতে গেলাম, প্রণাম ক'রেছি, তিনি জিগ্যেস ক'রলেন কেমন আছ ? ব'ললাম আপনাদের আশীর্ব্বাদে যেমন রেখেছেন। হঠাৎ কথা বেরিয়ে প'ড়ল, আগে একটু গোলমাল ছিল, এখন বেশ আছি কি ঠিক আছি এমনি কথা বেরুল, একটু ব'সলাম, সন্ধ্যে হয় হয় বেরিয়ে আসছি, আর ভাবছি ফণে ছোঁড়া হয়ত ধরবে, ঠিক ধ'রলো, আমি বুঝলাম এইরে, যাক্, সে ব'লল—ও কি কথা হো'লো, ব'ললাম, ঠিকতো, তোমরা সাইন বোর্ড বড় ক'রে ক'রেছো, এখন কাজ হ'চ্ছে কি না, দেখ্‌ছে বাজিয়ে। সে তো চুপ।

বলিয়াই হাসিমুখে এদিক ওদিক চাহিতে লাগিলেন, ছোট ছোট দুই একটি প্রসঙ্গ আসিল, শ্রীগুরুদেব সবই শুনিতেছেন, কোন উত্তর করিতেছেন না। তাহারই ভিতর শ্রীনিত্যানন্দ-কথাপ্রসঙ্গ আসিতেই কাঁদিয়া উঠিলেন, কি উল্লাস, বলিলেন—

## বিধি নিষেধের বেড়া ডিঙ্গিয়ে কে যায়

সে তো ব্যাপক তত্ত্ব, জগদ্‌গুরু তত্ত্ব, গুরু স্বরূপের কোন একটি বিশেষ স্বরূপেই আট্‌কে গেলে হবে না, সবই নিত্যানন্দের প্রকাশ, যেখানেই গুরু শব্দের বাচ্য, সেইখানেই নিত্যানন্দের বিশেষ প্রকাশ, (একটু আনমনা হইয়া) ওই যে তোমাদের কথা আছে, বৈষ্ণবের ক্রিয়া মুদ্রা না কভু হেরিবে, সেখানে ভাব্‌তে হবে জগদ্‌গুরু নিতাই তো ওই, ওই যে গো, তোমাদের ঘৃণার পাড়া, সকলের পতিত-আলয় ওখানে যাওয়ায় তো বাধে, তা হ'লে তাদের গতির পথ কোথায় ? কে তাদের কাছে যাবে ? কে টেনে তুল্‌বে ? কার প্রাণ কাঁদবে তাদের জন্যে। সবই তো বিধি নিষেধের বেড়ায় আট্‌কা, ওখানে বুক্‌ ঠুকে কে যেতে পারে ? যেতে পারে নিতাই, তাইতো "মদিরা যবনী যদি ধরে নিত্যানন্দ" ওর ব্যবহারেও নিতাই, সে যে নিত্যানন্দ। আর কেউ পারে না।

বলিতে বলিতে শিহরিয়া উঠিলেন, একবার দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া হা নিতাই বলিয়া গম্ভীর ধ্বনি করিলেন। একটু পরেই কি ভাবিয়া বলিলেন—

## নিতাই চাঁদের নূতন রঙ্গ

**দেখ এক সময় গোস্বামীদের মধ্যে শ্রীগৌর তত্ত্ব নিয়ে খুব বিচার চ'ল্‌ছিলো, আমার তো ওঁদের কাছেই যাওয়াই হোলো না, কি জানি বাপু কোন পথ দিয়ে বিচার এসে প'ড়বে, ভারি চিন্তায় প'ড়লাম, শেষটায় কর্ত্তাকে জুলুম করলাম, আর কি করি "আমি" এলেই তো শেষ, তারপর তার জবাব এলো কীর্ত্তনের অক্ষরে "মজাইতে প্রাণ গৌরাঙ্গ, নিতাই চাঁদের নূতন রঙ্গ।" উঃ সে কি সময়। দিন রাত যে কিসে যাচ্ছিলো ভারী গোলমালে ছিলাম ওগনি ঠাণ্ডা করে দিলে, ব্যাপারটা বুঝলে তো? শ্রীঅদ্বৈত তত্ত্ব তো বস্তু নির্দ্দেশ করা তত্ত্ব, তাইতো ওইখান থেকেই** ( শ্রীঅদ্বৈত বংশীগণের নিকট হইতেই ) **আগে বিচার আস্‌বে; তাই কথা এলো** ( অক্ষরে প্রকাশ পাইল ) **নিতাই চাঁদের নূতন রঙ্গ**............

আপাততঃ এই বিষয়ের প্রসঙ্গ আলোচনা এইখানেই স্তব্ধ হইল। কারণ শ্রীগুরুদেবের পূর্ব্ব প্রসঙ্গে এত আবেশ প্রকাশ পাইল যে, তাহাতেই তিনি আবিষ্ট হইয়া রহিলেন। দুই চারি মিনিট কাল এইভাবে চলিয়া গেল, শ্রীহরিদাস দাদা বর্ত্তমান কি গ্রন্থের প্রকাশ কার্য্যে ব্যস্ত রহিয়াছেন তাহারই আলোচনা হইতে লাগিল, প্রসঙ্গক্রমে বটতলার পুঁথির সম্বন্ধে কথা উঠিল, বহু পুস্তক যে আজও শিক্ষিত ভক্ত সমাজে আদর পাইয়াছে তাহা হয়তো সম্ভবই হইত না, যদি বটতলায় উহা ছাপা না হইত, হয়তো সে সব গ্রন্থ যথাযথ শুদ্ধাশুদ্ধির সহিত প্রকাশিত হয় নাই কিন্তু মূলতঃ গ্রন্থগুলিই হয়তো পাওয়া যাইত না। শ্রীগুরুদেব সেই প্রসঙ্গে বলিলেন—

## বটতলায় হারান পাওয়া

**ওগো বটতলা না থাক্‌লে তোমাদের রাজ্যের অনেক পুঁথিই এতদিন অন্তর্দ্ধান ক'রতেন, ধুলোমাটি আছে ধুয়ে পুঁছে নাও, জিনিষ তো ফিরে পেলে, ও যে হারিয়ে যাচ্ছিলো**... ...

বলিয়া হাসিলেন—সেই প্রসঙ্গে আবার বলিলেন—

## গৌর ভোগী

**ওরা অনেক. ওদের গ্রন্থও ধ'রে রেখেছে** ( বাউল সম্প্রদায়ের গ্রন্থ ) **এরা** ( বটতলা ), **যেমন পুঁথি ধ'রে রেখেছেন ওরাও তেমনি** ( বাউল সম্প্রদায় ) **গৌর ভোগের নিদর্শন হ'য়ে**

আছেন, ওরা ( বাউলগণ ) না থাকলে গৌরকে ভোগ করার এমন মাখামাখির ইঙ্গিত পেতে কোত্থেকে ?

বলিয়াই একটি গান গাহিতে লাগিলেন—

গৌর নাম আর ভুলবো না মা
হবো গৌর কলঙ্কী
বলে ব'লুক লোকে মন্দ
তা'তে আমার হবে কি
লোকের কথায় গৌর পাব কি ?

গানের এই পর্য্যন্ত বলিয়াই কেমন এক বিপরীত ভঙ্গীতে আবিষ্ট হইলেন, যে অবস্থায় হাসি খুসীতে মগ্ন ছিলেন একেবারে তাহা ভঙ্গ হইল, ভক্তবৃন্দ মুগ্ধ দৃষ্টিতে শ্রীগুরুদেবের এইরূপ অবস্থার দিকে চাহিয়া রহিলেন। আবার গাহিলেন—

যে দিন হৈতে রূপ হেরেছি
আমাতে কি আমি আছি
ও মন প্রাণ সব সঁপেছি মা,
কুল দিতে আর বাকি কি ?
গৌর রূপ নয়নের তারা
পলকে রূপ হই মা হারা
ও রূপ না যায় পাসরা
বল্ মা আমি করি কি ?

আর বলিতে পারিলেন না, অপলক দৃষ্টিতে চাহিয়া চাহিয়া চক্ষু বন্ধ করিলেন, চক্ষু দুটির পাশ দিয়া ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরিয়া পড়িল, অস্পষ্টভাবে কি বলিতে লাগিলেন। একটু পরে "শ্রীগুরু" "শ্রীগুরু" বলিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়িলেন।

আজ অন্যান্য দিন অপেক্ষা একটু বেশী সময় প্রসঙ্গ-সঙ্গে মত্ত ছিলেন! নিত্য সহচরগণ স্নানের আয়োজন করিয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। সমাগত ভক্তবৃন্দ একে একে উঠিতে লাগিলেন। শ্রীগুরুদেবও স্নানের জন্য প্রস্তুত হইলেন।

আজ চার দিন হইল, তেমনি ভাবেই ফোঁড়াগুলি শ্রীগুরুদেবের শরীরে কম-বেশী রকমের হইতেছে। কখনও নিম ঘি কখনও বা গরম-জলের তুলোর সেঁক; ইহার বেশী আর কিছু চিকিৎসা হয় নাই, অত্যন্ত যন্ত্রণাকর এতগুলি ফোঁড়া থাকা সত্ত্বেও কোন রকম উদ্বেগ বা দৈনন্দিন-কৃত্য সময়ের এতটুকু ব্যতিক্রম তাহার কিছুই নাই; যেন সমুদ্র-স্বভাব, ঝড়, ঝঞ্ঝা, প্রবল বারিপাত, বেগবতী নদীর আবেগ, কিছুতেই সমুদ্রের তীরোচ্ছ্বাসও নাই বেলার অতিক্রমও নাই।

শ্রীগুরুদেবের শরীরের এই অবস্থা দেখিয়া কত চিকিৎসক আসিতেছেন, ব্যবস্থাও দিতেছেন, ধনী, দরিদ্র, সাধু, ভক্ত কত ব্যক্তিরই আসা যাওয়া হইতেছে, নিরাময়ের নানা উপায়ই স্থির হইতেছে, শ্রীগুরুদেব সবই শুনিতেছেন কিন্তু এ সব যেন আকাশের গায়ে রেখাপাত হইতেছে। প্রভাতী-কৃত্য তেমনি চলিতেছে, মধ্যাহ্ন, সায়াহ্ন, সান্ধ্য, নৈশ কৃত্যের বাঁধা নিয়মগুলির একটুও এদিক ওদিক নাই। আজ সকালে সমাগত ভক্তবৃন্দ একটু শঙ্কিত ভাবেই শ্রীগুরুদেবের নিকট উপস্থিত হইয়াছেন, কি জানি, শ্রীগুরুদেবের কোন উদ্বেগ হইলে তাঁহার নিকট বসিয়া থাকায় অস্বস্তি বাড়িতে পারে। শ্রীগুরুদেব বুঝিয়াছেন তাঁহাদের মনোভাব, তাই প্রসন্ন দৃষ্টিতে একবার চাহিলেন, সকলেই সূত্রের আকর্ষণে বাঁধা বস্তুর মত একে একে গিয়া বসিলেন। একটু পরেই কেহ বলিলেন, অমুক "দাদা উজ্জ্বল নীলমণির" একখানি অনুবাদ গ্রন্থ ক'রেছেন, শ্রীগুরুদেব মুচকী হাসিয়া, তেমনি সহজ সুরেই বলিলেন—

## রসের আলাপ ও অধিকার

**আরে, উজ্জ্বলের অনুবাদ ক'রতে গেলে যে অন্ধকার ঘনিয়ে আসবে, সেদিকে নজর রেখে কথা কওয়া বড় শক্ত কথা, সমর্থা রতির অবস্থা কে ব'লবে? রস নিয়ে কথা কওয়া কি যা তা গা? তোমাদের রাজ্যে রসের পাক দেখেছো, একটু এদিক ওদিক হ'লেই ব্যস গেল সব, শুনেছিলাম তখন (শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়ে) নাকি সাড়ে তিন জন ছিলেন; আর এখন সবাই, ভাগবত যিনি পাঠ ক'রছেন তাঁরও রাস ছাড়া অন্য ব্যাখ্যা হ'চ্ছে না, আর যারা শুনছেন তাঁদেরও নাকি সেই অবস্থা, ভাগবতে কি আর কিছুই নাই? ভক্তের অবস্থা কি তাকি বোঝা হ'য়েছে? নিজের অধিকার কো'থায় তাকি একবার ভেবে দেখা হ'য়েছে? সেদিন তাই কথা বেরুলো, (শ্রীমুখের উক্তি) ব'ল্‌লে এসে—তিনি রাস ব্যাখ্যা শুনতে**

গেছেন, এখানে আসতেই ব'লে ফেল্‌লাম, রাসতো শুন্‌তে যাওয়া হ'য়েছিল তা তুমি সেখানের কে? দেহ-স্মৃতি গেছে তো? যাঁরা এসেছিলেন (তাঁর পত্নী মারা গেছেন) তাঁদের স্মৃতি সব শেষ হ'য়েছে তো? যেটা নিয়ে চলা ফেরা (দেহ নিয়ে) তাঁর স্বভাব গেছে তো? হুঁঃ কি বলি বল, শাসন ক'রতে গেলে মাথায় হাত দিয়ে কথা কইবে, শেষটায় উল্টো, কল্যাণের পথ পর্য্যন্ত রাখবে না।

বলিয়াই একটু গম্ভীর হইলেন। ভক্তবৃন্দ আর এ সম্বন্ধে কোন প্রসঙ্গই তুলিলেন না, শ্রীগুরুদেবও গম্ভীর ভাবে বসিয়া নামমালা জপ করিতে লাগিলেন, প্রায় দুই তিন মিনিট কাল চুপ করিয়া আছেন দেখিয়া কেহ প্রশ্ন করিল—বাবা! সাধু বৈষ্ণবগণ মঠ মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন কেন? আত্মপ্রতিষ্ঠা না আর কিছু থাকে? গৃহীরাও তো ঘর বাড়ী করেন, তাঁদের উদ্দেশ্য যা, তা তো আর সাধুদের থাকে না; শ্রীগুরুদেব শুনিয়া হাসিলেন, এমন ভাবটি প্রকাশ করিলেন যেন কথাটা শ্রীগুরুদেবকেই উদ্দেশ্য করিয়া বলা হইয়াছে; শ্রীগুরুদেবের দ্বারাও অনেক মঠ মন্দিরের প্রকাশ হইয়াছে তাই হাসি ও গাম্ভীর্য্যের স্বরে বলিলেন—

## কেউ করে আর ধরা পড়ে অন্য

ও কি কেউ করে? কেউ করায়, দরকার হয়তো লোক সংগ্রহ। আর প্রচারের হ'য়েছিল, তাও তো জীবের কল্যাণের জন্যে; ও একটা খেলা খেলে নিলে, খেলার আকর্ষণে ডেকে তারপর খাঁটী খাঁটী করে করায়, নিজে আর ধরিয়ে দেয় এক জনকে, ব্যস "আমি" এলেই তখন বেঁধে মার, ও এক তার ভঙ্গী, দেখ্‌ছো তো করালে ঢের, ধরিয়েও দিচ্ছে, কাজ নেই বাপু, আমরা রোজ ভিখিরী, দোরে দোরে ঘুরে বেড়ানই ভাল, আমাদের আবার ডেরা কিসের? বহ্‌তা নদী রেখো এই বেশ, অসাধনে চিন্তামণি, ব্যস্ আর কি চাই,—

বলিয়াই উল্লাসের সহিত হাসিলেন, আবার বলিলেন—

## ঠাকুর দেখিয়ে লোক ঠকান

ওগো মঠ মন্দিরে হিসেব রাখা বড় দায়, গৃহস্থ বাড়ীতে এই কক্ষার লোকদিকে একটু হিসেব ক'রে থাক্‌তে হয়, সহরের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখতে হয়, একটু বে-হিসেবে চ'লেছো কি ওমনি কড়া চাবুক, "সন্ন্যাসীর ছিদ্র সর্ব্ব লোকে গায়"। মঠ মন্দিরের থাকা অনুশীলনের জন্যে, সে দৃষ্টি না এলো তো সব গেল, উদর পোষণই সার হবে, তখন ঠাকুর দেখিয়ে লোক ঠকান।

বলিয়া হাসিলেন, প্রশ্নকারীর উত্তর হইল। শ্রীগুরুদেব ইহা বুঝিয়া ফিরিয়া চাহিলেন, প্রসঙ্গক্রমে আরও দু চারটী কথা বলিলেন। কেহ জিজ্ঞাসা করিল বাবা! আপনি বলেন সবই জগদ্‌গুরু নিত্যানন্দের প্রকাশ, আচ্ছা, যে যা বলে তাই শুনে চ'ল্‌তে হবে তো? কথাটি শুনিবামাত্র মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন, বড় প্রসন্ন মুখ, প্রচুর উল্লাস, সর্ব্বাঙ্গে লাবণ্যধারা, করুণায় ভরা দুটী চোখ, দৃষ্টি সরল শিশুর মত, আবেগে জড়িত কণ্ঠস্বরে বলিলেন—

## সরস্বতীর প্রকাশ

**ওগো এ রাজ্যের** ( বৈষ্ণবের আচরণে ) **রীতি দেখ কেমন—তোমরা তো সম্প্রদায় হিসেবে গোপাল গুরু বলতো? তা দেখ তাঁর আচরণ শেখান কেমন, তাঁকে** ( শ্রীমন্ মহাপ্রভুকে ) **যেই ব'ল্‌লেন এখন** ( শৌচকালে ) **কর্ত্তব্য কি? উনি** ( শ্রীগোপাল ) **ওমনি ব'ল্‌লেন নাম করা, তিনিও** ( শ্রীগৌরাঙ্গদেব ) **তৎক্ষণাৎ তাঁকে গুরু ব'লে স্বীকার করলেন; কেন বল দেখি এ আচরণ? তোমাদের চলিত কথায় বলে সরস্বতী সত্যি-কথা বলান, তিনি যাকে যা' বলান সে তাই বলে, তাহ'লে বাণী কার? সেই সরস্বতীর তো? তা'হলে বালকেও যদি প্রকাশ পায় তবুও বাণী তো, সে আর বালক কোথায়? ঐ হৃদয়ে বসে তোমাকে উপদেশ ক'রছেন,**

সে আবার প্রশ্ন করিল বাবা! লোক তাঁকে দুষ্টু সরস্বতীও তো বলে তাহ'লে সে বাণী তো দুষ্টু কথাও হবে সে ও কি শুন্‌তে হবে? শ্রীগুরুদেব খল খল করিয়া হাসিলেন, ভক্তবৃন্দও যেন রহস্য কৌতুকে ডুবিলেন, শ্রীগুরুদেব উত্তর দিলেন—

## স্বভাবের ইতিকথা

**তোমার স্বভাব দুষ্ট না বাণী দুষ্ট? মিল ক'রে দেখে নাও, অনুশীলন করে দেখ, এ দেহে সে কথার কাজ ঘটেছে কি না, না-পাও অতীত দেহে ঘটেছে জান্‌বে, তাতেও না পাও ভবিষ্যৎ জীবনে ঘট্‌বে মেনে নেবে, অনুশীলন ক'র্‌লে শুদ্ধ আধার হবে তখনই অন্তর্যামীরূপে তিনি এসে প্রেরণা দিয়ে জানিয়ে দেবেন। তারপর আর একটা কথা আছে জান? তাঁতে** ( শ্রীভগবানে ) **আরোপ ক'রে যখন ওকথা** ( দুষ্ট সরস্বতীর কথা ) **শুন্‌বে সে তো অসুরপক্ষের কথা। তাও তো অসুর পক্ষ বলে একটা কথা আছে, তাতেও তাঁর লীলা পুষ্টি হয়, দেখ না পুষ্টি হ'য়ে কেমন ভোগ হয়, এই যে সব পুঁথিতে** ( ভাগবত প্রভৃতিতে ) **আছে তাতে তাঁর লীলা পুষ্টি হয় নাকি?**

বলিয়া আবার স্নিগ্ধ মধুর হাসির সহিত চাহিতে লাগিলেন; শ্রীগুরুদেব এই সময়টুকুতে

বেশ তৃপ্তির পরিবেশ সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই জন্য সময় মত আবার এক ভক্ত প্রশ্ন করিল বাবা! মানুষ তো যুগে যুগে নূতন ভাবে নূতন চিন্তায় তৈরী হয়, কিন্তু ভজন সাধনের পদ্ধতি তো প্রাচীন, তা হ'লে মিল করা কি সহজ হয়? শ্রীগুরুদেব কথাটি শুনিয়া প্রথমটা গম্ভীর হইলেন, কিন্তু দু-এক মিনিট পরেই বলিলেন—

## নিত্য কিশোরের সবই নূতন

দেখ একজন গেছেন গম্ভীরায় দর্শন ক'রতে, সেই পাদুকা সেই কাঁথা দর্শন ক'রে বল্‌ছেন—এ অদ্দিনের জিনিষ এই সব? কথাটা শুনেই আমার মুখ থেকে বেরিয়ে প'ড়লো, তার স্বরূপটা কি? সে নিত্য কিশোর তো? তার সম্বন্ধে সবই তো নিত্য কিশোর; তবে অদ্দিনের ব'লে ও কি কথা, প্রাকৃত দৃষ্টি নিয়ে গেলে ওমনি হয়। হাঃ হাঃ প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি কি সহজ কথা, সে আর তার সবাই তো নিত্য কিশোর, তবে প্রাচীন আর নবীন কিসের? তিনি যখন নিত্য কিশোর তাঁর জীবের আশয়গত লীলা ভোগ তাহ'লে কি হবে? নতুন পুরোনো এ দেহের ব্যাপার।

এবার যেন বেশী গম্ভীর মনে হইল। একজন ভদ্রলোক আসিয়া বিশেষ বিনয়ের সহিত শ্রীগুরুদেবের একটু কাছে আসিয়া বসিলেন। তিনি এতক্ষণ বড় নিবিষ্ট মনে শ্রীগুরুদেবের কথা শুনিতেছিলেন, এখানে তিনি মাঝে মাঝে আসেন, তবে সাহস করিয়া কিছু বলিতে পারেন না, তাঁহার মনে বহুদিনের ধারণা যে শ্রীগুরুদেব খুব শাস্ত্র পড়িয়াছেন, সেই জন্য শ্রীগুরুদেবের কীর্ত্তনের অক্ষরগুলি এত জ্ঞান ও অলঙ্কারের কথা থাকে, তিনি খুব দৈন্য বিনয়ের সহিত জানাইলেন আজ্ঞে! আপনার কীর্ত্তনের অক্ষর পড়ে মনে করেছি খুব পাণ্ডিত্য না থাকলে এ সব কথা আসে না। শ্রীগুরুদেব তাঁহার কথা শুনিয়া কৌতূহল পূর্ণ হাসিয়া ভক্তবৃন্দের দিকে চাহিয়া বলিলেন—

## বিদ্যার দৌড়

কোন কথা এলে (কীর্ত্তনের অক্ষরে প্রকাশ পাইলে) তোমরা বল ঐ অমুক শাস্ত্রে আছে, আরে দূর! আমার কি অত সব বড় বড় শাস্তর টাস্তর পড়া আছে? সে দিয়ে গেছে (শ্রীবড় বাবাজী মহাশয়) এই গাঁথা নাম (ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম। জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥) ব'লতে হয়-তো তাকে বোলো, আর থাক্‌লে কিছু আছে তো ওতে আছে, ওই নামেই তো সব আছে, এ দান তো তারই, ওই দিয়েই যা কিছু খবরাখবর, ছোটো বেলায় তো বিদ্যের দৌড় সেই ছাত্রবৃত্তির কাছে, তারপর যা কিছু সব তা এই।

বলিয়াই বাম হাতের অঙ্গুলী পাঁচটীতে দেখাইয়া দিলেন। মুখখানি ও হাতের ভাবটী প্রকাশ পাইল বড় আদরতরা সঙ্কেতে, অপূর্ব্ব উল্লাস, স্নেহ ঝরা দৃষ্টি সর্ব্বাঙ্গে পুলক। শ্রীগুরুদেব চুপ করিয়া রহিলেন, প্রায় তিন চার মিনিট কাল কাটিয়া গেল সেই ভাবেই বসিয়া রহিলেন, আগন্তুক ভদ্রলোকটী বিশেষ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, একটু পরেই তিনি করজোড়ে প্রণাম করিলেন। অতি উচ্ছ্বাসের সহিত বলিলেন আজ শাস্ত্রের প্রত্যক্ষ মূর্ত্তির দর্শন পেলাম। একটু পরে শ্রীগুরুদেব ধীরে ধীরে মুখ তুলিলেন, চোখ দুটী গভীর রাঙা।

প্রসঙ্গ ক্রমে কথা উঠিল, গতকাল চালতা বাগানে মিটিং (সভা) বসিয়াছিল, তাহাতে নাকি শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটকের মধ্যে শ্রীগৌর-স্বরূপের যে কিশোরী-স্বরূপের ইঙ্গিত আছে এটী অস্বীকার্য্য; এ কথা শুনিয়া শ্রীগুরুদেব বেশী গম্ভীর হইলেন, প্রথমে এমন ভাব প্রকাশ পাইল যেন কথাটী বাবার কাণে পৌঁছে নাই, কিন্তু তাহা নয়, আবেশে ধাক্কা লাগিয়াছে, তাই চুপ করিয়া রহিলেন, পরে এমন ভাবে উত্তর দিলেন যেন বাহ্যতঃ সে কথারই প্রসঙ্গ নাই; কিন্তু গভীর ভাবে অনুশীলন করিলেন গ্রন্থকারও গ্রন্থের প্রসঙ্গের উত্তর দিয়াছেন, শ্রীগুরুদেব বলিলেন—

## বিচার সভা

তার খেলা তো পরিকরে থাকবে, এই পরিকর দৃষ্টিতে গ্রন্থ দেখলে তাঁদের রচনা আর তার বস্তুতে বিচার বুদ্ধিই আসে না, তারপর আর একদিক দেখ, নামমাত্র রূপে তো সে বেড়াচ্ছে, তা'হলে কোথায় বিচার বুদ্ধি আনবে? বিচার হয় অনিত্য বস্তুতে, নিত্য স্বরূপে আবার বিচার কোথায়? ধর না, তোমাদের এই যে জগৎ শব্দটী, ওকি কিছু প্রত্যয় ক'রে হয়? তবে কিসে তাকে বোঝো, তার ওপর আবার নিত্যানন্দ তত্ত্ব, ওর নামেই স্বরূপ বলা আছে, তত্ত্ব খুজতে আর কোথাও যেতে হবে না, ওখানে বিচার চলে না। এবার দেখ দেখি, আবার ওদিকে দেখ, হরি-ভক্তি-বিলাস মতে কত বিচার চলে, ওই ওমুক অর্থে ঠাকুর সেবা হয় না, ব্রাহ্মণ সেবা হয় না, আচ্ছা সব জল যখন গঙ্গায় পড়ে, তখন সব তো গঙ্গা জল হয় তবে? দৃষ্টি এলে বিচারের ঠাঁই থাকবে না, যত প্যাঁচ ওই দৃষ্টি নিয়ে, বস্তু ঠিকই থাকে, যেমন দৃষ্টি তেমনি প্রাপ্তি, দুই হয় ভাবে, কৃপা ক'রে কেউ সে ভাব দিলে তবে দৃষ্টি ফেরে, তখন দেখে বিচার কোথায়? সবই যে নিত্যানন্দময়, নিত্যানন্দের ধামেই গুরুতত্ত্বের বিকাশ, সেই হোলো গুরুধাম, সে শক্তি (নিত্যানন্দ শক্তি) যে স্বরূপে এসেছে সে কি আর বিচারে বসে? বসে না,

বলিতে বলিতে হাসিয়া একটু গম্ভীর হইলেন, গুণ গুণ করিয়া কি বলিলেন। কিছুক্ষণ মৌন হইয়াই নাম মালায় জপ করিতে লাগিলেন—এ আবেশ ক্রমশঃ গভীর

ভাবেই বিকাশ হইল। ভক্তবৃন্দ বুঝিলেন এই ভাবাবিষ্ট স্বরূপের গাম্ভীর্য্য শিথিল হইতে বিলম্ব হইবে, এ দিকে ৯৷৷০ বাজিয়া গেছে। আরও নূতন প্রসঙ্গের অবতারণা আসিলে স্নানের ও অন্যান্য কৃত্যের বিলম্ব হইবে বুঝিয়া সকলে একে একে উঠিতে লাগিলেন।

এই কয়দিন শ্রীগুরুদেবের শরীরটী অসুস্থ সেইজন্য সাধারণ নিয়মে অনেকেই প্রণাম করিতে পারেন না। কিন্তু সেই ভদ্রলোকটী ইহা লক্ষ্য করেন নাই, সেইজন্য যেই প্রণাম করিতে উপক্রম করিলেন অমনি ভক্তবৃন্দ তাঁহাকে নিষেধ করিলেন, তাহাতে তিনি দুঃখিত হইয়া বলিলেন—"এখানে আর সাংসারীদের নিয়ম কেন?" শ্রীগুরুদেব শুনিয়াছেন, তাই আনমনেই বলিলেন--

## আচরণ করার অবস্থা

**অধিকার আর অবস্থার ভুল হ'লেই উদ্দেশ্য নষ্ট হয়, যাঁরা আচরণ করেন তাঁদেরও তো একটা অবস্থা আছে—**

ভদ্রলোকটী বুঝিলেন ইনি বৈরাগী হইলেও যাঁহারা প্রণামাদি করেন তাঁহারা তো সংসারী, তাহা হইলে তাঁহাদের সাধারণ আচরণই কর্ত্তব্য। সকলে ধীরে ধীরে বাহিরে আসিলেন।

---

**১৩ই জ্যৈষ্ঠ্য, ১৩৫৬ সাল। কলিকাতা, সকাল ৭৷৷০টা—৯ পর্য্যন্ত।**

জগতে সমস্ত বস্তুরই বিকার পরিলক্ষিত হয়; কিন্তু আশ্চর্য্য স্বরূপ শ্রীগুরুদেবের এতটুকু বিকার নাই, এই পাঁচ দিনের মধ্যে শরীরের সেই ফোঁড়া গুলির অবস্থা অপরের পক্ষে কি নিদারুণ হইতে পারে? এক একটির আকার বড় কুলের মত হইয়াছে কোনটীর সিন্দুরের মত রঙ্ কোনটী আবার পাকিয়াছে, তাহার উপর প্রবল জ্বর, একবারের জন্যও আহা উহু নাই, কাতরতা নাই, যথা-নিয়মে দণ্ডবৎ প্রণামের বিরতি নাই, উদ্বেগ, বিমর্ষ, শৈথিল্য নাই, সদাই হাসি মুখ, সারাক্ষণই স্মরণ মনন প্রসঙ্গ আলাপন, কেবল পরিবর্ত্তনের মধ্যে দিবারাত্রির ভিতর তিনবার এক ছটাক করিয়া সামান্য জল সাগু গ্রহণ, অনুগতবৃন্দ শঙ্কিত হইয়াছেন; ভয়ে ভয়ে ধীরে ধীরে শ্রীগুরুদেবের নিকট উপস্থিত হইতেছেন, শ্রীগুরুদেব সন্তানদের সহিত মিলিত হইয়া প্রসঙ্গ-সঙ্গে থাকিবার জন্য চঞ্চল

হইয়াছেন, শারীরিক অস্বস্তি উপেক্ষা করিয়াছেন, পাছে তাঁর ছেলেরা বিষন্ন হইয়া থাকে, তাই নিজেই আগে বলিলেন—"

## আশ্রয় তত্ত্বের অনুসন্ধান

**কি গো? কিছু মিল্‌লো? এগুলো** ( ফোড়া গুলি ) **বাঁ দিকেই কেন হ'চ্ছে? একটাও তো ডান দিকে হয় নাই, বাঁ দিক্‌টাকে বলে আশ্রয় অঙ্গ, এখন অনুসন্ধান ক'রে দেখ— আশ্রয়ের কোথায় কি হ'য়েছে!**

বলিয়াই হাহাঃ করিয়া হাসিলেন, সকলের মনে যে আবরণ পড়িয়াছিল তাহা সরিয়া গেল। তেমনি হাসিমুখেই বসিয়া আছেন, "নাম" মালায় জপ করিতেছেন একটু পরেই বলিলেন—

## তবে কি সন্তান বাঁচে

**হ্যাঁ গো। কথা বেরিয়েছে** ( শ্রীমুখের কীর্ত্তনের অক্ষরে ) **যে, "তাপ জুড়াবার আর উপায় নাই"** ( অর্থাৎ শ্রীগুরু-পদাশ্রয় বিনে ভাই, তাপ জুড়াবার আর উপায় নাই ) **তা ভাব দেখি, সে তাপ যদি ওখানে থাকে** ( শ্রীগুরু স্বরূপে থাকে ) **তা হলে কি সন্তান বাঁচে? দেহ আর মন তো আলাদা থাকে না, তাপও আলাদা থাকে না, তবে? ও-সব হোলো বুদ্‌বুদ্‌, অনুসন্ধান কর, এদিকটায় এগুলো হোলো কেন?**

বলিয়া তেমনি অবুঝ শিশুর চাহনিতে হাসিয়া সকলের মন আরও আকৃষ্ট করিলেন, অনুগতবৃন্দের মনেও যেন কোন ভার আর রাখিলেন না। এই কয়দিনের মধ্যে কোন এক সেবক শ্রীগুরুদেবের কাছে আসেন নাই, শ্রীগুরুদেবের শরীরে এতগুলি ফোঁড়া হইয়াছে, জ্বর হইয়াছে ; তিনি কি ভাবিয়াছেন জানিনা কিন্তু আসেন নাই অথচ তিনিই নিয়মিত আসেন, শ্রীগুরুদেব ইহা ভাল ভাবেই লক্ষ্য করিয়াছেন, ইঙ্গিতে বলিলেন—

## সম্বন্ধের বাঁধন

**ওগো সম্বন্ধের বাঁধন আলাদা জিনিষ, সেখানের রীতির কথা শোনো নাই? দরকার হ'লে পদধূলি দিতেও কুণ্ঠিতা নয়, আগবাড়া হ'য়ে দিতে তাই যাচ্ছেন, সে আমাদের ভাল থাকুক** ( শ্রীকৃষ্ণ ও ব্রজগোপীকাগণের রীতি স্মরণ করাইয়া ) **এর কাছে তার কাছে** ( নানা দেব দেবীর কাছে ) **গিয়ে মানদ কর্‌ছেন, ও ভাল থাকুক্‌, দেখ দেখি সম্বন্ধের বাঁধন কেমন? নেচে গেয়ে খেয়ে খাইয়ে সম্বন্ধের বাঁধন বাঁধতেই তো আসা, তা যদি না হোলো তবে কিসের এত আয়োজন?** ( সেই আবেশেই ) **ও আমার ভাল লাগে না, যার সঙ্গে খেলেছি, ব'সেছি, কত হাসি ঠাট্টা করে রাত কাটিয়েছি তাকে বাপু আর কিছু** ( শ্রীজগদ্বন্ধু প্রভুর সহিত সম্বন্ধ-উক্তি ) **ব'লতে** ( অবতার—ভগবান ) **পারবো না। সেখানে ওই দশায়** ( শ্রীজগদ্বন্ধু প্রভুর অবস্থা বিশেষে ) **কথা উঠলো কি জান? বলে পিরভুর্‌ আবার অসুখ কিসের?**

বলিয়া বিমর্ষের হাসি হাসিলেন। প্রসঙ্গ-সঙ্গ গভীরতর হইয়াছে, সকলের সকল উদ্বেগ দূর হইয়াছে। সদানন্দময় পুরুষ প্রেমে মাতোয়ারা হইয়াছেন, দেহে যন্ত্রণার পরিবেশ বিলীন হইয়াছে। আবার সেই প্রসঙ্গেরই সূচনা হইল, এবার আশ্রিতের কথা উঠিল। কেহ প্রশ্ন করিল—বাবা! সমাধি হ'লে বাহ্য দেহে কি কিছু আভাস পাওয়া যায়? শুনিয়াই বাবা বলিলেন—

## আরশোলা ও কাঁচ পোকা

আভাস কি গো, একেবারে পুরোপুরি, সোজা কথায় দেখনা, আরশোলা আর কাঁচ পোকা, এদের কি হয়? কাঁচ পোকার আকর্ষণে আর ভাবনায় আরশোলা কাঁচ পোকা হ'য়ে গেল, সে তো চিন্তায় হয়; প্রাকৃত জগতে যদি এমন হয় তবে অপ্রাকৃত রাজ্যের আবার কি কথা? ওগো চ'খে দেখা গেছে বুঝলে? রামহরিদাস বাবাজী মহাশয়ের ভেতর দিয়ে দেখা, অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ভেতর দিয়ে সে রাজ্যের ভোগ বিকাশ দেখা গেছে। তিনি বলতেন (শ্রীবড়বাবাজী মহাশয়) নদীর ধারে যুবক যুবতীর ভ্রমণ দেখে নদীতে যমুনা উদ্দীপনে সে রাজ্যের স্মরণে তক্ষুণি সমাধি লাভ, দেহের বিকাশ ও ঠিক তাই হ'য়ে গেল—তবে, তবে আর কি অবশেষ থাক্‌লো?

বলিতে বলিতে গভীর আনমনা হইলেন,ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন,শ্রীগুরুদেবের শরীরটী একেবারে কোমল, উজ্জ্বল-লাবণ্যে ভরিয়া উঠিল, সকলেই হতবাক্‌, সকলেরই দৃষ্টি মুহূর্ত্তের মধ্যে স্তব্ধ হইল। একটু পরেই আবার বাহ্যভাবে সহজ হইয়া এদিক ওদিক চাহিতে লাগিলেন—কেহ প্রশ্ন করিল—বাবা! আচার অনুষ্ঠান যাঁদের সাধনের প্রথম সোপান, সেই সব পুরুষদের অনেক সময় বিপরীত দেখা যায় কেন? শ্রীগুরুদেব উত্তর দিলেন—

## ঘোড় সওয়ার

আচার তো লোকশিক্ষা আর দেহের আবেশে অভ্যাস, তা দেখ, এক বৈষ্ণবের সংকল্প জেগেছিল বৃন্দারাণীর (তুলসীর) একটি-টব্‌ হাতে নিয়ে চারধাম পরিক্রমা কোর্‌বো, তা সে তো ভক্তির বিরোধী আচার, শৌচ প্রস্রাব আছে তো? এইতো তোমরা প্রতিবাদ কোর্‌বে। তিনি কি বোললেন্‌ জান? আরে সোওয়ার তো ঘোড়ায় চ'ড়ে থাকে তখন ঘোড়া বাহ্যে প্রস্রাব করে তো? তাতে কি সোওয়ার অশুচি হয়? দেখ দেখি কি সিদ্ধান্ত? দেহে আবেশ নাই, কি বোলবে বল? আচারের সিদ্ধান্ত, শাস্ত্র তো দেহের আবেশে, না-কি?

আচারের সিদ্ধান্ত বলিয়া আবার সেই প্রসঙ্গেই বলিলেন—

তোমাদের পুঁথিতে আছে "বেদ ধর্ম্ম ছাড়ি"......। সে কি নিজে ইচ্ছে ক'রে ছাড়বে? তাকি হয়? তা হবে কেন? আপনা আপনি ছেড়ে যাবে, অনুরাগ আর খাঁটি খাঁটি নিষ্ঠা থাক্‌লে এদিকে দৃষ্টি থাক্‌বে না। না থাক্‌বে নিজে আর না থাক্‌বে অপরের ওপর। জোর ক'রে হবে না। একাদশীর দিন কোন বৈষ্ণব পান খেয়ে এসে পাঠ শুন্‌ছেন। শ্রীরামদাস পাঠক মহাশয়ের নিকট) তিনি সে বিষয়ে তাঁকে (সেই বৈষ্ণবকে) জিগ্যেস ক'রলেন—এ-রকম আচার দেখছি কেন? তাতে তিনি কি জবাব দিলেন জান? ব'ললেন (বৈষ্ণব বলিলেন)—আমাদের রাগ-মার্গে ওসব নেই, তাই না শুনে তিনি (শ্রীরামদাস পাঠক মহাশয়) ব'ললেন—সেকি? আপনার রাগ কৈ? ও তো মস্ত বিধি আপনার মাথায় র'য়েছে, রাগ-মার্গে আমাদের ওসব নেই—এই ধারণাতেই যে মস্ত বিধি মার্গ। যখন সে দিকে দৃষ্টি থাক্‌বে তখন কি বিধি-নিষেধের আলাদা পথ থাক্‌বে? তখন লোকবাহ্য হোয়ে যাবে।

বিধি-নিষেধের অতীত প্রেমরাজ্যে রাগ-মার্গের কথা বলিয়া হঠাৎ কি মনে করিয়া ভাবে মাথা নত করিয়া প্রণাম করিলেন, অনুগতবৃন্দও ভূমিতে প্রণাম করিলেন। আবার কেহ প্রশ্ন করিল—বাবা! সদাচার করা প্রত্যেকের কর্ত্তব্য, তা সদাচারের কোন মাপকাঠি আছে কি? শ্রীগুরুদেব সহজভাবেই তৎক্ষণাৎ বলিলেন—

## সদাচার

যে আচরণ কোরলে অপরে সমালোচনা কোরে অপরাধী হয় না, অকল্যাণ পায় না তাই সদাচার। এই জন্যে বৈরাগীরা কারু কড়া নজরে থাকেন, তাতে ওপরের চাবুকের ভয় থাকে, কারো সমালোচনার অবসর থাকে না। ও আসে (আমাদের কোন জ্যেষ্ঠ গুরুভ্রাতা, তাঁহার দ্বারা কয়েকটী প্রাচীন বৈষ্ণবতীর্থের পুনরায় সংস্কার হ'য়েছে, সেই মঠগুলি বাবার নামে সমর্পণ কোরেছেন) তাকে কেবল আশ্রমে কে কেমন আছে জিগ্যেস করি। ব্যস্ আর কিছু না। স্পষ্ট ব'লে দিয়েছি, ব্রত, উৎসবের দিন বাইরে কাউকে প্রসাদ বিতরণ চল্‌বে না। নাম দিয়ে চিঠি ছাপান বন্ধ করা দরকার, (তাঁকে বলা হ'য়েছে) লোকে নানাভাবে ব্যথা পায়, এও তো সদাচার, অপরে সমালোচনা কোরে অপরাধী না হয়, এদের আসার কি ওই ফল হবে? লোকের কল্যাণের জন্যই তো এত তোড় জোড়, তাই যদি না হোলো তবে তো.........

বলিয়াই চুপ করিয়া রহিলেন—পুনরায় শ্রীগুরুদেবকে কেহ জিজ্ঞাসা করিল, বাবা! এই যে শোনা গেছে "বৈষ্ণবের ক্রিয়া মুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয়।" আচ্ছা, বিজ্ঞে যদি না বুঝ্‌তে পারে তবে অজ্ঞরা কি ক'রবে? শ্রীগুরুদেব নিজ প্রিয়জনের কথাটী শুনিয়াই মৃদু হাসিলেন—একটু পরে মুখখানি নীচু করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন—

## অদোষদর্শী

তা কেন গো "অদোষ-দরশী" ব'লে একটা কথা আছে না? তাঁরা তো ক'রলেন না, কিন্তু দোষ-দর্শী তুমি হবে কেন? খাঁটি খাঁটি আচরণ করলে সে প্রসঙ্গই আসবে না......

"বৈষ্ণবের আচরণে কোন দোষ নাই।" শ্রীগুরুকৃপায় অদোষ-দরশী স্বভাবে বৈষ্ণবীয় নিষ্কপট আচরণ দেখিয়া অনুভবে খাঁটী খাঁটী আচরণ করিলে কোন দোষ-প্রসঙ্গই আসিবে না। করুণাময় শ্রীগুরুদেব প্রসঙ্গ রঙ্গে এইভাবে আচরণ বিষযে আলোচনা করিয়া উঠিলেন। নিজ অনুগতবৃন্দও প্রণাম করিয়া বাহিরে আসিলেন।

---

১০ই জ্যৈষ্ঠ্য, ১৩৫৬ সাল। কলিকাতা, সকাল ৮—৯টা পর্য্যন্ত।

আজ আর স্নান করিবেন না, সেইজন্য শ্রীগুরুদেব পূর্ব্বদিনের সেই প্রসঙ্গ-সঙ্গে বসিয়া আছেন। নিজ অনুগতবৃন্দকে সাধুর আচরণ ও দর্শনের কথা বলিলেন—

## সাধু দর্শন

হ্যাঁ—কথা হ'চ্ছিলো আচার, দেখ ব্যবহারও একটা আচার, গৃহস্থের ব্যবহার দেখে নিজেদের সাবধান হ'তে হয়, গৃহীরা যে ব্যবহার করে তাকি ইচ্ছামত করে? তাও তো একটা প্রাচীন রীতি দেখে করে, সেওতো কারও প্রেরণায় হ'য়েছে, সে প্রেরণার মূলওতো সেই সেখানে, (বেদ বা ঈশ্বর বাক্যে) তাহ'লে গৃহীর ব্যবহার, "ও কার ব্যবহার?" তাঁর তো? এই যে গৃহীরা অতিথি-সেবা করে, সে কে ক'রে? কার আচরণ সেটা? তবে? গৃহীর ব্যবহার দেখে সাবধান হ'তে হয়, ও ব্যবহার তোমায় শেখাবার জন্যে, সেদিন কে ব'লছিলো—আজকাল আর তেমন ভাল সাধুর দর্শন হয় না; তাতে' কথা বেরিয়ে প'ড়লো (শ্রীমুখের উক্তি) ভাল গেরস্ত হ'লেই ভাল সাধুর দর্শন হয়।

সাধু ও গৃহস্থের আচরণ সম্বন্ধে নিগূঢ় কথা বলিতে বলিতে একটু মুচকী হাসিয়া কি ভাবিয়া চুপ্ করিলেন, হঠাৎ চক্ষুদুটী রাঙা হইল, কিছু স্মরণ করিতেছেন, ক্রমশঃ আনমনা-ভাব পরিস্ফুট হইল, প্রায় তিন চার মিনিট কাল এইভাবে থাকিলেন। কেহ

প্রসঙ্গক্রমে প্রশ্ন করিল—বাবা! ভালো গেরস্ত কি? তদুত্তরে করুণাময় প্রভু বলিলেন —

## ভাল গৃহস্থ

ওগো! ছলেও যাঁরা কারুর ওপর কটাক্ষ করেন না—তাঁরাই ভাল গেরস্ত। উপোস-টোপোস ব্রত পার্ব্বণেই সবটা হয় না বুঝলে? ওইখান থেকেই গোড়া ধরে, ও গুলোকেই সার ক'রলে শেষটায় পথের সন্ধান চাপা পড়ে। বৃন্দাবন দাদা ব'ল্‌তেন—( ফরিদপুরের শ্রীবৃন্দাবন জ্যেঠা মহাশয়, ইনিও শ্রীজগবন্ধু প্রভুর সহচর ছিলেন ) হুঁ—পথ পাবে কি ক'রে, পথে তিনটে চাপা প'ড়েছে, শ্লোক চাপা, আচার চাপা আর বিধি-নিষেধ চাপা।

বলিয়া মৃদু হাসিলেন। একবার ফোঁড়াগুলির দিকে চাহিলেন, একটি ফোঁড়া ফাটিবার মত হইয়াছে, চাহিয়া হাসিলেন। এতটুকু উদ্বেগ নাই। ভক্তবৃন্দ অবাক্ হইয়া চাহিয়া আছেন। এক প্রিয়জন প্রসঙ্গক্রমে শ্রীগুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করিল—বাবা! আপনি ব'ল্‌লেন ব্রত-পর্ব্ব দিনে বাইরের কাউকে প্রসাদ দেওয়া বন্ধ, কেন বাবা? তদুত্তরে সেই স্নিগ্ধ হাসি মুখেই শ্রীগুরুদেব বলিলেন—

## বৈষ্ণবী মায়া

ও আমাদের মধ্যে একটা বৈষ্ণবী মায়া এসেছে। একাদশী বা অন্যান্য ব্রতের দিনে আমরা বলি যে, "আমরা না হয় বৈরাগ্যের ব্রত ক'রবো" তার জন্য ঠাকুর কেন বৈরাগ্য ক'রবেন? আরে বাপু! ঠাকুর যে মহা-বৈরাগী, বলনা গো তোমাদের পাঁজি পুঁথির কথাটা ( ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ। জ্ঞান-বৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা॥ ) তবে? বৈরাগীর ঠাকুর তো? তিনি দিলেন ( শ্রীসনাতন গোস্বামী-পাদ ) পোড়া আঙ্গা, তাও অলবণ, তা হোলে বোঝো তাঁর স্বরূপ কি, আমরা বৈষ্ণবী মায়ায় প'ড়েছি, তাই এখন ঐ সব ব্যবহার, বৈরাগ্যও তো তাঁর ( শ্রীভগবানের ) একটি স্বরূপ, তবে তুমি কোন ব্যবহারে সে-দিনে ( ব্রত পার্ব্বণের দিনে ) অতো ভোগের আয়োজন কর? তিনি তো এক পাতা তুলসী আর জলে বিকিয়ে যান, তা হোলে এ-সব ব্যবহার ( বিশেষ ভোগ-রাগের আয়োজন ) কার জন্য? হুঁ কি বলি বল—

ঐ কথা প্রসঙ্গেই স্মরণীয় প্রত্যক্ষ-দৃষ্টান্ত দিয়া আবার বলিলেন—

## কিশোরী কুণ্ডের বাবাজী

কিশোরীকুণ্ডে ললিতা দাস বাবাজী ছিলেন, তিনি কঠোর বৈরাগী। দর্শন করতে গেলাম, কোমরে একটি গাছের বাকল, শরীরটী এত শীর্ণ যে বাতাসে দুল্‌ছে, প্রণাম কোরে

চ'লে এলাম। কিছু দিন পরে একবার বনখণ্ডী মহাদেবের ওদিকে যাচ্ছি, দেখি কি, একজন টুক-টুক্ ক'রে লাঠি ধ'রে যাচ্ছেন, দূর থেকে চেনাই যাচ্ছেনা, একটু এগিয়ে গেলাম, চেনা মুখ মনে হোলো, প্রণাম করে ব'ল্লাম, বাবাজী মহারাজ! সেই শরীর আর এই শরীর? এমন কি ক'রে হোলো? তিনি হেসে ব'ললেন—"হুঁ" মনে ক'রেছিলাম দুটো নির্জ্জলা-ব্রত ক'রে—রূপ সনাতন হবো, তাই অনুকরণ ক'রছিলাম, সঞ্চয়ের জো নেই"—

শোনো তাঁর কথা, প্রথমে তো কঠিন ব্রতে ছিলেন, মাধুকরী ক'রে খান, তাতে তাঁর মনোবিকার দেখা দিতে লাগলো, শেষটায় ছেড়ে দিলেন। ব্রজবাসিরা ব'ল্লেন মহারাজ! এখানেতো ও-ভাবে চ'লবে-না, আপনার ভজনে বিঘ্ন হয় আমরা পাঠিয়ে দেবো, তাই তাঁরা ৯ মাস আধসের ক'রে দুধ পাঠিয়ে দিতেন, এখনতো এখানে। এবারে বাতে ধরেছে। বোঝো তা-হোলে ব্যাপার?

আবার ঐ কথা প্রসঙ্গেই বলিলেন—

## ব্রজে সঞ্চয়

দেখ ব্রজে সঞ্চয়ের কোন উপায় নেই, নিষ্কিঞ্চনের স্থান, ও ব্রজবাসিদের চোখ এড়াবার উপায় নাই, লাঠি পড়ে, এদের উপরেও (আমাদের জ্যেষ্ঠতম ভ্রাতারা অতি কঠোর বৈরাগ্যের সহিত সেখানে আছেন, তাঁহাদের মধ্যে শ্রীগৌরাঙ্গদাদা ও রজনীদাদার সম্বন্ধেই বিশেষ উক্তি) লাঠি প'ড়েছে, হুঁ হুঁ বাবা, ও লাঠী আর কারও নয়, ও তারই লাঠি (ব্রজেশ্বরের) ও হোলো ফকিরাবাদ, ও'-খানে সঞ্চয়ের-স্থান নয়। যাঁরা সেপথ দেখালেন (শ্রীষড়্-গোস্বামিগণ) তাঁদের আচরণ আর—অবস্থা দেখ—

নিষ্কিঞ্চনভাবে ব্রজে অবস্থিতির কথা শুনিয়া কেহ প্রশ্ন করিল—বাবা! ষড়্‌গোস্বামিগণতো বিরাট মন্দির, জমিদারী, আর ভোগের প্রচুর ব্যবস্থা করেছিলেন, তাহ'লে তাঁরা নিষ্কিঞ্চণ ছিলেন কি ক'রে? শ্রীগুরুদেব হাসিয়া উত্তর দিলেন—

## গোস্বামীগণের ঐশ্বর্য্য

আহা! তা কেন গো, সে সব কার? তিনি তো পোড়া আর অলবণের রুটী দিতেন (শ্রীসনাতন গোস্বামী)। ওমনি তো সবাই; তারপর জোর করে সেবা করিয়ে নিলেন, ওঁর দেখ-না (শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীর) শালগ্রাম শিলা থেকে আপনিই প্রকট হ'লেন, তা-হোলেই বোঝো, ওসব আয়োজন ব্যবস্থা তাঁরা করেন নি, যাঁর (শ্রীগোবিন্দের) দরকার হ'য়েছিলো তিনিই ক'রেছিলেন, সেবক কেন বাসনা করবে? তার আবার (সেবকের) স্বতন্ত্র বাসনা কোথায়? যখন যা খুসী, নিজে এসে, ছলে কৌশলে দেখা দিয়ে করিয়েছিলেন। প্রত্যেক বিগ্রহের প্রকটের কথা মনে করোনা।

শ্রীগুরুদেব ব্রজে শ্রীরূপ, সনাতনাদি গোস্বামীগণের আচরণীয় কথা বলিতে বলিতে ভাবাবিষ্ট হইলেন। মুখে তেমনি স্নিগ্ধ হাসি, চক্ষু দুইটী ঢুলু ঢুলু, শরীরে পুলকাদি সাত্ত্বিক-বিকার দেখা গেল। একটুপরেই নিজের প্রতি মহতের প্রত্যক্ষ-কৃপার কথা স্মরণ হইয়া আপন ভাবেই করুণা করিয়া বলিলেন—

## পূর্ব্বের সৌভাগ্য-রবি পশ্চিম আকাশে

**ওগো সব আছে সব আছে, সে চোখ কৈ? এ চোখে কি সব দেখা যায়? যাঁরা কৃপা ক'রে দর্শন দিয়েছিলেন** (প্রভু জগদ্বন্ধু, ব্রজবালা, চম্পটি মহাশয়, রঘুনন্দন-প্রভু, শ্রীরামহরি দাস বাবাজী মহারাজ প্রভৃতি) **তাঁদের ভেতর দিয়ে ওসব দেখা গেছে, সকলেই প্রকট ভোগ করেছেন।** ··

যাঁরা বাৎসল্যে স্নেহপরবশ হইয়া কৃপা করিয়া গৌর-গোবিন্দের প্রত্যক্ষ-লীলা অনুভব করাইয়াছিলেন তাঁদের অমায়িক প্রীতির কথা বলিয়া শ্রীগুরুদেব গভীরভাবে অন্তর্মনা হইলেন। তারপর ভাব সম্বরণ করিয়া একটু পরেই বলিলেন—দেখ ছোটবেলার একটি কথা মনে পড়ছে—

**স্মরিলে পূর্ব্বের কথা, অশ্রু জলে আঁখি ভাসে।**
**পূরব সৌভাগ্য-রবি আজ পশ্চিম আকাশে॥**

এই কবিতাটি আবার বলিলেন—এবার মৃদুস্বরে সুর করিয়া বলিতে লাগিলেন, বড় আবেশের সহিত বলিতেছেন, বলিতে বলিতে এত দুলিতে লাগিলেন মনে হইল পড়িয়া যাইবেন। একবার থামিয়া আবার গাহিলেন। হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সেই আবেশেই আস্তে আস্তে পায়চারি করিতে লাগিলেন। উপস্থিত সকলের মনে ভয় হইল, পড়িয়া না যান, কয়েকদিন অসুস্থতায় শরীর বড়ই দুর্ব্বল, কিন্তু ইহা স্বাভাবিক অবস্থায় দাঁড়ান নাই বুঝা গেল, দুই চারিবার পায়চারি করিয়া আবার আসনে আসিয়া বসিলেন। তখনও টলিতেছেন। ধীরে ধীরে সে আবেশটি গোপন করিলেন। তারপরেই শ্রীগুরুদেব উপস্থিত এক গুরুনিষ্ঠ ভক্তের দিকে চাহিয়া চাহিয়া হাসিতেছেন, একটু পরেই ঐ ভক্তকে লক্ষ করিয়া বলিলেন -

## মু কাহে গঙ্গা স্নানে জীবি

**শোনো শেনো উৎকল বাসী** (বাবাজীর কথা) **বাবাজীকে গঙ্গা-স্নানের কথা বলায়** (আজ কয় দিন হইতে এই দাদাটী গঙ্গা স্নানে যান না বাবা তাহা জানিয়াছেন) **তিনি ব'ল্লেন—মু**

কাহে গঙ্গা স্নানে জীবি? মোর পাদস্পর্শে গঙ্গা উদ্ধার হই জীবি, পাপী মানে উদ্ধার হেবে কেমতে –

বলিয়াই আনন্দে বালকের মত হাসিতে হাসিতে সকলকে মুগ্ধ করিলেন। সদানন্দময় শ্রীগুরুদেবের এই অবস্থা দেখিয়া সমাগত ভক্তবৃন্দের আনন্দের সীমা রহিল না। নিদারুণ ফোঁড়া ও জ্বরের তীব্র বেগে যে শ্রীগুরুদেবের কোন আবেশ আছে ইহা কেহই জানিতে পারিলেন না। ৯টা বাজিল ; শ্রীগুরুদেবের আনন্দময় মুর্ত্তিখানি দর্শন করিতে করিতে সকলে একে একে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলেন। বাহিরের দরজা বন্ধ হইল।

---

১৪ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৬ সাল। কলিকাতা বৈকাল ৫টা হইতে ৬৷৷০ ও ৭৷৷০—৮৷৷০

শ্রীগুরুদেবের শারীরিক অবস্থা এইরূপ দেখিয়া তাঁহাকে আনন্দ দিতে অনুগত সেবকবৃন্দ ভগবৎ-কৃপা প্রার্থী হইয়া অদ্য হইতে অনির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য অখণ্ড নামযজ্ঞের আয়োজন করিয়াছেন। আজ সকাল হইতেই নামের ধ্বনিতে শ্রীগুরুদেব বেশ প্রফুল্ল। আশ্চর্য্য ঘটনা, শ্রীগুরুদেবের ফোঁড়াগুলি দুপুর হইতে মলিন হইতেছে। বৈকালে অনেকেই উপস্থিত হইয়াছেন। শ্রীগুরুদেব যে ঘরে বসিয়া আছেন তাহার সামনের দরজাটী খোলা, পূর্ব্বদিকের সম্পূর্ণ ছাদটী দেখা যাইতেছে। শ্রীগুরুদেবের নিত্যসহচর কোন এক মনোজ্ঞ সেবক করতাল জোড়াটী হাতে লইয়া নামের কাছে আসিতেছেন, তাঁহাকে দূর হইতে দেখিয়া শ্রীগুরুদেব অপলক-দৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন, অকস্মাৎ আবেশভরে বলিলেন—

### বণিক কুলের নাথ

সুবর্ণ বণিক, তিনি ব'লতেন, "বণিক কুলের নাথ নিত্যানন্দ রায়", অত কৃপা আর কোনও কুলে বিকাশ হয় নাই। যিনি যে কুলে জন্মেছেন সে কুলের আদর্শ মনে ক'রলেই কাজ এগিয়ে যাবে, তাঁর ভাণ্ডারে ( শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরিবার বর্গে ) কিছু বাকী রেখে যান নি। সে আদর্শ ভুল হ'লেই এপথে ( বৈষ্ণব-রাজ্যে ) বিষম বাধা। তখন নানা সংসর্গে প'ড়ে আবার বিষম ধাক্কা আসে।

বলিতে বলিতে সেইরূপ আবেশভরা রাঙা দুইটী চক্ষুতে পার্শ্ববর্ত্তী অনুগতজনের প্রতি একবার চাহিলেন। উৎকণ্ঠিত-চিত্তে জিজ্ঞাসু হইয়া এক প্রিয় ভক্ত প্রশ্ন করিলেন—বাবা! নানা সংসর্গ কি? তদুত্তরে শ্রীগুরুদেব বলিলেন—

## ঐ তো গোড়া

কেন গো! এই ধরণা আহার ব্যবহার, আহারেতেই তুষ্টি-পুষ্টি হয়, সেই মনোবৃত্তিতেই তো ব্যবহার আস্‌বে, আদর্শ মনে রাখা আর ভুলে যাওয়ার ঐ তো গোড়া।

বলিয়াই একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়িলেন, বড় গভীর ভাবেই মনে হইল। আর কিছু বলিলেন না, চুপ করিয়া রহিলেন। কেহ প্রশ্ন করিল—বাবা! প্রথমে আহার ব্যবহারের সংযম, নিয়ম-পালন ক'রে চিত্তশুদ্ধি আস্‌বে তো? তারপর ধীরে ধীরে একাগ্রতা এলে নাম-গ্রহণ করা তো জীবের পক্ষে বিশেষ অনুকূল হয়, তাতে রুচি, নিষ্ঠা সবই তো সুগম হয়? এ ধরণের প্রশ্ন শুনিয়াই শ্রীগুরুদেব আচার্য্যের দৃঢ় কণ্ঠস্বরে বলিলেন—

## এবার এদের আসা কেন

সে আবার কি? এ যুগে আবার ওসব কায়দা-কানুন চলে নাকি? চিত্ত তো সদাই চঞ্চল, মায়ার প্রলোভন চারদিকে ঘিরে আছে, কলিরাজের আকর্ষণ প্রতি মুহূর্ত্তে, সেখানে আবার ঐ সব রীতির সময় থাকে নাকি? ওতো আগের যুগে ছিলো, তবে এবার এদের আসা কেন? তাইতো তিনি ব'লে গেলেন—"সংকীর্ত্তন হইতে পাপ সংসার নাশন। চিত্ত-শুদ্ধি সর্ব্বভক্তি সাধন উদ্‌গম" তোমাদের কবিরাজী শাস্ত্রে,কি, আছে! পিত্তদূষিত হ'লে মিছরী তেঁতো লাগে, তা ব'লে কি খাবেনা? খাবে, এটা ওটায় মিশিয়ে অল্প অল্প খাবে, খেতে খেতে পিত্ত কেটে যাবে, তখন ঐ ছাড়া আর কিছু ভাল লাগবে না, বাসনা কামনা থাক্‌তে নাম-গ্রহণে আবেশ আসে না, তাই কীর্ত্তন গান-নাচের ভেতর দিয়ে অল্প অল্প ক'রে তাতে আকর্ষণ কর্‌বার রীতি রেখে গেছেন, তাই দিয়েই কাজ হাসিল ক'র্‌ছেন তিনি, দেখ্‌ছো না কত কাণ্ড না ঘটাচ্ছে সে? লোকে বলাবলি ক'র্‌তো চোর-বদ্‌মায়েস্‌ খুঁজতে চাও ওমুক বাবাজীর (বাবা মৃদু হাসিয়া নিজের দিকে চাহিয়া) কাছে যাও, হ্যাঁ বাবা, আমিও বলি, এ তোমার বেশ খেলা—

বলিয়া কৌতুকময় চাহনির সহিত খল খল করিয়া হাসিতে লাগিলেন। শ্রীগুরু অনুগতবৃন্দও বেশ তৃপ্তি পাইতে লাগিলেন। শ্রীগুরুদেবের আবেশ গভীরতর হইয়াছে অথচ বাহ্যতঃ যেন সকলের অতি ঘনিষ্ঠ বান্ধবের মত কথা কহিতেছেন, এদিকে শ্রীমুখখানিতে রক্তিম আভা ভরিয়া গেছে, চক্ষু দুইটিতে করুণায় জলের উজ্জ্বলতা আসিয়াছে, মুহুর্মুহু কম্পন হইতেছে। পুনরায় কেহ প্রশ্ন করিল বাবা !

কোন উত্তর করিলেন না, আবিষ্ট আছেন; আবার বলিল—বাবা ! সহজ কোমল স্বরে উত্তর দিলেন—কিগো !

আহা কি মধুর ! কি আকর্ষণ ! কি করুণা ! গদ গদ কণ্ঠস্বর ! শ্রীগুরুদেব তেমনি ভাবেই চাহিয়া আছেন। নামজপের মৃদু কম্পন দুটী ঠোঁটে বিকাশ পাইতেছে। ভক্ত বলিল—নাম-গ্রহণ করিলে তো সর্ব্ববিধ পাপ যায়। আবার একটু এদিক ওদিক হ'লেই তো অপরাধও হয়, তখন ? শ্রীগুরুদেব কথা শুনিয়া আরও উল্লাসের সহিত বলিলেন—কেন গো !

## যে মাটিতে পড়ে লোক

**তোমাদের একটা চলিত কথায় আছে না "যে মাটিতে পড়ে লোক, উঠে তাই ধ'রে" তবেই, যার কাছে অপরাধ তারই কাছে খণ্ডন। বল না তোমাদের পাঁজি পুঁথির কথাটা "ভূমৌ স্খলিত"**(ভূমৌ স্খলিত-পাদানাং ভূমিরেবাবলম্বনং। ত্বয়ি জাতাপরাধানাং ত্বমেব শরণং প্রভো ॥)

ভক্ত জিজ্ঞাসা করিল—বাবা ! "নাম-অপরাধ ঘট্‌ছে কি ক'রে জান্‌তে পার্‌বো" ?

**কেন, ঐ যে বল্‌লেন—"সর্ব্বশুভোদয় কৃষ্ণে পরম উল্লাস" তাতে বিঘ্ন হ'লেই বুঝতে হবে অপরাধ ঘ'টছে। তারপর শ্রীগুরুদেব করুণা করিয়া আবার বলিলেন—**

## আরও বিষম ল্যাঠা

**ওগো ! এসব তো আছেই, আরো বিষম ল্যাঠা আছে জান ? সে হ'লো প্রতিষ্ঠা। তোমাদের তিনি** ( শ্রীভৈরব চন্দ্র গোস্বামী, বাবার অন্যতম গুরুদেব ) **ব'ল্‌তেন* রামদাস ! নাম ক'র্‌তে ক'র্‌তে তিনজন** ( অভিমান, গৌরব ও প্রতিষ্ঠা ) **এসে দেখা দেবে, সাবধান ! এদের খপ্পরে পোড়ো না।**

---

*শ্রীভৈরব গোস্বামী, ইনিও বাবার অন্যতম গুরুদেব, ইঁহার আবির্ভাব স্থান হুগলী জেলায় সিঙ্গুরে, এবং সমাধির স্থান হাওড়া সহরের দেড় মাইল পশ্চিমে জিগাছা শ্রীনিত্যানন্দ আশ্রম, এই আশ্রমটি বাবার নামে তত্রস্থ অধিবাসিগণ ( তাঁহাদের মধ্যে আমাদের গুরুভ্রাতা ৺তারক পাল দাদাই প্রধান উদ্যোক্তা ) **উৎসর্গ করিয়াছেন। প্রতি বৎসর বৈশাখে তাঁহার অন্তর্ধানের দিনে বিশেষ উৎসব হয়।**

অভিমানং সুরাপানং গৌরবং রৌরবং তথা।
প্রতিষ্ঠা শূকরীবিষ্ঠা ত্রয়ং ত্যক্ত্বা হরিং ভজেৎ ॥

প্রতিষ্ঠার ভয়ে সরে যাবে আর প্রতিষ্ঠা ও তাঁর ইচ্ছায় নানা কৌশলে পেছনে পেছনে ছুটবে। বড় বিষম পথ, তাঁর নাম-গ্রহণ আর সর্ব্বদা কৃপা-প্রার্থনা, নইলে পথটাই পাওয়া বড়ই মুস্কিল।

এইরূপ অভিমান, গৌরব ও প্রতিষ্ঠা দ্বারা ভজন-বিঘ্নাবস্থায় সর্ব্বদা কৃপা-প্রার্থী হইয়া নাম-গ্রহণের প্রসঙ্গ হইতেছে, ইত্যবসরে বরাহনগর পাটবাড়ী হইতে শ্রীগুরু-অনুগত এক সেবক শ্রীগুরুদেবকে দর্শন করিতে আসে। কিছুদিন পূর্ব্বে বৃন্দাবনে তাঁহার ভেক-আশ্রয় হইয়াছে, সেবকটীর বড় স্নিগ্ধ স্বভাব, অল্পভাষী ও নামনিষ্ঠ এবং বৈষ্ণবশাস্ত্র আলোচনায় প্রবিষ্ট। শ্রীগুরুদেব তাহাকে দেখিয়াই একটু গম্ভীর হইলেন, মনটী যেন সঙ্কুচিত হইল, যে স্বরে কথা বলিতেছিলেন তাহার পরিবর্ত্তন হইল, প্রায় আক্ষেপের স্বরই প্রকাশ পাইল, সেইভাবে প্রসঙ্গ-ক্রমে ভেক-আশ্রয়ের নিগূঢ় কথা বলিলেন—

## সাপ পেছনে পেছনে ঘুরছে

হুঁ ভেক্, দেখ দেখি, কি সব ব্যবহার চ'লছে, ধ'রলো আর কাপড় ছিঁড়ে পরিয়ে দিলে; ও তো আশ্রয়, তা ওই কি গোড়াতেই ধরাতে হবে? তার আগে কি আর আশ্রয় নেই? সে সব, হ'য়েছে তো? ( অর্থাৎ—নাম-আশ্রয়, শ্রীগুরু-পদাশ্রয়, মন্ত্রাশ্রয়, ভাবাশ্রয় ও বেশাশ্রয় ) ও আশ্রয়ের পরিণাম তো অনেক দেখালেন তিনি, পাকা গুটিও কেঁচে গেল তাও দেখিয়েছেন, যদি সে রকম কিছু ঘটে তার ম্যাও ধ'রবে কে? সে ধাক্কা লাগ্‌বে কোথায়? ওপথে বলা আছে ( ভেকাশ্রয় হইলে ( গ্রাম্যকথা বলা শোনা নিষেধ, সঞ্চয় থাকবে না। তা হ'লে এই যে সব ধ'রছে আর কাপড় ছিঁড়ে পরাচ্ছে এর ফল ভাল হচ্ছে কি? ভেক্ ভেক্ বুঝলে? সাপ পেছনে পেছনে ঘুরছে?

অন্তরঙ্গা-মহাশক্তি-স্বরূপিণী শ্রীরাধা ঠাকুরাণীর দাসীভাবে-বেশাশ্রয়ে শ্রীগুরুরূপা-সখীর আনুগত্যে সেব্যের সুখবিধানে তৎপরতাই হইল ভেকাশ্রয়ের তাৎপর্য্য।

এইভাবে শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখ-নিঃসৃত "ভেক-আশ্রয়ের" সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ কথা শুনিয়া সেবকটী এই বেশ ধারণে নিজেকে সর্ব্বথা অযোগ্য মনে করিয়া কৃপাপ্রার্থী হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে শ্রীগুরুদেবের সম্মুখ হইতে সরিয়া গেল। শ্রীগুরুদেবও গম্ভীর হইয়া রহিলেন। সন্ধ্যা হইয়াছে, আরত্রিক আরম্ভ হইল, অখণ্ড নামের সহিতই সন্ধ্যা-কীর্ত্তনও হইতে লাগিল। অনুগতবৃন্দ একত্র হইয়াছেন, শ্রীগুরুদেব ধীরে ধীরে

উঠিয়া দরজার নিকট একটুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন, হাতে নামমালা, কাঁধে চাদরখানি শিথিলভাবে ঝুলান আছে ; কিছুক্ষণ পরে করজোড়ে ভূমিতে বসিয়া প্রণাম করিলেন। পরে নিজ আসনে আসিয়া বসিলেন—দেখিয়া ভক্তবৃন্দ শ্রীগুরুদেবের কাছে আসিতেই নিত্য শ্রীঅঙ্গ-সেবক ইঙ্গিতে তাঁহাদিগকে সরিয়া যাইতে নির্দ্দেশ দিয়া বলিল—"শ্রীগুরুদেব স্মরণে বসিয়াছেন!" একটু পরেই দরজাটি অল্প ফাঁক রাখিয়া বন্ধ করা হইল। কীর্ত্তন ও নামের ধ্বনি আজ মৃদু-মধ্য সুরে হইতেছে, সোওয়া সাতটা বাজিয়া গেল, শ্রীগুরুদেব নামস্থলীতে প্রণাম করিতে আসিতেছেন দেখিয়া ভক্তবৃন্দকে শ্রীগুরুদেবের শারীরিক অসুস্থতায় প্রণাম করিতে বারণ করা হইল। সকলেই মনে মনে প্রণাম করিলেন, এবং তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজন আবার শ্রীগুরুদেবকে ঘিরিয়া বসিলেন। শ্রীগুরুদেবও সদানন্দময় মূর্ত্তিতে বসিয়া আছেন। শ্রীগুরুদেবের এক প্রিয়তম সেবক দক্ষিণদিকে বসিয়া শ্রীগুরুদেবের নিত্য পাঠ্য গ্রন্থগুলি পাঠ করিয়া শুনাইতে লাগিলেন। ঘরটি নীল ও স্নিগ্ধ, অল্প উজ্জ্বল আলোকে বড় সুন্দর হইয়াছে, বেশ মধুর গন্ধ ধূপবাতির সুবাস সারা ঘরখানিকে আমোদিত করিয়াছে। অন্যান্য গুরুভগ্নিগণও ঘরের বারান্দায় বসিয়া পাঠ শুনিতেছেন। রাত্রি ৮৷৷০ টার পর বিরতি হইলে সকলে প্রণামান্তে বাহিরে আসিলেন।

---

১৩৫৬ সাল। ১৮ জ্যৈষ্ঠ কলিকাতা। সকাল ৮টা হইতে ৯টা।

দুই তিন দিন হইল ফোঁড়াগুলি প্রায় বিলীন হইয়াছে, শ্রীগুরুদেব স্বাভাবিক অবস্থায় আছেন। নিত্য দর্শন-প্রার্থী শ্রীগুরু-অনুগতজন যেমন অনেকে আসিয়া নিকটে বসেন আজও তেমনি; শ্রীগুরুদেবও প্রতিদিনের মতই তাঁহাদের সহিত নানা প্রসঙ্গে আছেন ; গরম পড়িয়াছে খুব বেশী, উজ্জ্বল শ্যামলাবণ্যভরা অঙ্গে ঘর্ম্মের বিন্দুগুলিকে কর্পূর দানার মত দেখা যাইতেছে, বাঁদিকে এক অনুগত সেবক পাখায় বাতাস করিতেছেন, শ্রীগুরুদেবের মন গম্ভীর। আশে পাশে অনেকেই বসিয়া আছেন, কোন এক অনুগতজনের প্রতি শ্রীগুরুদেবের দৃষ্টি পড়িয়াছে, তাঁহার প্রতি কিছুক্ষণ চাহিয়াই চোখ ফিরাইয়া লইয়া কি ভাবিয়া বলিলেন—

## সংযম শিক্ষা হবে

এবার পাঁজি পড়গো পাঁজি পড়, এত দেখে শুনেও তো কিছু খাতে লাগছেনা, ওতে অনেক জিনিষ লাভ হবে, সকালে উঠে সেই দিনটার কৃত্যগুলি ভাল করে পড়গে অনেক কাজ হবে।

হঠাৎ শ্রীগুরুদেব একথা বলায় কেহ প্রশ্ন করিল—বাবা! পাঁজি পড়লে কি হবে? মুখ ফিরাইয়া উত্তর দিলেন—"সংযম শিক্ষা হবে" তারপর আবার বলিল—বাবা! পাঁজির ব্যবস্থা সম্বন্ধে একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো? শ্রীগুরুদেব বলিলেন—"বল", সে বলিল—ওতে দিন-তিথি হিসেবে আছে স্ত্রী, তৈল, মৎস্য নিষেধ। তাতে অনেকে বলেন আগেকার মুনিদের কাণ্ডই আলাদা, স্ত্রীজাতিটাকে তৈল-মৎস্যের সামিল ক'রেছেন; তাদিকে আর মানুষ বলে শ্রদ্ধা করার অবসর দেন নাই। কথাটী শুনিয়া শ্রীগুরুদেব হাসিলেন, মালার সংখ্যা রাখিয়া একটুঠেস দিয়া বসিলেন, তারপর বলিলেন—

তাঁদের কাণ্ড না তোমাদের কাণ্ডই আলাদা, শ্রদ্ধা করার বাধা দিচ্ছে কে? ও'দের যে (স্ত্রীজাতির) আর একটি স্বরূপ আছে সেটা জানত? একটি নাম কামিনী, কথাটীতে নজর এলে দেখতে পাবে কাম্-ইনি; নিজের সর্ব্বনাশের পথে তাঁকে (স্ত্রীজাতিকে) না দেখলে কি তাঁর ওপর শ্রদ্ধা করার আর পথ নাই? তাঁরা (মুনিরা) না বুঝেই কি ওকথা বলেছেন? এবার ভেবে দেখ পাঁজিতে ওসব কেন লেখা আছে।

কামিনীকে মূর্ত্তিমতী "কাম্-ইনি" স্বরূপে না দেখিয়া কৃষ্ণ-সেবাপ্রাণা কৃষ্ণ-সেবার্থে অঘটন-ঘটন-পটীয়সী জগৎ-পালিকা যোগমায়ার অংশ-স্বরূপিণী যে মহামায়া তাহারই কার্য্য-সাধিকা-মাতৃরূপে কামিনীকে দেখিলে শ্রদ্ধার উদয় হইয়া থাকে। জগৎকে ভগবানে উন্মুখী করিতে বহিরঙ্গা মহামায়া ভগবদ্-বহির্মুখী জীবকেই শাস্তি দিয়া থাকে।

এইভাবে কথা বলিয়া শ্রীগুরুদেব আবার গম্ভীর হইলেন। পরে বলিলেন—

## স্বভাবের দোষে কৃপা ভোগ হচ্ছে না

চুপ কর চুপ কর, ওকথা ব'লতে নাই, ওপরে দোষ প'ড়ে। অঙ্গীকার যখন ক'রেছে তার আগেই কৃপা পড়েছে, বল-যে নিজের স্বভাবের দোষে কৃপা ভোগ হচ্ছেনা, কৃপা তো সর্ব্বদাই হচ্ছে, তুমি যে নিজের স্বভাব, কর্ম্ম ছাড়তে পারছো না - তাই বল না, ও কথা বললে যে আঘাত আসে।

স্বভাবের দোষে কৃপাভোগে বঞ্চিত হওয়ার কথা বলিতে বলিতে শ্রীগুরুদেব যেন ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। কেহ প্রশ্ন করিল—বাবা! এতো বড় মুস্কিলের কথা, কৃপা ও সর্ব্বদা আস্‌তে থাকুন আর স্বভাবকষ্ট ও চল্‌তে থাকুক্, এ গরমিল যাবে কি করে? এইবার শ্রীগুরুদেবের মুখে হাসি ফুটিল, তেমনি হাসিমুখেই বলিলেন—

## আমির চেষ্টা গেলেই খাস দখলে

কিছুদিন কোন চেষ্টা না ক'রলেই গভর্ণমেণ্টের খাস দখলে যাবে, বলিয়া খিল খিল করিয়া হাসিলেন। তারপর ভক্ত বলিল— "সে আবার কি বাবা!" শ্রীগুরুদেব বলিলেন—"ওগো তা আর বুঝলে না, এই "আমি" গেলেই খাস দখলে এলে, তিনি তো সর্ব্বদাই ছুটছেন কিসে জীবের কল্যাণ হবে, জীব যে "আমির" আড়ালে তাঁকে ঠেলে ফেলছে. আমির চেষ্টা গেলেই খাস দখলে। হ্যাঁ গা! উনি না (শ্রীগুরু) বাঞ্ছা কল্পতরু, তবে?

বলিয়াই শ্রীগুরুদেব আবেশে আত্মহারাভাবে অস্ফুট-স্বরে কি বলিলেন। এক মিনিট কাল সকলেই স্তব্ধ হইয়া আছেন, শ্রীগুরুদেবকে আবার কেহ বলিল—বাবা। তবে যে আপনি নিজে আবরণ ক'রে আমাদিগকে ইঙ্গিতে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ওসব যাজন করতে বলেন? সে সব না ক'রলে দুঃখিত ও হ'ন, কাঁদেনও; এতে কি বুঝবো? প্রিয়ভক্তের কথা শুনিয়া শ্রীগুরুদেব করুণা করিয়া বলিলেন—

## মাঝির কাজ মাঝি করবে

ও-তরফের (শ্রীগুরুর) কৃপা যখন পড়েছে, অঙ্গীকার পত্র দিয়ে বাঁধা-পড়া হয়েই গেছে, প্যায়দা যখন ধরেছে হাজির সে করবেই, তবুও যে যাজনের উপদেশ, সে কেবল কাজ হাল্কির জন্যে, তাড়াতাড়ির জন্যে, বৃথা কেন সময় নষ্ট করা—তাই। মাঝি যে দাঁড়টা ধরতে ব'লেছে সে তো তোমারই সুবিধের জন্যে, দাঁড়টা এদিক ওদিক কর যদি তাতে বেগও পাবে দেরীও হবে, কিছু না কর সে ভাল, মাঝির কাজ মাঝি ক'রবে......

এই ভবপারের কাণ্ডারী শ্রীগুরুদেবের করুণার কথা শুনিয়া প্রিয়ভক্ত বলিল—বাবা। সে তো বেশ মজা, কিছু করতে হবে না, মাঝি নিয়ে যাবে।......শ্রীগুরুদেব ভক্তের কথায় আরও হাসিয়া বলিলেন—

হুঁ হুঁ বড় সোজা কথা কিনা, মাঝির ওপর আত্ম-সমর্পণ অত সোজা নয়।

সে অধিকার এলে তো ঐ কথা? তিনি (শ্রীবড় বাবাজী মহাশয়) ব'লতেন জীবের তিনটী অবস্থা আসক্তি, বিরক্তি আর অনাসক্তি। ঘর বাড়ী, টাকা-কড়ি, মান মর্য্যাদা, লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাতে যে মমতা তাকে বলে আসক্তি, এতেই তো সংসারের সব কিছু, আর এতেই যাওয়া আসা সংসারে। এ ছাড়া হোলে তবে বিরক্তির দশা, এক এক বৃক্ষতলে এক একদিন বাস, অলবণে বনের শাক্ পাক্, সাক্ষাৎ মদনমোহনও নুন চাইলে পান না, দিবা-রাত্রির মধ্যে ছাপ্পান্ন দণ্ড স্মরণ, চার দণ্ড বিশ্রাম। গায়ের ভোট কম্বলটীও বদলে ছেঁড়া কাঁথা বহন, এ হোলো বিরক্তি। তারপর তো অনাসক্তি তখন ওস্তুটির অবস্থাই থাকে না যেমন নাচাও তেমনি নাচি এই দশা।

বেলা হইতেছে দিনের তাপ ক্রমশঃ বাড়িতেছে, তাই সেবকবৃন্দের ইঙ্গিতে আগন্তুকগণ একে একে উঠিলেন। শ্রীগুরুদেব মালা রাখিয়া গুন্‌গুন্‌ স্বরে গান করিতে করিতে উঠিলেন, মুখে মৃদুহাসি। অযাচিত কৃপাকারী শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখ-নিঃসৃত বাণী স্মরণ ক'রে, তাঁরই কথা প্রসঙ্গে অবস্থিতিই একমাত্র বাবার জীবাতু। কেমন ক'রে পতিত জীবকে করুণা করিয়া ভালবাসতে হয়, তাহাই দেখাইতে ভালবাসাই মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আজ স্বয়ং ভগবানই শ্রীগুরুরূপে প্রত্যক্ষ বিহার করিতেছেন। সে মধুর মুরতি একবার দেখিলে আর ভোলা যায় না, দুঃখময় সংসার-চক্রের আবর্ত্তনে জীব যতই নিজ কর্ম্মফলে ভ্রমণ করুক না কেন, সব কিছুই ভুল হয়ে যায়, সদাই মনে পড়ে সেই পরমানন্দময় মূরতিখানি। সেই প্রেমময় মূরতি দর্শন করিতে করিতে সকলে প্রণাম করিয়া নিজ নিজ গন্তব্য পথে গমন করিলেন।

---

**১৩৫৬ সাল। ১৯ জ্যৈষ্ঠ। কলিকাতা। সকাল ৭টা হইতে ৯টা**

শ্রীগুরুদেবের দর্শন-প্রার্থী বহুভক্ত সমুপস্থিত হইয়াছেন। আজ যিনিই ঘরে ঢুকিতেছেন তাঁরই চোখ শ্রীগুরুদেবের মুখের উপর পড়িতেছে। শ্রীগুরুদেবের স্বচ্ছ-উজ্জ্বল চক্ষু দুটীতে বেশ গাঢ় রাঙা আভা, মুখের ভাব গম্ভীর, কিছু ভাবিতেছেন কিংবা শারীরিক কোন ক্লেশের ছায়া পড়িয়াছে বুঝা যাইতেছে না, গতকাল রাত্রে সামান্য বৃষ্টি হইয়াছে, গরমের বেগটা কিছু শান্ত, সকালটাও মেঘলা, শ্রীগুরুদেবের অবস্থিতি এমনি বিচিত্র যে গম্ভীর হইলে তাঁহার সহিত কথা কওয়া তো দূরের কথা নিত্য সেবকগণও কাছে যাইতে সহজে পারে না, আগন্তুকগণের তো কথাই নাই। শ্রীগুরুদেব স্বেচ্ছায় কথাপ্রসঙ্গে হাসি মুখে বাঁকা চোখের চাহনিতে সকলের দিকে ফিরিয়া একবার চাহিলেন, উদাসীর এই বাল্য-স্বভাবে সকলেই তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলিলেন। এক প্রিয়জন প্রফুল্ল মুখ দেখিয়া বলিলেন—বাবা! কাল যে আসক্তি, বিরক্তি আর অনাসক্তির কথাটী ব'ল্‌লেন তাতে একটি কথা জিজ্ঞাসা ক'রবো? শ্রীগুরুদেব বলিলেন—"কি বল"। সে বলিল—আসক্ত আর বিরক্তের স্বরূপ না হয় দেখা যায়—কিন্তু অনাসক্তের কথা তো শোনাই যায় ও কি

আর আশা আসে ? শ্রীগুরুদেবের মুখে চাপা হাসির বিকাশ, আবার মালাটী হাতে লইলেন মুখখানি একটু নীচু করিলেন, কি যেন দেখিলেন, সহজ চাহনিতে চাহিয়া বলিলেন—

## কৃপা সিদ্ধের সাধন

কৃপায় কি না হয়, সব অসম্ভব সম্ভব হয়, "লাগি রহ রে ভাই, বনত্ বনত্ বনি যাই" এ রাজ্যে যিনি পাঠিয়েছেন যোগ্যা যোগ্যের বিবেচনা তাঁর, অবশ্য-কর্ত্তব্য পালন ক'রলে কিছু আট্‌কাবে না। কৃপার প্রাণ বিশ্বাস, সেটি তো থাকা চাই, যাঁরা কৃপাসিদ্ধের গণ তাঁদের এই তো সাধন। এই সব। ওঁর গণের কথা ভাব তো? ( শ্রীপুণ্ডরিক বিদ্যানিধি, বিলাসী কৃষ্ণদাস, ঠাকুর শ্রীনরোত্তম, শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ প্রভৃতি গৌরগণের কথা )

আধ আধ ভাষায় শ্রীগুরুদেব যাহা বলিলেন, তাহাতে আর প্রশ্ন করিতে ইচ্ছা হইল না, তবুও কেন যেন অস্পষ্ট হইয়া রহিল, তাই একজন প্রিয়ভক্ত জিজ্ঞাসা করিল— আচ্ছা বাবা ! কৃপায় যদি সবই হয় তবে আবার ব'ল্লেন কেন "কৃপাসিদ্ধের এই তো সাধন, তবুও সাধন চাই ?" লোকে পারে না ব'লেই কৃপার ভরসা রাখে। কথা শুনিয়া শ্রীগুরুদেব ঘাড় নাড়িয়া অস্ফুটভাবে কিছু বলিয়া আবার বলিলেন—

## দুটীর তফাৎ ঢের

হ্যাঁ গো হ্যাঁ, এ রাজ্যে ও রাজ্যে তফাৎ কেবল দৃষ্টির ফের, বিশ্বাস মহাশয়ের সঙ্গে দেখা হ'লেই সব খুলে যাবে, কৃপার পরও সাধনের দরকার, আবার কৃপালাভের জন্যে ও সাধনের দরকার, দুটীর তফাৎ ঢের।

শ্রীগুরুদেব "বিশ্বাসে মিলয়ে বস্তু তর্কে বহুদূর" এইরূপভাবে কৃপা-লাভের কথা বলিয়া চুপ করিলেন, শ্রীমুখে এমন একটি ভাবের বিকাশ হইল যেন তোমরা আবার জিজ্ঞাসা কর; তাই এমন সময় কেহ প্রশ্ন করিল—কি তফাৎ বাবা ! ভক্তের কথা শুনিয়া করুণাময় শ্রীগুরুদেব বলিলেন—

## সম্পত্তি যেন নষ্ট না হয়

ও কি জান ? এই ধর অযোগ্য সন্তান, বিদ্যা-বুদ্ধি কিচ্ছু নাই, সম্পত্তি উপার্জ্জনও ক'রতে পারবে না, পিতা যেমনি ধনী তেমনি বুদ্ধিমান, অনেক চেষ্টা ক'রলেন ছেলেকে বিদ্যা শিক্ষা দিতে, কিন্তু হোলো না। শেষে স্থির ক'রলেন সম্পত্তি তো দিতেই হবে তবে রক্ষা করবার জন্যে দুটো কথা বলি, দেখ ! তোমায় আর কিছু ক'রতে হবে না, সব দিচ্ছি, কিন্তু তোমায় একটি কাজ করতে হবে। তুমি কেবল সব সময় লক্ষ্য রেখো এই সম্পত্তি

যেন নষ্ট না হয়, ব্যস্ তা হোলেই হোলো। বাবা নিশ্চিন্ত হ'লেন, ছেলেও দিনরাত নজর রাখে সম্পত্তি যাতে নষ্ট না হয়, এই হোলো কৃপাসিদ্ধের সাধন। প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষা, প্রাপ্তির আর আকাঙ্ক্ষা নাই, পিতার আদেশ পালনই তার কাজ। আবার কৃপার জন্যে যে সাধন তা হ'লো রোজকার; পিতা পিতামহের তেমন কিছু পায় নাই, সংসার তো চালাতে হবে, তাই তাকে একটি পথ ধ'রতে হোলো, তা সে চাকরীই হোক, ব্যবসাই হোক, তার জন্যে দিনরাত চেষ্টা, এ হো'লো কৃপালাভের সাধন। অনুকূল গ্রহণ আর প্রতিকূল বর্জ্জন, এ হোলো কৃপাসিদ্ধের সাধন।

শ্রীগুরু-কৃপা-প্রদত্ত-ভক্তি-সম্পত্তি-সংরক্ষণে অনুকূল ভাব গ্রহণ আর প্রতিকূল ভাব-বর্জনের কথা বলিতে বলিতে শ্রীগুরুদেব আদরভরা দৃষ্টিতে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিলেন। এমন কমনীয় মূর্ত্তিকে কথা বলাইয়া চঞ্চল করিতে ইচ্ছা হয় না, স্বভাব-কোমলরূপে কিছু চিন্তা করার ছাপ পড়িলে আনন্দময় মূর্ত্তিখানিতে যেন অন্য রাজ্যের আবেশ আসে; কিন্তু আমরা নিয়তই এ রাজ্যের বিষয় বস্তুতে আকৃষ্ট, তাই আমাদের মতই করিয়া তাঁহাকে পাইতে চাই, আর এ জগতের সব কিছু তো সরল নয়; তাই একান্ত সরল এই মূর্ত্তিখানিই তাঁহার প্রয়োজন বুঝিয়া নিজেই আকর্ষণ করেন, প্রশ্ন করার প্রবৃত্তি যে তাঁরই দান; তাই না আবার তাঁহাকে ভক্ত জিজ্ঞাসা করিল— বাবা! গ্রহণ বর্জ্জনের তারতম্য নির্দ্ধারণ হবে কি ক'রে? শ্রীগুরুদেব উত্তর দিতে অপেক্ষাই করিলেন না, তেমনি ভাবেই বলিলেন—

## শরণাগতি

কেন গো শরণাগতি এলেই তো গ্রহণ বর্জ্জন সহজ হ'য়ে যায়. বল না তোমাদের পাঁজি পুঁথির কথা—কৃপার প্রাণ তো বিশ্বাস, তিনি দৃঢ় হ'লেই শরণাগতি* তখন আর কোনটি অনুকূল কোনটি প্রতিকূল বলে দিতে হবে না, (শাস্ত্রে শরণাগতি ছয় প্রকার বর্ণনা ক'রেছেন) উনি ব'লেছেন (নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের উক্তি) "সতী সতী যেন সতীপতি।" অসতীরা তো উদ্বেগ দেয়. সেবা তো সুখ দেওয়া, আনুগত্য আর নিষ্ঠা এলে কাকেও কিছু ব'লে দিতে হয় না।

---

*শরণাগতি ছয় প্রকার—"আনুকূল্যস্য সংকল্পঃ প্রাতিকূল্যস্য বর্জ্জনম্।
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা।
আত্মনিক্ষেপ-কার্পণ্যে ষড়্‌বিধা শরণাগতিঃ॥
(১) আনুকূল্য অর্থাৎ—ভগবদ্ ভজনে অনুকূলতার কর্ত্তব্যতারূপে নিয়ম, (২) ভজনে

"শ্রীগুরুদেব ভিন্ন আমার আর কেহই নাই" এইরূপ নিশ্চলা বুদ্ধিতে আত্মসমর্পণ হইলে পতিব্রতা রমনীর ন্যায় শ্রীগুরুদেবের প্রতি সুদৃঢ় বিশ্বাস-সংস্থাপনে সর্ব্বথা শরণাগতি লাভ হইয়া থাকে। শ্রীগুরুদেব এই ভাবে কথা বলিলেন। এইবার কিছু গম্ভীর ভাব, প্রেমাবেশে মালার জপ অবিরাম চলিতেছে; বেলাও ৯টা প্রায় বাজে শ্রীগুরুদেবের প্রেমাবিষ্ট মূর্ত্তি সন্দর্শনে সকলে প্রেমে অভিভূত হইয়া পরমানন্দে প্রণাম করিয়া বাহিরে আসিলেন।

---

**১৩৫৬ সাল। ২০ জ্যৈষ্ঠ, কলিকাতা। সকাল ৬৷৷০টা হইতে ৮৷৷০টা।**

অদ্য প্রত্যূষে এক অনুরাগী-ভক্ত রায়সাহেব ডাক্তার শ্রীযুক্ত গোবিন্দ চন্দ্র রায় আসিয়া বলিলেন—বাবাজী মশায় কোথায়? কাছে দাঁড়াইয়া ছিলেন শ্রীখণ্ডের শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয়-পার্শ্বদাগ্রগণ্য শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর বংশীয় পণ্ডিত শ্রীমদ্‌ভাগবত পাঠক শ্রীযুক্ত নিমাই ঠাকুর, তিনি বলিলেন—**গেঁয়ো শিব সোজা পথে যান না, এ বাড়ীর ও বাড়ীর গলি ঘুঁচি দিয়ে ঘুরে ঘুরে যান, ঐ যে যাচ্ছেন।** শ্রীগুরুদেব তখন প্রভাতী-নামের কীর্ত্তন স্থলীতে প্রণামাদি সারিয়া, ছাদের পথে না গিয়া রান্নাঘরের সামনে দিয়া ও ভাণ্ডার ঘরের পাশ দিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া যাইতেছেন। তাঁহার বক্রোক্তি শুনিয়া শ্রীগুরুদেব মুচ্‌কী হাসিয়া একটু দাঁড়াইলেন; আবার অগ্রসর হইলেন, হাতে নাম মালা, কটিতে কেবল বহির্বাসটুকু, খুব ধীরগতিতে চলিতেছেন, আনমনা নন্‌ তবে নামের কীর্ত্তনের একটী আঁখর খুব মৃদুস্বরে বলিতে বলিতে যাইতেছেন "**কত যতন করে গাঁথা নাম।**" থম্‌কিয়া দাঁড়াইলেন, ডান পাশে চাহিলেন, আবেগের ভাষা কণ্ঠে, স্বর স্নিগ্ধ, উচ্ছ্বাসের আকর্ষণ, আস্তে আস্তে বলিলেন—

---

প্রাতিকূল্যের পরিহার, (৩) শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্ব বিষয়ে রক্ষা করিবেন এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস, (৪) রক্ষা করিবার জন্য শ্রীভগবানকে বরণ করা, (৫) আত্মনিক্ষেপ অর্থে আত্মনিবেদন অর্থাৎ দেহাদি শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিয়া তাহার ভরণ-পোষণার্থ চিন্তাত্যাগ এবং (৬) দীনতা।

## এ দান কার

যত গোল ওইখানে, ঢের ঝড় গেছে, এখনও কিছু কিছু জের চ'লছে, বলে নতুন ক'রে এইসব প্রচার, কি জানি বাপু অতশত জানি না, ধান ভানতে ব'লেছে তাই করছি, আরে মোল্লো, তাঁর (শ্রীবড় বাবাজী মহাশয়ের) জীবনটা ছাখ, তাতে যা ব'লতে হয় বল্। কাজটা ছাখ, হুঁঃ; বলে নতুন, আরে তার সবই যে নতুন, (শ্রীগৌর স্বরূপের প্রকাশকে লক্ষ্য করিয়া) পণ্ডিতরা তর্ক তুল্লেন ওটী (হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে) হ'লেন যুগোচিত নাম, ওই কীর্ত্তন ক'রতে হবে, কর্ত্তা (শ্রীমন্মহাপ্রভু) স্পষ্ট ক'রে বল্লেন—"প্রভু বোলে কহিলাম এই মহামন্ত্র। ইহা গিয়া জপ সভে করিয়া নির্ব্বন্ধ।" আর কীর্ত্তনের কথা আলাদা ব'ললেন .....। তোমরা ব'লবে এ দান তবে কার? (নিতাই গৌরাঙ্গের নাম কীর্ত্তন করা যে অবশ্য বিধেয় তাহা কার দান?) কেন তাঁর গণই তো জানালেন—"স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রভু অত্যন্ত উদার। তাঁরে না ভজিলে কভু না হয় নিস্তার"......।

কলিযুগ-পাবনাবতার শ্রীশ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গ-সুন্দরের নাম-কীর্ত্তন করার কথা আরও কিছু বলিতে চেষ্টা করিলেন, থামিয়া গেলেন, মুখখানি নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন, কি ভাবিতেছেন, বসিবার ঘরে না গিয়া বারান্দায় দাঁড়াইয়া আছেন, অনুগত ভক্তবৃন্দ তাড়াতাড়ি আসিতেছেন, শ্রীগুরুদেব তখনও দাঁড়াইয়া আছেন। এমন সময় কেহ বলিল,—বাবা! ঘরে চলুন, উত্তর নাই, আবার বলিল বাবা! শ্রীগুরুদেব খুব মৃদুকণ্ঠে বলিলেন,—"উঁ" কণ্ঠস্বর ক্লান্ত, চ'খে জল টলটল করিতেছে, অভিমানীর গতিতে ধীরে ধীরে চলিতেছেন, হলঘরের ভিতর দিয়া বসিবার ঘরে ঢুকিলেন, এমনভাবে আসিলেন যেন অন্য কাহাকেও এড়াইয়া, আবার পায়চারি করিতেছেন, কাঁধের চাদরটী বাম বাহুর ভিতর চাপিয়া ধরিলেন, ডান হাতে নাম মালা, প্রসন্ন গম্ভীর মুখ, দুই একবার পায়চারি করিয়া দক্ষিণের দেওয়ালের দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইলেন, অকস্মাৎ খল খল করিয়া হাসিয়াই মহাবদান্য শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর কথা স্মরণ করিয়া শ্রীগুরুদেব ভাবাবেশে বলিলেন—

## লঙ্কার গাড়ী চ'লে গেল

শোন শোন দাতার দানের কথা, শালকে গিছি, সঙ্গে নন্দ (শ্রীঅঙ্গ-সেবক নন্দ দাস) পাঠ হচ্ছেন, কানে এলো, মহাবদান্য (শ্রীগৌর), সে আবার কি? দো'বো ব'লে দেয় তাই দাতা, না, "দেওয়া হ'য়ে যায়?" কিসে সে (শ্রীগৌরাঙ্গ) মহাবদান্য? মাথায় ওই খেলছে, এখানে এলাম, ব'সে আছি, তা দেখ ওই পাশ দিয়ে (মুখ ফিরাইয়া পশ্চিমদিকের বড় রাস্তায় পোস্তার

বাজারের দিকে চাহিয়া ) একটা লঙ্কার গাড়ী চ'লে গেল, ব্যস্ ওমনি ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ করে হাঁচি, নন্দকে ডেকে বল্‌লাম—ওরে ওই ছাখ,"মহাবদান্য", দেখলি, ওতো চলে গেল, এদিকে কেমন হাঁচি আরম্ভ হোলো। দাতার কি খেয়াল থাকে কি দিলাম, কি হোলো, এও তেমনি, তার দান যে কি হোলো সে আর খেয়াল নেই, সে আপন গোঁজে যায়, আর এদের এমনি হয়।

"মহাবদান্য শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু" এই প্রশ্ন নিজেই করিয়া তাহারই সমাধান করিলেন, প্রেমদাতা শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর অযাচিত করুণায় কৃপা ভোগ করিয়া আনন্দে মুখে হাসি ধরে না, কার্য্যসিদ্ধির খেয়ালে চপল হাসি, সচেতন পাগলের হাসি, আবার পায়চারি করিতেছেন, একটু পরেই কি বলিলেন, হঠাৎ মৌন হইলেন, নাম মালা রাখিলেন, শ্রীগুরুদেব বসিয়া আছেন, ডান হাতের ও বাম হাতের কুনুই এর দিকে চাহিতেছেন আর হাসিতেছেন, এমন সময় অনুগত একজন জিজ্ঞাসা করিল—বাবা! এবার রথযাত্রায় পুরী গিয়ে কি ক'রবেন? শ্রীগুরুদেব বলিলেন—"কেন'? তদুত্তরে সে বলিল,—আপনি তো সেখানের মন্দির, পথ, মঠ, ঘাট, সমুদ্রের তীর কোথাও সাষ্টাঙ্গে প্রণাম ক'রতে বাকী রাখেন না, এবার প্রণাম ক'রবেন কি ক'রে? হাঁটু, কুনুই-কব্জিতে তো এখনও ফোঁড়ার অবশেষ আছে, ভাল ক'রে তো বস্‌তেই পারেন না; তা না হ'লে? শ্রীগুরুদেব এদিক ওদিক চাহিয়া হাসিলেন, ধৃষ্ট সন্তানের অবাচ্য চাপল্যে কৌতুক বোধ করিলেন, বাস্তব অভিযোগে কল্পনার উপেক্ষা সৃষ্টি করিলেন না, আনন্দময় স্বরূপে অগ্রাহ্য কিছুই নাই, হেয়ও কিছুই নাই, তাই তেমনি হাসিমুখেই উত্তর দিলেন—

## যখন যেমন তখন তেমন

গঁয়রা দেখেছো, গঁয়রা? ( কারবালায় হাসান হোসেনের বিয়োগ-ব্যথা স্মরণ ক'রে মুসলমানগণ পথে পথে শোভাযাত্রার আয়োজন করেন ) তার একটা কথা শোন, এক বাবু তো বিকেলে আপিসের কাজ সেরে বেরিয়েছেন, বাড়ী যাবেন, পথে তো গঁয়রা বেরিয়েচে, আগে থেকে ঠিক্ ক'রতে পারেন নি, বাধ্য হ'য়ে দলে ভিড়ে যেতে হোলো, কি করেন শেষটায় কাছাটা খুলে ফেললেন। কাঁধের চাদরটা মাথায় জড়ালেন, ওরাও ( মুসলমানগণ ) হাত তুলে তুলে যে রকমটি করছে ( হায় হোসেন! হায় হোসেন! ) ইনিও তাদের সঙ্গে মিশে গিয়ে হাত তুলে তুলে ব'লতে লাগ্‌লেন 'যখন যেমন তখন তেমন', ..

বলিতে বলিতে তেমনি হাসি, উপস্থিত ভক্তবৃন্দ শ্রীগুরুদেবের এই কৌতুকী দশা দেখিয়া হাসি সামলাইতে পারিলেন না।

শ্রীগুরুদেব আবার বলিলেন—বুঝলে "যখন যেমন তখন তেমন", কি উদ্দেশ্য আছে কি জানি, হয়তো অনুসন্ধান ক'রলে বেরিয়ে প'ড়বে এইসব জায়গাতে ( ফোড়ার জায়গাগুলি দেখিয়া ) কেন হোলো...

প্রিয় ভক্তটী শ্রীগুরুদেবের কথা শুনিয়া বলিল—হ্যাঁ বাবা! সে কি রকম? শ্রীগুরুদেব বলিলেন—

## কৃপা পড়লে অনুশীলনী আসে

"ওগো! কারণ নইলে কার্য্য হয় না।" প্রিয় ভক্ত বলিল—আচ্ছা বাবা! অনুসন্ধান প্রবৃত্তি কেন আসে? তেমনি সহজ সুরেই শ্রীগুরুদেব বলিলেন—যেমন সৃষ্টি তেমন দৃষ্টি, তোমাদের পুঁথি পত্তরে নাকি বলে যে "সবই গুণময়", তাহলে যেমন গুণে সৃষ্টি ( অর্থাৎ সত্ব, রজ, তমো-গুণে সৃষ্টি ) তেমনই দৃষ্টি আসে, কারও কৃপা প'ড়লে তবে অনুশীলন আসে।

ভক্ত বলিল—বাবা! কৃপা পেয়েও আবার ছট্‌কে যায় কেন? এ রকম তো দেখা গেছে প্রচুর কৃপা পড়েছে, বেশ আচরণ ক'রছে—আবার দিন-কতক পরেই উল্টো স্বভাব হোলো, এরকম কেন হয়? শ্রীগুরুদেব গম্ভীর হইলেন, তেমনি ভাবেই উত্তর দিলেন—"অভিমান এলেই সব যায়"। ভক্তটী বলিল—তারপর আবার সে ফেরে কিসে? শ্রীগুরুদেব বলিলেন—'আঘাত এলেই ফেরে"। ভক্ত বলিল—কেনআঘাত দেন? আর কি ফেরাবার পথ জানেন না? এ প্রশ্ন শুনিবামাত্র শিহরিয়া উঠিলেন, একটু মৌন হইলেন, বড় ব্যাকুল স্বর প্রকাশ পাইল, কিন্তু করুণায় কম্পিত কণ্ঠস্বর; আপন গরজে যিনি কৃপাকারী তিনি এ অভিযোগ সহিতে পারিলেন না। তাই করুণ স্বভাবে শ্রীগুরুদেব উত্তর দিলেন—

## বলবান্ প্রভু

সে আঘাত কি অন্য কোথা থেকে আসে? গলা টিপে ফোঁড়া টিপে পুঁজ বের করে, তা-ব'লে অপরের কথা সইতে পারে না, তখন তেড়ে যায়। ওই তো গো তারজন্যেই তো বলা "বলবান প্রভু তারে কেশে ধরে আনে"। দুর্দ্দৈব সর্ব্বদাই পেছনে পেছনে ঘুরছে, তিনিও সর্ব্বদা পেছনে পেছনে ছুটছেন, আঘাত কি এমনি আসে? না এলেই তাকে ঠেলে ফেলে?

বলবান প্রভুর স্বাভাবিক করুণার কথা বলিতে বলিতে শ্রীগুরুদেব চঞ্চল হইলেন। প্রিয়ভক্ত বলিল—বাবা! তবে আঘাত ক'রে নিজে অমন কাঁদেন কেন?

প্রিয় ভক্তের কথা শুনিয়া শ্রীগুরুদেবের চোখে জল, কড়া কথা বলিয়াও তিনি করুণাপরবশ হইয়া কাঁদেন। আবার দেখা যায় স্নেহপরবশ হইয়া শ্রীগুরুদেব অনুগত ভক্তবৃন্দকে সদা অপত্য-নির্ব্বিশেষে লালন পালন করিয়াই সুখী হন। কলিহত পতিত জীবের প্রতি বলবান প্রভুর স্বাভাবিক করুণার কথা শ্রবণ করিয়া সকলে পরমানন্দমনে প্রণামান্তে স্ব স্ব গৃহে গমন করিলেন।

---

১৩৫৬ সাল। ২১ জ্যৈষ্ঠ। কলিকাতা। সকাল ৭টা হইতে পৌনে ৯টা।

করুণাময় শ্রীগুরুদেব কথা-প্রসঙ্গে এক প্রিয় ভক্তকে বলিলেন —

## আমি তো জানি, তুমি তো জান না

কিগো! খবরাখবর নাই কেন? শ্রীগুরুদেব হলঘরের জায়গায় দাঁড়াইয়া আছেন। বহুদিন পর আমাদের কোন গুরুভাই আসিয়াছেন। তিনি করজোড়ে মুখ নীচু করিয়া বলিলেন—আজ্ঞে! আপনি তো সবই জানেন। শ্রীগুরুদেব রহস্য দৃষ্টিতে ও সেই সুরেই বলিলেন—**আরে আমিতো না হয় সব জান্‌লাম, তুমিতো আর সব জাননা, খবরও তো নিতে পারতে**; স্নেহভরা স্বর, আদরভরা ভঙ্গি, ধীরে ধীরে হলঘরের ভিতর গেলেন, পায়চারি করিতে লাগিলেন। এইমাত্র প্রভাতী-কীর্ত্তন সমাপ্ত হইয়াছে, প্রণামাদি করিয়া আসিয়াছেন। একটু অগ্রসর হইয়া আবার বলিলেন—"**শিশিরে কি ফোটে ফুল বিনা বরিষণে**;" অভিমানীর স্বর কণ্ঠে। ভক্তটী লজ্জিত হইয়াছেন। তিনি বলিয়াছিলেন— "অন্যান্য ভাইদের মুখে বাবার খবর তিনি রাখিতেন।" তারপর শ্রীগুরুদেব বসিবার ঘরে আসিলেন, যাঁহারা নিত্য আসেন প্রায় সকলেই আসিয়াছেন, দাঁড়াইয়া আছেন। শ্রীগুরুদেবের মুখখানি বেশ প্রফুল্ল, নামের মালা হাতে লইলেন, আসনে বসিলেন। সামনের দরজাটী খোলা সূর্য্যের রাঙা কিরণ শ্রীগুরুদেবের মুখে সোণালী পরাগ ছড়াইয়াছে। কথা-প্রসঙ্গে আগত ভক্তটীকে এক ভক্ত বলিল —"অপনি ইচ্ছা করলে এক ফাঁকে এসে বাবাকে দেখে যেতে পারতেন।" শ্রীগুরুদেব শুনিয়া মুচকী হাসিয়া বলিলেন—

## ইচ্ছামত হয় না

শুন্‌ছো পঞ্চতীর্থের ( শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শাস্ত্রী) কথা, ইচ্ছে ক'র্‌লে আস্‌তে পারতেন, উনি যেন ইচ্ছে করেই এই বয়েসে অতগুলো পাশ ক'রেছেন, হুঁ ; শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন—কেন বাবা ! মনুষ্যের ইচ্ছেয় কি কিছুই হয় না ? শ্রীগুরুদেব হাসিয়া বলিলেন—স্বাধীন ইচ্ছে ফিচ্ছে কারু কি করবার জো আছে? তার ইচ্ছাতে চিরকাল সব হ'চ্ছে আর হবেও। আঘাত পেতে পেতে তবে বোঝা যায়, কথা কি জান, খোঁটায় বাঁধা গরু, কর্ত্তার ইচ্ছেয় কর্ম্ম, দড়িটা লম্বা ক'রে বেঁধে দিয়ে এলো, গরুটা অনেকটা জায়গা পেয়ে চর্‌তে লাগলো, ছোট ক'রে বেঁধে দিলে অল্প জায়গা পেলে, ওতে যদি সে ভাবে আমার ইচ্ছের এই এতটা জায়গায় ঘোরা ফেরা ক'রতে পারি, তা ভাবুক, কর্ত্তা জানে আমার হাতে বাঁধা আছে, খোঁটার ভেতর ওর যা কিছু, এও তেমনি। সহজ কথা সহজ সুরে আবার বলিলেন—

## কাতর হ'য়ে প্রার্থনা

তবে কথা কি জান ? কাতর হ'য়ে প্রার্থনা ক'ল্লে কর্ত্তা তাকে নেড়ে চেড়ে বেঁধে দিতে পারেন, লম্বা করেও দিতে পারেন, আবার চাই কি, বাঁধন খুলে দিতেও পারেন।

শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন—বাবা ! সাধন ভজনের বেলাতেই বা তবে আমরা ব'লবো না কেন আমাদের কি হাত আছে আপনি যেমন ক'রবেন তেমনি হবে, না হয় ব'লবো কর্ত্তার ইচ্ছেয় কর্ম্ম, আপনি করান নি তাই হয় নি।'' শ্রীগুরুদেবের চোখে রহস্যপূর্ণ কৌতুকী দৃষ্টি, বলিলেন—

## ওর ভেতরই তাঁর কৃপার কথা

হুঁ, ওসব মুখে বল্লেই তো হবে না, যতটা জায়গায় লম্বা দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখেছেন, ততটাতে তোমায় চরে খেতে হয়, উঠতে হয় বসতে হয়, ওর ভেতরই তাঁর কৃপার কথা ভাবতে হয়, তাঁর কৃপায় ভরসা করতে হয়, তা হলেই দশ জন্মের কর্ম্ম এক জন্মেও হ'তে পারে, ওইটুকুতেও তাঁর কৃপার রাজ্য ভাবতে হবে।

শ্রীগুরুদেবের মুখে মৃদু হাসি। শাস্ত্রী মহাশয় প্রশ্ন করিলেন—বাবা ! কৃপা কি ? শ্রীগুরুদেব বলিলেন—"সে আবার কি ?" পুনরায় শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন—

কৃপা মানে তো করুণা, তা কার করুণা ? শ্রীগুরুদেব প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন—"দৃশ্য অদৃশ্য সকলের করুণা।'' শ্রীগুরুদেবের উচ্ছ্বাসপূর্ণ দৃষ্টি। পুনরায় প্রশ্ন করিলেন—হ্যাঁ বাবা ! সেটা কি সম্ভব এক দেহে ? প্রশ্নের উত্তরে শ্রীগুরুদেব বলিলেন—

## বৃক্ষ মূলে জল

বৃক্ষ-মূলে জল দিলে শাখা প্রশাখায় আর দিতে হয় না, সমস্তই মুঞ্জরে উঠে।

পুনরায় প্রশ্ন করিলেন—বৃক্ষতো অনেক জল দেবো কোথায়? শ্রীগুরুদেব তদুত্তরে বলিলেন—"যিনি যাকে এপথে নজর দিয়েছেন সেই মূল, সেখানে কৃপা হ'লে সর্ব্বত্রই হ'বে।"

কৃপাপরবশ হইয়া শ্রীগুরুদের পুনরায় "শ্রীগুরুরূপেই মূল কৃপা-প্রাপ্তির" কথা বলিলেন—

## অমনি ছুট

কৃপাপ্রাপ্তি আন্তরিক হ'লেই অমনি ছুট—"গুরুরূপে কৃষ্ণকৃপা তত্ত্বের অবধি" (শ্রীচরিতামৃত) অমনি অঙ্গীকার, তিনি কৃপাপরবশ, কৃপা তাঁকে যেমন করাবে তিনি তেমনি করেন, কৃপা তাঁকে যেখানে নিয়ে যাবেন তিনি যাবেন, স্বতন্ত্রতা নাই কৃপা পরতন্ত্র; জাতি কুল শীল ভজন-সাধনের অপেক্ষা নাই—কৃপা টানলেই ছুট।

শ্রীগুরুদেব প্রসন্ন, গম্ভীর। শরীরে বিন্দু বিন্দু ঘাম হইতেছে। শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রশ্ন হইল—বাবা! কৃপা পাবার পথ কি? প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন—

"লোভ আর আনুগত্য।" জান? হরিবোল দাদার কথা—"বামুন বেরাল মেয়ে, ভক্তি হয় না ধেয়ে (ধ্যান করিয়া), যদি কারও হয় তিনের ভেতর নয়"। বলিয়া হাসিতেছেন, হয়তো কিছু হেতু আছে, শ্রীগুরুদেব খুলিয়া বলিলেন না। হাতে গঙ্গাজল স্পর্শ করিলেন, বহির্বাস পরিলেন। মালাটী হাতে লইয়া বসিলেন। কোন পাঠকের কথা উঠিল, সম্প্রতি তাঁহার পাঠ কলিকাতার বহুস্থানেই হইতেছে, শ্রোতার সংখ্যা প্রচুর, সকলের মুখেই পাঠকের প্রশংসা। শ্রীগুরুদেব বলিলেন—

## আমি ঢুকলেই ছোবল

ওগো! পাঠ কীর্ত্তন বড় আকর্ষণের জিনিষ, ওতে ভগবানই বশ হয় আর মানুষের কি কথা, "তত্র সন্নিহিতো হরিঃ", তবে ভাল সাপুড়ে নইলে মুস্কিল, সাপ নিয়ে খেলা, একটু আনমনা হ'লেই ছোবল, আমি ঢুকলেই ছোবল, তারপর আছে বিষের জ্বালা, স্ত্রীলোকের সম্পর্ক। ওদের চোখে চোখে কাজ, বিষটুকু ঢেলে দেয়, মনোবৃত্তিতে কাজ হাসিল করে, আটকাবে কি দিয়ে। মহাজনরা যে পথ দেখিয়ে গেছেন সে পথে না গেলেই সর্ব্বনাশ।

মুচকী হাসি শ্রীগুরুদেবের মুখে, তাই বল্‌ছিলাম—"বামুন বেরাল মেয়ে"…। সেই ভক্তটী একটু বিনীতভাবে শ্রীগুরুদেবের কাছে আগাইয়া বলিলেন—"শান্তি পাচ্ছি না, সংসারে নানা অশান্তি আসছে।" কথা শুনিলেন। বাবা সকলের দিকে ফিরিয়া ফিরিয়া চাহিলেন। সহজভাবে তাই উত্তর দিতে যেমন চাহনি তেমনি কথা—

## শান্তি

**আত্ম-দোষ আত্ম-অপরাধ চিন্তা করলেই** শান্তি আসে, **নইলে ওই** ছোবল খেতে হয়। উদাসীর হাসি শ্রীমুখে। ভক্তটী একটু সরিয়া বসিলেন, মাথা নীচু করিয়া আছেন, সহজ উত্তরে তাঁহার চোখে জল আসিয়াছে। প্রসঙ্গ ভঙ্গ হইয়াছে, উদাসী বাবার কৌতূহল আছে, আবেগ নাই। ভক্তবৃন্দও চুপ্‌ করিয়া আছেন। এমন সময় পঞ্চতীর্থ প্রশ্ন করিল বাবা! আপনি বল্লেন—আনুগত্য আর লোভে কৃপা হয়, তা লোভ হয় কিসে? শ্রীগুরুদেবের মুখে হাসি ধরে না, বলিলেন—খাওয়া মাখা পরায় লোভ কি করে হয়? ওগো লোভ হোলো জীবের নিত্যসিদ্ধ, কর্ম্মবশে জীবের যেমন দেহই হোক না কেন, সে দেহতে লোভ বৃত্তিটি থাকবেই ও হোলো সহজাত। বল না তোমাদের পাঁজি-পুথির কথা, লৌল্যমেবলং!……মহৎ কৃপায় সেই লোভ নিত্যবস্তুতে আকৃষ্ট হয়, বাস্; সেই মহৎ আনুগত্যে সর্ব্বসিদ্ধি। ইষ্টসিদ্ধির হাসি গুরুদেবের মুখে। ওগো তাই না কথা আছে **"মহৎ কৃপা বিনা কোন কার্য্যসিদ্ধি নয়। কৃষ্ণকৃপা দূরে রহু সংসার না হয় ক্ষয়॥" ওই স্বরূপই তাঁর স্বরূপ।** (মহতের স্বরূপই কৃপা প্রাপ্তির মূল, উহাই হইল শ্রীগুরু-স্বরূপ) ওগো! আরও কথা আছে—**"কৃপা হলেই হবে না, সে কৃপার মর্য্যাদা না দিতে পারলে কিছুই ভোগ হবে না।"** স্তব্ধতা গাম্ভীর্য্য। কোন গোস্বামী সন্তান আসিতেছেন—সেবক উদ্ধব দাস আসিয়া বলিয়া গেলেন, শ্রীগুরুদেবের ইঙ্গিতে পূর্ব্বেই তাঁহার সম্মুখে আসন পাতা হইল। শ্রীগুরুদেব উঠিলেন, ভক্তবৃন্দও অনুগমন করিলেন। একটু পরেই তিনি আসিলেন, তাঁহাকে সমাদর করিয়া আসনে বসাইলেন। শ্রীগুরুদেব তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। ইঙ্গিত করিলেন। নিত্যসেবকগণ তাঁহার জন্য হলঘরে বাল্যভোগ গ্রহণের জন্য আসন প্রস্তুত করিল। শ্রীগুরুদেব তাঁহার সহিত কুশল প্রশ্ন বিনিময় করিলেন। আজিকার মত প্রসঙ্গ এইখানেই ভঙ্গ হইল। সকলে প্রণাম করিয়া বাহিরে আসিলেন।

১৩৫৬ সাল। ২২ জ্যৈষ্ঠ, কলিকাতা। সকাল ৮টা হইতে ৯৷৷০টা।

## সঙ্কেত সংগীত

"হরিষে লাগি রহো রে ভাই। বনত বনত বনি যাই, তেরা বিগড়ি বাতভি বনি যাই"

শ্রীগুরুদেব গাহিতেছেন খেয়ালী মন, শ্রীমুখে মৃদু হাসি, বাম হাতটী কোলে, ডান হাতে মালা, বামদিকে একটু হেলান অবস্থা, সামনের দরজা খোলা, ভক্তবৃন্দ বামদিকে বসিয়াছেন। এরূপ গাহিবার হেতু কি তাহা তখন বুঝা যায় নাই, যাঁহারা আগে আসিয়াছেন তাঁহারা বলিলেন—কাহার কথায় বাবা ঐ গান করিলেন বুঝি না। এক ভক্ত প্রশ্ন করিল – বাবা! এ গান কেন গাচ্ছেন? শ্রীগুরুদেব ভাবাবেশে বলিলেন—

## দীক্ষাদান প্রসঙ্গ

ওগো! সূত্র তো ঐ থেকে, "আপন আপন খাওয়ার যোগাড় তো শেয়াল কুকুরেও করে, পাঁচজনকে যে দিয়ে খায় সেই তো মানুষ।" দিব্য হাসি, গদ্‌গদ ভাব। আপনার হেঁয়ালী সবাই বুঝিলেন কি? শ্রীগুরুদেবের মুখে হাসি, বলিলেন—

## কি হোলো

তখন একবার (শ্রীবড় বাবাজী মহাশয়ের কালে) কথা উঠেছিল, কৈ আমরা এতদিন থেকে কি পেলাম। তিনি বিষম চ'টে ছিলেন, এদের সব (বর্ত্তমান আমাদের গুরুভাইদের) এখন কথা হচ্ছে, কৈ এতদিন তো কাছে থাকা হোলো আমাদের কি হোলো? "তাই তো সাধুদের বাণী, "হরিষে লাগি রহরে ভাই" –একদিনেই হবে? "সময়ে হবেই হবে।" বীচি পুঁতলেই কি ফল হয়? "মাটীতে প'ড়ে ভিজুক, অঙ্কুর হোক, চারা হোক, ডাল পালার বেড়া দে (ভক্তিলতাকে রক্ষার জন্য নানাপ্রকার অপরাধ প্রভৃতি থেকে রক্ষার উপায়) গাছ বড় হোক, তারপর ফুল, তারপর ফল" মুখের কথায় হবে? কত কত জন্মের সংস্কার এক দিনেই যাবে? আর যা পেয়েছো তা রক্ষা ক'রতে পারছো তো?

তদুত্তরে এক প্রিয়ভক্ত বলিল—বাবা! আমাদের অবস্থা তো আপনার অজানা কিছুই নাই, শুনেছি কারু ওপর ভার দিলে নাকি সব হয়, বকল্‌মা দেওয়াও তো হয়?

শ্রীগুরুদেব কথা শুনিয়া বলিলেন—

## বকল্‌মা

**এদের তো** ( শ্রীবড় বাবাজী মহাশয় ও বাবার ) **ও কর্ম্মের** ( মন্ত্রদানের সময় ) **সময় ঐ কীর্ত্তন করা হোতো** ( পাপ-তাপ সব আমায় দিয়ে, ভজ প্রাণের নিতাই গৌর রে, তোদের পাপ নিয়ে আমি নরকে যাব, ভজ প্রাণের নিতাই ) **আর বকল্‌মার বাকী কি আছে, সে কি চুপ্‌ ক'রে ব'সে আছে? দিনরাত ছট্‌ফট্‌ ক'র্‌ছে।**

শ্রীগুরুদেব পতিত-জীবের প্রতি শ্রীশ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গের করুণার কথা স্মরণ করিয়া দয়ার্দ্র হইয়া করুণ-ভাষায় বলিলেন—

**বকল্‌মার মানে বোঝ? আমি সব কোরবো আর ওটার জন্যে** ( পরকাল বা প্রেমভক্তি ) **বকল্‌মা, তা কি হয়? জোচ্চোর, দাগাবাজের কেউ বকল্‌মা নেয়? ওই যে গো গানটা বলনা "কৃষ্ণ পেলেও পেতে পারি, ছাড়ি যদি দাগাবাজি।" এ যুগে খুব করুণা, তাই তাদেরও** ( দাগাবাজীদের ) **সে বকল্‌মা নেয়** ( শ্রীগুরু রূপে ), **তখন কোন্‌ পথ দিয়ে তাকে** (যে বকল্‌মা দিতে পেরেছে) **কেমন ক'রে নিয়ে যাবে তা কি ব'ল্‌বে? প্রাণে প্রাণে কেবল টান প'ড়বে, কেবলই তার করুণার কথা মনে প'ড়বে—"কোথায় ছিলাম, কি ক'চ্ছিলাম, আর এখন কোথায়, আর কি করছি, চল্‌তে ফিরতে তার ভালবাসার কথা মনে জাগবে।" শুনেছি খল সাপও আশ্রয় পেয়ে বাস্তুসাপ হয়, আশ্রয় দাতার ওপর কৃতজ্ঞতা আসে। নিজের খল স্বভাব ভোলে। সংসারে প'ড়ে হাবু-ডুবু খাচ্ছিলাম, আর এখন প্রসাদ চরণামৃত খাওয়া। বকল্‌মা তো সে নিয়েইছে, এবার তাঁর করুণার কথা দিন রাত ভাব।**

শ্রীগুরুদেব গম্ভীর, শ্রীমুখে রাঙা আভা। ভক্তবৃন্দের মধ্যে সকলের চোখে চ'খে জল। আজিকার প্রসঙ্গ বড়ই হৃদয়স্পর্শী, বড়ই গম্ভীর। একটু পরেই শ্রীগুরুদেব—দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়িলেন, বড় মধুর বড় আর্ত্তিতে গানটী আবার বলিলেন—

**"হরিষে লাগি রহোরে ভাই"—।**

হরিষে লাগি রহোরে ভাই।
তেরা বনত্‌ বনত্‌ বনি যাই— তেরা বিগড়ি বাতভি বনি যাই,
অঙ্কা তারে বঙ্কা তারে তারে সুগন কসাই
( আওর্‌ ) শুগা পড়ায়কে গণিকা তারে, মীরাবাই।
দৌলত দুনিয়া মাল খাজনা, বেনিয়া বয়েল চালাই
( আওর্‌) এক বাত্‌কো টাণ্টা পড়ে তো খোঁজ খবর না পাই॥
এয়্‌সি ভক্তি কর ঘট ভিতর ছোড় কপট চতুরাই
সেবা বন্দি আওর্‌ অধীনতা সহজ মিলি রঘুরাই॥

বেশ সহজ অথচ গম্ভীর ভাব শ্রীগুরুদেবের। একবার এদিক ওদিক চাহিলেন। মুখখানি নীচু করিয়া আবার দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন—

## বড় সহজ নয়

বড় সহজ নয় গো, আশ্রয় কথা অল্প কথা নয়, সব ছাড়া। আমি ঢুক্‌লেই সর্ব্বনাশ। হরিদাস দাদাও একদিন ব'লেছিল, না দাদা, ছেড়ে না গেলে হয় না, বল্‌লাম—"হুঁঃ এ শ্মশান বৈরাগ্য।" কিছুদিন যায় আবার উল্টো কথা, তখন জুটেছে ( পত্নী-সম্বন্ধ )। তখন ভাষাও পাল্টে গ্যাছে, বলে কি, দাদা! তার এমন ( পত্নীর কথা ) স্বভাব যে আমাকে বলে ঠাকুর সেবার জন্যে পূজারী রেখে কি হবে, সেবা নিজে ক'রবো, আমিই ভোগ রাঁধবো, দাদা! কি অনুরাগ। শুনি আর হাসি, আবার ব'ল্লাম—"এ হ'লো বৈষ্ণবী মায়া, একে ছাড়া সহজ নয়, এবার উল্টোচাপ, নাও ঠ্যালা, ঐ যে ব'লেছিলে ছেড়ে না গেলে হয় না, তুমি কি ছাড়বে, তিনি কৃপা করে না ছাড়ালে ?"

এইভাবে প্রসঙ্গ হইতেছে ; এমন সময় ধাড়সামটের একখানি চিঠি শুনিতেই শ্রীগুরুদেব গম্ভীর ও বাহ্যক্রোধ প্রকাশ করিলেন। একভক্ত জিজ্ঞাসা করিল—বাবা! ধাড়সা যাবেন তো! শ্রীগুরুদেব বলিলেন—"কেন" ? ভক্ত বলিল—আপনার শরীর তো ভাল নয়, তাই বল্‌ছিলাম। শ্রীগুরুদেব বলিলেন—

যাওয়ার আর কি ? কেউ নিয়ে গেলে বাধা কি, কথায় বলে না, হাইকোর্টে যাব কি ক'রে, আরে সে কি যাবে ? পেয়াদা ধরে নিয়ে যাবে, আমার দিক্ দিয়ে তাই হিসেব বটে, তার দিক দিয়ে তা ঠিক আছে"।

"হেই, এত বড় ( হাত দেখাইয়া ) একটা হনুমানের ছবি! ( বাবার নাম ছাপা একখানি বড় চিত্রপট ) আরে মোলো যা, আক্কেল ছ্যাখ দেখি ব্যাটার, কার নাম দিয়ে চিঠি ছাপ্‌ছিস্, আর কার উৎসব হ'চ্ছে ? সেখানে, তাঁয় ( শ্রীভৈরব গোস্বামীর ) চিত্রপট খানি এই এতটুকু আর হনুমানের ছবিটা মস্ত বড় তার, "হুঁ", পরেই তো, এও সে এসে কান্নাকাটি করবে, বলে টাকা নিয়েছে দেয় না, এসব কি ব্যাপার, কাকে ঋণী ক'চ্ছিস্ ? সাইন বোর্ডটা কার লাগিয়েছিস্ ? যারা পেছনে থাক্‌ছে ( আশ্রমে আমাদের যেসব ছোটভাই আছে ) তাদের আদর্শটা কি হবে ? এর পরিণাম কোথায় তা কি বুঝিস্ ?

শ্রীগুরুদেব আবার গম্ভীর ভাবেই বলিলেন—

## ছড়াকাটা

"কলিরাজ সর্ব্বদাই পেছনে ঘুরছেন, ফাঁক পেলেই ঢুকবেন, নাম নিয়ে চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে ( গোবর্দ্ধন দাদার উদ্দেশ্যে) খালি ছড়া আর ছড়া, আরে বাপু! তাদের কথা ক' (পদাবলী কীর্ত্তন করিতে বলিতেছেন ) আর কওয়া কথাগুলো ক ( বাবার স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত আঁখরগুলি ) ওতেই হবে, তা নয় খালি সুর পাল্‌টান আর ছড়া কাটা।"

শ্রীগুরুদেব চুপ করিয়া রহিলেন, তারপর আবার বলিলেন—

ভুগছেও তো বারমাস, কোন্ রাস্তা দিয়ে কি আসে, কোথায় ধাক্কা লাগে হুঁস্ নাই। কি বলি বল। এতদিন এইসব কম্ম করিয়ে ( ভারতের প্রতি প্রান্তে গ্রামে নাম-কীর্ত্তনের উন্মাদ ভ্রমণে ) দেখালেন তো তিনি, কারু হুঁস্ এল না।

শ্রীগুরুদেব গম্ভীর হইলেন। আজিকার প্রসঙ্গ আর অন্য দিকে যায় না মনে হইল, সকলেই চুপ্ করিয়া আছেন। এই প্রসঙ্গেই আমাদের অন্যতম কোন বড় গুরুভাই দুই একটি কথা বলিতেই শ্রীগুরুদেব কুপিত হইলেন, সেই দাদাটী অপ্রতিভ হইলেন। শ্রীগুরুদেব কথাচ্ছলে বলিলেন—

কি জানি বাপু কি শেখালে সে, ফোঁড়া টেপার কম্ম যার তারই ভাল, অন্যে করলে সম্বন্ধচ্যুত হ'য়ে যাবে যে –বলিয়া তাঁহার প্রতি বক্র কটাক্ষ করিয়া মুখ ফিরাইলেন। একটু পরে "হরি হরি বল, হরি বল" বলিয়া উঠিয়া পড়িলেন। অনেকেই প্রণামাদি করিয়া বিষণ্নভাবেই বাহিরে গেলেন।

---

১৩৫৬ সাল। ২২ জ্যৈষ্ঠ। কলিকাতা। বৈকাল ৫॥টা হইতে ৭টা।

লীলাবিনোদী পরমকরুণাময় শ্রীশ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গসুন্দরের করুণাময়ী লীলা জীব-জগতে প্রচার হইয়াছে বটে, ত্রিকাল সত্য-লীলায় আজিও সে-লীলা হইতেছে—এ কথা সুসত্য, শ্রীগুরু কৃপায় ভাগ্যবান জনে দেখিতেছেন বটে, কিন্তু লীলারস-আস্বাদন জীবের স্ব-সৌভাগ্যে হয় না। শ্রীভগবানের মূর্ত্তিমতী করুণা শক্তি শ্রীগুরুদেব জীবের দুঃখে কাতর

হইয়া অযাচিত করুণায় ভগবল্লীলারস আস্বাদন করাইয়া জীবকে চির-সুখী করিতে যত্নবান, দীনাতিদীন হইয়া জীবের দ্বারে উপস্থিত, কিন্তু জীব শ্রীগুরুপদাশ্রয় গ্রহণ করিয়াও দুর্দ্দৈববশে নিজ স্বতন্ত্রতা-দোষে শ্রীগুরুকৃপা হইতে কেমন করিয়া বঞ্চিত হয় তাহাই আজ দেখাইতে ইচ্ছা করিয়াছেন। করুণাময়ের করুণ-লীলা-রহস্য শ্রীগুরুদেব কৃপা করিয়া না বুঝাইয়া দিলে কে বুঝিবে কার শক্তি আছে। শ্রীগুরু-পদাশ্রয় করিয়া জীব সতত সাবধানতার সহিত ভক্তি-অঙ্গ-যাজনে তৎপর হইবে। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয় "প্রেমভক্তি চন্দ্রিকায়" বলিয়াছেন—

"শ্রীগুরু-চরণ পদ্ম কেবল ভকতি সদ্ম
বন্দো মুঞি সাবধান মতে।"

শ্রীগুরুদেবের বসিবার ঘরটীর সমস্ত দরজা বন্ধ, ভিতরে আমাদের অন্যতম গুরুভ্রাতা খাঁদুদাদা (হাওড়া "নদের নিমাইর" শ্রীনিত্যানন্দ স্বরূপের অভিনেতা শ্রীহৃষীকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়) আর বাবার নিত্য সহচর এক সেবক। সেবকের আচার-ব্যবহারে শ্রীগুদেব অসন্তুষ্ট। শ্রীগুরুদেব কোচে বসিয়া আছেন, কটিতে বহির্বাস, শ্রীমুখে প্রসন্ন গম্ভীর ভাব, চক্ষু দুটী অভিমান-ক্রোধে রাঙা; বৈকালের নিত্যকৃত্য সমাপ্ত হইয়াছে। পাঁচটা বাজিয়াছে! শ্রীগুরুদেবের সামনে সেবক ভীত-ত্রস্ত, শঙ্কিত-উৎসুক খাঁদুদাদা। সেবক বলিল—"আগামী রথ যাত্রায় পুরী যেতে পারবো না।" শ্রীগুরুদেব শুনিয়া বলিলেন—

## ভাব ও ভাষা

**"ওসব ভাষা আসে কোত্থেকে? ভাব না এলে ভাষা হয়? মেলামেশা দেখা শোনাতেই তো বিরুদ্ধভাব জাগে?"** অভিমানে ফুলিতে ফুলিতে খাঁদুদার দিকে চাহিয়া শ্রীগুরুদেব বলিলেন—

## নতুন প্যাঁচ

**তাঁদের কথা কি জান?** (পূর্ব্বের মহাজনদের কথা) **মহাপ্রভু তো সব কেড়ে নিলেন, কলিরাজের খেলা হয় কি ক'রে, তিনিও ছাড়বার পাত্র নন, প্রভুর আদেশেই তো তাঁর** (কলিরাজের) **স্থিতি,** (শ্রীভগবতে পরীক্ষিত-উপাখ্যান) **ভাবলেন কি উপায়? এরা তো** (সাধু বৈষ্ণবগণ) **প্রসাদ, চরণামৃত খেয়ে, আর নাম নিয়ে নেচে গেয়ে আছে, তা'হলে রাস্তা কোথায়? নতুন প্যাঁচ ধরলেন, যেখানে সম্বন্ধের বাঁধন, প্রীতির বাঁধন, সেখানে শিথীল করতে হবে, আদর যশের ভেতর দিয়ে ঢুকতে হবে, তাই এই খেলা।**

বলিয়া "হা নিতাই" শব্দে উচ্ছ্বাসের সহিত কাঁদিয়া ফেলিলেন, পরিবেশের আবরণ কাটিয়া গেল। গম্ভীর হুঙ্কার, চোখে ধারা, ব্যথিত অন্তঃকরণে করুণ-স্বরে বলিলেন—

## চোরের দায়ে ধরা পড়া

এ আসন ( শ্রীগুরুর ) কি আমার ? যার দেওয়া সে তো পাঁচজনের জন্যে, শাসনই বল্ আর যাই বল সে অধিকার কেউ দিয়ে গেছে, আমার খালি আদেশ পালন করা, আমি কি চোরের দায়ে ধরা প'ড়েছি ? না চোরের মত থা'কৃতে বলিস ?

শ্রীগুরুদেব কাঁপিতেছেন। সেবকটীর চোখে জল, নতমুখ। খাঁতুদা ফুপিতেছেন, শ্রীগুরুদেব একটু চুপ করিলেন, বিনীত আদরের দৃষ্টিতে তুস্ত্যজ-স্বভাবের বিষয় বলিলেন—

## শুধ্‌রে যাবে

হ্যাঁরে ? এ রাজ্যটা তো ব্রহ্মচারীর, এখানে কার সম্বন্ধ নিয়ে থাকবি ? তিনি বল্‌তেন ( শ্রীবড় বাবাজী মহাশয় ) ওরে যৌথভজন কি জন্যে ? যখন বাসনা কামনা জা'গলো ওমনি তার ( শ্রীগুরুর ) মুখের দিকে তাকা, তখন দেখবি সেটা মনে এলেও শুধরে যাবি। পড়তে পড়তে বেঁচে যাবি, বাইরে গিছিস্ ছুটে আয়, মুখ দেখে প'ড়ে থাক্, মনের ছোঁয়াচ লোপ পেয়ে যাবে। তারপর বলিলেন—

## শাসন ক'রবে কে আর

বল্ দেখি, বল্ দেখি বুক্ ঠুকে, হৃদয়ে কোন দোষ নেই, ব'লতে পারবি ? শাসন করবে কে আর ? আশ্রয় করা কি মুখের কথা, না অল্প কথা, সব ছাড়া। তুই কি নিজে ছাড়বি ? ছাড়াবে সে, যেমন পথ তেমনি শাসন ? সে আবার কি ? সম্বন্ধ কার সঙ্গে ? যে সম্বন্ধ সে ধ'রেছে সে দিকে তাকা, ব'লে ফ্যাল, ব'লে ফ্যাল। মনে যা আছে লুকানো .....

গদ্‌গদ ভাব, উন্মাদীর অন্তর চপলতা, শ্রীগুরুদেবের বলাৎকারের আকর্ষণ ! পুত্র শিষ্য মুগ্ধ এখন, অধোমুখে ঝর ঝর চোখে জল। পার্শ্বের দ্রষ্টা স্তব্ধ। শ্রীগুরুদেব শিষ্যের ও অনুগত জনের দোষ সম্বন্ধে বলিলেন—

## মেনে নেবে

সে ব'লতো ( শ্রীবড় বাবাজী মহাশয় ) তুমি একটি দোষের খনি, কেউ দোষের কথা বল্‌'লে তৎক্ষণাৎ মেনে নেবে, অনুসন্ধান ক'রবে, না-পাও জানবে আসছে এ দোষ, হৃদয়ে ব'সে তিনি ( শ্রীগুরু স্বরূপে ) শাসন ক'রছেন, ইঙ্গিত ক'রছেন।

আবার শান্তভাব, উন্মুক্ত দৃষ্টি, কোমল সুরেই বলিলেন—

## কে তোরা এর

কাদিকে নিয়ে ( ইঙ্গিতে নিজেকে দেখিয়ে ) কাদের জন্যে এত তোড়জোড় ? ব'লবো না ? নিশ্চয় ব'লবো, একি কথা, সে সম্বন্ধ নিয়ে তোরা কি আমার কেউ নোস্ ? এ ভূতের ব্যাগার কেন দিয়ে গেছে সে ? কে তোরা এর ?

শ্রীগুরুদেবের চোখে ধারা নামিয়াছে, বাক্ রুদ্ধ, কম্পন,হুঙ্কার, আবার হা নিতাই হা নিতাই স্বর। ঘরের শান্ত আবহাওয়া গম্ভীর হইয়াছে। দুই তিন মিনিট কাটিল, ধীরে ধীরে ভূমিতে স্বর নামিল, কোমলতা আসন পাতিল, শ্রীগুরুদেবের স্নেহ-সিক্ত ছোট্ট কোলটুকুর আধেয় সন্তানদের আনন্দ-মুখরতা বিকাশ পাইল। স্নিগ্ধ সুর শ্রীগুরুদেবের, দৃষ্টি খাঁতুদার দিকে, বলিলেন—

## এখন তো ফাঁক থাকৃছে

**দেখ পতন হয় কোথায় ? তখন তো সময় ছিল না, অষ্টপ্রহর কটা হোলো এই দিয়ে দিন গোণা হোতো, বাইরের দিকে নজর থাক্‌তো না, বাইরের কথা কাণে আসতো না; কেউ এলে নাম ধ্বনির আনুগত্যে কথা কইতো, দেশ-বিদেশে দৌড় ঝাঁপ ঢের করিয়েছে, এদের সম্বন্ধ রাজ্যের গণ্ডীর বাইরে যাবার সময় কৈ, দেখবার শোনবার অবসর কৈ ? কার সঙ্গেই বা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ঘ'ট্‌তো ? এখন তো ফাঁক্ থাক্‌ছে, বাইরের সম্বন্ধ ঘরে ঢুক্‌ছে, ঘনিষ্ঠতা এখান থেকে বাইরে যাচ্ছে, বৈষ্ণবী মায়া ফাঁক খুজছেন, প্রসাদ, আদর, সেবা নিয়ে অপেক্ষা ক'রছেন, ব্যস্ তারপর লাগলো সম্বন্ধ, কাজ ফতে**……( একটু চুপ, তেমনি সহজ সস্নেহ অবস্থা )। শ্রীগুরুদেব বলিলেন—

## সম্বন্ধের দিকে তাকিয়ে করিস্

**মনের এসব আধি-ব্যাধি আসে কোত্থেকে ? নিজের অবস্থা ভাবলে মাথা তোলবার জো নেই। তারা কি এমনি বারণ করতো ? সঙ্গ ছেড়ে যাবে না, কোথাও অন্য প্রসঙ্গ শুন্‌বে না, খবরের কাগজ প'ড়বে না, এসব উপায় কিসের জন্যে ?** (একটু থামিয়া) **ওঃ সে আমায়** ( শ্রীজগদ্বন্ধু প্রভু ) **খুব বাঁচিয়ে গেছে "আমার হস্তাক্ষর ভিন্ন অন্য হস্তাক্ষর পড়িবে না, পাইলে যমুনায় ভাসাইয়া দিবে।** ( শ্রীগুরুদেব তখন বৃন্দাবন থাকিতেন ) **মহাপুরুষদের এক একটা কথা কি সোজা ? হুঃ, বাঁচাবার জন্যে তারা কি কম চেষ্টা ক'রেছে ? কেবলই ঝাঁপ আর ঝাঁপ। কর্ যা পারিস্, সম্বন্ধের দিকে তাকিয়ে করিস্, সম্বন্ধ যেখানে ধাক্কা সেখানেই আসবে, নে সময় কাটা, ধরেছে যখন হাজির সে ক'রবেই, প্যায়দাকে মিছে যন্ত্রণা দিচ্ছিস, আর পথে হেগে মুতে সময় নষ্ট ক'রছিস।**

প্রেমময় প্রভু আমার ভক্তির মর্য্যাদা অক্ষুন্নভাবে রক্ষা করিতে একান্ত অনুগত জন দিগের প্রতি উপদেশ করিলেন—**"আমরা কৃষ্ণ পেলে পেতে পারি, ছাড়ি যদি দাগাবাজী।"** মায়া-গন্ধবাসিত দেহ, মন লইয়া ভগবদুপাসনা হয় না। ভক্তি-ভাবিত দেহ, মন লইয়াই ভগবদুপাসনা হইয়া থাকে। হ্লাদিনী-সম্বিৎসার-রূপা শ্রীভক্তি-মহারাণীই একমাত্র শ্রীভগবানকে ও ভক্তকে আনন্দ আস্বাদন করাইতে সমর্থা। এই ভক্তি-অঙ্গ-যাজনে

নিজ অনুগত জনের শৈথিল্য দেখিয়া শ্রীগুরুদেবের গভীর দীর্ঘ নিঃশ্বাস, অপ্রসন্ন চিত্ত, আবার করুণা-বর্ষণে শান্ত চক্ষু, দোষ আকর্ষণে নিজে মলিন। সেবকটী সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া বাহিরে আসিলেন, খাঁতুদাও নতমুখে প্রণাম করিলেন। শ্রীগুরুদেব গম্ভীর হইয়া বসিয়া রহিলেন। বাহিরে ভক্তবৃন্দ উৎসুক হইয়া সময় মত প্রণাম করিয়া গৃহে গমন করিলেন।

---

১৩৫৬ সাল। ২৩ জ্যৈষ্ঠ, কলিকাতা। সকাল ৫॥টা হইতে ৯॥০টা।

## শ্রীগুরু-পদাশ্রয় ও প্রারব্ধ

গতকাল হইতে বাবার মন উদাসী, ভক্তবৃন্দ আসিয়াছেন। বাবার প্রভাতী-কৃত্য সমাপ্ত হইয়াছে, এমন বিশেষ কিছু প্রসঙ্গ হয় নাই, এভাবে চুপ করিয়া থাকা কেমন যেন লাগিতেছে, কোন ভাইও কিছু বলিতেছেন না, বাবাও কোন বিষয়ের কথা তুলিতেছেন না, অথচ নীরবতাও কাহারও তৃপ্তির হইতেছে না ; বাবা আনমনা হইতেছেন, মালাজপই করিতেছেন। এমন সময় শ্রীগুরু-অনুগত একজন বলিল—

বাবা! বিরক্ত হবেন না তো, কালকের একটা কথা জান্‌তে ইচ্ছা ক'রছে ; শ্রীগুরুদেব বলিলেন—"কি বল" সে বলিল—কাল যে বল্‌লেন—আশ্রয় করা কি অল্প কথা ?—একথা বেশ ধ'রতে পারি নাই, একবার শ্রীগুরু-আশ্রয় হ'লে পর, তার বাকী জীবনটার কর্ম্ম করাটা কি প্রারব্ধবশে না স্বাধীন ইচ্ছায় ? তা ছাড়া আশ্রিত হ'লে পর কর্ম্ম যে ক'রতে হয় সংসারে থেকে সেও কি আবার নূতন কর্ম্মফল সৃষ্টি হবে ? বাবা মুখ নীচু করিয়া মুচকী হাসিয়া বলিলেন "ঠেকছে কোথায়" ঠেকছে এই যে শ্রীহরি যদি নরতনুধারী গুরু হন তবে আশ্রিত জন যারা ত'াদের আবার কর্ম্মফলের রহস্যটা কেমন ঘোরাল হয়না কি ? নন্দ-নন্দনের ওপরেওতো বিচার আসে ? বাবা গম্ভীর হইলেন, দুএক মিনিট কাল চুপ করিয়া রহিলেন, পরে বলিলেন—

তোমাদের শাস্তর টাস্তরে কি খবর আছে জানি না, তিনি ( শ্রীগুরু ) অঙ্গীকার করার পর আর কি কর্ম্মফল থাকে ? প্রারব্ধই ভোগ হয়, দুর্দ্দৈবে পড়ে বটে, তবে তাতে আট্কে থাকে না, দুর্দ্দৈবের আঘাত এলেই সেটা-যে দুর্দ্দৈব এটা সে জানতে পারে, ওমনি বলবান প্রভুর আকর্ষণে সেটাতে ছট্ফটানি আসে, কেবল প্রারব্ধের যেটা ভোগ সেটা সে ক'রে যায়, নূতন ফলের সৃষ্টি আর হয় কৈ ? আচ্ছা বাবা ! ভোগের শেষ কখন্ হয়? শ্রীগুরুদেব বলিলেন— কেন, ঐ যে ব'ল্লেম ( শ্রীমন্মাপ্রভুর উক্তি )"আমি মরি যাবে"। ভক্ত বলিল—আমি মরবে কি সে? শ্রীগুরুদেব বলিলেন—অত শত জানি না, এই কর্ম্ম ক'রতে ব'লেছে তাই করি, ওতেই সব সহজ হয়ে যাবে শোনা গেছে। অন্তরে প্রফুল্লতা বাইরে আবরণ বাবার। আচরণ যে সকলের উপর, তার দ্বারাই সব সহজ হ'য়ে যাবে এবং সে আচারণ যে অবিরত নাম-গ্রহণ এটী বুঝাইয়া জটিল প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত অথচ সরল উত্তর দিলেন। বাবার শ্রীমুখে তৃপ্তির উজ্জ্বলতা ভাসিতেছে, সর্ব্বদাই আনন্দময়। এই সময় কয়েকজন গুরু ভ্রাতা ও ভগিনী আসিয়াছেন। প্রণামি দিয়া কথা বলিয়া চলিয়া গেলেন। সময় বুঝিয়া বাবাকে কেহ জিজ্ঞাসা করিল, বাবা ! একটি কথা জিজ্ঞাসা ক'রবো ? বাবা মনের কথা বুঝিয়াছেন, হাসিয়া ঘাড় নাড়িলেন, কিন্তু নিজেই কি বলিতে চাহিয়া থামিলেন, একটু পরেই বলিলেন—

## গুরু দক্ষিণা

কি গো তোমাদের শাস্ত্রে কি বলে দাক্ষিণ্য মানে আনুকুল্য তো, তাহ'লে ওই ওকে ( সামনের টাকা ) কি ব'লবে ? তাঁর আনুকুল্য তো ( অর্থাৎ গুরু দক্ষিণা মানে গুরুই আনুকূল্য করেন ) এ রাজ্যে ( শ্রীমন্মহাপ্রভুর দানের রাজ্যে ) যিনি অঙ্গীকার ক'রেছেন তিনিই তো দক্ষিণা দেন। বলনা তোমাদের পুঁথির কথা "ময়ানুকূলেন...( শ্রীভাগবতে "ময়ানুকুলেন নভস্বতেরিতং" ) এ রাজ্যের লক্ষ্যতো সম্বন্ধ আর সেবা, তাহ'লে দক্ষিণা কথাটা কোথায় লাগলো ? ওখানে দক্ষিণা মানে অধ্যয়ন শেষ ক'রে ( তখন কার দিনে অধ্যয়ন শেষ করে গুরুদক্ষিণা দিতে হোতো ) আর এখানে সম্পূর্ণ আত্মসাৎ, তা-হ'লে—তবে যে এসব আয়োজন ( মঠ, মন্দিরে শ্রীগুরু সমীপে অর্থ দেওয়া ) সে কেবল ভগবৎ সংসারের আনুগত্যের ব্যবহার ··

বলিয়াই কেমন এক অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে চাহিলেন। দুই একদিন পূর্ব্বে আমাদের কোন গুরুভগ্নী বাবাকে জানাইয়া ছিলেন তাঁহার গৃহে কয়েকটি বৈরাগী গুরুভাই কিছুক্ষণ নাম করিবেন এবং যৎসামান্য প্রসাদ গ্রহণ করিবেন, বাবা উদাসী ভাবেই বলিয়াছিলেন 'দেখ কে যাবে,' পরে দেখা গেল বাবার নিয়ত সহচরের এক মূর্ত্তি এবং অনিমন্ত্রিতের দু'চার মূর্ত্তি গিয়াছিলেন। ইঁহাকে দেখিয়া বলিতে লাগিলেন—

## অনুরোধ-উপোরোধ

হুঁঃ, কি বলি বল, ইষ্টলাভে দৃষ্টি এলে অনুরোধ উপরোধে নজর থাকে না, কার মনে কষ্ট হবে, কার মন রক্ষা হবে, এ-সব বুদ্ধি মাথায় এলেই কার্য্যনাশ, প্রাণের আকর্ষণটা কোথায় দেখ, সে দিকে তাকিয়ে তো চ'লতে হবে; ওতে নিজেরও কর্ম্মশেষ আর অপরেও বিষম প্যাঁচে পড়ে। যিনি যত তৈরীই থাকুন না, ওঁদের কাছ থেকে তফাৎ থাকৃতে হবে। তা সে ইনিই হন বা তিনিই হন (অর্থাৎ নর নারীর উভয়ের জন্য)। আসল সম্বন্ধ (শ্রীগুরু সম্বন্ধ) শিথীল করে ছায়...।

বাবা মালায় সংখ্যা রাখিলেন। গুরুভাইটি সঙ্কুচিত মনে মুখ নীচু করিলেন। সুযোগমত বলিল, বাবা! সর্ব্বদা সাধু সঙ্গ ক'রলেও ঐ কথা ব'লবেন কি? বাবা বলিলেন—

## অনেক দূরের কথা

আরে ধ্যাত, সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ, সে অনেক দূরের কথা, ও কথা ব'লুলেই হবে? একবার স্বামীজী (সচ্চিদানন্দ) চারুকে ব'লেছিলেন কার সঙ্গ কর? সে তো জড়সড়, বলে ওমুকের (বাবার সহচর ছিলেন তিনি) সঙ্গ। স্বামীজী ওমনি ধরে ব'সলেন, সঙ্গ কর, ঠিকতো? চারুতো এতটুকু হয়ে গেল, ভয়ে ভয়ে ব'ল্লে—"আজ্ঞে না, যাতায়াত করি।" হ্যাঁ তাই বল্ল যে যাতায়াত করি, বসা ওঠা করি। সঙ্গ করা কি সোজা। বিপরীত প্রবৃত্তি দূর হ'য়ে যায়। (শ্রীগুরু উন্মুখী প্রবৃত্তি ভিন্ন অন্য প্রবৃত্তি)।

বাবার গাম্ভীর্য্যের দৃঢ়তায় সারল্যের শৈথিল্য আসিল, বলিলেন—

## সাধু সঙ্গ

ও গো! ওঁদের সঙ্গে (সাধু বৈষ্ণব গুরুর সঙ্গে) দুটো ধর্ম্মকথা আলোচনা ক'রলেই সাধুসঙ্গ হবে? তাঁদের আহার ব্যাভার দেখ্‌তে হবে, অনুভব করতে হবে, কখন কি ভাবে দিন রাত্রি যাপন করেন, অনুশীলন ক'রতে হবে, নিজের দোষ ক্রটি ধরা পড়ে যাবে, আত্মগ্লানি আসবে, তবে না সঙ্গ! ওই যে গো কথা আছে..."সর্ব্বসিদ্ধি হয়" (লব-মাত্র সাধুসঙ্গ সর্ব্ব-সিদ্ধি হয়) সর্ব্ব শব্দে কি সঙ্কোচ আছে? সব-দিকের কথা বলা আছে, তোমার স্বভাব কি তাও জানাবে, স্বরূপ কি তাও জাগাবে।

## অভিমান না গেলে হয় না

বাবার আত্মহারা ভাব, মধুক্ষরণে অল্পবিরতি, আবার ধারা; ওগো সহজ নয়, বীজ না প'চলে অঙ্কুর হয় না, অভিমানই হোলো দেহ ধারণের বীজ; ও বীজ ম'রবে নতুন অঙ্কুর উঠবে, ও-দের সব (বাউল সম্প্রদায়ের) হেঁয়ালিতে কথা "জীয়ন্তে মরিয়া থাকে" (জীবন্মুক্ত)। ওঁরা সামনে ধ'রে গেলেন, (পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাজনগণ বলিয়া গেলেন) "অভিমান শূন্য"...(অভিমান শূন্য নিতাই) বাবার অকস্মাৎ কথা বন্ধ হইল। সাধু স্বরূপের চরম ইঙ্গিত করিলেন। যাহারা প্রশ্ন-প্রসঙ্গে বিরক্ত হইয়াছিলেন বাবার উত্তরে আনন্দ বিহ্বল হইলেন।

এক ভক্ত বলিল—বাবা ! আপনি সাধুদের আহার ব্যবহারের কথা ব'ল্লেন, প্রায়ই ওকথা বলেন. তা আহার তো প্রসাদ, তা পেলে বিড়ম্বনা ঘটায় না, তাতে ও কি অনিষ্টের সম্ভাবনা থাকে ? বাবা আবার মৃদু হাসিলেন একটু পরেই বলিলেন—

## প্রসাদ পাওয়া

গোবিন্দ দাদা ( ইনি বাবার বড় গুরু ভাই, পুরীতে শ্রীহরিদাস ঠাকুরের সমাধি মন্দিরের সেবক ছিলেন, শ্রীগুরু সেবার আদর্শ মূর্ত্তি ) থাকতে কোনদিন যদি ঠাকুরের রান্নার এতটুকু ক্রুটি হ'তো সব মাটিতে পুঁতে ফেলতেন্, ব'লতেন ওতে ঠাকুরের ভোগ হয় না, তুলসী দিয়ে তো আত্মতৃপ্তি হোলো, ভিতরে ঢুকে দেখলে কি, যা তৈরী হো'লো ? ( ভোগের জন্য যা রান্না হোলো ) তা ঠিকমত হোলো কিনা, ঠাকুরের কাছে ধ'রে দিলেই প্রসাদ হবে ? প্রসাদ পাওয়া তো ভাগ্যের কথা। আমাদের কেবল বিড়ম্বনা। হুঁঃ কি বলি বল, এসব ব'ললে নিজেদের গায়ে থুতু লাগে। এই সব উৎপাত আসছে কোত্থেকে ? ব'লছো ঠাকুর আর তাঁকে দিচ্ছ কি—তাতো ভেবে দেখা হয় না।

বাবা কেমন ক্লান্ত হইলেন। বেলা হইল, শ্রীঅঙ্গ সেবকগণ ব্যস্ত হইতেছে। বাধ্য হইয়া প্রসঙ্গ বন্ধ করিতে হইল। আগন্তুকগণ প্রণাম করিতে লাগিলেন। প্রসঙ্গক্রমে বাবা দুএকটি রহস্য কৌতুকের কথা বলিতেছেন, এই যে সব লিখ্ছো কে নেবে ? এতদিন যে এত কর্ম্ম করালেন (ভারতের চতুর্দ্দিকে নাম কীর্ত্তন ও প্রচার) তা কে নিচ্ছে ? লিখছোও ঢের ছাপাচ্ছোও তো, এসবে হবে কি ? বাবার আনত দৃষ্টি, আক্ষেপের সুর কণ্ঠে। ভক্ত বলিল—আজ্ঞে আপনার কৃপা শক্তিতে আপনি বশীভূত হ'য়ে যাদিকে অঙ্গীকার ক'রছেন তাদের যখন প্রয়োজন হবে, তখন তারাও অন্তত: নেবে ! বাবার কণ্ঠে অস্ফুট ধ্বনি হইল।

## কে সামলাবে

আমি তো তোমাদের শাস্ত্র টাস্তর পড়িনি, কি ব'লতে কখন কি ব'লে ফেলি—তা তুমি যে লিখে লিখে বের ক'চ্ছো লোকে যদি সমালোচনা করে সামলাবে কে ? ( অর্থাৎ শ্রীগুরু বাক্যের সমালোচনা করা বা শোনা মহা অপরাধ, সে মহা অপরাধের ভাগী হবে কে ? ) আজ্ঞে যারা সমালোচনা ক'রবে তারা আপনার প্রতিকূলে কৃপাই পাবে ? আর যারা অকপট মনে গ্রহণ ক'রবে তাদের কাজ এগিয়ে যাবে ; কিছুদিন আগে আপনাকে জিগ্যেস ক'রেছিলাম (শ্রীগুরুর প্রসঙ্গে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে) "সংসারীর তো ত্যাগী গুরু করা নিষেধ, তাহ'লে এত সব গৃহী গুরু ভাই আমাদের, তাদের কি অশাস্ত্রীয় কাজ করা হ'চ্ছে ?" আপনিও তো সমর্থন ক'রছেন, তাতে আপনি বলেছিলেন—

## বাঁধন আলগা হবে

চিরকাল কি সংসারে আটকে থাক্‌বি? ত্যাগী গুরুর রূপ ভাববি আর তাঁর কথা শুনবি, ধীরে ধীরে বাঁধন আলগা হবে।

বাবা অনুচ্চ কণ্ঠে হুঙ্কার দিলেন, একটু পরেই স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, শরীরে রোমাঞ্চ, মৃদু কম্পন্। দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িলেন। করুণাময় শ্রীগুরুদেবের করুণার কথা শুনিয়া সকলে আশ্বস্ত হইলেন। তারপর সকলে প্রণাম করিয়া বাহিরে আসিলেন।

---

১৩৫৬।১২ই অগ্রহায়ণ সোমবার সকালে পরমারাধ্য শ্রীলবাবাজী মহারাজ নিবিষ্টমনে শ্রীগ্রন্থপাঠ শ্রবণ করিতেছেন এবং ক্ষণে ক্ষণে সাত্ত্বিক ভূষণে ভূষিত হইতেছেন। আশে পাশে দাদারা ঘিরিয়া বসিয়া পাঠশ্রবণে তন্ময় হইয়া আছেন। এমতাবস্থায় নয়টা বাজিয়া গিয়াছে বলিয়া অনিচ্ছাসত্ত্বেও পাঠ সমাপ্ত করিতে হইল। ইতিমধ্যে বাবার প্রাচীন সংকীর্ত্তনসঙ্গীদের মধ্যে অন্যতম পূজনীয় শ্রীযুক্ত যুগলদাদা আসিয়া শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণে দণ্ডবৎ প্রণাম করতঃ নিকটে বসিলেন। বাবা দৃষ্টিপাত করিয়া আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন—"এবার উৎসব কেমন হল?" তদুত্তরে বলিলেন—প্রধান কীর্ত্তনীয়া হঠাৎ অসুস্থতা-বশতঃ আসিতে পারেন নাই, তাই কীর্ত্তনানন্দ তেমন হয় নাই, ইহা শুনিয়া গুটির মহোৎসবের পূর্ব্বস্মৃতি বাবার চিত্তে সম্পূর্ণ জাগ্রত হইয়া উঠিল। কিছুক্ষণ পরে বাহ্যাবেশে আসিয়া বর্ত্তমানে উপযুক্ত পাঠক, কীর্ত্তনীয়ার অভাবের কথা মনে হওয়ায় বিশেষ বিমর্ষভাবে বলিলেন—"সবদিকে গোলমাল।" কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীনিতাই সুন্দর পত্রিকার কথা উঠিল। "আজ অগ্রহায়ণ মাসের বার তারিখ, অথচ আশ্বিন মাসের পত্রিকা এখনও প্রকাশ পাইলেন না।" হতাশার ছায়া সকলকে সমাচ্ছন্ন করিয়া তুলিল দেখিয়া করুণ-হৃদয় শ্রীগুরুদেব আশার আলো জ্বালিয়া বলিলেন—

"জগাই-মাধাইএর পাপ তাপ নিয়ে নিতাইচাঁদ কিছুক্ষণ কালো হয়েছিলেন, তেম্নি শ্রীশ্রীনিতাইসুন্দর পত্রিকাও সেবকদের অযোগ্যতায় এবং কলির প্রভাবে মলিন হয়েছেন বটে, কিন্তু শ্রীনিতাইএর ইচ্ছায় "শ্রীশ্রীনিতাইসুন্দর" আবার নিজের সুন্দর স্বরূপ প্রকাশ করিতে ত পারেন—নাম নামী যে অভিন্ন।"

শ্রীগুরুদেবের বাক্যে উপস্থিত দাদাদের মনের নৈরাশ্য-মেঘ কাটিয়া গেল। আশ্বস্ত-হৃদয়ে একজন দাদা নিবেদন করিলেন—"আজ্ঞে, শ্রীশ্রীনিতাইসুন্দর পত্রিকায় "শ্রীশ্রীগুরুপ্রসঙ্গ" কি আর প্রকাশ পাইবেন না?" উত্তরে বাবা বলিলেন—

"স্বতন্ত্র স্বেচ্ছাময় শ্রীনিতাইসুন্দরের যখন যে সাজে সাজিবার ইচ্ছা, তখন সেইরূপ প্রকাশ পাইবেন ; যখন যাহাকে নিজ-সেবায় অঙ্গীকার করিবেন, তখন সে নিতান্ত অযোগ্য হইয়াও সেবা-সৌভাগ্যলাভে ধন্য হইবে।"

আবার প্রশ্ন উঠিল—"আজ্ঞে। 'শ্রীগুরুপ্রসঙ্গে' কি জাতীয় প্রসঙ্গ থাকা উচিত?" উত্তরে বাবা বলিলেন—

"জগজীবের কল্যাণ সাধনই শ্রীনিতাইচাঁদের লক্ষ্য ; সুতরাং যে জাতীয় প্রসঙ্গে পথহারা কলিজীব ভক্তিপথের সন্ধান পাইয়া সেই পথে চলিবার বল পাইবে, সেই জাতীয় প্রসঙ্গই থাকা ভাল।"

বেলা অধিক হইতেছে দেখিয়া সকলে অনিচ্ছাসত্ত্বেও সুখময় প্রসঙ্গ হইতে নিরস্ত হইলেন।

---

১৩৫৬ সাল ১৬ই আগ্রহায়ণ শুক্রবার সকালে শ্রীএকাদশীর অষ্টপ্রহর শ্রীনামযজ্ঞের সমাপ্তির পর নিত্য-নিয়মানুসারে শ্রীভক্তিগ্রন্থ-পাঠ আরম্ভ হইলেন। পরমারাধ্য শ্রীল-বাবাজী-মহারাজ পাঠ শ্রবণ করিতে করিতে সাত্ত্বিক-বিকারে ভূষিত হইতেছেন এবং ক্ষণে ক্ষণে হুঙ্কার করতঃ চতুষ্পার্শ্বস্থ অনুগতদিগকে নিজভোগের সন্ধান দান করিয়া যেন কোন এক অনির্ব্বচনীয় রাজ্যে লইয়া যাইতেছেন—এইভাবে পরমানন্দে কিছুসময় গত হইলে পাঠ সমাপ্ত হইলেন। তখন প্রসঙ্গতঃ শ্রীল-বাবাজী-মহারাজের শ্রীচরণে নিবেদন করা হইল যে—শ্রীভগবতসেবানুকুল্য-বিধানে খ্যাতিমান্ কোন এক বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁহার কঠিন ব্যাধি সারাইবার জন্য নিজবাড়ীতে বড়ডাক্তার ও শুশ্রূষাকারিণী (নার্শ) আনাইয়া অস্ত্রোপচারে বিশেষভাবে চিকিৎসা ও পরিচর্য্যার যাবতীয় ব্যবস্থা করিতেছেন। কথাটী শুনিয়া বাবা কিছুক্ষণ নীরব থাকিলেন, পরে বলিলেন—

"করছে করুক, কারণ নৈলে মন মানে না। তবে ঠিকমত চেষ্টা করা হচ্ছে দেখলে সুখ হয়। আজকাল সমাজের আবহাওয়া অন্যরকম হ'য়ে গেছে, মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি অন্যজাতীয় হ'য়ে পড়ছে। আগে কারোর রোগ হ'লে প্রথমে দেখা হ'ত—কি কারণে এ রোগের উৎপত্তি। আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র স্বীকার করেন যে, পাপ বা অপরাধ রোগের কারণ। ভিন্ন ভিন্ন পাপ হ'তে ভিন্ন ভিন্ন রোগ এবং ভিন্ন ভিন্ন রেগের জন্য ভিন্ন ভিন্ন শান্তির ব্যবস্থা শাস্ত্রে উল্লেখ আছে। তাই আগে রোগ হ'লে রোগীর অবস্থা দেখে—প্রথমে ঠিক

করা হ'ত—কি পাপে এ রোগের সৃষ্টি। তারপর শাস্ত্রোক্ত পাপ নির্ণয় করা হ'লে সেই পাপনাশের জন্য শাস্ত্রবিধানমতে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করা হ'ত। এইরূপে পাপ বা রোগের বীজ তুলে ফেলায় রোগ আর বাড়তে পেত না। তারপর রোগ আসার জন্য শরীরে যে সমস্ত রোগের উপসর্গ দেখা দিয়েছে, সে গুলির নিবারণের জন্য চিকিৎসক-মহাশয়ের আধখানা বড়িতে কাজ হ'ত। আজকালকার অবস্থা—'রোগ হয়েছে, ঔষধ খাও'। যেখানে আধখানা বড়িতে অল্প কয়েক দিনে কাজ হ'ত, সেখানে বৎসরের পর বৎসর রোগী ঔষধই খাচ্ছে, ভালমন্দ বিশেষ কিছু বুঝা যাচ্ছে না। মাঝে মাঝে বলা হ'য়ে থাকে—„সেকালের মত ভাল ডাক্তার কবিরাজ আর নেই, চিকিৎসাশাস্ত্রেরও মাথা মুণ্ডু কিছ নেই।" দোষ হ'ল চিকিৎসা শাস্ত্রের! কিন্তু শাস্ত্রের কথা কি সব শুনা হয়েছে? তোমরা যে কি বল—"অর্দ্ধকুকুটী ন্যায়"—একি তাই হ'ল না?

( অর্থাৎ ডিম্ব প্রয়জোন, তাই কুক্কুটের সম্মুখ ভাগটী অস্ত্রাদি দ্বারা বাদ দিয়া ডিম্ব প্রসবের জন্য কেবল পশ্চাৎভাগটী রাখিলে যেমন কোনদিন ডিম্ব পাওয়া যায় না, তেমনি শাস্ত্রের বিধান একাংশ বাদ দিয়া একাংশ পালন করিলে শাস্ত্রোক্ত.ফল কোন দিন পাওয়া যায় না )।

'শ্রীধন্বন্তরী' শ্রীভগবানের অবতার—তাঁর বিধানে কি ভুল থাকতে পারে? রোগের জনক বা বীজ নষ্ট করবার জন্য ত তাঁর ব্যবস্থা নয়। একদিন বড় প্রভুর ( খড়দহের প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত হরেন্দ্র মোহন গোস্বামীর ) সঙ্গে দেখা করতে তাঁর বৌবাজারের বাড়ীতে গিয়ে দেখি যে, তিনি একখানি গ্রন্থ পাঠ করছেন এবং শ্রীশ্রীনামের মহিমা ভোগ ক'রে অঝোরে ঝুরছেন। সে গ্রন্থখানিতে দেবদেবীগণ নিজ নিজ অধিকারের কথা বলেছেন। আমি যখন যাই, তখন শ্রীধন্বন্তরী নিজ অধিকারের কথা বলছিলেন,—"রোগের কারণ নষ্ট করবার ক্ষমতা আমায় দেওয়া হয় নাই, মাত্র রোগের উপাধি সারাবার ক্ষমতা আমার আছে। রোগের বীজ নষ্ট করতে হ'লে শ্রীশ্রীনামাশ্রয়ই সর্ব্বোত্তম উপায়।

( শ্রীপাণ্ডব গীতাতেও শ্রীধন্বন্তরী বলিতেছেন "শ্রীধন্বন্তরী উবাচ—অচ্যুতানন্ত-গোবিন্দ-নামোচ্চারণভেষজাৎ। নশ্যন্তি সকলা রোগাঃ সত্যং সত্যং বদাম্যহম্॥ )

তা হ'লে এখন বুঝ, ওষুধে রোগ সারান কি ক'রে হ'তে পারে। যে উপসর্গের জন্য ওষধ খেলে, তা না হয় সেরে গেল। কিন্তু পরক্ষণেই আর একটী নূতন উপসর্গ দেখা দিল। একটা বড় গাছকে উচ্ছেদ করতে হ'লে তার মূলে ঘা দিতে হয়। ছোট ছোট ডালপালা ছেঁটে ফেল্লে কিছু কাজ হয় না। তেম্নি রোগ সারাতে হ'লে, রোগের কারণ খুঁজে বাহির ক'রে তার ব্যবস্থা করতে হয়। শুধু ওষুধ খেলে পাপের ভোগকাল শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত কার্য্যতঃ কিছু ফল পাওয়া যায় না।"

উপস্থিত সকলে নিবিষ্টমনে শ্রীগুরুদেবের কৃপাময়ী কথা শুনিতেছিলেন। সকলের মুখে একটা বিস্ময়ের ভাব—সত্যই কি ঔষধ-সেবনের ফল এত অকিঞ্চিৎকর! একজন বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া বলিয়া ফেলিলেন—'আজ্ঞে, চিকিৎসা শাস্ত্রের বর্ত্তমানে নিত্যনূতন আবিষ্কার হইতেছে। পাশ্চাত্যদেশের মনীষীরা আশা করেন যে, কিছুদিনের মধ্যে মৃতদেহে প্রাণ সঞ্চারের চেষ্টাও সফল হইবে।"

শুনিয়া বাবা একটু হাসিয়া বলিলেন—

**"খোদার ওপর খোদ্‌গিরি!" কিছু পরে বলিলেন—"দেখ! ওষুধে যদি রোগ সারত, তবে ধনীলোকেরা ডাক্তার দেখিয়ে নীরোগ হ'য়ে থাকত—কেউ আর রোগে দেহত্যাগ করত না। আর ডাক্তারেরা নিজেরা রোগ ভোগ করত না। যাঁরা প্রকৃত সুচিকিৎসক তাঁরা স্বীকার করেন যে, রোগ হ'লে তাঁরা তাঁদের বুদ্ধি-অনুযায়ী ওষুধের ব্যবস্থা করেন বটে, কিন্তু রোগ সারান তাঁদের হাতে নাই, সে হাত ভগবানের। বাস্তবিক, রোগ হ'লে, 'কি করবে ডাক্-তারে (ডাক্তারে), ডাক্-তাঁরে।' শ্রীভগবানের কৃপা হ'লে সব ভাল হ'য়ে যায়।"**

একজন প্রশ্ন করিলেন—আজ্ঞে! কি উপায়ে রোগের বীজ নষ্ট হয়?

বাবা বলিলেন—

**"দেখ! রোগ সাধারণতঃ দুই কারণে হয়—পাপ এবং অপরাধ। পাপের জন্য যে সমস্ত রোগ সে সব কর্ম্মকাণ্ডোক্ত শান্তিস্বস্ত্যয়নেও ভাল হয়। শ্রীভগবানের নাম, বিগ্রহ, ভক্ত, প্রসাদ, চরণামৃত প্রভৃতি যে কোন ভগবৎসম্বন্ধীবস্তুর আশ্রয়ে ত ভাল হয়ই'। কিন্তু যে সব রোগের কারণ—মহতের মনে দুঃখ দেওয়া বা মহতের অবজ্ঞা—অর্থাৎ অপরাধ হ'তে যে সব রোগের উৎপত্তি, সেগুলি শান্তিস্বস্ত্যয়নে ভাল হ'তে পারে না। যে স্থানে অপরাধ হয়েছে, সে স্থানে ক্ষমা না পাওয়া পর্য্যন্ত রোগের শান্তি নেই। যে মহাত্মার নিকট অপরাধ হয়েছে, তিনি যদি প্রকট না থাকেন, তবে একান্তভাবে নামাশ্রয় করলে "সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীশ্রীনাম" সময়ে সে অপরাধ খণ্ডন করাইতে পারেন। এই যে ছেলেরা নামকীর্ত্তন করছে, ইচ্ছাতে হোক্ বা অনিচ্ছাতে হোক্ প্রসাদ চরণামৃত পাচ্ছে, সাধুগুরু-বিগ্রহের দর্শন পাচ্ছে, এদের কাছে পাপ ঘেঁসতে পারে না। এদের ব্যাধি হ'বার কারণ অপরাধ। কোথায় অপরাধ হয়েছে তা অনুশীলন করা দরকার। যাদের সঙ্গে মেলামেশা, তাদের কাছ ছেড়ে কি রাস্তার লোকের কাছে অপরাধ হ'তে যাবে? জাতসাপ নিয়ে খেলা, একটু বেহুঁস হ'লেই ফোঁস ক'রে কামড়ায়। নিজেদের মধ্যে কোথায় কি অপরাধ হয়েছে তা ঠিক হ'লে পর যেখানে অপরাধ সেখানে কায়মনোবাক্যে ক্ষমা প্রার্থনা করা চাই। তাঁর চরণামৃত গ্রহণ করলে সব ভাল হ'য়ে যায়। যদি তিনি চরণামৃত দিতে রাজী না হন, তবে কৌশলে তা গ্রহণ করিতে হয়। তিনিত আর পা মাথায় তুলে যান না। যেখান দিয়ে**

হেঁটে যাবেন, সেখানকার রজ নিলেই কাজ হ'বে। মোটের উপর নিজের অপরাধের জন্য অনুতাপ আসা দরকার। জগাই মধাইকে উদ্ধার ক'রে আর পাপ না করতে বলায়—তারাও বল্ল—আর নারে বাপ'। এই 'আর নারে বাপ' এলে তবে ও কাজ হ'বে।"

একজন বলিলেন "আজ্ঞে! পাপজ ব্যাধি নিবারণের জন্য যে দুই প্রকার ব্যবস্থার কথা বল্লেন—শান্তিস্বস্ত্যয়ন এবং ভক্ত্যঙ্গযাজন—ইহাদের মধ্যে কোন্‌টীর আশ্রয় আমাদের পক্ষে সুবিধাজনক ?"

উত্তরে বাবা বলিলেন—

"কলিযুগে কর্ম্মকাণ্ড ঠিক মত করা বড় সোজা নয়—বিশুদ্ধ সামগ্রীর এবং যোগ্য আচার্য্যের অভাব। আবার দেখ—শান্তিস্বস্ত্যয়ন ঠিক মত হ'লেও কৃত পাপের মোচন হয় মাত্র কিন্তু পুনরায় সেই পাপ করবার প্রবৃত্তি নষ্ট হয় না। ভক্ত্যঙ্গযাজনে হৃদয় শুদ্ধ হয় এবং সকল পাপের প্রবৃত্তি চিরকালের মত নষ্ট হয়। আর এক কথা—গ্রহরূপী জনার্দ্দনের শ্রীনাম বিগ্রহাদির আশ্রয়ের পরেও কি গ্রহপূজা বাকি থাকে ?"

তখন একজন জিজ্ঞাসা করিলেন—আজ্ঞে! কোন ভক্ত্যঙ্গযাজনে পাপের বীজ নষ্ট হ'বার পর ব্যাধির উপসর্গ দূর করবার জন্য কি ঔষধ সেবন অপরিহার্য্য ?"

বাবা বলিলেন—

"তা কেন হ'বে ? ভক্ত্যঙ্গযাজনে ব্যাধির উপসর্গ, ব্যাধির কারণ এবং কারণের প্রবৃত্তি সব বিনষ্ট হয়।"

আবার প্রশ্ন উঠিল, "আজ্ঞে, রোগের উপসর্গ দূর করতে যদি কোন ব্যাক্তি ঔষধ সেবন করেন, তবে তাতে কি দোষ হয় ?"

বাবা বলিলেন,—

'দোষ কি ? ওষুধের ব্যবস্থা ত শ্রীভগবানের। রোগের উপসর্গ হ'তে রেহাই দিবার জন্যই ত শ্রীধন্বন্তরী-অবতার। তবে সাধকের পক্ষে যে পর্য্যন্ত নিজ ইষ্টে পূর্ণ নির্ভরতা না আসে, সে পর্য্যন্ত ওষুধ না খেয়ে নামাশ্রয় ক'রে থাকাই ভাল। ইষ্ট ছেড়ে অন্য কিছু আশ্রয় করলে ইষ্টে নিষ্ঠা জন্মাতে পায় না। ইষ্টে নিষ্ঠা হ'বার পর ওষুধ খাওয়ায় কোন দোষ নাই। তখন চিকিৎসকরূপে ইষ্ট এবং ওষুধরূপে ইষ্টের কৃপাই ভোগ হয়। ইষ্ট-বিস্মৃতির জন্য ব্যভিচারিতা দোষ ঘট্‌বার সম্ভাবনা থাকে না।"

তখন একজন প্রশ্ন করিলেন,—আজ্ঞে! ইষ্টে পূর্ণনির্ভরতা হ'বার পর আবার ঔষধ-সেবনের কি অর্থ হ'তে পারে ?''

বাবা সহাস্যবদনে বলিলেন,—

"বৈষ্ণবের ক্রিয়ামুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয়"—এই একটী কথার মধ্যে এত কিছু বলা আছে যে লিখলে একটী পুঁথি হয়। বৈষ্ণব-দেহ অপ্রাকৃত, সুতরাং বৈষ্ণবের রোগ আসতে পারে না। এবং ওষুধ খাওয়ারও প্রয়োজন হয় না। তবে তাঁরা আবরণে থাকতে ভালবাসেন, তাই সাধারণ মানুষের মত ওষুধ খান। তাঁদের ওষুধ খাওয়া আর সাধারণ লোকের ওষুধ খাওয়ার মধ্যে আকাশ পাতাল তফাৎ। তোমাদের দাদুর ওষুধ খাওয়ার হিসাবের কথা "শ্রীচরিতসুধায়" পড়েছ ত? যে যা ওষুধ দিবেন সব আনা চাই। একটীও বাদ দিলে চলবে না,—কারণ ওষুধরূপে কৃপা এসেছেন, কৃপা ভোগ হ'তে কি বঞ্চিত হওয়া ঠিক? ওষুধ সব আনা হ'লে সবগুলি একসঙ্গে খাওয়া চাই। এ ভাবে ওষুধ খেলে কোন রোগ ভাল হ'তে পারে, একথা কোন চিকিৎসক নিশ্চয় স্বীকার করবেন না। এখন সাধু-বৈষ্ণবদের ওষুধ খাওয়ার ব্যাপার বুঝলে?"

তখন একজন প্রশ্ন করিলেন,—"আজ্ঞে, সাধুমহাত্মাদের অপ্রাকৃত দেহে রোগাদি আসে কেন?"

বাবা উত্তরে বলিলেন,—

শ্রীরূপ গোস্বামী-পাদের উপদেশামৃতে এ বিষয়ে সুন্দরভাবে বুঝান হয়েছে।—গঙ্গাজল শ্রীভগবানের চরণামৃত, অপ্রাকৃত বস্তু, তথাপি জলধর্ম্মবশতঃ সাধারণ জলের মত গঙ্গাজলেও ফেন, পঙ্ক, বুদ্বুদ যেমন দেখা যায়; সেইরূপ অপ্রাকৃত ভক্তদেহেও দেহধর্ম্মবশতঃ রোগাদি আসে।

("দৃষ্টৈঃ স্বভাবজনিতৈর্বপুষশ্চ দোষৈ র্ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ।
গঙ্গাম্ভসাং খলু ন বুদ্বুদ-ফেন-পঙ্কৈ, ব্র্রহ্মদ্রবত্বমপগচ্ছতি নীরধর্ম্মৈঃ॥")

ফেন বুদ্বুদ পঙ্ক থাকা সত্ত্বেও যেমন গঙ্গার জল অপ্রাকৃত গঙ্গাজলই থাকে, সেইরূপ ভক্তদেহে রোগাদি আশ্রয় করলেও ভক্তদেহ অপ্রাকৃত নিশ্চয়ই থাকে। ভক্তদেহে রোগ দেখলেই মনে করা উচিত নয় যে, কৃতপাপ বা অপরাধের ইহা ফলভোগ, কারণ পাপ এবং অপরাধ, রোগের প্রধান দুই কারণ হইলেও অন্য কারণেও রোগ আসে। রোগের বীজ প্রতি শরীরেই আছে, রোগীর সংস্পর্শ বা অন্য কোন কারণে কিছু আনুকূল্য পেলেই রোগ প্রকাশ পায়—ইহা দেহের স্বভাব। এই দেহধর্ম্মবশতঃ ভক্তদেহে রোগ আসতে পারে। আবার সাধুদের করুণ হৃদয়, তাঁরা অন্যের দুঃখ দেখতে পারেন না। কেউ রোগে কষ্ট পাচ্ছে দেখলে এঁরা নিজদেহে সে-রোগ টেনে নিয়ে তাকে মুক্ত ক'রে দেন। শ্রীচরিতসুধায় ত এ বিষয়ে অনেক দৃষ্টান্ত পেয়েছ। বাবাজী-মহাশয় অতীন-দাদার গায়ে প্রস্রাব ক'রে দিয়ে তাঁকে

সারিয়ে দিয়ে এসে নিজে লেপ চাপা দিয়ে রোগে ভুগলেন। অপ্রকটের চার পাঁচ দিন আগে সমাজবাড়ীর বৈঠকখানা ঘরের দক্ষিণ বারাণ্ডায় দক্ষিণমুখো হ'য়ে ব'সে বল্লেন—এটী দক্ষিণ দিক, যমের দক্ষিণ দুয়ার। সাতটী মূত্ররোগ নিয়েছি (রাজর্ষি বনমালীবাবু, শ্রীরঘুনাথ দেব গোস্বামী, গিরীশ ঘোষ প্রভৃতির নাম ক'রে বল্লেন।) অনেকেই ত কৃপা করেছেন, এখন এর ধাক্কা সামলাতে পারলে হয়।" এখন বুঝলে ত যে, ভক্ত-দেহে এবং প্রাকৃত দেহে রোগের কারণ একপ্রকার নয়।"

আবার প্রশ্ন উঠিল—"আজ্ঞে, ভক্তদেহ এবং প্রাকৃত দেহে রোগভোগ কি এক প্রকারেই হয় ?"

বাবা বলিলেন,—

"না! রোগ হ'লে সাধারণ জীব ত্রিতাপ জ্বালা ভোগ করে; কিন্তু ভক্ত নিজের দৈন্য-স্বভাবে মনে করেন—আমি অশেষ দোষের দোষী, ঠাকুর অল্প কৃপাদণ্ড দিয়ে আমায় শুধরে নিচ্ছেন। রোগের মধ্যে ভক্ত ভগবানের কৃপাই ভোগ করেন, তজ্জন্য তিনি দুঃখ করার পরিবর্ত্তে আনন্দাশ্রুই বর্ষণ করিয়া থাকেন।"

এতক্ষণে উপস্থিত সকলের মনের সকল সন্দেহ মিটিয়া গেল। তাঁহারা যেন এক নূতন পথের সন্ধান পাইয়া পরমানন্দে বলিয়া উঠিলেন—"এবার হ'তে রোগ হ'লে আমরা শ্রীনামাদি আশ্রয় ক'রে থাকবার চেষ্টা করব।"

বাবা শুনিয়া অতি আনন্দ সহকারে বলিলেন—

"পারলে খুব ভাল এবং একটু পরীক্ষার পর ফল নিশ্চয়ই পাবে। তবে ধোপে বড় কেউ টেঁকে না। চরণামৃত পাবার সময় বলা হয়—অকালমৃত্যুহরণং সর্ব্বব্যাধিবিনাশনম্, আর বাড়ীতে কারুর অসুখ একটু বাড়লে ডাক্তার ডাকতে ছুটা হয়। এই দেখ না, আমার কথা বলি। যখন বড় অসুখ হ'ল, তখন কলকাতার বড় বড় ডাক্তার ডাকা এবং তাদের ওষুধ খাওয়া ব্যাপারে কোন ত্রুটি করা হয় নি। ফল কিছু না পেয়ে শ্রীধাম নবদ্বীপে গেলাম। সে সময়ে মনে হ'ল—ওষুধ ত অনেক খাওয়া হ'ল এবার শুধু চরণামৃত খেয়ে থাকব। "অকাল-মৃত্যুহরণং" কেবল মুখের কথাতেই থাকবে ? কিন্তু একথা শুনে কোন শ্রীমুখ হ'তে আজ্ঞা হ'ল—"বাবাজী মহাশয় (পরমারাধ্য শ্রীস-বড়-বাবাজী মহাশয়) ওষুধ চরণামৃত দুই খেতেন।" মনের সঙ্কল্প মনেই র'য়ে গেল। বাবাজী-মহাশয় (বড়-বাবাজী-মহাশয়) ব'লে গেছেন "ঠিক মানুষের মত থাকবি।"

তখন একজন বলিলেন—"আজ্ঞে! আপনিত আর রোগ সারাবার জন্য ঔষধ বা চরণামৃত খান না। আপনার কথা স্বতন্ত্র। আমাদের রোগ সারাবার প্রয়োজন হ'লে আমরা আর ঔষধ ব্যবহার করব না।"

শুনিয়া বাবা হাসি মুখে বলিলেন—

"বেশ ভাল কথা। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি রোগ সারাবার দরকার কি? সবই যদি কৃপাময়ের কৃপার দান হয় তবে রোগ দেওয়ার মধ্যে কি ঠাকুরের কৃপা নেই?"

একজন আবেগভরে জানিতে চাহিয়া বলিলেন,—"আজ্ঞে! রোগের মধ্যে কৃপার কথা ত বুঝ্‌তে পারি না।"

বাবা বলিলেন—

"দেখ! রোগ হ'ল মাষ্টার। যখন আমাদের মধ্যে 'আমিত্ব' বা অহঙ্কার বেড়ে যায় তখনি রোগ এসে চাবুক মেরে বুঝিয়ে দেন—'তোমার ক্ষমতা কিছু নেই। ভগবানের ইচ্ছায় তুমি কাজ করবার ইচ্ছা এবং সামর্থ্য পাও, সুতরাং ভগবানকে ভুলে তুমি অন্যায় করেছিলে।' এখন বুঝলে ত, রোগ-শয্যায় শ্রীভগবানের শ্রীহস্তের কৃপা-পরশ কিরূপে পাওয়া যায়!"

বেলা দশটা বাজে। সকলের এতক্ষণ সে দিকে নজর ছিল না। ভাগ্যবান্ সেবক আসিয়া একথা স্মরণ করিয়া দিলে সকলে ব্যস্তভাবে প্রসঙ্গ হইতে বিরত হইলেন।

---

১৩৫৬ সাল, পৌষ মাস, সকাল ৯ টায় কলিকাতা

নিত্য সেবক কয়েকমূর্ত্তি ভাগ্যবান্, সানন্দমনে পূজ্যপাদ শ্রীল বাবাজী মহারাজের শ্রীঅঙ্গে মৃদুমন্দভাবে তৈল ম্রক্ষণ করিতেছেন। দুই এক মূর্ত্তি আগন্তুক ভক্ত সন্নিকটে উপবিষ্ট। সকলের দৃষ্টি, ঐ ভাবভারানত শ্রীমুখের দিকে। এমন সময়ে বারুইপুর আশ্রমের প্রধান সেবক শ্রীযুক্ত নফর দাস আসিয়া শ্রীল বাবাজী মহারাজের সম্মুখভাবে পঞ্চাঙ্গ প্রণাম-পূর্ব্বক উপবেশন করিলেন এবং অবসরক্রমে সানুনয়ে নিবেদন করিতে লাগিলেন—"এবার শ্রীএকাদশীর দিন স্থির হইয়াছে কি?"

আমরা শ্রীল বাবাজী মহারাজের দক্ষিণ পার্শ্বে বসিয়াছিলাম। তিনি আমাদের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া প্রশ্ন করিলেন, "কি, একাদশী নিয়ে কিছু আছে নাকি ?" শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচৈতন্যদা সংক্ষেপে জানাইলেন, আজ্ঞে না। আবার শ্রীল বাবাজী মহারাজ নিজেই একটী অপূর্ব্ব সমাধান করিতে লাগিলেন—

**"একাদশী কর" এইরূপ কেহ জিজ্ঞাসা করলে, যখন বলতে হয়, হাঁ, একাদশী করি, কেননা বৈষ্ণব সেজে না করবার জো নাই, তখন একাদশী করতেই হবে। এদিকে আবার তিথির গোল মিটছে না। যা হোক্, তিথি স্মরণ করে একাদশী পালন ক'রলেই হ'ল। কথা আছে, "একবেলা খাও বা দু'বেলা খাও তাতে কোন আপত্তি নাই। সারাদিন সারারাত শ্রীহরিনাম করো। এই হ'ল, হরিবাসর বা একাদশী পালন।" তখন ত আর গাড়ী ঘোড়া ছিল না। এক গোসাঞি আছেন শ্রীবৃন্দাবনে আর এক গোসাঞি নন্দগ্রামে। এদিকে একাদশী পড়ছে, আজ কাল দুদিন। কি করে সমাধান করা যায় ? ৩০ মাইল রাস্তা হেঁটে বুঝা পড়া করতে গেলে সময় বেশী লাগে, ভজনের নিয়মও ভঙ্গ হয়ে যায়। তাই তাঁদের ইঙ্গিত ছিল, যখন আজকাল দুদিন একাদশী পড়বে তখন কালই ধরে নিয়ে পালন করতে হবে। আমরাও তাই করব।"**

শ্রীল বাবাজী মহারাজ তাঁহার বক্তব্য এই সিদ্ধান্তটীর উপর আমাদের গাঢ় মনঃসংযোগ বিধানের জন্যই যেন অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রযুগল সম্পূর্ণ উন্মীলিত করিয়া একটু গম্ভীরকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন—

**'বুঝলে ! যখন দেখবে আজকাল দুদিন একাদশী তখন তার মধ্যে পরের দিনটী পালন করিলেই সব মিটে যায়।"**

সহজবোধগম্য এই সরল সিদ্ধান্তটী শ্রবণ করিয়া উপস্থিত ভ্রাতৃবৃন্দের মুখে একটি আনন্দ জড়িত তৃপ্তির ছায়া ফুটিয়া উঠিল।

একদিন পরমারাধ্য শ্রীল বাবাজী মহারাজ ভাবমগ্ন চিত্তে উপবেশন করিয়া মালা জপ করিতেছেন। তাঁহার দর্শন লালসায় ভক্তগণ একে একে আসিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম-পূর্ব্বক নিকটে বসিতেছেন। "সাধু পুরুষদিগের দর্শন বিফলে যায় না, তাঁহাদের দর্শনের ফলে দুই একটি উপদেশ-বাণী শ্রবণ করিলে সংসার কারাগারে চির আবদ্ধজীবের মুক্তির সন্ধান পাওয়া যায়"। এই বলবৎ সংস্কারটীকে মানবের অন্তঃকরণ হইতে মুছিয়া ফেলিতে এ পর্য্যন্ত কেহ সমর্থ হয় নাই। তাই যেখানে সাধু মহাপুরুষদের অবস্থিতি, সুযোগ থাকিলে সেখানে সংসারীজনের সমাগম হইয়া থাকে। শ্রীল বাবাজী মহারাজ নিজ ইষ্টের মাধুর্য্যাস্বাদনে রত আছেন ; সমাগত ভক্তদিগকে দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ে সুপ্ত করুণা

যেন জাগিয়া উঠিল, যে রস এতক্ষণ উপভোগ করিতেছিলেন তাহা দর্শনাগত ভক্তদিগকে বিতরণ না করিয়া থাকিতে পারেন না। তাই তিনি কোন জিজ্ঞাসার অপেক্ষা না রাখিয়াই বলিতে লাগিলেন,—

শাস্ত্রে আছে যে, কোটি কর্ম্মীর মধ্যে একজন জ্ঞানী, কোটী জ্ঞানীর মধ্যে একজন মুক্ত, ইহার পর শুদ্ধভক্তের সংখ্যা নির্ণয় করিতে গিয়া শাস্ত্র কোন নির্দ্দেশ করিতে পারিলেন না। যথাযোগ্য সাধন ফলে জ্ঞান মিশ্রা ভক্তি পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। কিন্তু শুদ্ধা অহৈতুকী ভক্তির সন্ধান কোটি কল্প কঠোর সাধনেও কেউ কখনও পায় নাই,—ব্রহ্মাদিরও ইহা অগোচর ছিল। এই প্রেমলক্ষণা ভক্তি, ভগবানকে পুত্র, সখা, প্রাণপতির কোন একটী সম্বন্ধের বন্ধনে বাঁধিয়া ভক্তের অধীন করে। এই ব্রজজাতীয়-সম্বন্ধা রতি শ্রীকৃষ্ণেরই ভোগ্যবস্তু, গোলোকের গুপ্তনিধি। শাস্ত্র বলিলেন—ইহা 'নৃলোকে না হয়'; তবে যাঁহার জিনিষ, তিনি যদি কাহাকেও দেন তবে সে ইহা পাইতে পারে। এই কথার মধ্যে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, রসময় শ্রীগোবিন্দে রস বিতরণের ইচ্ছা জাগিতে পারে। রস-বস্তুর স্বভাব রসভোগী যতই রস ভোগ করিতে থাকেন, ততই পাঁচজনকে দিয়া ভোগ করিবার বাসনা জাগে। তাই যিনি রসিক, তিনি করুণ হইয়া থাকেন। শ্রীবৃন্দাবন-লীলায় যখন রসাস্বাদ চরম অবস্থায় পৌঁছিল, তখন পরম কারুণ্যের উদ্ভব হইল। তবে প্রতি লীলার মধ্যে এক একটী মুখ্য উদ্দেশ্য থাকে। ত্রেতাযুগে শ্রীরামচন্দ্র দণ্ডকারণ্যের ঋষিদের মধুর রসাস্বাদের প্রার্থনা পুরণ করিতে পারিতেন, কিন্তু তাহা হইলে পরবর্ত্তী দ্বাপর লীলায় রাসলীলার প্রয়োজন থাকে না। তাই তিনি ঋষিদের প্রার্থনা পুরণ করিতে বিরত হইলেন। তারপর দ্বাপরে রসভোগ করিতে আসিয়া যদি তিনি রস বিতরণ করেন, তবে কলিযুগে শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলার প্রয়োজন থাকে না তাই রসময় শ্রীগোবিন্দ রসিকশেখর ও পরম করুণ হইয়াও রসিকশেখরের লীলা প্রকাশ করিলেন, কারুণ্যের লীলা প্রকাশ করিলেন না। তারপর কলিযুগে রসিকশেখর পরম করুণ শ্রীগোবিন্দ শ্রীগৌরাঙ্গরূপে চির অনর্পিত নিজভোগ্য প্রেমভক্তি দান করিবার ইচ্ছা করিলেন।

এ দিকে যাহাদিগকে দান করিবেন (কলিহত-জীব) তাহারা অন্যান্য সকল যুগের জীব অপেক্ষা সর্ব্বাংশে অযোগ্য। তপ, যজ্ঞ, অর্চ্চনা প্রভৃতি কোন সাধনেরই যোগ্যতা তাহাদের নাই, সুদুর্লভা হরিভক্তি-লাভ কিরূপে সম্ভব হইবে! অযোগ্য সন্তানের প্রতি পিতামাতার অধিক বাৎসল্য দেখা যায় উপার্জ্জনে অক্ষম সন্তানের জীবন-যাপনের উপায়স্বরূপ তাঁহারা তাঁহাদের নিজস্ব ধন দিয়া যান। সর্ব্বসাধনশক্তিহীন অযোগ্যপুত্র কলিজীবের দুরবস্থা দেখিয়া জগৎ-পিতা গৌরহরির প্রেমভক্তি-দানের বাসনা বৃদ্ধিপ্রাপ্তই হইল। প্রিয়পার্ষদ শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু, শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু, শ্রীগদাধর ও শ্রীশ্রীবাসকে লইয়া তিনি কলিজীবের সর্ব্বপ্রকার অযোগ্যতা ঘুচাইয়া প্রেমভক্তিলাভের স্বভাবদানের উপায় চিন্তা করিতে বসিলেন। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু, শ্রীগদাধরপণ্ডিত গোস্বামী এবং শ্রীশ্রীবাসপণ্ডিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর

চিন্তাক্লিষ্ট মুখের গাম্ভীর্য্যদর্শনে আলোচ্যবিষয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া বিশেষ মনোযোগ সহকারে চিন্তাপূর্ব্বক নিজ নিজ মত প্রকাশ করিলেন। তাঁহাদের সকলেরই বিচারে, কলিজীবকে কিছু সাধন করিতে হইবে, অন্যথা প্রেমভক্তি-লাভ অসম্ভব। পতিত-বন্ধু শ্রীনিতাইচাঁদের মত ত্রিতাপদগ্ধ কলিজীবের দুর্গতি আর কেহ উপলব্ধি করেন না। কলিজীবের উপরই সাধনের ভার অর্পিত হইল শুনিয়া শ্রীনিতাইচাঁদ ক্ষুব্ধমনে চুপ করিয়া বসিয়া ছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন—"অবধূত! তুমি যে কিছু বল্‌ছ না?" তখন পরামর্শদাতাদের লক্ষ্য করিয়া শ্রীনিতাইসুন্দর শ্লেষভরে বলিলেন—"কলিজীবের উদ্ধার সাধন এবং নামপ্রেমদান তোমাদের হল ত? এখন ঘরে যাও! জগাই মাধাইকে নাম করতে বলায় মার খেতে হল, আর এই সমস্ত সাধনের ভার তাদের উপর দিলে তারা তোমাদের কথা খুব পালন করবে।" শ্রীমন্‌মহাপ্রভু বুঝিলেন যে এই পাগলের নিকট হইতে যথার্থ উপায় বাহির হইবে। তাই প্রশ্ন করিলেন—"শ্রীপাদ। এ সম্বন্ধে তোমার মত কি?" শ্রীনিতাইচাঁদ বলিলেন—"তোমার নাম যে সর্ব্বশক্তিমান্। কোন প্রকার বিধি নিষেধ না দিয়ে কলিজীবকে নাম দেওয়া হোক্। নাম পেয়াদার হাতে পড়লে কলিজীব ভক্তি-কারাগারে না এসে রেহাই পাবে না।" ইহা শুনিয়া বিচারক শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর চিন্তামেঘ কাটিয়া গেল। হর্ষের সহিত তিনি রায় দিলেন—"নামসংকীর্ত্তন কলিযুগে পরম উপায়।"

কলির অর্থ, কলহ। শ্রীনিতাইচাঁদের কৃপায় কলহের যুগ প্রেমের যুগে পরিণত হইল। যে কলিতে শ্রীনিতাই গৌরাঙ্গের অবতার, তাহা সর্ব্বযুগসার, 'ধন্যকলি' নাম ধরিল, সেই কলিতে জন্মলাভ, অন্য সকলযুগের জীবের একান্ত কাম্য। এহেন কলিযুগ কৃপা করিয়া আমাদের আশ্রয় দেওয়ায় আমরা ধন্য এবং গৌরবান্বিত, অতএব যুগরাজ কলিমহারাজ আমাদের প্রণম্য। আমরা এই কলিতে জন্মগ্রহণ না করিলে ভুবনমঙ্গল শ্রীহরিনামসঙ্কীর্ত্তনকে যুগধর্ম্মরূপে পাইবার সৌভাগ্য পাইতাম না।

শ্রীল-বাবাজী-মহাশয়ের শ্রীমুখনিঃসৃত এইরূপ পরম উপাদেয় উপদেশামৃত পান করিয়া সমাগত ভক্তগণ পরমানন্দ লাভ করিলেন।

আর একদিন শ্রীল-বাবাজী-মহাশয়ের নিকট এক ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করিলেন, আজ্ঞে! শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তনকে এ যুগে এত প্রাধান্য দেওয়া হইল কেন? ত্রেতাদিযুগে কি নামের সেরূপ মহিমা ছিল না?

উত্তরে শ্রীল-বাবাজী মহাশয় বলিলেন,—

অন্যান্য যুগে জীবের কঠোর সাধন করিবার সামর্থ্য ছিল, তাই, তাহারা এই সহজসাধনে (জিহ্বায় নামগ্রহণ মাত্র) রুচিসম্পন্ন হইতে পারিবে না জানিয়া শ্রীভগবান্ সে-সবযুগে তাহাদের সামর্থ্যানুযায়ী তপ, যজ্ঞ, অর্চ্চনারূপ কঠোর সাধনকে যুগধর্ম্মরূপে প্রচার

করিলেন। সুতরাং কলিযুগে যুগধর্ম্মরূপে শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন প্রচার করায় ভগবানের উপর পক্ষপাতিত্ব দোষ আরোপ করা যায় না, কি ত্রেতাদি যুগে নামের প্রভাব তেমন ছিল না, বলা চলে না। সে-সবযুগে নামমহিমার দৃষ্টান্ত রাখিয়া যাইতে শ্রীভগবান্ বিরত হন নাই। ত্রেতাযুগে শ্রীরামচন্দ্রকে সেতুবন্ধন করিয়া সমুদ্র পার হইতে হইয়াছিল, আর শ্রীহনুমান শ্রীরামচন্দ্রের নাম আশ্রয় করিয়া অনায়াসে এক লম্ফে সমুদ্র পার হইলেন। আবার সেতুবন্ধনের সময় শ্রীরামচন্দ্র নিজহাতে সমুদ্রে শিলাদি নিক্ষেপ করিয়া সেগুলিকে জলে ভাসাইতে পারেন নাই, কিন্তু শ্রীনলজী শৈলের উপর শ্রীরাম নাম লিখিয়া জলে ছাড়িয়া দিলে, তাহারা ভাসিতে লাগিল। আবার সমুদ্রে ভাসমান শৈলাদি যখন পরস্পরের সঙ্গে মিলিত না হইয়া পথনির্ম্মানের বাধা সৃষ্টি করিতে ছিল, তখন শ্রীহনুমানজী, একটি পাহাড়ের গায় শ্রীরামনাম এবং আর একটীর গায়ে শ্রীসীতানাম লিখিয়া দিলে, তাহারা সঙ্গে সঙ্গে এক হইয়া মিলিয়া গেল। ইহা দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট শ্রীরামচন্দ্র ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, মহাবীরজী বলিলেন—এ আপনি বুঝবেন না।

আবার দ্বাপরযুগে শ্রীসত্যভামাদেবী নিজের প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য (শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সমান ওজন স্বর্ণদানের জন্য) যখন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে পাল্লার একদিকে দাঁড় করাইয়া অপরদিকে সমস্ত স্বর্ণ চাপাইয়া ব্যর্থমনোরথ হওয়াতে বিপদ গণিলেন, তখন শ্রীনারদজীর উপদেশে একটী তুলসী পত্রে শ্রীকৃষ্ণনাম লিখিয়া স্বর্ণস্থিত পাল্লার উপর দিবামাত্র শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র হাল্কা হইয়া গেলেন। শ্রীনামমহিমার এসব দৃষ্টান্ত থাকা সত্ত্বেও ত্রেতাদিযুগের জীব সাধনশক্তি-গর্ব্বে যদি শ্রীনামাশ্রয় না করে তজ্জন্য শ্রীভগবান্‌কে দোষী সাব্যস্ত করা চলে না।

তখন একজন জিজ্ঞাসা করিলেন, আজ্ঞে! ত্রেতাযুগেও কি শ্রীনামকীর্ত্তনের শক্তি এ-কলিযুগের মত সমানভাবেই ছিল?

উত্তরে শ্রীল-বাবাজী মহাশয় বলিলেন,—

শাস্ত্রে পাওয়া যায়—শ্রীনাম সকল কালে সকল দেশে সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ হইয়া বিরাজ করিতেছেন—"ইথে (শ্রীনামগ্রহণে) কাল দেশ নিয়ম নাই সর্ব্বসিদ্ধি হয়।" সুতরাং ত্রেতাদিযুগে কোন ভাগ্যবলে মহৎকৃপাফলে যদি কোন ভাগ্যবান্ জীব শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তনে বিশ্বাসবান হইয়া উহা আশ্রয় করিতেন, তবে সেই যুগোচিত বস্তু প্রাপ্তির কথাকি, পঞ্চম-পুরুষার্থ প্রেমধন পর্য্যন্ত যোগ্য আধার থাকায় (কলিজীব অপেক্ষা) অনায়াসে সহজেই লাভ করিতে পারিতেন।

এক্ষণে প্রশ্ন উঠিতে পারে—কি কারণে শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন এত শক্তিমান্? উত্তর, প্রাকৃত জগতে নাম নামীকে নির্দ্দেশ করে মাত্র, নামী হইতে নাম পৃথক। কিন্তু ভগবৎরাজ্যে শ্রীভগবদিচ্ছায় নাম নামী অভিন্ন, নামীর শক্তি নামেতে পূর্ণভাবে বিরাজমান। উপরন্তু নামী যাহা করিতে পারে না, নাম আশ্রয় করিয়া ভক্ত তাহা অনায়াসে সাধন করেন।

আবার শ্রীনামসাধনের এমনি অপরূপ মহিমা যে সাধ্যবস্তুপ্রাপ্তির পরও সাধক শ্রীনাম-মাধুরী পান না করিয়া থাকিতে পারে না। অধিক কথা কি, নামী পর্য্যন্ত নিজ-নামরসাস্বাদনে উন্মত্ত।

শ্রীব্রজলীলায় শ্রীরাধারাণী শ্রীকৃষ্ণবিরহে দশমীদশাপন্ন হইয়া যখন দেহরক্ষার জন্য যমুনাজলে নামিয়াছেন—অর্দ্ধেক দেহ জলের মধ্যে—তখন লীলাশক্তি দেখিলেন যে, এ বিরহ শান্ত করিতে না পারিলে লীলা রক্ষা করা অসম্ভব।

তাই বিরহ-শান্তির উপায়স্বরূপে তিনি শ্রীকিশোরীর মুখে "হরেকৃষ্ণ" মহামন্ত্রের প্রকাশ করিলেন। যখনি প্রথম 'হরে' (হরি শব্দের সম্বোধন) নাম প্রকাশ পাইলেন, তখনি শ্রীরাধা-রাণী শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনিতে পাইলেন, অমনি মনে হইল, "তবে ত কৃষ্ণ ব্রজেই আছে, ঐ যে বাঁশী বাজায়ে আমায় আকুল করছে।" প্রথম 'হরে' নামস্ফুরণে পূর্ব্বরাগলীলা প্রকাশ পাইলেন। তাহার পর 'কৃষ্ণ' আবার 'হরে' ইত্যাদি পর পর নামের এক একটি স্ফুরণে পর পর শ্রীকৃষ্ণলীলার এক এক প্রকাশ হইতে লাগিল। শেষে 'হরে' নাম প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীরাধারাণী মহারাসলীলাসমুদ্রে মগ্ন হইলেন, বিরহজ্বালা একেবারে নির্ব্বাপিত হইল। আবার শ্রীগৌরাঙ্গলীলায় বিরহ-বিধুরা গৌরকিশোরীর প্রাণরক্ষার জন্য এই শ্রীমহামন্ত্র শ্রীগৌরাঙ্গমুখে প্রকাশ পাইলেন। তাই শ্রীমহামন্ত্র সম্বন্ধে শ্রীকবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—"শ্রীচৈতন্য মুখোদ্‌গীর্ণ।" এই নাম একা শ্রীরাধাণীরই ভোগ্য নয়, শ্রীরাধাকৃষ্ণ যুগলেরই ভোগ্য।

এইরূপ নামের অপূর্ব্ব মহিমা শ্রবণে উপস্থিত শ্রোতৃবর্গের মুখমণ্ডলে অন্তরে উদিত নামানুরাগচন্দ্রের স্নিগ্ধ কিরণচ্ছটা যেন ফুটিয়া উঠিল, তাঁহারা আজিকার শ্রীল-বাবাজী মহাশয়ের দর্শনলাভটীকে যেন বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত বলিয়া মনে করিলেন। তন্মধ্যে একজন অতি আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, আজ্ঞে! নামের মহিমা হৃদয়ে জাগ্রত রাখিবার জন্য কোন্ গ্রন্থখানি নিত্যপাঠ করা উচিৎ?

উত্তরে, শ্রীলবাবাজী মহাশয় কম্পিত কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন,—

শ্রীনামমাহাত্মের সম্বন্ধে শ্রীল বাবাজী মহাশয় (বড় বাবাজী) বলিলেন "শিক্ষাষ্টক পড়ে নাম কি দিতে পারে দেখ, তার পরেও যদি কিছু পাবার থাকে তখন অন্যস্থানে যেও"।

বাস্তবিক, যেমন ৫ এর মধ্যে ১, ২, ৩, ৪ আছে, সেইরূপ কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি (জ্ঞানমিশ্রাভক্তি) এই চার প্রকার সাধন ফলে যাহা লাভ করা যায় তাহা পঞ্চম সাধনপথে অর্থাৎ শুদ্ধাভক্তিপথে অনায়াসে মিলিয়া যায়। ভক্ত তাহা বুঝিতেও পারে না। অথচ পৃথক্‌ভাবে ঐ চার প্রকার সাধন করিতে গেলে কলিযুগে হিতে বিপরীতই দাঁড়ায়। কর্ম্মকাণ্ডের হোমযজ্ঞাদিতে একটু ত্রুটী হইলে লেটা উৎপত্তি হয়। কলিযুগে আচার্য্যের অভাব, যজ্ঞাদির প্রয়োজনীয় বস্তুর অভাব—সুতরাং ত্রুটী হওয়া স্বাভাবিক।

তাই শ্রীনামের ব্যবস্থা। শ্রীনাম গ্রহণে ত্রুটি হইলেও ধানের বীজের মত ঠিক সোজা হইয়া চারা উঠিবে। পুরীর মহাত্মা বাসুদেব মহারাজজী বলিয়াছিলেন—"**শ্রীসুদর্শনমন্ত্র জপ করার মত বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার** আর কোন উপায় নাই।" আবার নামাশ্রয় ব্যতিরিকে কর্ম্মকাণ্ড ফলপ্রদ হইতে পারে না। তাই যাগযজ্ঞাদির শেষে শ্রীগোবিন্দনাম গ্রহণ করিবার বিধি। যখন শ্রীনাম ব্যতিরিকে সমস্ত কর্ম্মকাণ্ড পণ্ডশ্রমে পরিণত হয়, তখন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির কি মনে হওয়া উচিত নয় যে, তবে নামই আশ্রয় করি?

আর যোগপ্রক্রিয়ার ফলে কুলকুণ্ডলিনী জাগরণ প্রভৃতি যাহা লাভ হয় তাহা শ্রীনামসাধনে অনায়াসে সম্পাদিত হয়। পৃথকভাবে যোগসাধন কলিজীবের পক্ষে দুষ্কর। কারণ, ব্রহ্মচর্য্য, সংযম তাহাদের নাই। এমতাবস্থায় প্রাণায়ামাদি করিতে যাওয়ায় মাথার গোলমাল দেখা দেয় এবং অকেজো হইয়া পড়িতে হয়। আর জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিসাধনও কলিজীবের সাধ্যায়ত্ত নহে। অথচ নামাশ্রয়ে সমাধি প্রভৃতি অনায়াসে লাভ করা যায়। বাস্তবিক, কলিযুগে নামসংকীর্ত্তন ছাড়া অন্য কোন সাধন নাই।

---

**১৩৫৬ সাল, চৈত্র মাস, শ্রীভাগবতাচার্য্যের শ্রীপাঠবাড়ী, আশ্রম বরাহনগর।**

ভক্ত যখন শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ করেন তখন তিনি প্রায়শঃ শ্রীভগবানের গুণাবলী লাভ করেন। সেজন্য শ্রুতি বলিতেছেন, "**ব্রহ্মবিদ্* ব্রহ্মৈব ভবতি**" "**নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি**" অর্থাৎ ঈশ্বর সাক্ষাৎকারী ব্যক্তি ঈশ্বর সদৃশ হইয়া যান। সদৃশ বলাতে ভক্ত ও ভগবানের অভিন্নতা আসিল না। দুইটী বস্তুর যেখানে পরস্পর ভেদ থাকে সেইখানেই তাহাদের কোন বিশেষ সাম্যকর্ম্ম দর্শনে সদৃশ শব্দ প্রয়োগ করা হয়। অভিন্ন বস্তুতে সদৃশ শব্দ প্রয়োগ করা হয় না। যেমন বলা হয়, অশ্বসদৃশ গর্দ্দভ. অশ্বসদৃশ অশ্ব কখনও বলা হয় না। আরও বুঝিবার বিষয় এই যে, কোন ন্যূন বস্তুর উৎকর্ষ দেখিলে তাহাকে তদপেক্ষা উত্তমগুণ-বিশিষ্টবস্তুর সঙ্গে তুলনা দেওয়া হয়। যেমন কাহারও মুখ দেখিতে সুন্দর হইলে, তাহা তদপেক্ষা অধিক সুন্দর চন্দ্রের সঙ্গে তুলিত হয়। তেমনি যে জীব মায়ার নিপীড়নে মলিন হইয়া ছিল, মায়ার লাথি খাইতে খাইতে যাহার প্রাণ

---

*ব্রহ্মএব, ব্রৈহ্মৈব। এব শব্দের অর্থ সাদৃশ্য, (অমরকোষ)

ওষ্ঠাগত হইতে ছিল সেই জীব ভক্তিনেত্রে ভগবদ্দর্শন করিয়া নিকৃষ্ট মায়াগুণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক উৎকৃষ্ট অপ্রাকৃততনুতে অপ্রাকৃতধামে বাস করাতে, শ্রুতি তাহাকে তদপেক্ষা অধিক গুণবিশিষ্ট ঈশ্বরের সঙ্গে তুলনা করিয়া "ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি" বাক্য প্রয়োগ করিতেছেন। সুতরাং জীব-ঈশ্বর সাক্ষাৎকার লাভ করিলেও ঈশ্বর হইতে ভিন্নই এবং ন্যূনই থাকে।

তথাপি শ্রীভগবানের মহিমার তুলনায় ভক্তের মহিমা অধিক। কারণ যিনি অখিল ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর, যাঁহার ইচ্ছার বিরূদ্ধে একটী তৃণ পর্য্যন্ত সক্রিয় হইতে পারে না সেই শ্রীভগবান্‌কে তাঁর ভক্ত সম্পূর্ণ অধীন করিয়া যেমন ইচ্ছা তেমনি নাচাইতে থাকে। ইহা শ্রীভগবান্ নিজেই তাঁর শ্রীমুখে স্বীকার করিতেছেন। যখন দূর্ব্বাসা-মুনি সুদর্শনচক্র হইতে রক্ষা পাইবার জন্য সত্যলোক, শিবলোক প্রভৃতি স্থানে ব্রহ্মা, শিব প্রমুখ দেবগণের নিকট ব্যর্থ-মনোরথ হইয়া বিষ্ণুলোকে ব্যাকুল-প্রাণে উপনীত হইলেন তখন শ্রীনারায়ণ বলিতেছেন—হে ব্রাহ্মণ! তুমি বড় আশা করিয়া আমার কাছে আসিয়াছ বটে কিন্তু তোমার প্রার্থিত রক্ষা বিষয়ে আমরেও স্বাতন্ত্র্য নাই। নিখিল জগৎ আমার অধীন থাকিলেও আমি চিরকাল ভক্তের অধীন। (অহং ভক্ত-পরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব স্বিজ!) তখন অগত্যা দূর্ব্বাসা শ্রীভগবানের উপদেশানুসারে ভক্ত অম্বরীষের শরণ লইয়া নিজেকে রক্ষা করিলেন। তাই এ সম্বন্ধে একদিন পরমপূজ্যপাদ শ্রীলবাবাজী মহাশয় বলিলেন—

"দশজন বিচার করিতে বসিয়াছেন। বিচার্য্য-বিষয়, কে বড়। কেহ বলিলেন পৃথিবীই সর্ব্বাপেক্ষা বড়। এ কথার প্রতিবাদ করিয়া আর একজন বলিলেন আকাশই সর্ব্বাপেক্ষা বড়। তখন আর একজন খুব জোর গলায় বলিলেন, না, না, ভগবান্‌ই সর্ব্বাপেক্ষা বড়। কারণ, তিনি বিরাট। এ মীমাংসার পরেও আবার প্রশ্ন উঠিল আচ্ছা! ভগবান্ অপেক্ষা আর কেহ বড় আছে কি না? বহুক্ষণ চিন্তার পর একজন নিবিড় অরণ্যে পথহারা পথিকের পথ পাওয়ার মত আনন্দোল্লাসে বলিয়া উঠিলেন, আছে আছে! ভগবান্ অপেক্ষা তাঁর ভক্তই বড়। কেন না, যে বিরাট ভগবান্‌কেও নিজ হৃদয়ে রাখিতে পারে, সে বড় হইবে না?"

মীমাংসা শুনিয়া সকলে আনন্দে আত্মহারা হইলেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, শ্রীভগবানের আরাধনা যেমন আমাদের কর্ত্তব্য, তাঁর ভক্তের আরাধনাও তেমনি কর্ত্তব্য। তথাপি মহিমার আধিক্যবশতঃ এবং "মদ্‌ভক্তপূজাভ্যধিকা" এই শ্রীভগবদুক্তি-বশতঃ ভক্তারাধনার অধিক গুরুত্ব পরিলক্ষিত হয়। আমাদের পরমগুরুদেব পরমারাধ্য শ্রীশ্রীরাধারমণচরণ দাস দেব (পুরীর বড় বাবাজী মহাশয়) ঐরূপ

ঈশ্বর সাক্ষাৎকারী ভক্ত পর্য্যায়ের অন্তর্ভুর্ক্ত। তাই তাঁহার তিরোভাব তিথির আরাধনা উপলক্ষে শ্রীধাম নবদ্বীপ সমাজবাটীতে অনুষ্ঠিত উৎসবে তাঁহার শিষ্যপ্রশিষ্য ছাড়াও বহু জনসাধারণ যোগদান করিয়া জীবন ধন্য করিয়া থাকেন। এই মহান্ উৎসবটী চতুশ্চত্বারিংশৎ (৪৪) বৎসর যাবৎ অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছেন। আমাদের এই উৎসবের প্রধান অঙ্গ হইল নামসংকীর্ত্তন ও মহাপ্রসাদ বিতরণ। তৎকালে এ নামসংকীর্ত্তন-ধ্বনির ব্যাপকতা এবং প্রসাদ বিতরণের প্রচুরতা যিনি একবার দর্শন করিয়াছেন তিনি যুগপৎ বিস্ময় ও আনন্দে বিমুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারেন নাই। বিরহ উৎসব যত বিরাট্ আড়ম্বর সহকারে অনুষ্ঠিত হউক না, উৎসবে সমাগত ব্যক্তিগণের হৃদয়ে যদি বিরহ জাগিয়া না উঠে তবে সে উৎসব প্রাণশূন্য বলিয়া মনে হয়। আমাদের এ উৎসবে সে বস্তুটীরও অভাব হয় না। যখন পরমারাধ্য শ্রীল বাবাজী মহাশয় শ্রীরাধারমণের সূচককীর্ত্তন করিতে বসেন তখন তাঁহার সেই অশ্রুপ্লাবিত শ্রীমুখ দর্শন করিয়া, ব্যাকুলতাপূর্ণ উচ্চ ক্রন্দন শুনিয়া মনে হয়, পাষাণও বুঝি বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। কীর্ত্তনশ্রবণরত শত শত নরনারী ও বালক বালিকাগণের মধ্যে যাহার দিকে তাকানো যায়, দেখিতে পাওয়া যায়, সকলেই ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতেছে। এমন কি তরুলতা প্রভৃতির দিকে তাকাইলে মনে হয়, তাহারাও আজ শ্রীরাধারমণের বিরহে কাতর হইয়া অঝোরে ঝুরিতেছে।

এই সর্ব্বজনসমাদৃত মহোৎসবটী এ বৎসরও শ্রীশ্রীনিতাচাঁদের করুণায় গত ফাল্গুন মাসে নির্দ্দিষ্ট দিবসে পূর্ব্ববৎ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

এই উৎসব সময়ে একদিন পরমারাধ্য শ্রীল বাবাজী মহাশয় তাঁহার গৃহে উপবেশনপূর্ব্বক নামমালা স্মরণ করিতেছেন। সম্মুখে ভক্তগণ উপবিষ্ট। তাঁহাদের একজন জিজ্ঞাসা করিলেন, আজ্ঞে আমার ভজনে মন লাগে না, কি করি? মৃদু হাসিয়া

শ্রীলবাবাজী মহাশয় বলিলেন—

**এ যুগে ভজন বড় শস্তা, নাম কর, নামে সব ঠিক হইয়া যাইবে।**

তখন ভক্তটি বলিলেন, কি কি নিয়মে নাম করিতে হইবে?

শ্রীলবাবাজী মহাশয় বলিলেন,

**আমাদের এখানে কোন নিয়ম কানুন নাই। কেবল নাম করিলেই সব হইবে। সংখ্যা রাখিয়া নাম কর। জান? একজন মৎস্য না খাইয়া থাকিতে পারিত না, পরে শ্রীনামের কৃপায় এমন অবস্থা হইল যে, যেখানে মৎস্যের গন্ধ পাওয়া যাইত সে সে-রাস্তা দিয়া পর্য্যন্ত চলিত না। অতএব শ্রীনাম সর্ব্বশক্তিমান, নামাশ্রয়ে সব আপনা আপনি হইয়া যাইবে।**

তবে এইটী মনে রাখিতে হইবে যে, ঔষধ খাইয়া তৎসহ কুপথ্য করিলে কোন ফল পাওয়া যাইবে না।

নামাশ্রয় কিভাবে করিতে হয়, তাহার একটী সুন্দর উদাহরণ বলিলেন—

একজন একটী ভূতকে বশীভূত করিয়াছিল এবং তাহাকে নিজের কৃত্যকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিল। কিন্তু সর্ত্ত ছিল এই যে, সদা সর্ব্বদা তাহাকে কাজ দিতে হইবে। তাহা না হইলে সে তাহার ঘাড় মটকাইবে। তাহার পর সে ব্যক্তি সদা সর্ব্বদা কাজ দিতে না পারিয়া একদিন মহা চিন্তিতাবস্থায় বসিয়া আছে, এমন সময়ে তাহার এক বন্ধু সব শুনিয়া তাহাকে বলিল, ভাই! ইহাতে চিন্তা করিবার কি আছে। তুমি এক কাজ কর, একটী ১০৮ গাঁটের বাঁশ কাটিয়া উঠানে পুঁতিয়া রাখিবে এবং যখন কাজ না থাকিবে সেই ভূতকে উহাতে উঠিতে ও নামিতে বলিবে। এই উপদেশে তাহাই করিয়া সে নিশ্চিন্ত থাকিত। এখন তোমার মনকে ভূত ও শ্রীনামের মালাকেই ১০৮ পর্ব্ব বাঁশ মনে করিও। তবে কাহারও নিন্দা করিও না কি শুনিও না।

সে দিন এই প্রসঙ্গটী শুনিয়া সকলেই বড় প্রীতি লাভ করিলেন।

যিনি শ্রীশ্রীভগবন্নামসংকীর্ত্তনের সর্ব্বশক্তিমত্তা দেখাইতে গিয়া স্থাবরকেও প্রেমাবিষ্ট করিয়া নাচাইলেন মৃতকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া তুলিলেন, যিনি প্রেমপারবশ্যে স্বীয় বিশাল বাহু প্রসারিত করিয়া প্রেমালিঙ্গনদানে হিন্দু-যবন-নির্ব্বিশেষে আপামরকে ধন্য করিলেন এবং সর্ব্বানর্থকারী যে ভেদবুদ্ধি তাহা অনায়াসে বিনষ্ট করিতে হইলে শ্রীশ্রীনামসংকীর্ত্তনকেই তাহার পরম উপায় বলিয়া প্রত্যক্ষভাবে যিনি জীব-জগৎকে জানাইলেন সেই পতিতপাবন পরমপ্রেমোন্মত্ত পরমারাধ্য পুরীধামের বড়বাবাজী শ্রীলরাধারমণদেবের তিরোভাব তিথি স্মরণ উপলক্ষে শ্রীধাম নবদ্বীপস্থ সমাজবাটী আশ্রম আজ মুখরিত হইয়া উঠিতেছে। পূজ্যপাদ গোস্বামী, মহান্ত সাধুসজ্জন ও অন্যান্য ভক্তবৃন্দ আশ্রমে আগমন করিতেছেন ঐ মহাপুরুষের আন্তরিকতাপূর্ণ আকর্ষণে। শিষ্টাচার ও শাস্ত্রাচারমতে যাঁহার যেরূপ সমাদর ও অভ্যর্থনার প্রয়োজন তাহার কোনই ত্রুটি ঘটিতেছে না মর্য্যাদাবিত্তম পরমারাধ্য শ্রীলবাবাজীমহারাজের অনুগত সেবকগণের তত্ত্বাবধানে।

যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, মনে হয়, সবই যেন আপনার বস্তু। এ যেন বহুদিনের পর বিদেশ হইতে ঠিক ঠিক নিজের গৃহে সকলে ফিরিয়া আসিয়াছে। সকলে যেন সকলের চিরপরিচিত একান্ত আপনার জন। সিন্ধুসম্মিলনে নদ নদী যেমন আপন-ব্যক্তিত্ব হারাইয়া ফেলে এই চিন্ময়ধামান্তর্গতস্থানেও তেমনি কোন এক মহতী

মমতার আলোড়নে সমাগত সকলে নিজ নিজ ব্যক্তিত্ব হারাইতেছে। ধনীর ধনাভিমান পণ্ডিতের পাণ্ডিত্যাহঙ্কার, কুলীনের কৌলীন্যগর্ব্ব, উচ্চপদস্থব্যক্তির সশঙ্কজনমণ্ডলী হইতে পাওয়া মানসম্মান, সবই যেন দূরাতিদূরে সরিয়া গিয়াছে। তৎপরিবর্ত্তে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ছন্দময় এক সুমধুর মহান্ ঐক্য, যাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া মানুষের মনে প্রবাহিত হইয়া থাকে বিপুলশক্তির অনুপ্রেরণা, নিষ্পেষিত হইয়া যায় প্রসন্নতার পরিপন্থী যাবতীয় দুর্ভাবনা, অনায়াসে লাভ করা যায় বিরামবিহীন চরমশান্তি।

যাঁহার দূরপ্রসারী শ্রীভগবন্নামসংকীর্ত্তনের প্রচার ফলে পূর্ব্বোক্ত আকর্ষণ উদ্দীপিত হইয়া আজ এইরূপ ঐক্যবন্ধনে সমাগত ব্যক্তিবর্গকে আবদ্ধ করিয়াছে সেই পরমপূজ্যপাদ শ্রীলবাবাজীমহারাজের কুটীর প্রাঙ্গণে জনমণ্ডলী সমবেত হইতেছেন তাঁহার পূত দর্শন লাভ করিয়া তপ্তজীবন শীতল করিতে এবং তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত উপদেশামৃতকে সম্বল করিয়া আধ্যাত্মিকপথে নিরাশপ্রাণে আশার সঞ্চার করিতে।

তখন সূর্য্য অস্ত যাইতে বিলম্ব ছিল না। শ্রীলবাবাজীমহারাজ শ্রীগ্রন্থ পাঠ শেষ করিয়া বাহিরে দর্শনোৎকণ্ঠায় অপেক্ষ্যমান জনমণ্ডলীকে দর্শন দান করিলেন এবং পূজ্যচরণ গোস্বামীসন্তানদিগকে দণ্ডবৎপ্রণামাদি করিলেন। যত বড় বিরাট মহোৎসব অনুষ্ঠিত হউক, যত বৃহৎ সংখ্যক লোকের সমাগম হউক, অথবা হউক না কেন বিপুল কর্ম্মচঞ্চলতার উপস্থিতি, সেই মহাপুরুষের নিত্যকরণীয় বিষয়ে কেহ বাধা সৃষ্টি করিতে পারে নাই। তাই তিনি ধামস্থ দেবদেবী মন্দিরে দর্শনপ্রণামাদি করিবার জন্য বাহির হইলেন। সঙ্গে বহুভক্ত অনুগমন করিলেন। পথে বাহির হইয়াছেন। গন্তব্যপথের সম্মুখে একটী কুক্কুর শয়ন করিয়াছিল। গমনের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য তাহার অনুগামী নবাগত এক ভক্ত উক্ত কুক্কুরকে অনুচিতভাবে (পাদচালনাদ্বারা) অপসারিত করিয়া দিল। সাধারণতঃ বৃক্ষলতাকেও দণ্ডবৎপ্রণাম করা যাঁহার চিরন্তন স্বভাব তাঁহারই অনুগামী হইয়া একজন ধামবাসী কোন প্রাণীকে এরূপ অপ্রয়োজনীয়ভাবে অবমানিত করিলে তিনি তাহা কেমন করিয়া সহিবেন? নিমেষের মধ্যে তাঁহার ঐ হর্ষোৎফুল্ল মুখমণ্ডল বিষাদে ও খেদে মলিন হইয়া গেল, তিরস্কারজড়িত কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন—

**ধামের জীব তোমার আমার চেয়ে ঢের বড়। ধামবাসীকে লাথি মারিলে কেন? কুক্কুর গাছপালা সবই ধামবাসী। এখনও তোমাদের এ জ্ঞান হলো না? "এরা ধামে আসে শুধু অপরাধ কিনিবার জন্য, ধামে শ্রদ্ধা নাই, ধামবাসীদের প্রতি শ্রদ্ধা নাই, কেবল অবজ্ঞা করিতে শিখেচে।" কুক্কুরের মহোৎসব হয়েছিল, চরিতসুধায় পড় নাই? ও কুক্কুরটী ঐরকম? (অর্থাৎ তুমি যাহাকে লাথি মারিলে সে কি তোমার লাথির যোগ্য?) তোমাদের দাদামহাশয়**

**দেখিয়েছেন, এখানে প্রত্যেক কুকুরটী ধামবাসী,** ( অর্থাৎ যে ধামে থাকে সেই ধামবাসী এবং তজ্জন্য তাহার অসাধারণ বৈশিষ্ট্য আছেই । )"

তখন সেই নবাগত ভক্তটী নিজের অপরাধ বুঝিতে পারিয়া কাঁদকাঁদভাবে নিবেদন করিতে লাগিল, আজ্ঞে ! আমার অপরাধ হয়েছে আমায় ক্ষমা করুণ।

উত্তরে শ্রীলবাবাজীমহাশয় বলিলেন,—"**আমি কে যার কাছে অপরাধ সেই ক্ষমা করিবে।**"

এদিকে ক্ষমা চাহিবে কোথায় ? সে কুকুরটী কি আর সেই পথের ধারে বসিয়া আছে ? তথাপি বহু অনুসন্ধানের পর উক্ত ভক্তটী সেই সারমেয়ের নিকট দণ্ডবৎ-প্রণামপূর্ব্বক ক্ষমা চাহিয়াছিল।

ঐদিন রাত্রে প্রসাদ পাওয়ার পর আমাদের এক দাদা শ্রীধামবৃন্দাবনে যাইবার জন্য শ্রীলবাবাজীমহারাজের নিকট অনুমতি প্রার্থণা করিলে তিনি পূর্ব্বোক্ত কথারই পুনরুক্তি করিয়া সাবধান করিলেন এবং অতি আক্ষেপের সহিত বলিলেন—,

**ধামের প্রত্যেক বস্তুটীর মর্য্যাদা আলাদা আছে। ( কিন্তু সে মর্য্যাদাদানে তেমন কারো আগ্রহ দেখি না ) ভবিষ্যৎ দেখছি খুব খারাপ আমার শৌচে যাবার পথে একখানি চট পড়ে থাকে। তাকে সকলেই পা দিয়ে এদিকে ওদিকে ফেলে দেয়। আমি মনে করিলাম, ওকে একটী প্রণাম করে যাই।**

বহুদিন পূর্ব্বে কলিকাতায় থাকাকালীন, ছাদের উপর শ্রীলবাবাজীমহারাজ বেড়াইতেছেন, সামনে একখানি ইট দেখিয়া এক অনুগামী সেবক পায়ের দ্বারা সরাইয়া দিয়াছিল। তাহা দেখিয়া তিনি বলিলেন,—

**আমি ওটা পারি না, সবইত নিতাইয়ের সত্তা।**

আর একটী যুবক অনুশোচনাস্বরে বলিল, আমার সময় হলো না, তখন বেলা ৪টা, মনে করিলাম আর গিয়ে কি হবে, পাটবাড়ী যাই, সেখানে তাঁর দর্শন পাব। আবার ভাব্‌লাম, না, পাণিহাটীতে গিয়ে প্রণাম করে আসি, আজকে ত তিনি এসেছেন, কীর্ত্তম শেষ হয়ে গেলেও তাঁরাত সকলে আছেন। যুবকটীর ঐরূপ আর্ত্তিপূর্ণ কথা শুনিয়া শ্রীলবাবাজীমহারাজ অতি হর্ষোৎফুল্ল হইয়া বলিলেন—

**সত্যি, সত্যি, এই দিনটী, যে যাবে সে কিছু না কিছু পাবে। এতে সন্দেহ নাই। ত্রিকাল সত্য লীলা। তোমাদের বলে ক্ষণের পূজা। ক্ষণদা-চিন্তামণিতে আছে।**

উপস্থিত একজন বলিলেন, শ্রীজগন্নাথবল্লভে আছে, শ্রীরাধারাণী বলছেন—"সে ক্ষণটী যদি পাই তবে মুক্তামাণিক দিয়ে বাঁধিয়ে রাখি।" শ্রীলবাবাজীমহাশয় বলিলেন,—

সে ক্ষণের পুজা, এখানে দিবসের পূজা।

আর একদিন শ্রীলবাবাজীমহাশয় প্রসঙ্গক্রমে বলিলেন,—

এখানে সব আছে, গৌর এখনও নাচে, তার প্রমাণ পাওয়া যায়, নূপুর পাওয়া গেছে। এই ডবু বাবু (তাঁহার চিত্রপটের দিকে লক্ষ্য করিয়া, ইনি বরাহনগরের স্থানীয় বিশিষ্ট ভদ্রলোক এবং শ্রীপাটবাড়ী শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর বিশিষ্ট ভক্ত) চেঁচিয়ে বললেন, কি মশায়! ঠাকুরের পায়ের নূপুর, ঠাকুর আছেন মন্দিরে, এ নূপুর নাটমন্দিরে এলো কি করে? শ্রীপাণিহাটীতেও তাই। এখনও আসেন প্রতিদিন। শ্রীমুখের কথা, শচীমাতার রন্ধনে, রাঘবভবনে ........। এসব কি মিথ্যা হয়? আমরা দেখ্‌তে পাই না বটে কিন্তু ব্যবহারে জান্‌তে পারি। এই তো এবার উৎসব হবে না কথা ছিল, কে করাল? আমিও সংপূর্ণ নাই করে দিয়েছিলাম। গোবিন্দদার ভেকের গুরু শ্রীহরিদাসঠাকুরে থাক্‌তেন। রাত্র দুটোর সময়ে ডাকছেন, সনাতন! ও সনাতন! শুনছ? কি? হরিদাসঠাকুর নাম করছেন?

আমি ত এবার সমাজবাড়ীতে বলে এলাম, তোমায় দেখ্‌তে পাই না বটে কিন্তু তোমার ব্যবহারে তোমায় জান্‌তে পারছি।

এমন সময়ে একজন বলিলেন, তিনি ভক্তের হৃদয়ে থাকেন। শ্রীলবাবাজীমহাশয় বলিলেন,—

সে সব পরের কথা, এখন বিশেষ কথা তিনি এইখানেই আছেন। এইখানে বসেই যদি আমি নিতাই-গৌর পেলাম, আর আমার কি দরকার? কথা আছে, খুব প্রাচীন কথা, পুঁথিতে নাই বটে, "গৌরভক্ত কভু নাহি যায় বৃন্দাবন।" "শ্রীগৌড়মণ্ডলভূমি" অন্যরকম ব্যাখ্যা করা কি দরকার? শুধু জান্‌লেই, উপলব্ধি করলেই ব্রজবাস হলো, ব্রজে গিয়ে নয়, এই ব্রজ।

আর একদিন শ্রীপাটবাড়ীতে অষ্টপ্রহরব্যাপী শ্রীশ্রীনাম সংকীর্ত্তন হইতেছেন। সন্ধ্যা আরতির পর কলিকাতা নিবাসী এক ভক্ত নাম করিতে করিতে অন্তরে নিতাই বাহিরে নিতাই' পদ ধরিয়াছেন। এদিকে শ্রীলবাবাজীমহারাজ তাঁহার বাসগৃহে কতিপয় ভক্তপরিবেষ্টিত হইয়া বসিয়াছেন। একজন জিজ্ঞসো করিলেন, কৃষ্ণের এত নাম কেন? শুনিয়া শ্রীলবাবাজীমহারাজ বলিতে লাগিলেন,—

মদনগোপাল, রাধারমণ প্রভৃতি নামের দ্বারা এক কৃষ্ণকে বুঝাইলেও ভিন্ন ভিন্ন নাম বলবার প্রয়োজন আছে। যে লীলার অভিব্যক্তি যার চিত্তকে আকৃষ্ট করেছে সে সেই লীলার অনুরূপ নামটী রেখেছে। সেই নাম করলে সেই লীলা ভোগ হয়। এমনি এদিকে আস্‌বে শচীনন্দন, নিমাই, বিশ্বম্ভর, গোরা। এক এক জনের এক এক লীলার আকর্ষণে সে সেই নাম রেখেছে। তার মধ্যে 'গোরা' এই নামটী পদকর্ত্তাদের বেশি ব্যবহার। পদকর্ত্তারা ঐ নামে বিবর্ত্তবিলাসের সংপূর্ণস্বরূপ ভোগ করেন। বিবর্ত্তবিলাসে যিনি গোবিন্দ

তাঁর গো, যিনি রাধা তাঁর রা। নিতাই-রমণ-গোরা এই নামটী আমি প্রথমে শুনি শ্রীশ্রীরাম-হরিদাস বাবাজীমহাশয়ের মুখে। তিনি, পূজ্যপাদ শ্রীরঘুনন্দন প্রভু শ্রীশ্রীমাধবদাস বাবাজী, কর্ত্তা (বড় বাবাজী) এঁরা রাধাবিনোদকুঞ্জে (রাধাকুণ্ডে) থাকতেন। ইষ্টগোষ্ঠী হোত। বসেন সব ক্ষীরখণ্ড। নিকুঞ্জরহস্য আস্বাদন করতেন। যেদিন যেভাব উঠ্‌ত সেদিন জানালা দিয়ে পুজারীকে বলতেন, সেই বেশ কর।. একদিন নিকুঞ্জরহস্য ভোগ করতে করতে এই পদ তাঁদের এসে পড়েছে, 'যদি গৌরাঙ্গ না হত কেমনে হইত……'। আমি এখন ঐ পদগুলি জানালাধারে শুনছি। আমাকে দেখ্‌তে পেয়ে শ্রীরামহরিদাস বাবাজীমহাশয় বললেন, আয় ভাই! আয়! আমার তখন ভয় করছে, এর ভেতরে কি করে যাব? তখন কর্ত্তা চোখ রাঙালেন। তখন যেতেই হলো। গিয়ে বসেছিতখন শ্রীরামহরিদাস বাবাজী বল ভাই বল বলে পিঠে এক থাব্‌ড়া দিলেন। তখন ওই পদে তাঁদের ভোগ সব বেরিয়ে পড়লো, গাও গাও পুনঃ শ্রীগৌরাঙ্গগুণ…আমার গৌরগুণ গাও ভাইরে,…বদনে বলো জয় জয়… নিগম নিগূঢ়…এসে গেল। ওইখানে এক ঘণ্টা কেটে গেল। তার পরে এল যার গুণে ঝুরি ঝুরি… এই সেই কুণ্ডতীর, কোই রঘুনাথ। তখন একেবারে আবেশে অস্থির হয়ে "কোই রঘুনাথ" বলে একবারে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লেন। যা দিবার সব দিয়ে গেছেন।

কি পাঠ শুনবো, শুনতে গেলে এই কথাই বলবে, এ দেহ-আবেশ ত্যাগ না হলে চিন্ময়রাজ্যের বিলাসাদি সাক্ষাৎ কিছু ভোগ হয় না। কিন্তু তা চোখে দেখেছি, শ্রীরামহরিদাস বাবাজীমহাশয় পথে যেতে যেতে যেন কাকে আলিঙ্গন করে পড়ে গেলেন। দেহেতে বিকারাদি বিলাসচিহ্নসকল, মুখেও তদুচিত শব্দ প্রকাশ পাচ্ছে, এ সব চোখে দেখেছি, আর কি শুনবো। লেখাপড়া জানি না, ভজনও করি নাই, সব কৃপা, কি হলো না হলো কিছু বুঝলাম না, সুখ পাওয়া গেল।

শ্রীলবাবাজীমহারাজ যে কয় দিন শ্রীপাটবাড়ীতে অবস্থান করিয়াছিলেন এইভাবে তাঁহার মধুর চিন্ময়বাণী শ্রবণ করিয়া সকলে পরমানন্দ লাভ করিয়াছিলেন। তাহার কণামাত্র তাঁহারই কৃপায় লিপিবদ্ধ করা হইল। ইতি—

কলিকাতা পোস্তার রাজবাটী, বেলা ৫টার পর, ১৩৫৬ সাল।

ভাব-রাজ্যের কথা ভাবুক না হইলে বুঝা যায় না। এই প্রাকৃত জগতে একমাত্র শ্রীগুরুদেবই (ভক্তরূপী শ্রীহরি) ভাবুক ও রসিক। তাই ভাবুকের কথা ভাবুকই আস্বাদন করিয়া জীব জগতে জানাইতেছেন।

ভাব

মন পাগলা রে
হরদম গুরুজীর নাম লইও।
আরে দমে দমে লইও রে নাম
কামাই নাহি দিও।

পোস্তার রাজবাড়ীর পাশে বিবেকানন্দ রোডে একটি বাউল কীর্ত্তন করছিলেন সঙ্গে তাঁর বৈষ্ণবী। তাঁরা যেন ভাব রাজ্যের বাসিন্দা হঠাৎ এসে পড়েছেন মাটীর দেশে। তাতে কি যায় আসে, তাঁদের গানই সম্পদ সেই সম্পদ নিয়েই তাঁরা এসেছেন। আপন পর তাঁদের কে আছে? সবাই আপন, তাই আপন জনের কাছে গান শোনাচ্ছেন। পথের ধারে অনেকেই শুনছে তাঁদের গান। কিন্তু সব পথিকই কি ওঁদের রাজ্যের সংবাদ শুনে খুসী? খুসী হয়তো সবাই নয়, ভাব রাজ্যের ভাষা কি সবাই বোঝে? তবে অবুঝের কাছে ওঁরা গাচ্ছেন্ কেন? না সবাই অবুঝ নয়। বোঝদার আছে তাই তাঁরা তাঁর আকর্ষণে গাচ্ছেন। সে বোঝ্দার ঐ পোস্তার রাজবাড়ীর তিনতলার বারান্দার একটি কোণে দাঁড়িয়ে একা। বাউল দুটী গেয়ে চলেছেন, পায়ে নুপূর, হাতে একতারা আর ছোট একটি তবলা। তাঁরা গাচ্ছেন আর ওপরের দিকে মাঝে মাঝে তাকাচ্ছেন। শ্রোতাটি আমাদের বাবা, বিকেলের ডোবা সূর্য্যের রাঙা আভা মুখে পড়েছে, আর রাজপথের জন কোলাহলেও তাঁর নির্জনতা এসেছে। হাতে মালা, গায়ে গাঁতি চাদর, চোখে টল টল জল, ঝরতে শুধু বাকী। কাছে কেউ নাই। হয়তো বহুক্ষণ দাঁড়িয়েই আছেন, বিকেলের পাঠ শোনা শেষ করে দাঁড়িয়েছেন। চেনা রাজ্যের অধিবাসীর কথা কানে এসেছে, তাই ছুটে গিয়ে বাইরে দাঁড়িয়েছেন। গান শেষে তারা চলে গেল। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন। উদ্দেশ্যে প্রণাম জানালেন। ঘরে ফিরে এলেন, পায়চারি করছেন। কাছে গিয়াও ভক্ত কথা কইনি, শ্রীগুরুদেব ঘরে এসে ফিরে চাইলেন। তখনও রাঙা চোখের ছটা। কিছু বলতে বাধছে। দেহ স্বাভাবিক

ভাবে ফিরে আসতে তখনও দেরী হচ্ছে। বলি বলি করেও পারছেন না। আস্তে আস্তে পায়চারী করছেন। কোন সেবকও কাছে নেই তাঁর। নিরিবিলি সময় হয়তো বেশীক্ষণ থাক্‌বে না। শ্রীগুরুদেব বল্লেন—**শুনলে, ওদের ভাষা ওকি আর অন্যে আসে? ভাষা তো পরে? ভাব হলো কর্ত্তা নিজে।** শ্রীগুরুদেব কথা বলে আনমনা হ'লেন।

প্রিয়ভক্ত শ্রীগুরুদেবের কথা শুনে। করযোড়ে বিনীত ভাবে বলিলেন—

বাবা! এবিষয় একটু জানতে ইচ্ছা হয়। আমরা বস্তু রাজ্যে থাকি; ভাব টাব ঠিক বুঝতে পারি না, তবে আপনি যখন বলেন তা লিখে রাখতে ইচ্ছে হয় লিখি। বস্তু রাজ্যে আর ভাব রাজ্যে মিল করতে পারি না।

শ্রীগুরুদেব বলিলেন—

**কেন, গরমিল কোথায় হয়?**

তারপর মালার সংখ্যা রেখেই আসনে ব'সে বল্লেন—

**গোড়ায় গলদ্ থাক্‌লেই ভাব রাজ্যের ভাষা বোঝা যায় না। নাচা কোঁদা মাতামাতি করলেই কি ভাবের খবর টের পাওথা যায়? আগের কথা আগে, পরের কথা পরে। ওঁরা** (পূর্ব্বের আচার্য্যগণ) **ওতে কি বল্‌ছেন দেখ,** (অর্থাৎ গোস্বামীগণ ভাব সম্বন্ধে কি বলেছেন) **ব্যবহার রাজ্যে গোড়ার কথা না এলে ওখানে কিছু হদিস্ পাওরা যাবে না। আজকাল ওই গোড়াটাই হয় না শেষের টুকুতেই আবেশ। তাকি হয়? তাঁরা তো ব্যবহার রাজ্য ছেড়ে কিছু বলেন নি। ব্যবহার রাজ্যে এগুলি এলে তবে ভাব। তখন দেখতে পাবে, তোমাদের বস্তুবাদের সঙ্গে একটুও গরমিল নেই।**

**যাদের ওটা হয়েছে তাঁরা এ রাজ্যের কিছুই ছেড়ে নেই। ওই যে তাঁরা বল্লেন—**
"ক্ষ্যান্তিরব্যর্থকালত্বং" *......

---

* শ্লোকার্থ—সাধন ভক্তির পরিপাক দশাতেই শ্রীভগবানের বা তদীয় ভক্তের কৃপা হয়, এবং ঐ কৃপা হইলেই ভাবভক্তির উদয় হইয়া থাকে। নয়টী প্রীত্যঙ্কুরই ঐ ভাবের চিহ্ন।

ভাবের নয়টি চিহ্ন যথা—ক্ষন্তি, অব্যর্থকালত্ব, বিরক্তি, মানশূন্যতা, আশাবন্ধ, সমুৎকণ্ঠা নামগানে সদা রুচি, ভগবদ্‌গুণাখ্যানে আসক্তি ও তদ্-বসতি স্থলে প্রীতি। ক্ষোভের কারণ সত্ত্বেও চিত্তের অক্ষুব্ধতার নাম ক্ষান্তি। ভজনাঙ্গ ভিন্ন অন্য বৈষয়িক বিষয়ে বৃথা কালযাপন না করার নাম অব্যর্থকালত্ব। বিষয়ে অরুচির নাম বিরক্তি। নিজের উৎকর্ষ সত্ত্বেও যে অমানিত্ব তাহার নাম মানশূন্যতা। দৃঢ়তর ভগবৎপ্রাপ্তি-সম্ভাবনার নাম আশা-বন্ধ। স্বীয় অভীষ্ট লাভের নিমিত্ত যে গুরুতর লোভ তাহার নাম সমুৎকণ্ঠা। সর্ব্বদা নামগানের যে অভিলাষ তাহার নাম নামগানে-সদা-রুচি। শ্রীভগবানের গুণবর্ণনে আসক্তিকেই ভগবদ্‌গুণাখ্যানে আসক্তি বলা যায়। আর শ্রীভগবানের ধাম যে বৃন্দাবন তাহাতে বাসের অভিলাষই তদবসতি স্থলে প্রীতি। যখন ঐ সকল প্রীত্যঙ্কুর দৃষ্ট হয় তখন ভক্ত শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎকারের উপযুক্ত হইয়াছেন, ইহাই জানিতে হইবে।

ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং বিরক্তির্মানশূন্যতা।
আশাবন্ধঃ সমুৎকণ্ঠা নামগানে সদা রুচিঃ ॥
আসক্তিস্তদ্‌গুণাখ্যানে প্রীতিস্তদ্ বসতিস্থলে।
ইত্যাদয়োঽনুভাবাঃ স্যুর্জাতভাবাঙ্কুরে জনে ॥

শ্রীগুরুদেব দৃঢ় গম্ভীরভাবে বল্লেও বড্ডো হেঁয়ালী লাগলো। এমন সময় কয়েকজন ভক্তবৃন্দ এলেন। তাঁরাও আশে পাশে বসলেন। শ্রীগুরুদেবের মধুর কথা শুন্‌তে তাঁরা উদগ্রীব হয়েছেন দেখিয়া শ্রীগুরুদেবও ভাবাবেশে ভাবের কথাই বলিতে লাগিলেন—

তিনি আসার আগে ব্যবহার রাজ্যে এগুলি এসে আগে দেখা দেয়।

অর্থাৎ ভাব উৎপত্তির আগে মানুষের চরিত্রে প্রথমে এসব অবস্থা আগে দেখা দেয়।

ক্ষমা তার ভিৎ। সর্ব্বত্র থাকবে ধৈর্য্য আর ক্ষমা। নিন্দা, অপমান, অত্যাচার, দুর্ব্যবহার, তার ওপর যতই হোক; কিছুতেই বিচলিত হয় না। অদোষদরশী হবে, ক্ষমা আসবে। এই না গোড়ার কথা। এবার দেখ দেখি, প্রথম ধাপেই কি ঠেলা। ভাব কি মুখের কথা গা? না গোড়ার কথা? ও হোলো অনেক দূরের কথা। তিনি বলতেন ভাব কালি। এক ভক্ত, ভগবানকে বল্লেন, প্রভু! এ জগতে বড্ডো রোগ শোক্ আর দারিদ্র্য। আপনি কোন দিকেই লক্ষ্য করেন না। আমার হাতে যদি ক্ষমতা থাক্‌তো এসব আগে দূর করতাম। ভগবান্ বল্লেন আচ্ছা তাই নাও। দুদিন তোমাকে ক্ষমতা দিলাম। ভক্ত তো শক্তিমান হয়ে ফিরে এলেন। সন্ধ্যা হয় হয়, বনের পথ ধরে যাচ্ছেন। কতকগুলি সৈন্য আসছিল। তাদিকে দেখে ভক্তটি রাস্তা ছেড়ে দাঁড়ালেন। তারাও কাছে এল। ভক্ত দেখেই তারা তো মহা খাপ্পা। বলে, এই বেটা সেই খুনী, ধর বেটাকে। এখন আবার সাধু সেজে বনে বনে ঘুরে বেড়ান হচ্ছে। আমাদিকে দেখেই পাশ কাটাবার মতলবে পথ ছেড়ে সরে যাচ্ছে। ধর বেটাকে। বলেই তারা ভক্তকে ধরিতে যাচ্ছে। ভক্ত তো রেগে অস্থির। বলে, কি ব'ল্লে তোমরা, আমি খুনে? তোমরা মহা অপরাধী। সাবধান! সেকথা শুনে সৈন্যরা আরও ক্ষেপে গেল। তারা ভক্তকে মারধোর করতে যায়। ভক্তও চোখ পাকিয়ে হাত গুটিয়ে মারমুখো হলো। একটা হুলুস্থুল বাধে আরকি। কর্ত্তার টনক নড়লো। ওমনি একটি বুড়োর বেশ ধরে ভক্তটির কাছে এগিয়ে এলেন। বল্লেন—কি বাবা! তুমি না ভগবানের ক্ষমতা নিয়ে লোকের দুঃখু দূর করবে বলেছিলে, তা এইটুকু অপমানেই এত রাগ। আর ভগবান যে কত অপমান কত অত্যাচার সহ্য করেন জীবের। যাও যাও আগে ক্ষমা শিখে এসো। ব্যস্, বলেই তিনি সরে পড়লেন। ভক্তটি অধোমুখে থেকে সব শুনলেন। সৈন্যরা তার অবস্থা দেখে যা ভাববার ভেবে তাকে ছেড়ে দিয়ে চলে গেল। ভক্ত কাঁদতে লাগলেন। বুঝলে তো? ভাব মুখের কথা নয়। তার গোড়ার ভিত্তি ক্ষমা। সে গুণ দেহে আগে আসবে

শ্রীগুরুদেবের মনে যেন তৃপ্তির অবশেষ হয়নি, তাই আবার ভক্ত বলিল, বাবা ! ক্ষমা তো গুণ, আর গুণ থাকে দ্রব্যে, তাহলে ক্ষমার দ্রব্যটা কি, যা থাকলে ক্ষমা থাকে ? এ কথায় বাবার মুখে স্বচ্ছহাসি এসেছে, তেমনি হাসি মুখেই বল্লেন,

দ্রব্য হোলো ব্রহ্মচর্য্য, এ রাজ্যের তাই হোলো গোড়ার কথা, বৈরাগীর তাই হোল আসল। তবে কি জান, ও আসনে 'আমি' না থাকে। তাঁর মুখের পানে চেয়ে থাকতে হবে নইলে ব্রহ্মচর্য্যে 'আমি' ঢুকে সব মাটি হবে। তাই কথা হচ্ছিল—যে, ব্যবহার রাজ্য ছেড়ে ভাব রাজ্যের ঠাঁই নাই। এর পর হবে হায় ! হায় ! সব সময় মনে হবে, আমার বৃথা সময় নষ্ট হচ্চে। অর্থাৎ অব্যর্থ-কাল-মানিত্বং।

এটী তার পরের ধাপ। সন্ধ্যে হ'য়ে গেল। শ্রীগুরুদেবের আরও কাজ আছে জেনে ভক্ত চুপ করে থাকিল।

একজন ভক্ত একদিন শ্রীগুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"চরিত সুধা" গ্রন্থে পড়িয়াছি শ্রীল বড় বাবাজী মহারাজ নিমতলার ঘাটে যে মড়া বাঁচাইয়াছিলেন আপনি তখন সঙ্গে ছিলেন, সেই বিবরণ আপনার মুখে শুনিতে ইচ্ছা হইতেছে, যদি অনুগ্রহ করিয়া বলেন তবে আমরা ধন্য হই। ইহার উত্তরে শ্রীগুরুদেব সে লীলা-স্মরণে ভাবাবেশে কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন—

## নামে মড়া বাঁচে

নামে মড়া বাঁচিবে সে আর অধিক কি ? নাম করিয়া যদি সূর্য্য চন্দ্রকে খসিয়া পড়িতে বলা হয় খসিয়া পড়িবে। যেই নাম সেই নামী, নামী অপেক্ষাও নামের কৃপা-শক্তি অধিক। নামেত বিশ্বাস হইল না ! চক্ষের সম্মুখে দেখিলাম, শ্রীগুরুদেব কৃপা করিয়া সব দেখাইলেন কিন্তু হায় ! "আমার দুর্দ্দৈব নামে নাহি অনুরাগ।"

কলিকাতা পোস্তার রাজবাটী।  বেলা ৫টার পর, ১৩৫৬ সাল।

একদিন শ্রীগুরুদেব বৈকালে রাজ বাড়ীর ছাদে একা পায়চারী কচ্ছেন। হাতে নাম মালা। গাঁতি চাদরটি গলায় কাঁধে জড়ান। পাতলা বেনিয়ান্ গায়ে। ছাদের উপর কয়েকটি তুলসী গাছ আর একটি মাধবী লতা। ছাদের উত্তর দিকে মোটর তেলের পাম্পের দোকানের পিছনে বাড়ীর ছাদের ঘরে একটি আট-ন বছরের মেয়ে নাচছে। হাতে তালি দিচ্ছে আর হিন্দী ভাষায় গান করছে। শ্রীগুরুদেব সেদিকে তাকাচ্ছেন, আর থমকে থমকে দাঁড়াছেন। শ্রীগুরুদেব একটু দাঁড়িয়ে এক প্রিয় ভক্তকে বলে ফেললেন "দেখ দেখ? কি সুন্দর", বলেই গৌরভাবিনী নদীয়া-রমণীর ভাবে আবার সেই মেয়েটির দিকে চাইলেন। তন্ময় হয়েই দেখছেন। মনে মনে কি বলেই মুচকী হাসলেন। চল্‌তে চল্‌তেই বল্লেন—

**আজ কাল হ'য়েছে, আগে বুঝবো তবে ক'রবো। তখন ছিলো আগে কর তারপর বুঝবে। এখন তো মানামানি নেই তাই আগে বোঝাবুঝি, তারপর যদি কিছু করার থাকে দেখা যাবে।**

বলেই ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছেন। ভক্তটী তাই কাছে এগিয়ে বলিল—আপনি বলেন—"কৃপাই টেনে আনে, কৃপাই অধিকার দেয়, তবে আবার মানামানির কথা ব'ললেন কেন, আপনার কাছে আসা কি আমাদের স্বেচ্ছায় হ'য়েছে? কৃপাই যখন এনেছে তখন আপনাকে মানি কি না মানি আপনিই জানেন?" শ্রীগুরুদেব কথা শুনে বললেন—

**আরে, জানি ব'লেই বল্‌ছি, "কাজ আগে করতে হয় তবে বুঝতে হয়।" কাউকে মানলে, সে যা বলে সে কথা শুনে কাজ ক'রে গেলে বুঝতে কি কিছু বাকী থাকে?**

শ্রীগুরুদেব গম্ভীর হ'য়েছেন। ভক্ত শ্রীগুরুদেবের কথা শুনে বলিল—

"আপনি কি বলেন আগের যুগ আর এযুগ সমান? যে যুগে সাধুতা ছিল সে যুগে হয়তো আগে মেনে পরে কাজ করা চল্‌তো, আর এযুগে বঞ্চনাই সর্ব্বস্ব হ'য়েছে, তা'হলে বঞ্চকদের কথা আগে মানার অর্থই হোলো আগে ঠক্‌তে হবে পরে ঠকা কাজই করতে হবে।"

শ্রীগুরুদেব কথা শুনে হেসে ফেললেন, সেই হাসিমুখেই বল্লেন—

**যে রাজ্যে আস্‌তে হয় সেখানে আগে মানা, পরে আচরণ এই তো-না তোমাদের ব্যবহার জগতের কথা?**

ভক্তটী কথা শুনে বলল—তবে যে শাস্ত্রে বলে "পরিপ্রশ্নেন," প্রশ্ন করে জানতে হয়। শ্রীগুরুদেব তেমনি সুরেই বল্লেন—

হুঁ, ফাঁকি দিয়ে প্রশ্ন করলে হয়?

ভক্ত বলল—"কেন এতে ফাঁকির কি আছে? শ্রীগুরুদেব বাধ্য হয়েই বলিলেন—

"ওর পরের কথাটি বল, প্রশ্নের আগে সেবা। সেবা মানে সুখ দেওয়া। মুখের দিকে চেয়ে কাজ করলে সুখ হয়, তাকেই বলে সেবা, তবে প্রশ্ন। সেবাছাড়া অধিকার হয় না, অধিকারী না হলে প্রশ্ন করা চলে না, তিনি বল্‌তেন "অধিকারী নহে ধর্ম্ম চাহে আচরিতে! অচিরাতে বিনাশ হয় হাসিতে খেলিতে।"

সেবা এলে অবস্থা, অবস্থায় অনুকূল প্রতিকূল দশা ঘট্‌লে তবে প্রশ্ন, এখন-তো তা হয় না, যা খুসী জিগ্যেস, ব্যাস পছন্দ না হোলো, ওমনি উল্টো চাপ, শেষটায় মাথায় চড়া।

ভক্ত শ্রীগুরুদেবের কথা শুনে তারপর বলিল—আপনি থাকেন ভাবের রাজ্যে, আমরা থাকি অভাবের রাজ্যে মুখ দেখে ভাব বোঝা আর সুখ দেওয়া আমাদের বেশ সহজ হবে বলে মনে করেন কি? যেমনি আপনার কীর্ত্তন তেমনি আপনার আচরণ। "অভাবের সঙ্গ করে না।" "ভাব বিনে নাহি সঙ্গ।" তাহলে আমাদের সঙ্গে আপনার মিল কোথায়? যতটুকুই দেখা ততটুকুই আপনার কৃপার জয় জয়কার।

শ্রীগুরুদেব কৌতুকের স্বরেই বল্লেন—

## অবর্থকাল

বেশ তো! অভাবের রাজ্যে থাকলে তো অভাবের বোধ হবে। বস্তুর অভাব বোধ হবে। বস্তুর অভাব বোধ জাগলেই তো ভাবের সন্ধান আস্‌বে, তখুনি সঙ্গ হবে। সেই কথাই তো কাল হচ্ছিলো। ভাবের ভিৎ ক্ষমা, তারপর হবে হায়! হায়! হাতে পয়সা না নিয়ে শুধু দর যাচাই করলে কি বস্তু লাভ হয়? হয় না। হায়! হায়! হোলো অভাব বোধ। দু বন্ধুর পরামর্শ হোলো,, তীর্থে যাব, একজন গেলেন, একজনের যাওয়া হলো না। যিনি তীর্থে গেলেন তিমি সেখানে গিয়ে পাঠ কীর্ত্তন শুনেন, সাধুদের কাছে কাছে ঘোরেন। একদিন দেখ্‌লেন সামনের এক বাড়ীতে কয়েকটী বাবু যাতায়াত কর্‌ছেন। তার মনে কেমন খট্‌কা লাগলো। এত বাবু ওখানে যাচ্ছে আর আসছে। তিনি পাথর নুড়ি দিয়ে সংখ্যা রাখতে লাগলেন, কজন যায় আসে। তার তীর্থে যাওয়ার কর্ম্ম ওই খানেই খতম। আর যিনি যেতে পারেন-নি তিনি সংসার করছেন আর ভাবছেন, হায়! হায়! আমার ভাগ্যে কিছুই হোলো না। বন্ধু এখন গঙ্গা স্নান করে প্রসাদ পাচ্ছেন, না হয় সাধুদের কাছে বসে ভাগবত হরিকীর্ত্তন শুনছেন, হায়! হায়! আমার কিছু হোলো না। এ পোড়া সংসার আর মেটে না। এমনিটী তারা দুজনে উল্টো উল্টো ভাবতে লাগলেন। একদিন দুজনেরই হরি হরি, ব্যস্‌ ঠিক উল্টো গতি। একজন তীর্থে গিয়েও সংসারের জ্বালা আর একজন সংসারের

জ্বালায় থেকে তীর্থ-গতি লাভ করলেন। এরাজ্যে থেকে তাঁকে দেখা, আর তাঁর দৃষ্টিতে সংসার দেখা, এবোধ এলেই কাজ হয়। তারপর আসবে বৈরাগ্য। ভাবের ভিত্তি বৈরাগ্য তাঁর একটি স্বরূপ। তাঁর ছোঁয়া পেলে তখন পরীক্ষার ভিড়। সে এক বিষম ল্যাঠা।

পরমকরুণাময় শ্রীগুরুদেব ভক্তের প্রতি করুণা করিয়া নিজের সাধনাবস্থায় শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধুপ্রভুর কৃপায় শ্রীবৃন্দাবন-বাসকালে বৈরাগ্য ও পরীক্ষায় কৃপালাভের কথা বলিলেন—

## বৈরাগ্য

তখন বৃন্দাবনে থাকা। সকালে করতাল বাজিয়ে কীর্ত্তন তারপর রাধাবাগে তুলসী তোলা, সে তুলসী নিয়ে প্রভুর ( রঘুনন্দন প্রভু ) ওখানে দেওয়া। রাত্রে প্রসাদ ধরা থাকতো। সেগুলি নিয়ে এক ব্রজবাসী মায়ের ওখানে পুরাণ সহরে দিয়ে আসি বিনিময়ে কিছু শুকনো রুটি নিয়ে আসি। বৈরাগ্য তখন খুব চাগাড় দিয়েছে। বন্ধুর আদেশে বৃন্দাবন থাকা।

এমন সময়ে এক ভক্ত শ্রীগুরুদেবকে বল্‌লেন—

হাঁ বাবা! আপনার তখন বয়স কত?

শ্রীগুরুদেব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যেমন বল্‌ছিলেন তেমনি দাঁড়িয়ে বল্লেন—

কত আর। পনর ষোল হবে। এখানেতো তখন আসা হয়নি। ( অর্থাৎ শ্রীবড় বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে তখনও সাক্ষাৎ হয়নি ) এদিকে সেই ব্রজবাসী মায়ের ওখানে এলেন এক পরীক্ষা—( একটি যুবতী ) তিনি তার বাড়ীতে কাজকর্ম্ম করেন। কি উদ্দেশ্য জানি না, একদিন আমার সামনে এগিয়ে এসে বল্লেন—"আপনি কেন তুলসী আনতে কষ্ট করেন। আমিই এনে দোবো।" জোর করে 'বল্লুম' রক্ষে করুন। কিন্তু কথা কানে নিলেন না, মতলবটা অন্য রকম ছিলো। রাধাবাগে গিয়ে দেখি—তিনি।

তাড়াতাড়ি তুলসী তুলে-ত সরে পড়লাম। ব্রজবাসির বাড়ীতে বিকেলে রুটি আন্‌ছি নামলো বৃষ্টি। ওঃ সে কি বৃষ্টি, বাধ্য হয়ে তার একটি ঘরে বস্‌লাম। ভাবলাম বৃষ্টি ছাড়ুক যাব। ওমা, দেখি সেই তিনি ঘরে ঢুকেছেন, বল্লেন কি? যে আপনি সরে বসুন আমি ঘরটি ঝাট দিই। বড্ডো জলের ছাঁট আস্‌ছে, দরজাটা বন্ধ করে দিই। বলেই তো দরজা বন্ধ করবে, আমি ওমনি দে দৌড়। ভিজে ভিজে পালিয়ে এলাম। পাটনা বাড়ীতে পৌঁছে আবার স্নান করলাম। মনে ভারী তাপ হলো, ভাবলাম "এখামে আর থাক্‌বো না", সন্ধ্যায় গোবিন্দের আরতি দেখে আসছি আর নানারকম ভাবছি। একদণ্ড আর বৃন্দাবনে থাকার ইচ্ছা নাই। গোপীনাথের বাজারের কাছে এসেছি, একটি আট-দশ বছরের ব্রজবাসী মেয়ে পাস দিয়ে বলে গেল "এ বাবাজী! কাহে শোচতা, কাল তেরা রূপেয়া আজায়েগা।" ঠিক্ তাই হোলো। সেদিন আর তুলসী দিতে যাইনি। অভিমান খুব। পিওন এসে ডাকছে, পনরটী টাকা। বন্ধু লিখেছেন, চলে আস্‌বে। আমি কাশীপুরে থাকবো।

বলতে বলতে বাকী কথা আরও কিছু বলে শ্রীগুরুদেব ঘরের দিকে এলেন। সন্ধ্যা আরতির ঘণ্টা বাজলো।

ব্রজধাম হইতে আমাদের এক গুরুভ্রাতা আসিয়াছেন, তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীগুরুদেব বলিতেছেন—

## তৃণাদপি স্বভাবে ব্রজবাস

"দেখ ব্রজেবাস করতে হলে সর্ব্বদা মাথা নীচু করে থাক্‌তে হবে। তৃণাদপি সুনীচ স্বভাব না হলে ব্রজবাস হয় না। এক অনুরাগী বাবাজী মহারাজ পরিক্রমা করছেন, এক যায়গায় গিয়ে তাঁর সন্দেহ হলো, ব্রজের সীমানার বাহিরে চলে আসিনিতো? কাকে জিজ্ঞাসা করি, এখানে কাউকে দেখছিনা। মনে মনে চিন্তা করছেন, এমন সময় দেখলেন এক ব্রজমায়ী চলেছেন আপন মনে, বাবাজী ডাকছেন—'এ মায়ী! এ মায়ী'! ভ্রুক্ষেপ নাই, আপন মনেই চলে যাচ্ছেন অথচ এসেছেন তারই জন্য, এ যেন তুতির আন কাজে যাওয়া। বাবাজী তার কাছে গিয়ে বল্লেন—"এ মায়ী! আমি ব্রজের সীমানার মধ্যে চলেছি না বাইরে এসেছি।" তিনি বল্লেন—"পেড়কো নেহি দেখে"? "অর্থাৎ ব্রজের সব তরুলতার অবনত শির। ব্রজভূমিতে আছ কিনা ইহাতেই বোঝা যাবে।"

## শ্রীমুখোক্তি—

"ওগো সূক্ষ্মরূপে প্রতিষ্ঠা ঢুক্‌ছে।"

১৩৫৬ সালে শ্রীরথযাত্রা সময়ে শ্রীনীলাচলে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের পাণ্ডা ও পরিহারীগণের মনোমালিন্যের জন্য শ্রীজগন্নাথ দেবের দৈনিক সেবার ভয়ানক বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছিল, রাত্রি ৮টার সময় মঙ্গল আরতি, রাত্রি ২টা, ৩টার সময় সকাল ধুপ হইত। এই সমস্ত সংবাদ নিত্য শ্রীগুরুদেবের কর্ণ-গোচর হওয়ায় একদিন তিনি বলিলেন—

"যে এখানে আর থাকা হইবে না, কারণ যাহার বাটিতে আসিলাম তিনি যখন ঠিক সময়ে খাইতে পাইতেছেন না, তখন আমি এখানে থাকিয়া কিরূপে দুইবেলা প্রসাদ পাইব।

শ্রীগুরুদেবের এই উক্তির পরে জানিনা কি অনির্ব্বচনীয় শক্তির প্রভাবে তাহার পরদিন পাণ্ডাগণের যুবক সম্প্রদায় একটি সভা করিয়া শ্রীজগন্নাথ দেবের সেবার সুব্যবস্থা করিলেন। অতি সুন্দররূপে সেবা চলিতে লাগিল, বেলা ১০টার মধ্যে মধ্যাহ্ন ধুপ হইতে লাগিল। তখন শ্রীধাম পুরীর গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ ও পাণ্ডা-পরিহারীগণ শ্রীগুরুদেবের নিকটে আসিয়া বলিতে লাগিলেন যে "আপনি চলি জীবাক সঙ্কল্প করিথিলা, সে পরি শ্রীজগন্নাথ সেবা ঠিক চালিছি" এইরূপ নিত্য নিত্য বহু ভক্ত

শ্রীগুরুদেবের নিকটে আসিয়া ঐরূপ বলাতে তিনি একদিন তদীয় ভক্ত শ্রীনন্দলাল পালকে বলিলেন—"ওগো সূক্ষ্মরূপে প্রতিষ্ঠা ঢুকেছে" এই বলিয়া তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। প্রতিষ্ঠা শূকরীবিষ্ঠা জ্ঞানে পরিত্যাগ করিয়া, রৌরবজ্ঞানে গৌরব ত্যাগ করিয়া সুরা জ্ঞানে অভিমান ত্যাগ করিয়া, কেমন করিয়া কায়োমনবাক্যে ভজন করিতে হয়, তাহারি উদাহরণ।

---

কলিকাতা, পোস্তার রাজবাটী—২৫শে চৈত্র ১৩৫৬ সাল, ইং ৮ই এপ্রিল ১৯৫০ সাল।

দয়ানিধি, অদোষদরশী, পতিত পাবন শ্রীগুরুদেবের কৃপাকর্ষণে অদ্য সকাল ৮-৩০ ঘটিকায় শ্রীগুরুদেবের অভয় চরণ সান্নিধ্যে উপস্থিত হইল মাণিকতলা গড়পার নিবাসী তদীয় প্রিয় ভক্ত শ্রীবলাই চাঁদ চট্টোপাধ্যায়। নিত্য নিয়মানুযায়ী শ্রীগুরুদেব পাঠ শ্রবণ করিতে বসিয়াছেন। আগ্রহান্বিত হইয়া ভবাণীপুর নিবাসী তদীয় প্রিয় ভক্ত শ্রীনন্দলাল পালকে আজ্ঞা করিলেন।

চরিত-সুধার প্রথম খণ্ড হইতে শ্রীল বড় বাবাজী মহাশয়ের স্বহস্ত লিখিত তত্ত্ব মীমাংসটি পাঠ হইতেছে। জীব কি উপায়ে পরম শান্তি লাভ করিতে পারে, তাঁহার কর্ত্তব্য কি, এই কথা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য শ্রীল বাবাজী মহাশয় বৈজ্ঞানিক, মায়াবাদী সাধু, আধ্যাত্মবাদী যোগী প্রভৃতি বহু ব্যক্তির নিকট গমন করিয়া প্রকৃত তত্ত্ব জানিতে পারিলেন না, শেষে একমাত্র তাঁহার অন্তর্য্যামী অভিষ্টদেব শ্রীশ্রীগুরুদেবের চরণে পতিত হইয়া আনন্দময় শান্তির বাণী লাভ করতঃ জীব উদ্ধার করিবার আদেশ পাইলেন। এক ভদ্রলোক এতক্ষণ পর্য্যন্ত অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে সমস্ত পাঠটি শুনিতে ছিলেন এবং পাঠের শেষের দিকটি তিনি পাঠককে দুইবার করিয়া পাঠ করিতে বলিলেন এবং যখন শুনিলেন যে শ্রীল বড় বাবাজী মহাশয় বহু স্থান ভ্রমণান্তর একমাত্র পরম দয়াল শ্রীগুরুদেবেরই নিকট প্রকৃত তত্ত্ব লাভ করিলেন, তখন তিনি হঠাৎ শ্রীগুরুদেবকে প্রশ্ন করিলেন—আচ্ছা "সদ্গুরু" কাহাকে বলে, এই প্রসঙ্গটি আমাকে কৃপা করে বুঝাইয়া দিন। শ্রীগুরুদেব "চরিত-সুধার" অমৃতময় বাণী শ্রবণে বিভোর হইয়া যেন কোন অপ্রাকৃত

রাজ্যে ভ্রমণ করিতেছিলেন। হাতে মালা করিতেছেন কিন্তু মন তাঁহার এই রাজ্যে নাই। কখনও নয়ন যুগল বিস্ফারিত হইতেছে, আবার কখনও বা মেঘাবৃত সূর্য্যের ন্যায় নয়ন মুদ্রিত করিয়া মত্ত মাতালের ন্যায় পিছনের উপাধানটির উপর দেহভার অর্পণ করিতেছেন। কখনও বা কাঁদিয়া অধীর হইতেছেন, আবার পরক্ষণেই মৃদু মধুর হাসিতে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করতঃ সমাগত ভক্তবৃন্দকে আকর্ষণ করিয়া যেন দৃঢ় আলিঙ্গন পাশে আবদ্ধ করিতেছেন। ভদ্র লোকটির কথায় যেন হঠাৎ তাঁহার চমক ভাঙ্গিল। অতিকষ্টে যেন এ রাজ্যে ফিরিয়া আসিলেন। বলিলেন 'কি বল্‌ছেন'? ভদ্রলোকটি পুনর্ব্বার "সদ্‌গুরু তত্ত্বটি" কি তাহা জানিতে চাহিলেন। এইবার শ্রীগুরুদেব বলিলেন— বাবা! গুরুর আগে ঐ সৎ কথাটি কেন?

ভদ্রলোক—আজ্ঞে বুঝিতে পারিলাম না।

শ্রীগুরুদেব বলিলেন—

"জীবের নিস্তার লাগি নন্দসুত হরি।
ভুবনে প্রকাশ হন গুরুরূপ ধরি॥"

ভগবান স্বয়ং যখন হাত ধরিয়াছেন তখন সে আবার সৎ বা অসৎ হয় কিরূপে? আপনি যাঁহাকে গুরুপদে বরণ করুতে ইচ্ছা করেন তাঁহাকেই গুরু করুতে পারেন। তিনি সব সময়ই সৎ এবং মঙ্গলময়। তিনি যখন হাত ধরেন তখন চাইবার বা পাইবার কিছুই থাকে না। সকল দায়িত্ব তাঁর!

ভদ্রলোক—তাহা হইলে আমাদের কি কিছু করিবার রহিল না?

শ্রীগুরুদেব—যথেষ্ট রহিল।

ভদ্রলোক—কি রহিল?

শ্রীগুরুদেব—তাঁর সেবা, সেবা অর্থাৎ তাঁকে সুখ দেওয়া অর্থাৎ নাম-কীর্ত্তন, ভগবৎ প্রসঙ্গ যাতে তিনি সুখী হন।

কিছুক্ষণ মালা করিতে করিতে আবার বলিলেন—কি জানো, "শ্রীগুরু কল্পতরু" সেবকের কর্ত্তব্য তরুর দিকে দিবা-নিশি তাকাইয়া থাকা, কল্পতরু কখন কি ফল প্রসব করিবেন অন্য-মনস্ক হইলে ফললাভ হইবে না, অন্য কেহ ভোগ করিবে, নিজেকে বঞ্চিত হইতে হইবে। শিষ্যকে যতক্ষণ পর্যন্ত না ঠিক স্থানে লইয়া যাইতে পারিতেছেন ততক্ষণ তাঁহার রেহাই নাই। শিষ্য নরকে যাইলেও তাঁহাকেও নরকে যাইতে হইবে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত না ঠিক পৌঁছাইয়া দিতেছেন ততক্ষণ তাঁহার শান্তি নাই। কি রকম জানো, পেয়াদা যেমন আসামীকে ধরে। পেয়াদার কর্ত্তব্য তাকে থানায় পৌঁছাইয়া দেওয়া। যত শীঘ্রই হয় পেয়াদা সেই চেষ্টা করবে, কিন্তু পথিমধ্যে আসামী চেষ্টা করবে যাতে বেশী সময় লাগতে

পারে বা সে ছাড়িয়ে পালাতে পারে, কিন্তু পেয়াদা তো আর তাকে ছাড়বে না, সে দেহ ধর্ম্মের অছিলায় রাস্তায় যতই বিলম্ব করুক। আমাদের বেলায়ও ঠিক তাই।

ভদ্রলোক—আচ্ছা, এক এক দিন বেশ আনন্দ হয়। ঐ আনন্দকে স্থায়ী করা যায়?

শ্রীগুরুদেব—ঈষৎ হাসিতে হাসিতে ভদ্র লোকটির প্রতি করুণ-নয়নে চাহিয়া বলিলেন—

"যা কোরে ঐ আনন্দ হইয়াছিল সেইটাই বার বার করবার চেষ্টা করুন। তাহা না হইলে স্থায়ী হবে না। সাধারণ কথায় বলি, পানা-পুকুরে একটা ঢিল ছুঁড়িলে কিছু পানা সরিয়া গেলে নির্ম্মল স্বচ্ছ জল দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু কিছু পরেই আবার ভর্ত্তি হইয়া যায়। তাই মুহুর্মুহু ঢিল ছুঁড়িতে হইবে। বন্ধ দিলে চলিবে না।"

ভদ্রলোক—কি থেকে আনন্দ হোলো কি করিয়া জানিব?

শ্রীগুরুদেব—কেন একটু খোঁজ করিলেই বুঝিবেন।

ভদ্রলোক—আনন্দ হয় কিরূপে?

শ্রীগুরুদেব—"নাম, ভগবৎ-প্রসঙ্গে।"

ভদ্রলোক—ঠিক্ আবার ভালো লাগ্‌বে কিরূপে?

শ্রীগুরুদেব—কি জানো, মায়া-পিত্ত-বিকার-গ্রস্ত জীব। পিত্ত-বিকারের রুগী তাহার মিছরী খাইতে মোটেই ভাল লাগে না। সমস্ত জিব তিক্ত হয়ে থাকে। কিন্তু ঔষধ তার ঐ মিছরী। হাসিতে হাসিতে প্রিয়ভক্ত কবিরাজ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শাস্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"এই সব কবিরাজরা কি আজকাল ঠিক চিকিৎসা করে, কেবল উল্টোটাই করিবে। আসল ঔষধ তাহাকে দেয় না। মিছ্‌রী তাকে দিতে হবে, না হইলে রোগ সার্‌বে না! সে যদি শুধু মিছ্‌রী না খাইতে পারে, যাহা সে খাইতে ভালবাসে তাহার সহিত কিছু কিছু করিয়া মিছ্‌রী মিশাইয়া দিতে হইবে। এইরূপে মিছ্‌রীও কাজ কর্‌বে আর তার রোগও সার্‌বে। রোগও কমিবে আর জিব্‌ও অল্প অল্প পরিষ্কার হইতে থাকিবে। তখন তেঁতোর বদলে তা'র মিষ্টি লাগ্‌তে থাক্‌বে, শেষে আর তাকে সাধতে হবে না, সে নিজেই চেয়ে খাবে। এই বিষয় বল্‌তে গিয়ে এক ঘটনা মনে পড়ে গেল। একবার শ্রীখণ্ডে বড় উৎসবে গিয়ে দেখি পুতুল নাচের ব্যবস্থা, তা শুনিলাম, শ্রীসর্ব্বানন্দ ঠাকুর বলিলেন, "দেখ উৎসবের জন্য ভিক্ষা করে টাকা জোগাড় হয়েছে, আমায় কিন্তু সকলে বকিবে, কি করেছি জানো? পুতুল নাচের ব্যবস্থা, বেশ বড় বড় পুতুল, সুন্দর দেখিতে, লোকে দেখ্‌বে, কিন্তু কতক্ষণ দেখ্‌বে পুতুল তো আর কথা কয় না। এদিকে যাত্রার ব্যবস্থা রয়েছে, তখন এসে যাত্রা দেখিবে, অনেকক্ষণ দেখে যখন আর ভালো লাগ্‌বেনা তখন এদিকে ঠাকুর আছেন, এসে ঠাকুর দেখ্‌বে, মনোরম সাজানো হয়েছে। একবার ঐ গৌর রূপ দেখ্‌লে আর যেতে পার্‌বে না।"

ভদ্রলোক—তাহা হইলে কি আমাদের স্মরণ কর্‌তে হবে?

শ্রীগুরুদেব—একটু চুপ করিয়া বেশ উল্লাসভরে আবার বলিতে লাগিলেন—

"স্মরণ", সে বড় শক্ত কথা, যাঁহাকে (বড় বাবাজী মহারাজকে) লক্ষ্য করে তাঁহার (বড় বাবাজী মহাশয়ের) গুরুদেব বলেছেন—তিনিই (বড় বাবাজী মহাশয়) পারবেন। তবে কি জানো "সে" তো সব জায়গায় আছে, সর্ব্বদা চেষ্টা করছে আমাদের ভিতরে ঢুকতে, কিন্তু পারছে না। বসবার একটুও স্থান নাই। ডাকা বা নিমন্ত্রণ করা হয় বটে, কিন্তু থাকবে কি কোরে, বসবার স্থান কোথায়?

সব আবর্জ্জনায় ভর্ত্তি। তবে হ্যাঁ, যদি একটু ঢুকতে পায় তবে শত তাড়ালেও সে যাবে না। ঐযেগো ঠাকুরুণের কথা, সখীরা তাঁহাকে বিরহে বড়ই কাতরা দেখে বল্‌লে—"তুমি তার চিন্তা ত্যাগ করো নইলে বাঁচিতে পারিবে না।" এই বলে কৃষ্ণ উদ্দীপক সমস্ত জিনিষই দেখ্‌তে বারণ করে ঘরের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখল। তিনি কিছুক্ষণ চুপ করে কেঁদে ফেললেন, বললেন—সই! তাকে ভোলা গেল না, সে মনের মধ্যে ঘুমিয়ে আছে। ঘুমন্ত লোককে জাগানো মহাপাপ।

শ্রীগুরুদেব একটু চুপ করিয়া বেশ উল্লাসভরে আবার বলিতে লাগিলেন—

তা অনুভব করার ত সুবিধাই রয়েছে, সে তো সব হয়েই আছে। সকলের ভিতর অনুভব করা যায়। সেই কথা—

"স্থাবর জঙ্গম দেখে, না দেখে তার মূর্ত্তি।
সর্ব্বত্র হয় তার ইষ্ট দেব স্ফুর্ত্তি॥"

মিলন না হ'লে উপলব্ধি হয় না। মিলনের মধ্যেও সেই যুগলের অনুভূতি হয়। বায়েস্কোপ, থিয়েটার যে হয় তার মধ্যে কি তার কথা নেই? "কানু" ছাড়া কি গীত আছে গো? কি করে যে সে আকর্ষণ করে তাকি বলা যায়। এই যেমন মাছ ধরা হয়, মাছ ধরেছো?

ভদ্রলোকটি একটু হাসিলেন।

শ্রীগুরুদেব—মাছ ধরার সময় বঁড়সীতে একটা মাছ আট্‌কে রাখে। মাছগুলো তাকে দেখে আসে আর আট্‌কে পড়ে।

সবের মধ্যে তাঁকে দেখতে পাওয়া যায়, একবার ইডেন গার্ডেনে প্রদর্শনী হ'য়েছিলো। ছেলেরা দেখ্‌তে গেলো, আমি বলে ছিলুম প্রদর্শনী দেখ্‌তে যাচ্ছো তা বেশ, কিন্তু প্রদর্শনী কাকে বলে........"প্রদর্শনই, প্রকৃষ্টরূপে দর্শন" তার মানে সবের মধ্যে তাঁর অনুভূতি।

সমর্থা-রতি-শিরোমণি শ্রীগুরুদেবের কৃপা-শক্তির অচিন্ত্য প্রভাবেই মায়ামুগ্ধ কলিহত পতিত জীব "নাম-প্রসঙ্গে" ভগবদুন্মুখী হইয়া ভগবৎ-সেবানন্দভোগে অধিকারী হয়। ভগবৎ-কারুণ্য-ঘন-বিগ্রহ শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখ নিঃসৃত "শ্রীগুরু কল্পতরুতে" সেবকের কর্ত্তব্যের কথা শ্রবণ করিয়া সকলে পরমানন্দে গন্তব্য পথে গমন করিলেন।

---

১৩৫৭ সাল, শ্রাবণ

শাস্ত্রকারগণ নির্দ্দেশ দিলেন, পারমার্থিকবস্তু নির্ণয় করিতে গিয়া কোন লৌকিক যুক্তির অবতারণা করিও না॥ কারণ লৌকিক যুক্তিদ্বারা লৌকিক বস্তু নির্ণীত হইতে পারে। কিন্তু লোকাতীত অতীন্দ্রিয় বস্তু তদ্দ্বারা নির্ণীত হইতে পারে না। সুতরাং শাস্ত্র-বাক্য অবিচারে মানিয়া লইতে হইবে, শিশু যেমন বর্ণপরিচয়কালে শিক্ষকের কথায় 'ক' বর্ণকে "ক" বর্ণ বলিয়াই অবিচারে মানিয়া লয়। ইহাই হইল শাস্ত্র অধ্যয়নের পূর্ব্বে আমাদের প্রতি শাস্ত্রকারগণের সতর্ক বাণী। তবে শাস্ত্রীয় তর্ক উত্থাপন করিতে কোন নিষেধ তাঁহারা করেন নাই। অর্থাৎ শাস্ত্রবাক্যসমূহের মধ্যে যেখানে পূর্ব্বাপর বাক্যের পরস্পর বিরোধ বলিয়া প্রতিভাত হইবে সেখানে সেই বিরোধকে পরিহার করিবার জন্য শাস্ত্রানুকূল বিচারপ্রণালী আশ্রয় করিতে শাস্ত্রকারগণ অনুমতি দিয়াছেন। অনেকস্থলে এক এক শব্দের বহু অর্থ দেখা যায়, তন্মধ্যে কোন্ অর্থটী বর্জ্জনীয়, কোন্‌টী বা গ্রহণীয় তংহা শাস্ত্রীয়প্রণালী অনুসারে নির্ণয় করা আমাদের পক্ষে সহজ হইবে না ভাবিয়া তাঁহারা আবার সহজ সরল পন্থা দেখাইলেন, যে শ্রীগুরুমুখে যেরূপ অর্থ শুনিবে তাহাই যথার্থ বলিয়া গ্রহণ করিবে। সদাচারকেও শাস্ত্রকারগণ বাদ দেন নাই। বরং তাঁহারা সদাচারের প্রতি বিশেষ আস্থা স্থাপন করিতে ব্যবস্থা দিয়াছেন। সদাচার সাধুদিগের আচরণ। সাধুদিগের কোনও কোনও আচরণ সম্বন্ধে শাস্ত্রে উল্লেখ না থাকিলেও উহা মহৎদিগের অভ্রান্ত অনুভূতি প্রসূত বলিয়া সর্ব্বথা গ্রহণীয়। সুতরাং সদাচারও আমাদের উপেক্ষার বিষয় নহে। আবার সাধুদিগের প্রত্যেক আচরণটীও আমাদের পালন করা উচিত নয়। কারণ

প্রত্যেকটী আমাদের পক্ষে উপযোগী নাও হইতে পারে। সেইজন্য যেগুলি তাঁহাদের উপদেশের গণ্ডীর ভিতর পড়ে, মাত্র সেইগুলিই পালন করা উচিত এবং উহাই সদাচার পদ-বাচ্য। অতঃপর পূর্ব্বোক্ত বিষয়গুলি সম্বন্ধে পূজ্যপাদ শ্রীলবাবাজী মহারাজ কি বলিয়াছেন তাহাই উল্লিখিত হইতেছে।

একদা কোন এক ভক্ত সম্প্রতি স্বীয় কন্যার বিবাহ দিয়া গৃহে অষ্টপ্রহরব্যাপী শ্রীশ্রীনামসংকীর্ত্তন যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিবার জন্য শ্রীলবাবাজী-মহারাজের নিকট আমন্ত্রণ পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু বিবাহের জের তখনও রহিয়াছে। এক পক্ষ কাল গত না হইলে সে গৃহে ত্যাগী বৈষ্ণবদিগের প্রসাদ পাওয়া নিষিদ্ধ। যিনি আমন্ত্রণ পাঠাইয়াছেন তিনিও এ বিষয়ে বিশেষ জ্ঞাত আছেন। কারণ, তিনি একজন শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি। তথাপি তাঁহার বক্তব্য, শ্রীহরিভক্তিবিলাসে উক্ত আছে—"ভক্তিপথের গৃহস্থেরা বিবাহাদি সকল কার্য্যে প্রত্যেক দ্রব্য শ্রীহরিকে আগে সমর্পণ করিয়া লইবেন।" তদনুসারে তিনি বাটীতে যাবতীয় কাজ করিয়া আসিতেছেন। সুতরাং সে-ক্ষেত্রে সে প্রসাদ-গ্রহণে কি বাধা থাকিতে পারে? শ্রীহরিদাস-ঠাকুর বিপ্রের শ্রাদ্ধের অগ্রভাগ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

পণ্ডিতজীর বৈষ্ণবসেবায় বিশেষ আবেশ থাকাতে তিনি একথা ভাবিয়া দেখিবার অবসর পান নাই যে, শ্রীলঅদ্বৈতাচার্য্য শ্রীহরিদাস-ঠাকুরের গুরুদেব। তাঁহার আদেশ পালনের জন্যই তিনি ঐরূপ করিয়া ছিলেন। এক্ষণে আমাদের লক্ষ্য করিবার বিষয়—আমাদের শ্রীগুরুদেব কি বলিতেছেন। তিনি কর্ম্মকাণ্ডের বাড়ীতে কোন দ্রব্য-গ্রহণে অনুমতি দিতেছেন না। যেখানে নান্দীমুখ হইয়াছে সেখানে কোনমতে আশ্রমের ত্যাগী বৈষ্ণবেরা কিছুই গ্রহণ করিতে পারেন না। সেদিন প্রসঙ্গক্রমে শ্রীলবাবাজী-মহারাজ উপস্থিত ভক্তগণকে পূর্ব্বোক্তবিষয়ে চরমসিদ্ধান্তের কথা বলিতেছিলেন। তিনি বলিলেন,—

**মহাপ্রসাদে বিশ্বাস হ'লে তখন আর বিচার চলে না। তখন জগন্নাথ-দর্শনে যে অষ্ট সাত্ত্বিক বিকার হবে মহাপ্রসাদ পেয়েও সে জাতীয় সুখ ও বিকার প্রকাশ পাবে। এরূপ মহাত্মাদের আমরা নকল করতে গেলে মুস্কিলে পড়ব। তাঁরা প্রসাদ পেয়ে অবিচারে গ্রহণ করিবেন, কিন্তু সাধকদের সাবধান হওয়া উচিত। আজকাল হয়েছে যেটুকু সুবিধা সেইটুকু মহাত্মাদের আচরণ হতে নকল করিলাম। সিদ্ধ-মহাত্মারা একাদশীতে মহাপ্রসাদ পাইতেছেন দেখে সেইটুকু সুবিধা বুঝে নকল করিলাম। কিন্তু এতে সর্ব্বনাশ হচ্ছে। তাই রামানন্দী বৈষ্ণবগণ শ্রীএকাদশী-দিনে মন্দিরে যান না। কারণ, গেলে সাম্‌নে প্রসাদ এসে পড়লে অমর্য্যাদা করা চলে না। শ্রীমন্মহাপ্রভুর মত সকলের অবস্থা হয়নি যে, মহাপ্রসাদ তিনি সেবা ক'রবেন। শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীএকাদশীর দিন পরিক্রমা বন্ধ করবারও ইহা একটী কারণ।**

ইহার পর উপসংহারে বলিলেন,—

কাশিমবাজারের রাজার বাবার শ্রাদ্ধের সময়ে নিয়ে যাবার জন্য আহ্বান এল। আমি গেলাম না। ঠাকুরমহাশয়কে বলিলাম, জের না কাটা পর্য্যন্ত সে বাড়ীতে যাওয়া আমাদের শ্রীগুরুদেবের নিষেধ আছে। এক পক্ষ পরে যেতে পারি। কথা কি জান? "মাছের তেলে মাছ ভেজে নেওয়ার মত।" কিছু বেশী হয়েছে বৈষ্ণব সেবা ক'রে নাম কেনা যাক্। ১০।১২ দিন কেটে গেলে আবার নতুন ক'রে জোগাড় করতে হবে। কারণ বিয়ের জিনিষ তখন পচে গেছে বা খরচ হ'য়ে গেছে। তার আগে অষ্টপ্রহর করে দাও স্বার্থ পরমার্থ দুই লাভ করা হবে। মহদনুভূতি শাস্ত্র অপেক্ষা কম ওজনের নয়। শ্রীহরিভক্তিবিলাস মতেই মহদনুভূতির মূল্য বেশী। আমাদের যা আদেশ ক রে গেছেন সে আমরা ক'রবো। তাতে সকলে ত্যাগ করে করুক। পুনশ্চ বলিলেন, যাজন করা সোজা নয়। গুরুজনের মুখে শোনা আছে, সিদ্ধ মহাত্মা নিজ অন্তরের ভাব বাহিরে প্রকাশ হতে না দিয়ে প্রবর্ত্তকদের মত আচরণ করেন। তাঁর মানসিক অবস্থা অনুযায়ী তিনি আচরণ ক'রলে পাঁচজনে নকল ক'রে নষ্ট হবে। যাতে পাঁচজনের ক্ষতি হবে সে আবার কি যাজন?

শ্রীরথযাত্রার পূর্ব্বেকার ঘটনা। একদিন সকাল বেলা এক বিশিষ্ট ব্যক্তির একান্ত আগ্রহে কলিকাতায় পূততোয়া গঙ্গা তীরে শ্রীলবাবাজী-মহারাজ শ্রীনাম কীর্ত্তন করিলেন। লোকে লোকারণ্য। ঘাটে শত শত লোক স্নান করিতে আসেন। যাঁহারা স্নান করিতে আসিতেছেন যাঁহারা স্নান করিয়া ফিরিতেছেন সকলেই সেই সংকীর্ত্তনের সুমধুর আকর্ষণে চুম্বকাকৃষ্ট লৌহের মত কীর্ত্তনস্থলী ত্যাগ করিতে পারিতেছেন না। একেই পতিত পাবন প্রেমময় শ্রীনিতাইচাঁদের প্রেমেনাচা-পাদপদ্মের পরশ পাওয়া চিদাত্মক-দ্রবময়ী সুরধুনীর তটভূমি, তাহাতে আবার যিনি সংকীর্ত্তন করিতেছেন তাঁহার মানসক্ষেত্রে সপার্ষদ শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীরথযাত্রাকালীন অপরূপ লীলামাধুরীর উদ্দীপনা ধারা—ঐ সুরধুনীর প্রবাহের মতই প্রবাহিত হইতেছে। সুতরাং সেদিনকার শ্রীলবাবাজী মহারাজের শ্রীমুখনিঃসৃত কীর্ত্তনধ্বনি পরম অমৃত স্রোতে পরিণত হইয়া শ্রোতৃমণ্ডলীকে এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ সাগরে ভাসাইয়া দিল। তাঁহারা সেই আনন্দ সাগরে ভাসিয়া ভাসিয়া যেন সাক্ষাৎভাবে শ্রীনীলাচলাধামে সপরিকর শ্রীগৌরসুন্দরের রথযাত্রা-কালীন ঝালিসমর্পণ গুণ্ডিচামার্জ্জন, রথাগ্রেনর্ত্তন প্রভৃখি যাবতীয় লীলামাধুরী দর্শন করিয়া আত্মহারা হইলেন।

সংকীর্ত্তনের শেষে কোন এক ভদ্র মহোদয় শ্রোতাদের ঐরূপ কীর্ত্তন শ্রবণের সৌভাগ্য স্মরণ করাইয়া দিবার উদ্দেশ্যে কিছুক্ষণ বক্তৃতা দিয়া পরিশেষে বলিলেন আমরা বাবাজী মহাশয়কে ঝালির জন্য কিছু দিতে ইচ্ছা করি, আপনারা আপনাদের সাধ্য মত কিছু কিছু ভিক্ষা দিন। এই শেষোক্ত কথায় শ্রীলবাবাজী মহারাজের প্রেমোজ্জ্বল মানস আকাশ

অকস্মাৎ এক নিবিড় কালো মেঘে যেন ঢাকিয়া ফেলিল, আনন্দোৎফুল্ল মুখপদ্ম যেন আকস্মিক শিশির স্পর্শে মলিন হইয়া গেল। যথা সম্ভব আত্মভাব গোপন করিয়া তৎক্ষণেই সে স্থান হইতে পোস্তায় চলিয়া আসিলেন। কিছু সময় পরে উক্ত কীর্ত্তনস্থলী হইতে দুই জন কিছু মালসা ভোগ এবং পূর্ব্বোক্ত ভদ্রলোক কর্ত্তৃক প্রার্থিত কিছু টাকা লইয়া পোস্তায় শ্রীলবাবাজী মহারাজের নিকটে হাজির। তিনি তদ্দর্শনে নিতান্ত ব্যথিত কণ্ঠে বলিলেন,—

**নামপ্রসঙ্গ করিতে গিয়া টাকার জন্য কোন কথা উল্লেখ করা আমাদের শ্রীগুরুদেবের আদেশ বিরুদ্ধ। টাকার কথায় আমার প্রাণে বড় ব্যথা লেগেছে। আমি নিতে পারবো না। আমি এইভাবে টাকা নিয়েছি শুনিলে নবদ্বীপে দিদি ( শ্রীললিতা-সখী ) কি বলবেন ?**

তখন উক্ত ভদ্রলোক দুইজন বড় মুস্কিলে পড়িলেন। কেন না, সে টাকা পাঁচজনের নিকট হইতে ঝালির জন্য নেওয়া হইয়াছে, তাহা বর্ত্তমানে আবার ফিরাইয়া দেওয়া সম্ভব নয়; নিজেরাও আত্মসাৎ করিতে পারেন না। সেজন্য অতি বিনীত-ভাবে ক্ষমা প্রার্থনা পূর্ব্বক উক্ত টাকা গ্রহণ করিতে পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, শুনিয়া শ্রীলবাবাজী-মহাশয় বলিলেন,—

**ও টাকা আমি কিছুতেই নিতে পারি না তোমরা পুরী পাঠিয়ে দাও।**

শেষে তাহাই হইল।

সাধুসঙ্গই ভক্তিরাজ্যে প্রবেশ করিবার প্রথম দরজা। যাহার ভাগ্যে সাধুসঙ্গ বা সাধুগণের কৃপা পাইবার সুযোগ ঘটে নাই তাহার পক্ষে অমৃতময় শ্রীভগবৎসেবানন্দ আকাশকুসুম তুল্য। তাই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলিলেন— "কৃষ্ণ-ভক্তিজন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ।" কিন্তু যিনি সাধককক্ষায় আসিয়াছেন তাঁহাকে এই সাধুসঙ্গ বিষয়ে কিছু সাবধনতা অবলম্বন করিতে হইবে। তাই একদিন শ্রীলবাবাজী-মহারাজ কোন এক সাধু দর্শনে যাইবার পূর্ব্বে বলিতেছিলেন,—

**প্রীতিই সৌন্দর্য্য, দেহের চামড়ার সৌন্দর্য্য, সৌন্দর্য্য নয়। স্ত্রীর যদি স্বামীর প্রতি প্রীতি হয়ে থাকে তবে স্বামী যতই কুৎসিত হউক না কেন, স্ত্রীর নিকট সে কার্ত্তিকের চেয়ে সুন্দর। আর যদি প্রীতি না থাকে স্বামী যতই সুশ্রী হোক না কেন, দুদিন পরে সে স্বামীতে স্ত্রীর মন ভরে না। অন্য পুরুষের দিকে ছুটে। চামড়ার সৌন্দর্য্যের পানে ছুটে ছুটে কোথায়ও শান্তি পায় না। কারণ, সৌন্দর্য্য-শান্তি প্রীতি ছাড়া মিলে না। তেমনি এ রাজ্যে দীক্ষা-গুরুতে নিষ্ঠা হয় নি, অন্যান্য সাধু দর্শন করতে করতে নিজের গুরুর উপর গৃহস্থাদি জ্ঞানে অবজ্ঞা আসিল। আর তাঁর কাছে না গিয়ে অন্য সিদ্ধ মহাত্মা খুঁজে ভেক নিতে ছুটলো, শান্তি পেল না। মূলে ত নিষ্ঠার পরিবর্ত্তে অবজ্ঞা এসেছে ? যাঁর দীক্ষা-গুরুতে নিষ্ঠা**

হল না তার কি কখনও অন্যত্র নিষ্ঠা হতে পারে? অন্য সাধুর প্রতি সাময়িক শ্রদ্ধার ভাব দেখা যায়, স্থায়ী হয় না। তখন তাহার গুরু খোজাই সার হয়। মনের মত গুরু মিলে না। আর যার গুরুতে নিষ্ঠা হয়েছে তার গুরু লোকদৃষ্টিতে যতই অযোগ্য হন না কেন, তার নিকট তার গুরুর মত কেউ ভাল হতে পারে না। সাধু মহাত্মাদের প্রতি নজর পড়লেও তার মন কিছুতেই গুরু ছাড়া অন্যত্র আকৃষ্ট হয় না। তাই নিষ্ঠা না আসা পর্য্যন্ত, শ্রীগুরুগত-প্রাণ না হওয়া পর্য্যন্ত অন্য মহাপুরুষদের সাথে মেলামেশা করা ঠিক নয়।

শ্রীল বাবাজী মহারাজ নিজেই বলিতেছেন,—

আমার ত সাধু মহাত্মাদের দর্শনে যেতে ভয় লাগে। যাবো কি জন্য—লাভের জন্য না লোকসানের জন্য? দূর থেকে যাঁ রনাম শুনে আমার মাথা শ্রদ্ধায় নত হয় যদি তাকে পেয়ে আবার কোন বিচার এসে পড়ে তবেত আমি সে ভাব হারালাম?

আর একদিন পূর্ব্বোক্ত উদাহরণটী উত্থাপন করিয়া শ্রীলবাবাজী মহারাজ বলিলেন,—

প্রীতি না জন্মানো পর্য্যন্ত স্ত্রীর উচিত নয়, বয়স্থ কোন পুরুষের পানে তাকানো বা তার সঙ্গে মেলামেশা করা। কারণ, তাতে স্বামীর প্রতি প্রীতি জন্মিতে বাধা ঘটবে। যখন স্বামীর সহিত প্রীতি ঘনিষ্ট হলো তখন আর কোন নিষেধ নাই। কথা কও, আলাপ করো, তোমার প্রয়োজন মত স্বামী-সেবার জন্য কিছু চেয়ে নিলে, স্বামী সেবাই লক্ষ্য। সেইরূপ ইষ্টের সহিত সম্বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত অন্য দেবদেবীর পূজা করবে না। দণ্ডবৎ প্রণাম মাত্র করবে। কারণ, তোমার যে ঠাকুর, তাঁর সঙ্গে রীতিমত না মজিলে তাঁর ঐশ্বর্য্য তোমার দৃষ্টিতে পড়বে না। অন্য দেবদেবীর ঐশ্বর্য্য প্রত্যক্ষ রয়েছে। তুমি তাহাতে সহজে আকৃষ্ট হয়ে পড়লে। তোমার ইষ্ঠনিষ্ঠা হয়ে উঠলো না। যখন ইষ্টনিষ্ঠা ঘটেছে তখন যথেষ্ট প্রীতিভক্তি লাভের জন্য অন্য দেবদেবীর পূজা করতে পার, উদ্দেশ্য—ইষ্টভক্তি লাভ। এ উদ্দেশ্য ছেড়ে অন্য কাহারও নিকট যাওয়া উচিত নয়।

ঐ সময়ে একজন জিজ্ঞাসা করিলেন, আজ্ঞে! "শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং'……এখানে শ্রবণ কথাটী আগে উল্লেখ করা হোল কেন? উত্তরে শ্রীলবাবাজী মহারাজ বলিলেন,—

শ্রবণ হল ভক্তির প্রথম অঙ্গ, তারপর কীর্ত্তন।

সাধক প্রথমেই যে শ্রবণরূপা-ভক্তি আশ্রয় করিয়া পরে ক্রমশঃ সিদ্ধাবস্থায় উপনীত হয় তাহার একটী বিশেষ শিক্ষামূলক প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত তিনি উত্থাপন করিলেন। শ্রীল বাবাজী মহারাজ বলিলেন—

কালনায় শ্রীল সিদ্ধ ভগবান দাস বাবাজী মহারাজের নিকট দুই মূর্ত্তি ব্রাহ্মণ এসেছিলেন। তিনি তাঁদের যথাযোগ্য আদর সম্মানপূর্ব্বক বসালেন। কিছুক্ষণ পরে

দুই মূর্ত্তি গৃহস্থ বৈষ্ণব আসিলে তাঁদেরও তিনি তদ্রূপ সন্মান-পূর্ব্বক বসালেন। এই দেখে পূর্ব্বাগত ব্রাহ্মণ রেগে উঠে বল্লেন, এদের এরূপ জন্ম, আমাদের মত এদের সন্মান দিলেন কেন? তখন শ্রীল ভগবান দাস বাবাজী মহাশয় আস্তে আস্তে বল্লেন, চুপ চুপ বাবা! ও কথা বলতে নাই। এদের জন্মের দোষ থাকলে থাকতে পারে কিন্তু সমাজে এদের যেরূপ শাসন অন্য কোন জাতির সেরূপ নাই। প্রতি জাতির এক এক বৃত্তি আছে। এদের কোন বৃত্তি নাই, হরিনাম ক'রেই উদর পুরণ করে। এদের কোন কর্ম্মকাণ্ড নাই, জন্ম এবং মৃত্যুতে মালসা ভোগ দিলেই হ'লো। কিরূপ ব্যবস্থা বল দেখি বাবা? ভোর বেলায় এদের মুখে নাম শুনে আজ আমি এই সিদ্ধ ভগবান দাস বাবাজী।

দৃষ্টান্তটী শুনিয়া উপস্থিত সকলে পরমানন্দিত হইলে পর শ্রীল বাবাজী মহাশয় পুনশ্চ পূর্ব্বোক্ত প্রসঙ্গের উপসংহার করিবার অভিপ্রায়ে বলিলেন,—

কথা কওয়া এবং চলাফেরা ঠাকুরের সঙ্গ করতে পারে তারা, যাদের সর্ব্বত্র ইষ্টস্ফুর্ত্তি হয় কোথায়ও দোষ-দৃষ্টি ঘটতে পারে না। সুতরাং সাধুর কহিত মেলামেশায় এদের কখনও লোকসান হতে পারে না।

---

৩০শে আশ্বিন ১৩৫৭ সাল। বৈকাল ৪টায়, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীহরিদাস ঠাকুরের মহোৎসবের অন্তে প্রত্যাবর্ত্তনের পর কলিকাতায় ভক্তবৃন্দের প্রীত্যনুকূলে শ্রীশ্রীনির্য্যাণ কীর্ত্তন স্মরণে লীলারস আস্বাদনে শ্রীগুরুদেবের কীর্ত্তনমুখে মহাবাক্যরূপ কয়েকটী অমূল্যদান প্রকাশ পাইয়াছে। তাহা এই—

১। "ইহা লীলা নয় অভিনয়" ২। "জগন্নাথ শ্যামের শ্রেষ্ঠস্বরূপ"

৩। "শ্রীশ্রীহরিদাস ঠাকুরের স্বরূপে বাবার নিজের অনুভূতি"। শুনিয়া অবধি এই সম্বন্ধে শ্রীগুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করা হয় নাই, তাই একদিন তদীয় অন্তরঙ্গ ভক্ত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শাস্ত্রী অতি আগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন—

১। বাবা! "ইহা লালা নয় অভিনয়" ইহার রহস্য কি? গতকাল শ্রীকীর্ত্তনমুখে মনে হইল লীলাপেক্ষা অভিনয়ে কোটী কোটী গুণ মাধুর্য্য-রস আস্বাদন হয়।

উত্তর—অতিশয় উল্লাসের সহিত বলিলেন—সে ত খুব ঠিক কথা একটু ভাবলেই বুঝতে পারবে "মিলনে হয় লীলা" আর "বিরহে হয় অভিনয়" মিলন অপেক্ষা বিরহে প্রিয়ের অবিচ্ছেদ চিন্তা হেতু কোটীগুণ ভোগাধিক্য। প্রিয়-বিরহে যখন জীবন-ধারণ কঠিন হইয়া উঠে তখনই অভিনয়ের আবির্ভাব। শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে শ্রীমতীর যখন জীবন সঙ্কট তখন সখীবৃন্দ শ্রীকৃষ্ণলীলা অভিনয় করিয়া তাদের জীবন-সর্ব্বস্ব রাইকে প্রাণে বাঁচায়, এদিকে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর বিরহে অধৈর্য্য হইয়া পড়িলে, শ্রীকর্ণপূর গোস্বামী শ্রীশ্রীচৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটক অভিনয় করিয়া মহারাজ প্রতাপরুদ্রকে রক্ষা করেন, শেষে বলিলেন—জান অভিনয় হচ্ছে মৃতসঞ্জীবনী।

২। "জগন্নাথ শ্যামের শ্রেষ্ঠ স্বরূপ" ইহা শুনিয়া "চরিত সুধার" অন্তর্ভুক্ত, দাদা মহাশয়ের দান শ্রীশ্রীজগন্নাথের স্বরূপের কথা মনে পড়িল বটে কিন্তু মন হইতে একটা প্রশ্ন উঠিল শ্রীজগন্নাথ একলা শ্যামের বিবর্ত্ত স্বরূপ, এদিকে শ্রীশ্রীরাধাশ্যাম-যুগলিত বিবর্ত্তবিগ্রহ শ্রীশ্রীগৌর-সুন্দর স্বমাধুর্য্য আস্বাদনলুব্ধ হইয়া রাধিকা-ভাবিত-মতি, ধারণায় আসে না। "একলা বিবর্ত্তস্বরূপে, যুগল বিবর্ত্তস্বরূপ কেন এত আকৃষ্ট? শুধু তাই নয় নিতুই শ্রীশ্রীজগন্নাথের মঙ্গল আরতি দর্শনছলে শ্রীশ্রীজগন্নাথের শ্রীঅঙ্গে নিকুঞ্জ-বিলাস চিহ্ন দেখিয়া গৌর কিশোরী আনন্দে সুখ সাগরে ডুবিয়া যাইতেন। এখানেও আর একটা মহাসন্দেহ উপস্থিত, বিবর্ত্ত-নাগরীর সঙ্গ না পাইলে সুখী হওয়া অসম্ভব; অথচ গৌর কিশোরীর সংবাদ আমরা যাহা পাই তাহাতে "গম্ভীরা ভিতরে গোরা রায়। জাগিয়া রজনী পোহায়॥" তাহা হইলে শ্রীজগন্নাথের সঙ্গে কোন্ বিবর্ত্ত-নাগরীর বিলাস হয়? আগাগোড়া সব কথা শুনিয়া বেশ আনন্দের সঙ্গে উৎফুল্ল মনে শ্রীগুরুদেব হাসিয়া অতি সহজ সরল, অল্প কথায় সুন্দর মীমাংসা করিয়া দিলেন।

উত্তর—ভাবে ভাবে মিলন তোমাদের রাজ্যে আছে না? এখানেও তাই, বিরহী জগন্নাথ, গৌর কিশোরীর মিলন চিন্তায় বিভোর হইলে ভাবরূপী গৌর কিশোরীকে লাভ করিয়া তৎসঙ্গে বিলাসে সুখী হন; এদিকে বিরহিণী গৌর কিশোরী জগন্নাথ শ্যামের মিলন চিন্তায় বিভোর হইলে ভাবরূপী জগন্নাথ-শ্যামের সঙ্গ লাভ করিয়া তৎসঙ্গে বিলাসে সুখী হন; কিন্তু এই উভয়ের ভাবে ভাবে মিলন ও সঙ্গ-সুখ ভুলাইয়া ততোধিক নব নব সুখ দিবার জন্য যোগমায়া দেবী নব মিলন ও নব সঙ্গের তীব্র উৎকণ্ঠা জাগাইয়া রাখেন, যেন পূর্ব্বে কখনও পরস্পর পরস্পরকে পায় নাই।

৩। "শ্রীশ্রীহরিদাস ঠাকুরের" স্বরূপ বিষয়ে আপনার প্রাণের অনুভূতি শ্রীশ্রীহরিদাস ঠাকুর দশমী-ভাবগ্রস্ত কৃষ্ণবিরহিণী গৌর-কিশোরীকে মহানাম শুনাইয়া প্রাণে

বাঁচাইতেন, ইহা শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখেই প্রকাশ, ইহাতে সহজেই অনুমিত হয় দশমী-দশাক্রান্ত গৌর কিশোরীকে যদি হরিদাস শ্রীমতি রাধারাণীর দশমী দশোত্থিত "শ্রীমহানাম" শ্রবণ করাইয়া সেবা করার অধিকার পা য়া থাকেন তবে হইাও সহজে ও আনায়াসেই বুঝা যায় যে পূর্ব্ব লীলায় দশমীদশায় শ্রীশ্রীরাই-কিশোরীর সেবা-অধিকার না পাইলে এ লীলায় শ্রীশ্রীগৌর-কিশোরীর সেবা পাওয়া অসম্ভব, অতএব শ্রীহরিদাস ঠাকুর উভয় লীলার দশমী দশায় সেবক ও সেবিকা, ইহাই তাঁর স্বরূপ মনে হয়। আপনার এই অনুভূতির সংবাদ পাওয়ার পর শ্রীশ্রীহরিদাস ঠাকুরকে অন্য স্বরূপে চিন্তা করা মনে স্থান পায় না। শ্রীগৌর-গণোদ্দেশ-দীপিকায় শ্রীকর্ণপূর গোস্বামীর দান শ্রীহরিদাস ঠাকুরের স্বরূপ আর ভাল লাগে না, ইহাতে কি আমি গোস্বামীর পদে অপরাধী?

উত্তর—প্রাণের অনুভূতি শাস্ত্রীয় প্রমাণের পার, জেনে রেখ, গৌর পরিকরকে আশ্রয় করিয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব লীলার একাধিক পরিকর তাদের অপূর্ন সাধ মিটাইয়া ধন্য হন। গৌর পরিকর কোন এক বিশেষ তত্ত্বেই যে আবদ্ধ থাকিবেন তাহা নয়; তাতে সবই সম্ভব।

সন্ধ্যার পর যেতেই শ্রীগুরুদেব বলিলেন—দেখ আজ সারাদিন একটা কথা মনের ভিতর তোলপাড় করিতেছে, সমস্ত ব্রজমণ্ডল শ্রীরাধাঠাকুরাণী ব্যাপিয়া আছেন অর্থাৎ সমস্ত ব্রজই ব্যাপক রাধা, তার মানে ব্রজের যাবতীয় প্রকাশ বস্তু (সখা, সখী, গোপ গোপী, তরু লতা স্থাবর জঙ্গম, জল বায়ু ইত্যাদি) সমস্তই সেবা-বিগ্রহ শ্রীরাধাতত্ত্ব; এদিকে নবদ্বীপ নীলাচল, এমন কি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড বলদেবাভিন্ন সেবা বিগ্রহ শ্রীশ্রীনিতাইয়ের প্রকাশ অর্থাৎ এক কথায় বলিতে গেলে শ্রীনিতাইয়ের সত্বায় জগতের সত্বা, তা হলে হলো এই শ্রীরাধারাণী ও শ্রীবলদেবাভিন্ন শ্রীনিতাই-সুন্দর এই দুইই এক সেবাবিগ্রহ উভয়েই শ্রীগৌরকৃষ্ণের সেবা-সুখে সুখী, যদি নিতাই সত্বায় জগতের সত্বা একথা ঠিক হয় তবে জীব মাত্রই নিতাই তত্ত্ব, তবে জীবের পরিমাণ অণুত্ব-হেতু বৃহত্ত্বের অধীন। এদিকে শাস্ত্র বলে "অভিন্ন চৈতন্য তনু প্রভু নিত্যানন্দ" তবে শক্তি শক্তিমৎ অর্থাৎ পুরুষ প্রকৃতি মিলিত, ইহাও সুনিশ্চিত, আরও দেখ অষ্টোত্তর শতনামেও তোমরা পাও "পরোক্ষে প্রকৃতিশ্চৈব প্রত্যক্ষে পুরুষস্তথা" এ দর্শন যদি হয় তবেত—

"অন্তরে নিতাই, বাহিরে নিতাই; নিতাই জগতময়।
নাগর নিতাই, নাগরী নিতাই; নিতাই কথা সে কয়॥
সাধন নিতাই, ভজন নিতাই; নিতাই নয়ন-তরা।
দশদিকময়, নিতাই সুন্দর; নিতাই ভুবন-ভরা॥"

একদিন বাবা সকালে পোস্তায় ছাদে বেড়াইতেছেন। এক ভক্ত শ্রীগুরুদেবের পিছনে পিছনে আছেন, সামনে একখানি ভাঙ্গা ইট পড়িয়া ছিল, তিনি এগিয়ে গিয়ে পায়ের ঠোকর দিয়ে ইটখানি সরাইয়া দেন, দেখিয়া শ্রীগুরুদেব বলিলেন—

আমার ওসব আসে না, আমি ও পারি না। পূর্ব্বের প্রসঙ্গ অবলম্বনে বলিলেন—মোট কথা, শক্তি-শক্তিমান মিলন ব্যতীত কোন বস্তুর অস্তিত্বই সম্ভব নয়। তবে স্বাধীন তত্ত্বই বিষয়তত্ত্ব এবং অধীন তত্ত্বই আশ্রয়তত্ত্ব। পরের দিন শ্রীগুরুদেব এক ভক্তকে বলিলেন—দেখ, সেব্য ও সেবকের মধ্যে সম্বন্ধটা কি বল দেখি? ভক্ত বলিল "প্রভু ও দাস" শুনিয়া বলিলেন—জীবের স্বরূপ তবে দাস; ভক্ত বলিল হাঁ, পঞ্চরসের যে কোন রসাশ্রয়ে তাকে সেবা কর, দাসত্বই মূল ও দাসের ধর্ম্ম ও স্বরূপ? ভক্ত সমর্থসূচক মাথা নাড়িল। তাহ'লে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসে দাসত্বেরই ক্রমোন্নতি পর্য্যায়ে বিশুদ্ধ উন্নততম অবস্থা—একথা ঠিক? সমস্ত রসের সেবাই দাসত্বরূপ ভিত্তিতে অবস্থিত? ভক্ত বলিল—তার আর সন্দেহ কি? শ্রীগুরুদেব বলিলেন, তবে দাসের স্বভাব সর্ব্বদা সেবোল্লাসী হইয়া প্রভুর সেবা অপেক্ষায় দণ্ডায়মান থাকা। ধর অন্যান্য যাবতীয় সেবা, দাস খুব উল্লাসভরে করিতেছে, কিন্তু যখন ভোজনের বেলায় দাসের হাতছাড়া হ'য়ে প্রভু অন্তঃপুরে চলিয়া যান; তখন যদি উন্নততম-সেবালুব্ধ-দাস উক্ত সেবার অভাব বোধে নিজেকে অযোগ্য ও অপরাধী-জ্ঞানে বিশেষ অনুতপ্ত ও সেবা-বঞ্চিত হইয়া মৃতপ্রায় হয়, তবে আর দাস, দাসী হ'তে বিলম্ব হয় না। দেখ দাসত্ব, দাসীত্ব একই স্বরূপে অবস্থিত; পার্থক্য শুধু ভাব। গৌর-পরিকরে নজর পড়লেই বুঝবে, পুরুষ ও প্রকৃতির দুই খেলাই চলিতেছে; "দেখ্‌তে পুরুষ, ভাব প্রকৃতি" এই বাক্যের সার্থকতা সেখানে বর্ত্তমান।

পরদিন সন্ধ্যারতির একটু আগেই শ্রীগুরুদেব প্রিয়ভক্ত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শাস্ত্রীকে দেখেই বলিলেন,—

যেও না কথা আছে; আরতির পর ডাকিয়া বলিলেন,—দেখ আজ ২টী বেশ কথা পেয়েছি, "করেছি ও করেছেন।"

পূর্ব্বাগত দুইটী গুরুভাই চলিয়া যাওয়ার পর আবার বলিলেন—জগৎ শুদ্ধ লোক এই করেছির দলে মিশে পুরুষ-অহঙ্কারে নষ্ট পেল। এইগুলো, এটা করেছি, ওটা করেছি বলে ঐ রসেই মেতে আছে।

আচ্ছা, আমি করেছি বল্লে, কর্ত্তা ও ভোক্তার অভিমান এল না? আর তারই কৃপাবলম্বনে সমস্ত কাজ সমাধান করিয়া অকপট সত্যানুভূতিতে যদি কেও বলে, সমস্তই তিনি করেছেন, তাহলে তিনি যে সমর্পিত ও আশ্রিত এবং প্রভুর বিশুদ্ধ সেবক ইহা বুঝতে কি বাকী থাকে? এই "করেছি" কথাটা জগতের কি দুর্দ্দশাই ক'রেছে। ভেবে দেখ্‌তে গেলে শুধু এই ছোট দুইটী কথার মধ্যে জগজ্জীবের স্বরূপ, প্রভু-দাসের সম্বন্ধ ও পরস্পরের কর্ত্তব্য, সমস্তই নিহিত আছে। পূর্ব্বোক্ত ভাই দুইটীর নাম উল্লেখ করিয়া খুব দুঃখের সহিত বলিলেন, এইগুলো জীবনেও কখনও কোন প্রসঙ্গে এলো না।

একদিন এক ভক্ত শ্রীগুরুদেবকে বলিল—বাবা! যাহার কোন যোগ্যতা নাই, অভাব বোধ নাই, জানিবার পিপাসা নাই, কখনও প্রসঙ্গ কিংবা স্মরণও করে না, অনুভূতি ত

একেবারেই নাই ; অথচ অনেক বড় বড় কথা মাঝে মাঝে মনের ভিতর উঁকিঝুঁকি মারে কেন ? যা নাকি ছোট মুখে বড় কথা বলে আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেও সঙ্কোচ হয় ?

**উত্তর—তোমার কথায় তবে বুঝা গেল, যে কৃপার কোন মহিমা নাই। দাতা যদি যোগ্যাযোগ্য-বিচারে দান করবে, তাহলে তাকে উত্তমদাতা ও অহৈতুকী কৃপা-বিগ্রহ বলবে কেন ?**

শ্রীগুরুদেবের কথা শুনিয়া ভক্ত বলিল—বাবা ! এই জাতীয় কৃপার সার্থকতা কি ? দত্ত বস্তুর মূল্য ও আস্বাদন যদি গ্রাহকের বোধই না হইল, তবে এরূপ দানে লাভ কি ?

**উত্তর**—একটু হেসে,—**স্কুলে পড়েছো ?** বলিলাম হাঁ, **প্রমোশন পেয়েছ ? হাঁ, কতকগুলি নূতন বই কিনেছ ?** হাঁ, **কেন কিনলে ?** যা **কখনও পড় নাই, জান না, সম্পূর্ণ নূতন, তবে কিনলে কেন ? দেখ যিনি কিনিয়েছেন, সে দায় তাঁর, তিনি বুঝিয়ে দেবেন।**

পরদিন সন্ধ্যার পর শ্রীচরণ-প্রান্তে নিয়মিত পাঠের সেবক উপস্থিত হইতেই শ্রীগুরুদেব বলিলেন, **আজ কি পাঠ হবে, কীর্ত্তন-পাঠ কি বাকী আছে ?** ( শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখের অক্ষর সমন্বিত কীর্ত্তন ছোট ছোট পুস্তিকাকারে বাঁধান আছে, তাই আস্বাদন করা হয় ) সেবক উত্তর করিল—না, কীর্ত্তন পাঠ শেষ হইয়াছে, তা শুনে এক ভক্ত বলিল, কীর্ত্তন শেষ হইয়াছে এ আবার কেমন কথা ? শ্রীগুরুদেব একটু শ্লেষ করে বলিলেন, **এটা আর বুঝলে না ? তার মানে ও সব কীর্ত্তন পুরোণো হয়ে গেছে, বার বার শুনলে পুরোণো হয়ে যায়।** ( দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে ) **যে জিনিষ নিত্যনূতন, নব নব আস্বাদন দান করে তাই আজ এদের হাতে পড়ে পুরোণো হয়ে গেছে, কই ডাল ভাত রোজ খাচ্ছিস, সেটা তোদের কাছে পুরোণো হয় না ?** যাহা হউক পাঠের পর খুব গম্ভীর, আর কোন প্রসঙ্গ হইল না। সকল ভক্তবৃন্দ চলিয়া গেলেন।

এমন সময় তালতলা নিবাসী শ্রীজীবন কৃষ্ণ ব্রহ্মচারীর শিষ্য শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত শ্রীধামবৃন্দাবন হইতে শ্রীমহাপ্রসাদ লইয়া উপস্থিত হইতেই শ্রীগুরুদেব ত্রস্ততার সহিত করজোড়ে উঠিয়া শ্রীমহাপ্রসাদের যথোচিত মর্য্যাদা ও দণ্ডবৎ প্রণামাদি করিয়া এক ভক্তকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—

## করুণায় কে বাঁধা ?

**সেদিন তুমি বলছিলে না ? এ জাতীয় কৃপায় লাভ কি ? তোমার লাভালাভের বোধ কি তোমার আছে ? তোমার ভাল-মন্দর জন্য কি তুমি চিন্তা কর, না চেষ্টা কর, তুমি ত তোমার বিষয়ে উদাসীন ও নিষ্ক্রিয় ; কথায় বলে না, গরজ বড় বালাই ; এই দেখ মা ব্রজে নিয়ে যাওয়ার জন্য কত চেষ্টা করেও যখন নিতে পারলে না, অবশেষে স্বয়ং এসে হাজির। ওগো যে তোমায় নিয়েছে, সে তোমায় ছাড়বে কেন ? অতএব কৃপা করে যারা আসেন, যত্ন করে রেখো, তার নিজের গরজেই সব বুঝাইয়া দিবে।**

এখন এখানে একটা লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, শ্রীমহাপ্রসাদের আগমনে সাক্ষাৎ বুদ্ধি এবং তদোচিত মর্য্যাদা-দানে ও সাক্ষাৎ দর্শনানন্দের অনুভূতি ও ভোগ-হেতু শ্রীঅঙ্গে সাত্ত্বিক বিকারাদির বিকাশ, ইহা কলিহত নরাধমকে কৃপামূলে শিক্ষা দিবার জন্য স্বয়ং আচরণ করিয়া বহুবার দেখাইয়াছেন এবং দেখাইতেছেন।

একদিন প্রসঙ্গক্রমে এক ভক্ত শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণে নিবেদন করিল—শ্রীরামচন্দ্র খাঁ শ্রীশ্রীনিতাই পদে অপরাধী নয়, কারণ নিতাই অদোষ দরশী এবং পতিতের বন্ধু ; খাঁ-মহাশয় শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ বিগ্রহকে অমর্য্যাদা করায় তিনি শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণে অপরাধী, তাঁর ইচ্ছা হইলে পরিবর্ত্তন সম্ভব।

শ্রীগুরুদেব—সব কথা শুনিয়া বলিলেন,—

**এ সব নজর থাক্‌লে ত অপরাধ ভয়ে আর কাছে আস্‌বে কি করে।**

ভয়ে ভয়ে ভক্ত নিবেদন করিল—তা না হয় সবই ঠিক ; কিন্তু সাধারণ-দর্শনে খাঁ-মহাশয় শ্রীশ্রীনিতাই-পদে অপরাধী বলেই ত জগতে গায় ; শ্রীশ্রীনিতাই-চরিত্রে এ খোঁজটা থাকে কেন ? তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশ লইয়া খাঁ-মহাশয়কে উদ্ধার করিলেই ত পারিতেন ?

ভক্তের কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীগুরুদেব অভিমানে ফুলে উঠে, আবেশভরে কম্পিতস্বরে বলিলেন,—

**রামচন্দ্র খাঁ উদ্ধার হয় নাই, কিম্বা হবে না—ইহা তুমি কোন সাহসে বল ? তোমার দর্শন ত জড়ীয় ও সীমাবদ্ধ, তুমি দেখতে পেলে না বলে, রামচন্দ্র খাঁ বঞ্চিত বলতে হবে ? তাহলে, শ্রীনিতাই দর্শনের ফল কি বিফল ? শ্রীনিতাই-লীলা নিত্য নয় ? সে লীলা কি হয়ে গেছে ? তা কি এখন হচ্ছে না ? "অদ্যাপিও সেই লীলা করে গোরারায়" একথা কি মিথ্যা ? শ্রীনিতাই ছেড়ে কোন লীলা হয় ? তার দরকার অনুযায়ী উদ্ধার করেছেন কি করিবেন।**

**দেখ ওদের গ্রহণ ও বর্জ্জন দুইই বিশেষ রহস্যমূলক, সবই কৃপাভিনয়। এই দেখ না ছোট হরিদাস বর্জ্জন, এটী কি বর্জ্জন না গ্রহণ ? জগৎকে দেখাইলেন সাক্ষাৎ স্বরূপে সেও আমার সেবক বটেই, অশরীরী কিম্বা যে কোন অবস্থাতেই তারা আমার নিত্য সেবক। যাহা বুঝিতে না পার তজ্জন্য তোমার মনটাকে তাঁর শ্রীচরণে ফেলে রেখো, সব ঠিক করে দিবেন।**

১৪ই কার্ত্তিক, ১৩৫৭ সাল।

সেদিন শ্রীশ্রীনরোত্তমঠাকুর মহাশয়ের সূচক-কীর্ত্তনে শ্রীযুক্ত-চৈতন্যপ্রভু প্রমুখ অনেক গোস্বামী ও মহান্তগণ উপস্থিত হইয়াছেন। কীর্ত্তনে আনন্দ-উচ্ছ্বাস ও ভোগের প্রাচুর্য্য ভাষায় প্রকাশ অসম্ভব—"ভাগ্যবান শ্রোতৃবৃন্দ আনন্দ-পাথরে ডুবিয়া গিয়াছেন।" কীর্ত্তনে শ্রীগুরুদেবের আবেশ উক্তিতে ভোগসম্পদরূপ যে মহাদান তাহা এই, পুণ্যভূমি শ্রীখেতরিধামে পূর্ব্বাপর সমস্ত লীলার প্রকটাপ্রকট যাবতীয় পরিকর লইয়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীঠাকুর মহাশয়ের কীর্ত্তনে নৃত্য করিলেন; যাহা অন্য কোন লীলায় অন্য কোন ধামে হয় নাই, যে প্রভু স্বয়ং যেখানে বিহার করেন পূর্ব্বলীলার ধাম সকলও সেখানে আসিয়া মিলিত হন, অতএব, শ্রীনদীয়া, নীলাচল ও বৃন্দাবনধাম শ্রীখেতরিধামে মিলিত হওয়ায়, শ্রীখেতরি তিন ধামের সমন্বয় ও সর্ব্বোপরি ধাম, এ কথা শাস্ত্র ও লীলানুরোধে সত্য।

আর একটী দান এই; আজও নাকি শ্রীখেতরি সিংহাসনে প্রেমভক্তি-মহারাজ শ্রীঠাকুর মহাশয় স্বমন্ত্রী-পরিকর বেষ্টিত হইয়া বিরাজমান। আর একটী দান হইতেছে যে, ব্রজধামে যাওয়ার ও লীলা ভোগের অধিকার আমাদের নাই, সবই কৃপা ক'রে এখানেই ভোগ করান।

পরদিন সন্ধ্যার পর এক ভক্ত শ্রীপাদপদ্মের করুণায় ভরসা করিয়া অভয়পদে নিবেদন জানাইল—বাবা! গতকাল কীর্ত্তনে শ্রীমুখে শ্রীখেতরিধামের সর্ব্বোপরি প্রাধা ও মহিমা শুনিয়া মনে খুব বড় একটা ভরসা হইল; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই মনে প্রশ্ন উঠিল, বেদ-পুরাণাদিতে অনাদিকাল হইতে শ্রীনদীয়া, নীলাচল, বৃন্দাবনধামের মহিমা ও নিত্যত্ব শুনিয়া আসিতেছি; আজ যদি তাঁরা শ্রীখেতরিধামে মিলিত হইয়া ধন্য, পূর্ণ ও মাহিমান্বিত হইয়া সমন্বয় হয়, তবে কি খেতরিধামেরও সমন্বয় সম্ভব?

ব্রজধামে যাওয়া ও লীলাভোগের অধিকার আমাদের নাই এবং শ্রীখেতরিতে সিহাসনাসীন প্রেমভক্তি-মহারাজের দর্শন করার চক্ষুও নাই। আমার মনে বলে কি সমস্তধামের সমন্বয় শ্রীগুরুচরণ-তলে বসিবার অধিকার ত পাইয়াছি? যখন শ্রীগুরুদেবের হৃদয়াসীন যাবতীয় প্রকটাপ্রকট লীলা ভবোচ্ছ্বাসে তরঙ্গায়িত হইয়া বুক ছাপাইয়া মুখে ফুটিয়া উঠে, তখন ত আমরা তার আভাস দেখিতে পাই, তাতে ত আমরা বঞ্চিত নই। আচ্ছা বাবা এটা সত্যি?

সব কথা শুনে করুণা-বিগ্রহ শ্রীগুরুদেব আদর ও স্নেহমাখা বাক্যে বলিলেন—

দেখ কৃপার দান, শাস্ত্র ও যার তার সঙ্গে মিলাতে যেও না, ও আলোচনা করো না, শাস্ত্র ওসব দানের খবরই দেয় না। যাহা পেয়েছ উহা উপরালার অমূল্য দান, খুব যত্ন করে ধরে রেখো, সে আরও দেবে, শেষে ঢেলে দেবে।।

একদিন ভিক্ষা করিয়া সবাই আশ্রমে ফিরিয়া আসিলে, শ্রীগুরুদেব জিজ্ঞসা করিলেন কি ভিক্ষা করলে ? সেবকগণ সবাই নীরব। তখন শ্রীগুরুদেব বলিলেন,—

দেখ, শ্রীকৃষ্ণ-বিমুখ হইয়া এইরূপে কত জন্ম যে ঘুরে বেড়ান হচ্ছে তার ত ঠিক ঠিকানা নাই, তাই জন্মে জন্মে স্থাবর জঙ্গম ইত্যাদি প্রত্যেক প্রাণীর নিকট জানা অজানা কম বেশী অপরাধী ও ঋণী, সেই অপরাধ ও ঋণমুক্ত হওয়ার একমাত্র রাস্তা প্রত্যেক দ্বারে দ্বারে উচ্চ-শ্রীহরিনাম শুনাইয়া তাদের নিকট "ক্ষমা ভিক্ষা চাওয়া," তোমাদের দাদা মহাশয়ের ইহাই অপরাধ ও ঋণ পরিশোধের হিসাব ছিল।

একবার শ্রীশ্রীপুরীধামে ঝাঁজপীটা-মঠে শ্রীশ্রীরথযাত্রার সময় শ্রীল বাবাজী মহারাজ শ্রীশ্রীচিত্রপট, শ্রীশ্রীচরিতামৃত ও শ্রীশ্রীমহাপ্রসাদ প্রসঙ্গে বলেন—

মহদনুভবই সর্ব্বাপেক্ষা প্রকৃষ্ট প্রমাণ। চিত্রপট বাদ দিলে লীলা থাকে না। লীলার সূত্রপাতই চিত্রপট দিয়ে। চরণামৃতে আমাদের বিশ্বাস নেই। তাই আমাদের অসুখ কর্‌লে 'ডাক্ তারে' না ব'লে 'ডাক্তার' ডাক্‌তে বলি। মহাপ্রসাদ চিন্ময়। এ স্পর্শদোষে কখনও দুষ্ট হয় না। শ্রীকৃষ্ণে যা কিছু নিবেদন করা যায় তাই মহাপ্রসাদ ব'লে অবিচারে গ্রহণ করতে হবে। যখন এইভাব স্বাভাবিকতায় দাঁড়াবে তখন ভক্তিরাণী আপনি আস্‌বেন। মহাপ্রসাদ যে অবিচারে গ্রহণ কর্‌তে হয়—এরই নিদর্শন দেখাবার জন্য এই শ্রীশ্রীপুরীধামে অবিচারে মহাপ্রসাদ গ্রহণের ব্যবস্থা। এর অর্থ এই নয় যে, শুধু এখানেই এরূপ কর্‌তে হয়, অন্যত্র নয়।

কোনও নিশ্চিত বস্তুর সম্বন্ধে যদি কোনও স্বার্থপর প্রভাববান্ ব্যক্তি বিরোধিতা করেন তবে সে স্থলে বুদ্ধিমান্ ও নিষ্ঠাবান্ সাধক কিরূপ পন্থা অবলম্বন করেন এই সম্বন্ধে একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত দিয়ে বাবা বলিলেন—

শ্রীধাম নবদ্বীপবাসী কোনও এক মহাপুরুষ সর্ব্বদা কাছে ধামের একখণ্ড মৃত্তিকা রাখ্‌তেন্। কেউ জিজ্ঞাসা কর্‌লে বল্‌তেন—যদি কেউ আমাকে জোর ক'রে ধামছাড়া ক'রে মায়াপুরে নিয়ে যায়, তবে কি আমি সত্যই ধাম ছাড়া হব ? ধামের মৃত্তিকা যেখানে ধামও সেখানে।

শ্রীধাম পুরীতে শ্রীশ্রীরথযাত্রায় কত দেশ খেকে কত ভক্ত 'রথে বামন' দর্শন কর্‌তে আসেন। কথা আছে 'রথে চ বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে।' অর্থাৎ রথে শ্রীশ্রীজগন্নাথকে দেখলে আর পুনর্জন্ম হয় না। এই প্রসঙ্গে একজন জিজ্ঞাসা কর্‌লেন্ যে এই

জনসমুদ্র রথে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেখে নিশ্চয় মুক্তিলাভ করবে। আর বছর বছর লক্ষ লোক তা হ'লে এইভাবে মুক্তি পাচ্ছে। এর উত্তরে বাবা গম্ভীরভাব ধারণ করে কিছুক্ষণ পরে ঈষৎ স্মিতবদনে বললেন,—

ওসব কথার অনেক নিগূঢ় অর্থ আছে। যদি তোমার বিশ্বাস হ'য়ে থাকে, তা হ'লে পুনর্জন্ম হবে না। কিন্তু পুনর্জন্ম হবে কি না তার জন্য এত ব্যস্ত কেন? কর্ম্মফল কি ভুললে চলবে? আমার কথা এই যে পুনর্জন্ম হ'ক বা না হ'ক, সব সময় বলবে—"করম-বিপাকে গতাগতি পুনঃ পুনঃ, মতি রহু তুয়া পরসঙ্গে।"

---

সন ১৩৫৭ সাল, ৬ই অগ্রহায়ণ।

শ্রীগুরুদেব ছেলেদের লক্ষ্য করে শ্রীপাদ-বড়-বাবাজী-মহারাজের শ্রীমুখের মহাবাক্য অবলম্বনে বলিতেছেন—

যদি কেউ বৈষ্ণব বুদ্ধিতে নিমন্ত্রণ করেন সে নিমন্ত্রণ-গ্রহণে নিজেকে বৈষ্ণব কক্ষায় পড়তে হয়, উৎসবান্তে বৈষ্ণব-সেবার অবশেষে ফেলা পাতা হ'তে বৈষ্ণব-উচ্ছিষ্ট-কণা গ্রহণ ক'রে ধন্য হবে। কেউ যদি বলেন "আজ আমার বাড়ীতে ঠাকুরদের ভোগ হবে, তোমরা ভাই সবাই প্রসাদ পাবে।" এরূপ স্থলে যেতে দোষ নাই!

পরে দুঃখ করে বলিলেন—

আজকাল সবাই বৈষ্ণব সাজতে চায়, বৈষ্ণবতা, বৈষ্ণবের আচরণ, সমস্তই লোপ পেতে বসেছে, আর বেশী কি বলব (একজন বিশিষ্টের নাম উল্লেখ করে) অমুককে আমি নিজের কাণে বলতে শুনেছি যে, কেন? আমরা কি বৈষ্ণব নই, আমরা অমুকের শিষ্য প্রশিষ্য।

পরে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে অতি দুঃখে বলিলেন—

বাবাজী মহাশয়ের (বড় বাবাজী) চিঠি খানা শুধু বাঁধানই রইল, তাঁর আদেশ—"বৈষ্ণব সাজিও না, বৈষ্ণব সাজাইও না। শুধু কাঙ্গাল হইয়া কাঁদিতে থাক।" তার মানে কি বৈষ্ণব হওয়ার জন্য কান্না? তা নয়। বৈষ্ণবোচিত আচরণ করতে পারিলাম না বলে কাঁদতে থাক।

এই কথার পর এক ভক্ত প্রশ্ন করিল—আচ্ছা বাবা! আবিষ্ট অবস্থায় দাদা মহাশয়ের শ্রীমুখের উক্তি "নিত্যানন্দ দাস মুই, মুই নিত্যানন্দ" এটী কিরূপ? প্রশ্ন শুনে মনে খুব তাপ পেয়ে বেশ একটু রোষায়িত কটাক্ষে ও বিরক্তির সুরে উত্তর করিলেন—সেটা কি

তার কথা? সেত, বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের কথা। সে যদি ভিতরে ঢুকে বলায় তাতে তার কি হাত আছে? একটু থেমে সেইরূপ রাগে বলিলেন—আগেকার কথাটাই ত বল্লে, "নিত্যানন্দ দাস মুই, মুই নিত্যানন্দ" কই শেষের কথাটা ত বল্লে না, "জগৎ ভরিয়া মুই দেখি নিত্যানন্দ"। কথা বলতে হ'লে পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য রেখে, ভাল করে বুঝে তারপর কথা কইতে হয়, নতুবা দোষ পড়ে যায়।

কেহ প্রশ্ন করিল—মহাপুরুষদের সাধারণত দুইটি অবস্থা লক্ষিত হয়—একটি সহজ ও একটি আবিষ্ট। ইষ্টের গুণ-কীর্ত্তনে তদগত-প্রাণ হইয়া তন্ময়তা প্রাপ্ত হইলে সেই অবস্থায় উক্তি কি জীবের পক্ষে হিতকর নহে? শুনে বল্লেন—

দেখ সবই জানি বুঝি, বলতে কি আমার ও সব ভাল লাগে না, আমার সহজ অবস্থাই ভাল লাগে। একটু বুঝে দেখলেই ত হয়. যে নিজের গরজে তোমাদের সঙ্গে মিশে, তোমাদের মতন হয়ে তোমাদের কাছে বসে কথা কইছে, হাসি ঠাট্টা ক'রছে, তবু তাকে ভাল বাস্‌তে পারছ না? আর যদি বড় রকমের কিছু হয়ে আসে, তা হলে কি তার কাছে ঘেঁস্‌তে পারবে? আবেশে কি না হয়? তবে আবেশের কথা সাধারণের গ্রহণ যোগ্য নয়, নইলে আবেশ ছুটে গেলে প্রভু স্বয়ং (শ্রীমন্মহাপ্রভু) কেন বল্‌তেন—"আমি প্রকৃতিস্থ ছিলাম না। কি বলতে কি বলেছি। এ পাগলের কথায় তোমরা (এখানে সাধারণকে লক্ষ্য করে) কিছু মনে কোরো না।" তার মানে, ও তোমাদের মনে করবার অর্থাৎ ভাববার জিনিষ নয়। আসল কথা কি জান? পাগলের কথা পাগলেই বুঝবে। এটা বুঝতে কি কিছু শক্ত? বড় ভেবে সুখ নাই, মেলামেশা হয় না, ভালবাসা হয় না, সবই বাধ বাধ ঠেকে, বলেই বলছেন— এই দেখ না "চরিত সুধায়" ত পড়েছ, শ্যাম দাদা একদিন বড় কিছু দেখবার আশা প্রকাশ করায় বড় কর্ত্তা (বড় বাবাজী) একটু মুচকি হেসে বলেছিলেন—"সে যদি বড় হয়ে এখন তোর কাছে আসে তবে তুই কি করবি? এই ত ছোট হয়ে কাছে এসে কান-মলা-মলি করে চলে যাচ্ছে, কই তাকে ধরতে পারছিস?"

আবার বল্‌লেন—

এই দেখ, নবদ্বীপ দাদার মত অমন অন্তরঙ্গ ত আর কেউ ছিল না। সেও যেই বড় দেখতে গেল অমনি তাকে দূরে সরিয়ে দিলেন। বড় দেখার আধার জীবের কম, উহাতে প্রায় অসুবিধাই হয়।

২৪শে অগ্রহায়ণ, ১৩৫৭ সাল।

## অক্ষরময়ী কৃপা

সন্ধ্যার পর নিয়মিত গ্রন্থপাঠ আরম্ভ হইয়াছে, শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর অষ্টোত্তর শতনাম পাঠের পর শ্রীপাদ বাবাজী মহারাজ বলিলেন,—

'দেখ এই প্রত্যেকটি নাম তার স্বরূপ ও তত্ত্ব ব'লে দেয়, এই 'শ্রীনিত্যানন্দ' নামেই বলে আনন্দের নিত্যত্ব যেখানে সেই নিত্যানন্দ। আবার এদিকেও দেখ 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' নামের অক্ষরেই বলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য কি বস্তু? শ্রী আর কৃষ্ণ (রাধাকৃষ্ণ) এক হলেই চৈতন্য, তাই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য; প্রভুপাদ প্রাণগোপাল গোস্বামীর এদিকে ভারি লক্ষ্য ছিল. প্রভু বলতেন ষড়গোস্বামীর অক্ষরের প্রতি যার লক্ষ্য নাই, অক্ষর তাকে কখনও কৃপা করবেন না, আর অক্ষর যাকে কৃপা করেন, তাকে নিজস্বরূপ দেখিয়ে আনন্দের সাগরে ডুবিয়ে দেন। এই অক্ষরের কৃপা অবশ্য শ্রীবৈষ্ণব-কৃপা সাপেক্ষ। তাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী "যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।"

## প্রভুপাদের প্রতি বৈষ্ণব কৃপা

শ্রীপাদ বাবাজী মহারাজ বলিলেন,—

প্রভুপাদ (শ্রীযুক্ত প্রাণ-গোপাল গোস্বামী) কিন্তু এ বিষয়ে খুব অকপট ছিলেন, তিনি ব্যাসাসনে বসিয়া সভার মধ্যেই বলতেন, আমি কাব্য মোটেই পড়ি নাই, ব্যাকরণও ভাল জানি না; কেবলমাত্র বৈষ্ণব (শ্রীবৃন্দাবন বাসী পূজ্যপাদ মাধব দাস বাবাজী, রাজর্ষি বনমালী রায় বাহাদুর ও শ্রীযুক্ত কামিনীবাবু) কৃপায় আজ আমি আপনাদের নিকট পাঠক।

## পদ পদার্থ বিধি

একবার প্রসঙ্গ পেলে ত বাবার অন্যদিকে খেয়াল থাকে না, বাবা আবার বলিলেন,—একটা কথা আছে না? পদেই পদার্থ? এ কথার অর্থ শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের লীলাসম্বন্ধীয় মহাজনদের রচিত যে সমস্ত পদাবলী আছে, লক্ষ্য করিয়া দেখিলে তাহাতেই (ঐ পদেই) যাবতীয় লীলাপদার্থ বর্ত্তমান, এ কথায় কোন সন্দেহ নাই, বৈষ্ণব সমাজে ভোগীদলের ইহা সার্ব্বজনীন দৃষ্টিভোগ। 'পদেই পদার্থ' শব্দে ইহাই প্রাণের ভোগ, শ্রীগুরুপদে যার দৃষ্টি বাঁধা পড়িয়াছে পদার্থময় জগৎ তার সন্মুখে উন্মুক্ত।

আবার করুণা করিয়া বলছেন,—

## শব্দ-ব্রহ্মের প্রকট স্বরূপ

কত কথা মনে উঠ্‌ছে, দুটো একটা কি বল্‌ব? কথায় বলে না? "শব্দব্রহ্ম" শব্দ মাত্রই ব্রহ্ম, একটু চিন্তা ক'রে দেখ্‌লে তার কৃপায় বুঝ্‌তে বাকী থাকে না। প্রত্যেক নামের সঙ্গে তার স্বরূপ ও সম্বন্ধ জড়িত। শব্দ ব'লে দেয় তার স্বরূপ কি ও সম্বন্ধ কি! শ্রীধাম-নবদ্বীপে ত দেখেছ? ভোরে সকলে দর্শনে বেড়োয়, জিজ্ঞাসা করলে, কেও বা বলে আমি মহাপ্রভুর বাড়ী যাই; কেমন এখন দেখ শব্দই ব্রহ্ম কিনা, স্বরূপ ও সম্বন্ধ বলে কিনা? মহাপ্রভু অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যময় বিগ্রহ; সম্বন্ধ-দাস ও প্রভু।

আবার কেও বা বলে হরিসভার গৌর দেখ্‌তে যাই; তার মানে, গৌর যেন ভালবাসায় তাদেরই হয়ে গেছে, তাদের কাছে বাঁধা, এখানে গৌরের কোন স্বতন্ত্রতা নাই। তাদের নামে গৌরের পরিচয়। এখানে গৌরব, সঙ্কোচ একেবারেই নাই, শুধু ভালবাসার সম্বন্ধ। আবার যখন নিতাইয়ের বাড়ী যাই তখন বলে-কোন্ নিতাই ও কাদের নিতাই, কোন পরিচয়েরই দরকার হয় না, নিতাইকে সবাই চেনে, নিতাই সকলেরই আত্মীয়, সে যেন বিশ্ববন্ধু, তার উপর সকলেরই সমান দাবী, সম্বোধনেই বুঝা যায় নিতাই তাদের কত আপন-জন। সম্বন্ধ বোধে তাকে কত আপন করে-তা ব'লে বুঝানো যায় না। এখন বুঝ্‌লে অক্ষর ও নামে কত বড় ভোগ দেয়।

তারপর "শ্রীচরিতসুধা" পাঠ আরম্ভ হইল, সেদিন গুণসিন্ধুর উপাখ্যান পাঠশেষে শ্রীযুক্ত নন্দকাকা মহাশয়কে লক্ষ্য করিয়া বাবা জিজ্ঞাসা করিলেন, গুণসিন্ধুর প্রসঙ্গ এই গ্রন্থে দেওয়ার উদ্দেশ্য কি? এ থেকে আমাদের শিক্ষার কি আছে? কাকা ব'লিলেন, আপনি বলুন আমরা শুনি; বাবা বলিলেন, বেশ, তোমাদের কাছে আমি শুন্‌তে চাইলাম, বলেই চুপ করিলেন। পরে একদিন কথা প্রসঙ্গে কেহ বলিল—"গুণসিন্ধুর প্রসঙ্গে দাদা মহাশয়ের উদারতা ও অদোষদর্শীতার পরিচয় এবং গুণসিন্ধুর আচরণ বৈষ্ণবসেবার নিষ্ঠারূপেই গ্রহণ—" ইহাই ত আমাদের শিক্ষার বিষয়? কথা শুনিয়া বাবা বলিলেন, তাইত, একটা শিক্ষার কিছু না থাক্‌লে কি শ্রীচরিতসুধায় স্থান পেয়েছে?

কেহ প্রশ্ন করিল :—"শ্রীভগবদ্বিরহ হইতে শ্রীভক্তবিরহ তীব্র, শ্রীরামানন্দ রায় মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু আমাদের শুনাইয়াছেন। গম্ভীরায় শ্রীগৌরসুন্দরের কিশোরীভাবে ভগবদ্বিরহ-লীলা কিন্তু শ্রীঠাকুর মহাশয়ের গাম্ভীলায় তীব্র ভক্তবিরহ, যাতে শ্রীঠাকুর মহাশয়ের চিন্ময় তনু গলিয়া পদ্মায় মিশিয়া গেলেন, তবে কি গম্ভীরা গলিয়া গাম্ভীলা হইয়াছে?

উত্তর :—শুনিয়া বলিলেন-পরে বলব।

কেহ প্রশ্ন করিল :—আশ্রয়জাতীয় সুখ আস্বাদনে লোভযুক্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতী-রাধারাণীর ভাবকান্তি অঙ্গীকার করিয়া শ্রীগৌর কিশোরী হইলেন। এদিকে শ্রীমুখের কীর্ত্তনে

শুনিতে পাই—গৌর, গৌর-আস্বাদনের জন্য শ্রীনিবাসরূপে ; নিতাই নিতাই-আস্বাদনের জন্য শ্রীনরোত্তমরূপে ; এইরূপ শ্রীঅদ্বৈত শ্রীশ্যামানন্দ-রূপে······ইত্যাদি ; এটি আমি ধারণা করিতে পারি না। শ্রীগৌরমাধুর্য্য-আস্বাদনে শ্রীনিতাইসুন্দরের সুখ ও আনন্দাধিক্য দেখিয়া উহা যদি ভোগেচ্ছার উদগম হয়, তবে ত শ্রীগৌরসুন্দরই শ্রীনরোত্তমরূপে ; ঐরূপ গৌর-মাধুর্য্য-আস্বাদনে শ্রীঅদ্বৈতের সুখ ও আনন্দে লোভ হয়, তবে শ্রীগৌরসুন্দরই ঐ আশ্রয়জাতীয়-ভোগে লুব্ধ হইয়া শ্রীশ্যামানন্দ-ইত্যাদি-রূপে প্রকাশ সম্ভব? বিশেষতঃ শ্রীগৌরকৃষ্ণ ব্যতীত অন্যস্বরূপে ভোক্তাভিমান নাই, বাকী সমস্তই সেবকাভিমানী। ভোক্তা স্বরূপেই ত ভোগ-পিপাসার উদগম স্বাভাবিক। সেবক স্বরূপে (ভোগদাতা স্বরূপে) কিরূপে ভোগ-পিপাসা সম্ভব ?

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া ভাব-বিহ্বল-চিত্তে শ্রীমুখের কীর্ত্তনের অংশ "রমণী-রমণ রমণ-রমণী" এই বাণীরূপভোগ-সম্পুট উদ্‌ঘাটন করিয়া·········

উত্তর :—"রমণীই রমণে" এই যে বাবার নিজের প্রাণের খোরাক, দিবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন,—

**উপর আলার (শ্রীরামহরিদাস বাবাজী) দান, যা আজ পর্য্যন্ত বুক থেকে মুখে আসে নাই, কি জানি, কেন, কার ইচ্ছায় তোমার কাছে বেরিয়ে গেল।**

মনে হইল, "তোমার কৃপায় তোমায় করায় নিন্দ্যকর্ম্ম' অহৈতুকী কৃপাবিগ্রহবাবার এই অনুচিত দান-গ্রহণের আধার আমাদের নাই। সকলে প্রসঙ্গে আনন্দিত হইয়া রাত্র অধিক হইয়াছে দেখিয়া প্রণাম করিয়া বাহিরে আসিলেন ?

---

**৩০শে অগ্রহায়ণ, ১৩৫৭ সাল।**

সকালে একটি ভদ্রলোক শ্রীগুরুদেবের নিকট দীক্ষিত হওয়ার সদিচ্ছা লইয়া করযোড়ে প্রার্থনা জানাইতেছেন। ভদ্রলোকটীর কুলগুরুর বংশে যিনি আছেন, তাঁর কাছে ইহার দীক্ষা লইতে মন চায় না। শুনিয়া শ্রীগুরুদেব জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁরা কি আচার্য্য-সন্তান ? উত্তর হ'ল, না, শ্রীগুরুদেব পুনঃ জিজ্ঞাসিলেন, তবে তাঁরা কোন্ পরিবার ? জবাব হলো ঠাকুর মহাশয়ের ; পুনঃ বলিলেন,তবে ? তার মানে বোধ হয় "আচার্য্য" নয় কি সে? শ্রীগুরুদেব জিজ্ঞাসা করিলেন "তাহলে তাতে মন না নেওয়ার কারণ কি ?" এই বলেই অন্যকে শ্রীমুখ ফিরাইয়া বলিলেন ;—

দেখ ঝোঁকে পড়ে অনেকে এটা ক'রে, পরে তার চেয়ে বেশী বিভূতি-ব্যাপার দেখে, তখন এটা ছেড়ে সেইদিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে; এইরূপে একটার পর একটা ক'রে শেষে অনেক হয়ে পড়ে, ফলে কোনটীরই আদর থাকে না, জীবনে এমন কত দেখলাম। আজ পর্য্যন্ত শিষ্যই হতে পারলাম না, তাঁর আজ্ঞা পালন করতে পাচ্ছি না; যেটা দেখছ সেটা কি গুরুগিরি? গুরুর কক্ষায় বসিবার অধিকার আমার নাই, আমি বসিও না। তাঁকে সামনে রেখে, তাঁর আদেশে মারফৎ-দ্বারী হিসেবে—"তোমার কাজ তুমি কর, আমার কোন অধিকার নাই" ব'লে, তাঁর জিনিষ তাঁর পায়ে দিয়ে আমি খালাস।

শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখের এই অকপট দৈন্যোক্তির সত্যতামূলে শ্রীমন্মহাপ্রভু, দক্ষিণ ভ্রমন-কালীন বাসুদেব বিপ্রকে উপদেশ করিয়াছিলেন;

"যারে দেখ তারে কহ কৃষ্ণ উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হইয়া তাড় এই দেশ॥"

এই মহাবাণী শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখের বাণীর সমর্থনসূচক প্রমাণ। শ্রীগুরুদেব বলিলেন,—

তবে নবদ্বীপে যখন থাকি, তখন কিছু অনুসন্ধান নেওয়ার অবসর আমার থাকে না। তখন যা হওয়ার তা হয়ে যায়। কিন্তু যখন বাহিরে থাকি তখন সব অনুসন্ধান নিয়ে, সব কাজ করতে হয়, নতুবা কুলগুরু-কুল মনে তাপ পাবেন না? তাঁরা ত আশা করেন। জীবনে কত অনুযোগ শুনতে হয়েছে—বলেই চলে গেলেন।

শ্রীধাম নবদ্বীপে শ্রীগুরুদেবের সমাধিদর্শনে তাঁর প্রকটানুভূতিতে নিজ স্বাতন্ত্র্য ভুলিয়া শ্রীগুরুদেব আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া সব কাজ করেন তাই অনুসন্ধান নেওয়ার অবসর থাকে না।

---

২রা মাঘ, ১৩৫৭ সাল।

সন্ধ্যার পর আমাদের শিক্ষার উদ্দেশ্যে স্বধামগত শ্রীবিশ্বরূপ গোস্বামী-প্রভুর প্রিয়পাত্র কালী নামক ছেলেটীকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীগুরুদেব বলিলেন—অনেক গান ত মুখস্থ করেছ, "সাধক কণ্ঠ-মালা," পড়ছ? না, পড়বার সময় হয় না? ছেলেটী সরলভাবে বলিল সত্যই সময় পাই না, সকালে ৬॥০ টায় উঠি আর ৮॥০ টায় আফিসে যাই; শ্রীগুরুদেব বলিলেন, সন্ধ্যার পর পড়লেই হয়। তা শুনে কেহ—শ্রীচরণে নিবেদন করিল অবশ্য সাধু মহাত্মাদের কথা স্বতন্ত্র;

## ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত ও প্রকৃতির সাম্য

শ্রীগুরুদেব বলিলেন,—

তুমি সাধারণের কথা কি বলছ, প্রত্যেক সিদ্ধ মহাত্মাদের আচরণেও ত দেখা যায়। দেখ আমি যখন শ্রীধাম বৃন্দাবনে ছিলাম, তিনি ( জগদ্বন্ধু প্রভু ) সেই সময় সেখানে ছিলেন। তাঁর হিসাবই ছিল—রাত ১২টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত বিশ্রাম ; ঠিক ৪টায় যদি কেও জাগানা না পেত, হয় কুশাসনের বাড়ি, নয় করঙ্গের জল ঢেলে দিতেন। যাঁদের একটুও ভজন সাধন করার ইচ্ছা, তাঁদের সকলেরই লক্ষ্য বিশেষ ঐ ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্ত হইতে ভোর পর্য্যন্ত মূল্যবান্ সময়টী বাজে নষ্ট না হয়।

## সিদ্ধ ভগবান দাস বাবাজী-আদি বৈষ্ণব।

প্রসঙ্গক্রমে কালনার সিদ্ধ বাবজী মহারাজের নাম উল্লেখ করিয়া শ্রীগুরুদেব বলিলেন,—

একদিন কয়েকজন ব্রাহ্মণ বাবাজী-মহারাজকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন, বাবাজী-মহারাজ অমনি তাদের যথাযোগ্য মর্য্যাদা দিয়া অভ্যর্থনা করিলেন। একটু পরেই কয়েকমূর্ত্তি বৈষ্ণব উপস্থিত হতেই ঠিক পুর্ব্বের মতই যথাযোগ্য সম্মান ও অভ্যর্থনা করিলেন ; ঐ দেখে ব্রাহ্মণ যাঁরা ছিলেন, তাঁরা প্রাণে একটু ব্যথা পাইয়া বল্লেন, আচ্ছা বাবাজী-মশায়! আমরা একটা কথা বলতে চাই,শুনেই হাতযোড় ক'রে বুড়ো বলছেন,কি বাবা! বলুন। আমরা ব্রাহ্মণ আমাদের সম্মান করলেন, সেটা না হয় বুঝিলাম, কিন্তু এই বৈরাগীদের আমাদের তুল্য সম্মান দেওয়া কি আপনার উচিত হল?

তাঁদের কথা শুনে সিদ্ধ-বাবা হাতজোড় করেই বল্লেন,—

দেখুন বাবা ও-কথা বল্‌তে নাই ; আজ যে আমি আপনাদের স্নেহের ও ভালবাসার পাত্র, সে শুধু এঁদেরই কৃপায়। আজ যে আমি আপনাদের এত প্রিয় ও আদরের, সে শুধু এঁদেরই কৃপায়। আজ যে আপনারা আমাকে দর্শন দিয়া কৃতার্থ করিতেছেন, সে শুধু এঁদেরই কৃপায়। এঁদের কৃপা না হইলে, আপনাদের স্নেহ, আশীর্ব্বাদ হইতে বঞ্চিত হইতাম। এঁরা যদি ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্ত হইতে প্রত্যহ আমায় শ্রীহরিনাম না শুনাইতেন, তবে আমার কোন গতি ছিল না। এঁদেরই কৃপায় আজ আমি ভগবান দাস বাবাজী। এঁদেরই অনুগ্রহে আমি আপনাদের শ্রদ্ধার পাত্র হইয়াছি। শ্রীশ্রীহরিনামের টহল-ব্রতধারী-গৃহস্থ বৈষ্ণবই আমার আদি গুরু ; শুধু কি তাই? শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত পথ, এদের কোনরূপ কর্ম্মকাণ্ডে আবদ্ধ করেন নাই। এদের ক্রিয়াকর্ম্মের মধ্যে আবির্ভাব ও তিরোভাবে ( হ'লে ও ম'লে ) শুধু মালসা ভোগ ব্যবস্থা, আর শ্রীহরিনামের টহলই জীবন-ধারণের ব্যবস্থা হয়েছে। এদের দ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভু জগতের মহৎ উপকার সাধন করিয়াছেন।

## অমানীর প্রকটরূপ

শ্রীধামবৃন্দাবনের শ্রীসনাতন-গোস্বামী প্রভুর সমাধির মহান্তজীকে লক্ষ্য করে শ্রীগুরুদেব বলিতে চেষ্টা করিতেছেন, পুনঃ পুনঃ বাক্যস্খলিত হইতেছে ; অনেকক্ষণ পর একটু ভাব সম্বরণ করিয়া বলিলেন,—

যে সব আচরণ স্বচক্ষে দেখিয়াছি, তাহা স্মরণ করিলেও ধন্য ও কৃতার্থ হওয়া যায়। একবার মহোৎসবের শেষ ধামবাসী মেথরের পঙ্গত হইতেছে, সমস্ত পঙ্গত অপেক্ষা মেথরদের পরিবেশনে দিদির মুক্তহস্ত ও উল্লাস বেশী। খুব যত্ন ও আদরের সহিত দিদি তাদের সেবা করাইতেছেন, এদিকে সাধারণ বেশধারী কয়েকমূর্ত্তি বৈষ্ণব একপাশে দাঁড়াইয়া তাহা দর্শন করিয়া অঝোরে ঝুরিতেছেন ; হঠাৎ তাঁদের দিকে দিদির লক্ষ্য পড়িতে করজোড়ে তাঁদের জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনারা কি শ্রীমহাপ্রসাদ গ্রহণ করিবেন ? এদিকে আসুন তবে ব্যবস্থা করিয়া দিই। তাঁরা কি যে দৈন্যভরে জিজ্ঞাসা করিলেন, কোথায় দিবেন ? দিদি বলিলেন এদিকে আসুন স্বতন্ত্র জায়গায় ব্যবস্থা করিয়া দিতেছি। তদুত্তরে তাঁরা করজোড়ে নিবেদন জানাইলেন, কেন এদের সঙ্গে। বোধ হয় বৈষ্ণবের বিশেষ মহিমা প্রকাশের ইচ্ছায়, ঠাকুর দিদির মুখে ব্যবহারিক ভাষা প্রকাশ করিয়া বলিলেন, এরা মেথর, এদের সঙ্গে আপনারা কি করিয়া এক পঙ্গতে বসিবেন ? তখন দিদির কথা শুনে তাঁরা আর মুখে কোন কথা বল্‌তে পারছেন না, শুধু চোখের জলে তাঁহাদের বুক ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

একথা বলিতে গিয়া বাবারও তদ্রূপ অবস্থা, মুখে আর বাণী সরে না, শুধু চোখের জলেই যেন তাঁর বক্তব্য প্রকাশ পাইল। প্রায় বোধ হয় ১০ মিনিটকাল এইভাবে গেল। পরে বাবা বলিলেন,—

তাঁরা অতি কাতরকণ্ঠে দিদিকে জানাইলেন, যদি এদের পঙ্গতে বসিবার অধিকার দেন, তবেই শ্রীমহাপ্রসাদ-সম্মানের অধিকার পাইব এবং ভাগ্যে ঘটিবে ; নতুবা শ্রীমহাপ্রসাদ গ্রহণে আমাদের কোন অধিকার নাই। তাঁদের অবস্থা দেখিয়া শুনিয়া দিদি যেন একটু অপ্রস্তুত হইলেন, অবশেষে মেথরের পঙ্গতে বসিয়া শ্রীমহাপ্রসাদ গ্রহণ করিয়া তাঁরা চলিয়া গেলেন। এই সব আচরণ দেখার সৌভাগ্য ঘটিয়াছে।

তারপর শ্রীগুরুদেব ভাবগদগদ-কণ্ঠে সেবকের কর্ত্তব্যানুরাগের কথা বলিলেন—

## কুকুরের দৃষ্টান্তে সেবকের প্রভুনিষ্ঠা।

বৈষ্ণবতা কি মুখের কথা, সমাজের ছোটকে বড় ক'রে দেখার নাম বৈষ্ণবতা। অনেক মহৎ চরিত্রে দেখা ও শুনা যায়—কুকুরকে তারা বড় আদর ও স্নেহ করেন, তার কারণ, কুকুরের

প্রভুভক্ত-গুণটী তারা দেখ্‌তে পান। প্রভুর সেবা ক'রে কুকুরের খুব আনন্দ, সর্ব্বদা প্রভুর কৃপা ও মুখাপেক্ষী। প্রভুর ইঙ্গিৎ পাইলে তাঁর হুকুম পালনে কুকুরের আনন্দ আর ধরে না, প্রভু রাগ ক'রে শাসন করিলে, অমনি ভয়ে জড়সড় হইয়া একটু দূরে থাকিয়া প্রভুর করুণা-কটাক্ষের আশায় প্রভুর মুখের দিকে কাতর-প্রাণে চাহিয়া থাকে, একটু ইঙ্গিত পাইলেই লেজ নাড়িতে নাড়িতে চরণতলে পড়িয়া কৃতজ্ঞতা জানায়।

শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখে কুকুরের দৃষ্টান্তে সেবকের প্রভু-নিষ্ঠার বাণী ও বৈষ্ণবতা-শ্রবণে সকলে পরমানন্দে প্রণাম করিয়া বাহিরে আসিলেন।

---

পোস্তা রাজবাটী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৮ সাল।

আজ অতি প্রত্যুষে ভক্তবৃন্দ উপস্থিত হইয়াছেন। ভাবলুব্ধ ভোগদাতা শ্রীগুরুদেব মালা করিতে করিতে এক একবার আবিষ্ট হইতেছেন আবার সহজ ব্যবহার রীতিতে নানা প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়া কৃপা-প্রাপ্তির কথা বলিলেন—

## আমির অবসান ও কৃপা

"সনাতন কহে প্রভু! কৃপা হবে কবে। প্রভু কহে সনাতন! আমি মরি যবে॥" কৃপার বাধা ত ঐখানে, তাঁর কৃপা তো সর্ব্বদাই আসছে। খেতে, শুতে, বস্‌তে সর্ব্বদাই তাঁহার কৃপা। জীবের এই দেহে কি কর্‌তে পারে? সব তৈরী, বাস, একটুতেই সব উল্টে পাল্টে গেল। কোত্থেকে আমি এনে দিলে রাগ, সব গেল, ও হ'লো আমির খেলা গো আমির খেলা!! এরাজ্যে এস, সেখানেও দেখ্‌বে আমিই সবেতেই বাধা দিচ্ছে। নাম করাচ্ছেন, এল যশ, প্রতিষ্ঠা, অম্নি আমি দিলে ঠেলে, আমির ঠাঁই কোথাও নাই।

বলিয়াই এদিক্ ওদিক্ একবার চাহিলেন, যেন নিজের আচরণ আর নিজের স্বরূপ, অনুগতজনকে অনুশীলন করিতে বলিলেন। এই সময় কেহ প্রশ্ন করিল, বাবা! বিষয়ের মধ্যে থাকৃলে আমি মরে কি করিয়া?

কথাগুলি শুনিয়া বাবা সহজ জবাবেই বলিলেন,—

## ভগবদ্বিস্মৃতির জন্মক্ষেত্র

ও সব আমির পরিণামে কি লাভ হয়? সব ত অজ্ঞানতা। যেখানে আমি সেখানেই বিস্মৃতি, বিস্মৃতি এলেই ভয়। দ্বিতীয়েতে অভিনিবেশই ত ভয়; আমি যেখানে ভয় সেখানে, কাজেই বহির্ম্মুখতার ঐ হ'লো জন্মক্ষেত্র।

বাবার কথাগুলি শুনিয়া সকলেই গম্ভীর হইলেন। আবার প্রশ্ন হইল—বাবা! গৃহীতে ও ত্যাগীতে তফাত্ কি? বাবা সরল হাসিমুখে বলিলেন—

## সংসারী ও ত্যাগী

হুঁ, ত্যাগীরা তাঁকে আশ্রয় ক'রে সব করে, আবার তাঁর জন্য সব ছাড়তে পারে। গৃহীরা ঠিক উল্‌টো; তাঁকে ছেড়ে সংসার করে, আবার সংসারের জন্য তাঁকে ছাড়তে পারে।

বলিয়া আবার বলিলেন,—

বৈষ্ণব-বন্দনা পড়েছ তো? তাঁদের (গৌরগণের) মধ্যে ত্যাগী কে? অধিকাংশই ত গৃহী। কিন্তু তাঁহারা কৃষ্ণ-সম্বন্ধ-যুক্ত, আর ইহারা কৃষ্ণ-সম্বন্ধ-শূণ্য।

গৌরগণ সদা কৃষ্ণ-সম্বন্ধ-যুক্ত হইয়াই গৃহী; তাহারা কেবল গৌরের সুখের লাগি গৃহী হইয়া ও সর্ব্ব ত্যাগী। এইভাবে গৌরগণের কথা বলিয়াই শ্রীগুরুদেবের কণ্ঠস্বর রোধ হইল, চক্ষু জলভারাক্রান্ত, দেহ পুলকাবলি-নিচিত; কোন্ আবেশে বিভোর হইয়া শ্রীগুরুদেব কি যে ভোগ করিলেন আমাদের ধারণাতীত। কিন্তু যে কথাগুলি ব'লিলেন সেগুলির পরিপূর্ণ বিকাশ নিজের আচরণেই প্রত্যক্ষ করাইলেন; এই মাত্র অনুভব হইল। তখন মালা জপের মাত্রা মন্দীভূত হইতে লাগিল; চক্ষু দুইটি আরক্তিম হইয়া উঠিল, মনে হয় যেন জমাট অনুরাগই আঁখির শরণাগতি লাভ করিয়াছে। কিয়ৎকাল পরে কেহ বলিলেন,—বাবা! সত্যঘোষ নাকি খুব কমিউনিষ্ট হ'য়েছে। সে নাকি আগের ভাবধারা সব ছেড়ে ফেলে বল্‌তে সুরু করেছে—ভগবান টগবান নাই, ওসব হরিনাম টরিনাম বাজে···শুনিয়াই বাবা একটু করুণার হাসি হাসিয়া শ্রীগুরু-কৃপা-শক্তির কত বল তাহা দেখাইতে লগিলেন—

## জীবনের অন্তিম কোথায়

হাঁ মাসী তোরি কথাই সত্যি,—তুলসীতলা আর হরিবোল। একটী গল্প শোন। একটী ছেলের ছিল সংসারে কেবল এক মাসী। মাসী বৃদ্ধা হ'য়েছিলেন। তিনি সকাল থেকে ঐ তুলসীতলা আর হরিবোল নিয়ে থাক্‌তেন। ছেলে বড় হ'লো, লেখা-পড়া শিখ্‌লে, উপার্জ্জনশীল হ'লো. তারপর বে-থা কর্‌ল। তখনও দেখে মাসী কেবল তুলসীতলা আর হরিবোল নিয়ে থাকেন। তার এ সব ভাল লাগে না। কালক্রমে

দুটী একটী সন্তান হ'তে সংসার বেশ বড় হ'লো। নানা দেশ বিদেশ ঘুরলো, হঠাৎ পত্নীটী গেল মারা। তারপর ছেলেপিলেও একটি ক'রে খস্‌তে সুরু হ'লো, মনের ভাব বদলে গেল। তখন মাসীকে ডেকে বল্‌ল, মাসী! অনেক ক'র্‌লাম, অনেক দেখ্‌লাম, বুঝ্‌লাম তোর কথাই সত্যি,—তুলসীতলা আর হরিবোল।

যার ছোঁয়া লেগেছে সে ত আর ছেলেখেলা নয়। কিছু করুক্ আর নাই করুক্ শেষটায় ঐ তুলসীতলা আর হরিবোলই সার হবে।

"ভয় কি আছে পতিত ভাই—পতিতের তরে আছে (শ্রীগুরু) নিতাই।" এইরূপ পতিতের প্রতি পতিতপাবনের কৃপার আশ্বাস-বাণী শ্রবণ করিয়া ভ্রাতৃবৃন্দের মনে আনন্দ আর ধরে না। কেহ কেহ উঠিবার উপক্রম করিয়াছেন দেখিয়া আবার কথা-প্রসঙ্গে বাবা সৎসঙ্গের কথাই বলিলেন,—

## সৎসঙ্গের বিশ্লেষণ

শচ্চীদানন্দস্বামী চারুকে একদিন ব'লেছিলেন, তুমি কি কার' সঙ্গ কর? চারু (ইঁনি আমাদের অন্যতম জ্যেষ্ঠ গুরুভ্রাতা ছিলেন। শ্রীগুরুনিষ্ঠার আদর্শ মূর্ত্তি। ইঁহার সাহচর্য্যে কলিকাতাবাসী অনেকেই শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণ-সান্নিধ্য-লাভের সুযোগ পাইয়াছিলেন।) বলেছিল শ্রীযুক্ত বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গ করি। তখন স্বামীজী বলিলেন—তুমি কি বল্‌লে, বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গ কর? চারু ভয়ে ভয়ে বলিল, আজ্ঞে সঙ্গ করি না, তবে তাঁর কাছে যাতায়াত করি। স্বামীজী বল্‌লেন, হ্যাঁ তাই বল। সঙ্গ করা অত সোজা নয়, বল যে যাতায়াত করি। বুঝ্‌লে?

শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখ-নিঃসৃত প্রাণ-স্পর্শী কথাগুলি উপস্থিত ভক্তমণ্ডলীর প্রাণে বৈদ্যুতিক শক্তির স্পর্শ আনিল। সকলের মনে হইল লবমাত্র সঙ্গে করিলেই ইষ্টসিদ্ধি হয়। আমরা কাছেই আসি, প্রকৃত সঙ্গ-ত আমাদের হয় না, হ'লে কল্পতরুর কৃপা বুঝ্‌তাম। কেন না, কল্পতরুর কৃপা অনুকূলেও হইতেছে, হইবেও। সেবকবৃন্দ উঠিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন, মনের বাসনা, যাবার সময় বাবার হাসিমুখ খানি দেখিয়া যাইব। এমন সময় বাবা সকলের অবস্থা দেখিয়াই একটী প্রসঙ্গ তুলিলেন,—

## জাত বাঁচানর ফাঁকি

একবার নবদ্বীপে ব্রাহ্মণ-সভায় কোন ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তুমি কি ওদের হাতে খাও? সে কি বল্লে জান? না, আমি আমার নিজের হাতেই খাই। বুঝ্‌লে ফাঁকি দিয়ে কেমন জাত বাঁচানর ফন্দী।

স্নিগ্ধোজ্জ্বল হাসিমাখা বাবার প্রসন্ন বদন দেখিয়া সকলের বুক ভরিয়া গেল। প্রণাম করিয়া সকলে বাহিরে আসিলেন।

পোস্তা-রাজবাটী ২৩শে অগ্রহায়ণ, ১৩৫৮ সাল।

নিত্যদর্শন প্রার্থী একভক্ত অতি প্রত্যুষে শ্রীগুরুদেবের নিকট "নিতাই গৌর-লীলা" রহস্য জানিতে উৎসুক হইয়া আগমন করিয়াছেন। শ্রীগুরুদেব তাহার অভিপ্রায় উপলব্ধি করিয়া কথা বলিতে অনুমতি দিলেন—

ভক্ত—শ্রীকীর্ত্তন মুখে বহুবার শুনিয়াছি, নাম করিতে করিতে হৃদয়ে নামীর উদয় হয়, আরও শুনিয়াছি "নিতাই! নিতাই! বল্‌তে শুনতে হৃদয়ে গৌর উদয় হয়।" আবার শ্রীমুখে ইহাও শুনিয়াছি—"শ্রীনাম-নামী" অভিন্ন। যদি নাম ও নামী অভিন্ন হয়, তাহলে নিতাইকে ডাকিলে হৃদয়ে গৌর আসিবে এ যে বিপরীত?

শ্রীগুরুদেব মৃদু হাসিয়া বলিলেন—

**শুনেছ তো! ভুলেছ বলেই গোল, আবার শোন! সৎস্বরূপ শ্রীনিত্যানন্দ, নিতাইয়ের সত্বায় জগতের সত্বা, নিতাই উপাদানে গৌর গঠিত। গোরা-রসে গঠিত নিতাই কলেবর। ওগো কাউকে ছেড়ে কেউ নয়, "সর্ব্বোপরি তত্ত্ব নিতাই, গৌরাঙ্গ স্বরূপ। রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ।" আসল কথা ব্রজের বিষয়-আশ্রয় তত্ত্বের বিবর্ত্ত শ্রীগৌরাঙ্গ-স্বরূপ, আবার তাহার বিবর্ত্ত শ্রীনিত্যানন্দ-স্বরূপ।**

ভক্ত—সর্ব্বোপরি-তত্ত্ব নিতাই-গৌরাঙ্গ স্বরূপ, ইহাতে কি বুঝিব, তত্ত্ব বলিতে একমাত্র নিতাই তত্ত্ব? কারণ নিতাইয়ের সত্বায় জগতের সত্বা, তাহলে দুইটি বিগ্রহই নিতাই তত্ত্ব? নিতাই স্বরূপে নিতাই, আর গৌররূপে নিতাই এবং "গৌরাঙ্গ স্বরূপ" এই স্বরূপ শব্দে কি ইহাই বুঝিবে যে, স্বরূপে সবই গৌরাঙ্গ? লীলা পুষ্টির জন্য বাহিরে পৃথক পৃথক রূপ?

তাহা হইলে আমরা ইহাই বুঝিব কি! গৌরস্বরূপে গৌর, নিতাইস্বরূপে গৌর, শুধু তাহাই নহে, গৌর জড়িত নিতাই, আর নিতাই জড়িত গৌর?

শ্রীগুরুদেব বলিলেন—

**শ্রীগুরুদেব বলিলেন—হাঁ গো হাঁ, তাই বটে, কথা কি জান! পরস্পর সুখের জন্য যার যখন যেমন প্রয়োজন সে তখন তেমনি হয়। তত্ত্ব বিচারের দৃষ্টিতে এই প্রেম-বিলাস-বিবর্ত্ত বোঝা যায় না, সে দৃষ্টতে দেখতে গেলে গোলে পড়তে হয়। শ্রীগুরু কৃপায় অন্তরে প্রেরণা হলে তবেই শ্রীনিতাই-গৌর-স্বরূপ-রহস্য উপলব্ধি হয়। রায় রামানন্দ বলেছেন "রাধাকৃষ্ণ লীলা হয় অতি গূঢ়তর।" রাধাকৃষ্ণ লীলা গূঢ়তর সুতরাং রাধাকৃষ্ণ-মিলিত-গৌর-লীলা গূঢ়তম। শ্রীনিতাই-স্বরূপের লীলা আবার গূঢ়তমেরও গূঢ়তম। অতিগূঢ় নিত্যানন্দ এই অবতারে।**

ভক্ত—শ্রীগৌর-লীলার মুখ্য উদ্দেশ্য অনর্পিত প্রেম বিতরণ দ্বারা রাই ঋণ-পরিশোধের প্রচেষ্টায় রাধাপ্রেম ও স্বমাধুর্য্য আস্বাদন ? কিন্তু লীলায় দেখ্‌তে পাই শ্রীগৌর সুন্দর গম্ভীরা-বাসী ( সন্ন্যাসের পর ) হওয়ার পর প্রেম-নাম বিতরণের দ্বারা শ্রীরাধার প্রেমঋণ পরিশোধের ভার শ্রীনিতাই চাঁদের উপর পড়িল ? এ কেমন হ'ল ?

শ্রীগুরুদেব বলিলেন—

সেই কথাইত হচ্ছে ! নিজকে আস্বাদনের ইচ্ছায় তাঁদের অভিন্ন তনু দ্বিতীয় স্বরূপের প্রকাশ। ব্রজলীলায় তাঁহার দ্বিতীয় প্রকাশ শ্রীরাধারাণী এবং নদীয়া লীলায় তাঁহার দ্বিতীয় প্রকাশ শ্রীনিতাই চাঁদ। কবিরাজ বলেছেন—"রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি। অন্যোন্যে বিলসে রস আস্বাদন করি॥ সেই দুই এক এবে চৈতন্য গোসাঞি। রস আস্বাদিতে দুঁহে হৈলা এক ঠাঁই॥" ঠাকুর লোচন দাস বলেছেন—"অভিন্ন চৈতন্য বন্দো ঠাকুর অবধূত। শ্রীনিত্যানন্দ নাম রোহিণীর সুত॥"

"নিতাই গৌর যে অভিন্ন তত্ত্ব এর উপর আর কি প্রমাণ চাই ? শ্রীগৌরস্বরূপের নিজকার্য্য—শ্রীনিতাইস্বরূপে সম্পন্ন হ'ল, এইত চরম প্রমাণ, দুইস্বরূপ যে অভিন্ন এতে আর কি বুঝিতে বাকী থাকে ? শ্রীগৌর লীলার ব্যাসাবতার শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর নিজ গ্রন্থ "শ্রীশ্রীচৈতন্য-ভাগবতে" শ্রীনিতাই চাঁদকে "মহাপ্রভু" সংজ্ঞা দিয়েছেন। এ কি শ্রীবৃন্দাবন-দাসের কথা ? "বৃন্দাবনদাস মুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য" শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-গ্রন্থে পূজ্যপাদ কবিরাজ গোস্বামী তাই বলেছেন। তারাত বল্‌তে কিছু বাকী রাখেন নি, চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন ? এতেও যদি কেউ ধরতে না পারে তবে তার ভাগ্য মন্দ ছাড়া কি বল্‌ব ?"

শ্রীগুরুদেবের নিত্য-কৃত্য সম্পাদনের বিলম্ব হইতেছে, সেবকগণ প্রসঙ্গ শেষ করিতে ইঙ্গিত করিতেছেন, অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রসঙ্গ সাঙ্গ হইল। ভক্তবৃন্দ পরমানন্দে দণ্ডবৎ করিয়া বাড়ী ফিরিল।

---

**১৩৫৮ সাল, ১৫ই ফল্গুন। শ্রীধাম নবদ্বীপ। সকাল ৮টা হইতে ১১টা**

আজ আমাদের পরম গুরুদেব শ্রীরাধারমণের সাম্বৎসরিক মহোৎসব। সকাল আটটার পরই আমাদের শ্রীগুরুদেব সহচরগণের সঙ্গে পরম আনন্দভরা পরিবেশর মধ্যে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলেন। শ্রীধাম নবদ্বীপের প্রতি পথে পথে নগর সংকীর্ত্তন বাহির হইবে, সঙ্গে অগণিত লোক, সকলের মনে 'সোনার গৌর ঐ নেচে যায়' এই ভাবটী জাগিয়া

উঠিল, বাবা তাঁহার সহজ মধুর চাহনিতে সকলের প্রতি একবার চাহিলেন। সকলের আগ্রহ আকুল দৃষ্টি, মুখে চোখে অফুরন্ত আনন্দ। বাবার উজ্জ্বল রাঙা, সজল দৃষ্টি তাঁহাদিগকে আরও মাতাইয়া দিল। শ্রীবাস অঙ্গনে যাইয়া নাটুয়া-মূরতি "গৌর কিশোরের ভাবে বিভাবিত হইয়া ডাহিনে বামে সহচর লইয়া কীর্ত্তন ধরিলেন—"ধবল পাটের জোড় পরেছে", এই পদটিতে এক একটী অক্ষর দিতেছেন আর ফুলিয়া ফুলিয়া ফুকারিয়া ফুকারিয়া কাঁদিতেছেন, প্রায় আধঘণ্টার উপর পদটি গাহিয়া ধুয়া ধরিলেন—**"নেচে যায় প্রাণ গৌর-হরি, নদে নাগরীর চিত করে চুরি"** অনুচরবৃন্দ সেই ধুয়া লইয়া সংকীর্ত্তনে বাহির হইলেন। কাঁদিয়া কাঁদিয়া চোখ দুটি ফুলিয়া গেছে, প্রসন্ন কোমল রক্তিম দৃষ্টিতে তাঁহাদের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। তারপর সেই আবেশভরা গতিতে ধীরে ধীরে আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন,আর কোনদিকে দৃষ্টি নাই, ভিতরে ভাব-সমুদ্র উথলিয়া উঠিতেছে, নিজের বসিবার ঘরটিতে ধীরে ধীরে পায়চারি করিতে লাগিলেন—শ্রীঅঙ্গ সেবক রাজু ও নন্দদাস সময় বুঝিয়া স্নানের আয়োজন করিল। নিত্যসহচর গোপাল দাসও তাহার অনুবর্ত্তী হইলেন—বাবার অঙ্গে ইঁহারা তেল মাখাইতেছেন। গম্ভীর সদানন্দময় মূর্ত্তিতে আবার ভাবান্তর হইল, শ্রীগুরুদেব সহজ চাহনিতেই চাহিলেন, কি বলিতে চান, থামিয়া গেলেন। একটু পরেই মৃদুস্বরে প্রকাশ পাইল।

## মন তো পথে পড়ে থাকলো

**দেখলে; কেমন কাণ্ডজ্ঞান ব্যাটার,** ( এক সেবকের প্রতি ইঁহাকেই নগর কীর্ত্তনে মুখপাত্র করিয়া পাঠাইয়াছেন। ) **নগর কীর্ত্তনে বেরুলো কখন? এদের মাথায় কোন হিসেব নেই,—আরে ফিরতে কত দেরী হবে জানিস? কাকে নিয়ে বেরুলি? কে পথ পানে চেয়ে থাকলো?** ( শ্রীগৌরাঙ্গ নগর-ভ্রমণে গমন করেছেন, শ্রীশচীমাতা পথ পানে চেয়ে আছেন, ) **সে না ফিরে আসা পর্য্যন্ত মন তো পথেই পড়ে থাক্‌লো, বেলা হোলো, রোদে কষ্ট পাবে,** ( প্রকারান্তরে আবিষ্ট শ্রীগুরুদেবের অবস্থাও তাই ) **হুঁ কি বলি বল,** ( বলিয়া দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ছাড়িলেন এবং একটু পরেই বলিলেন, )—**শোন শোন তাঁদের** ( শ্রীষড়্ গোস্বামীদের ) **লীলা-সমাধান কেমন, উনি তো** ( শ্রীনন্দ-নন্দন ) **খেলুড়েদিকে** ( ব্রজ বালকগণ ) **নিয়ে সকাল থেকে খুব খেলায় মত্ত, খেলা আর ভাঙ্গে না, মা তো একবার পথ একবার ঘর ক'রছেন, এখনও আসছে না। লীলাশক্তি চঞ্চল হয়ে উঠেছেন, খেলা না ভাঙ্গলে চলে না। কি উপায়, এদিকে তখন বৎসাসুরেরও সময় হ'য়ে এসেছে** ( মৃত্যুকাল এসেছে ) **ব্যস্ এই সুযোগ, তিনি** ( লীলাশক্তি ) **তখন তাকেই দিলেন ঢুকিয়ে** ( খেলার প্রাঙ্গণে বৎসাসুর ঢুকে পড়লো, ) **এক মুহূর্ত্তের মধ্যে হৈচৈ পড়ে গেল, ইনি তো** ( শ্রীবলরাম ) **তখন ভারী বিরক্ত হ'য়ে পড়্‌লেন, উঃ এমন খেলাটা বেটা মাটি করে দিলে, উনিও**

( শ্রীগোবিন্দ ) চঞ্চল হ'য়ে পড়্লেন, খেলা ভেঙ্গে যাচ্ছে, সহচরগণ এদিক ওদিক দৌড়ে বেড়াচ্ছে, এঁরা ভারী বিরক্ত হ'লেন, ও কম্ম ( মারণ কার্য্য ) তো করতে হবে—

উনি ( শ্রীবলরাম ) যে র'য়েছেন, এদিকে তিনিও ব'লে ফেল্লেন—মেরে ফ্যাল ব্যাটাকে আছড়ে মেরে ফ্যাল, ছেলেরা যেমন বলে-না, এও তেমনি। ব্যস্ যেই বলা ওমনি কাজ, ও কম্ম হ'য়ে গেল, এদিকে খেলায়ও ছোড়ভঙ্গ হোলো, যে যার বাড়ী ফিরলেন, ব্যস, লীলাশক্তি কৌশলে কাজ সারলেন, উনি ( শ্রীমতী যশোদা ) ছট্ফট কোরছিলেন, তা এখন নিশ্চিন্ত হোলেন, ঘরে ফিরে এলেন ( যশোদা দুলাল ); দেখলে কেমন সমাধান। ঐ নিয়ে ( বৎসাসুরবধের ব্যাপারে ) তাঁরা একবার ( ব্রজ গোপীগণ ) টোকা দিয়েছিলেন ( শ্রীগোবিন্দকে গো-বধের জন্ম অপাংক্তেয় ক'রেছিলেন। )

এইটুকু বলিতে বলিতে বাবা বার বার শিহরিয়া উঠীলেন। ইত্যবসরে স্নান ঘরের বাহিরে কেহ আসিয়াছেন এবং ভিতরে ঢুকিতে চাহিতেছেন, সেই জন্য বাবা একবার ইঙ্গিত করাতে সেবক নন্দদাস বাহিরে আসিয়া তাঁহার পরিচয় লইল, শোনা গেল একচক্রা হইতে আসিয়াছেন, তাঁহাকে বাহিরে অপেক্ষা করিতে বলা হইল। একচক্রা নামটী শুনিয়া বাবা অকস্মাৎ খিল্ খিল্ করিয়া ছেলে-মানুষী হাসি হাসিলেন। একভক্ত প্রশ্ন করিল বাবা! অমন ক'রে হাসিলেন কেন? শ্রীগুরুদেব তেমনি হাসিমুখেই "একচক্রা" স্মরণে শ্রীনিতাই চাঁদের আবেশে বলিলেন—

## দু'চাকা না হলে রথ চলে ?

শুনলে না, এক চক্রা, এক চাকা, হা হা হা হা,—একটি চাকা। সে আবার কিগো, এক চাকা কি সে, ওগো সেখানে এক চাকা আর এখানে ( শ্রীনবদ্বীপে ) এক চাকা বুঝলে? দু'চাকা না হইলে রথ চলে? দেখদেখি ভাল মানুষে আবার কখনও কাণে একটী চাকা পরে? পরে গো পরে, কেবল ওই পরে, আর কি কেউ পরে? পরে না। সে যে ( শ্রীনিত্যানন্দ ) আধাআধি হ'য়ে আছে, সে যে আধেক নাগর আধেক নাগরী, তাই না এককানে একটী চাকার গয়না, শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর তাই না বলেছেন, "নাগর নিতাই নাগরী নিতাই......"

বলিতে বলিতে আত্মহারা হইলেন। সেবকগণ স্তব্ধ হইলেন। কিছুক্ষণ পর ধীরে ধীরে গঙ্গাবারি ঢালিয়া ঢালিয়া স্নান সমাধান করিলেন। শ্রীঅঙ্গ মুছিয়া ভিতরের ঘরে গেলেন, মন, মুখ আবেশে ভরিয়া আছে।

আজ এক নূতন ছন্দে নগর কীর্ত্তনে সুর বাহির হইয়াছে "নদে নাগরীর চিত্ত করে চুরী, নেচে যায় প্রাণ গৌরহরি" তাই না শ্রীগুরুদেব নিতাই তত্ত্বের এই একটি দিক্ ইঙ্গিত

করিয়া আবিষ্ট রহিয়াছেন? এতদিন "নিতাই এনেছে নাম গৌর-হরি হরিবোল" এই ধুয়া ধরিয়া নগর কীর্ত্তন বাহির হইত, আজ আর এক স্বরূপের ইঙ্গিত। একটু পরেই আমাদের আশ্রমে নগর কীর্ত্তন ফিরিয়া আসার ধ্বনি শোনা গেল, শ্রীগুরুদেব চঞ্চল হইয়া প্রণাম করিতে আসিলেন। ১২॥ বাজিয়া গেল।

---

স্থান -পোস্তা রাজবাটী। ২৯শে চৈত্র বৈকাল, সন ১৩৫৮ সাল।

আন্দাজ বেলা ৪টার সময় পোস্তায় বড় হলঘরের বাহিরের বারান্দায় শ্রীগুরুদেব, ও দাঁড়াইয়া এক বৃদ্ধ হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ। কথা বার্ত্তায় বেশ পণ্ডিত বোধ হইল। ব্রাহ্মণ শ্রীগুরুদেবকে বহু সম্মান সূচক ভাষায় শাস্ত্রযুক্তি সিদ্ধান্ত সহ অনেক কিছু ভজন রাজ্যের কথা শুনাইতেছেন। শ্রীগুরুদেবও খুব হাসিমুখে উৎকণ্ঠা ও উল্লাসের সহিত পণ্ডিতজীর বক্তব্যগুলি শ্রবণ করিয়া পণ্ডিতজীকে যথোচিত সম্মান মর্য্যাদা দান করিতেছেন। বিদায় কালীন পণ্ডিতজীর শ্রীগুরুদেবের হাত দুটি টানিয়া লইয়া নিজের মাথায় চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন—"তা বাবা! এই বুড়োকে যেন ভুলিও না, এ বুড়োকে নজর রেখো।" পণ্ডিতজীর কাণ্ড দেখিয়া শ্রীগুরুদেব ঈষৎ কাঁপিতে লাগিলেন ও "জয় গুরু" "জয় গুরু" বলিতে লাগিলেন। পণ্ডিতজী একটি কথা বড়ই সুন্দর শ্রীগুরুদেবকে বল্লেন—দেখুন বাবা! "বাড়ীর কর্ত্তা বাজার কর্ত্তে গেল, এদিকে ঘরে যেমন ছেলে ভাবতে থাকে—"বাবা আমার জন্য সন্দেশ আনিবে", বুড়ো বাপ মনে মনে ভাবে "ছেলে আমার জন্য ভাল ভাল ফল আনিবে" আর স্ত্রী ভাবে "স্বামী আমার জন্য ভাল ভাল কাপড় ও গহনা আনিবে।" তা বাবা আপনাকে পাঠাইয়া দিয়া ঘরে সব আত্মীয়েরা আপনার পথ চেয়ে আছে। এ সম্বন্ধে শ্রীগুরুদেব পরে বল্লেন—পণ্ডিতজীর সাদা কথায় খুব অনুভবের খবর আছে। তোমাদের কীর্ত্তনে এসব কথাই হয়। বুড়ো বাবা ফলের (প্রেমফলের), ছেলে সন্দেশ (সংবাদ অর্থাৎ গৌরের সংবাদ) ভাল কাপড় (অনুরাগ বসন) গহনা (কম্পঅশ্রু পুলক ইত্যাদি মণিমুক্তা খচিত ভাব-রত্নহার)—বলেই বলছেন বুড়ো খুব রসিক ভজনীয়া। পণ্ডিতজীর শেষ কথাটি আরও চিত্তাকর্ষক। তিনি বলিলেন, দেখুন বাবা! আমাদের রাধারাণী তার সবচেয়ে প্রিয়জনকে

ব্রজে থাকতে দেয় না। সে বলে আমার সমস্ত জগৎ ত্রিতাপ জ্বালায় জ্বলিয়া জ্বলিয়া পুড়িয়া যাইতেছে তোমার আর ব্রজে থাকিতে হইবে না। তুমি যাও জীবের দ্বারে দ্বারে আমার নাম-অমিয়া পিয়াইয়া আমার সমস্ত দগ্ধ জীবকে শীতল কর ও রক্ষা কর। তা আমাদের রাধারাণী তার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় কাজের ভার আপনার উপর দিয়াছেন—দেখো —এ বুড়ো যেন তোমার দানে বঞ্চিত না হয়। পণ্ডিতজী চলিয়া গেলেন শ্রীগুরুদেব বলিলেন—"যে যেখান থেকেই কথা বলুক সকলেরই এক সুর।" তার মানে বন্ধু সুন্দরও শ্রীগুরুদেবকে এই কথাই বলিয়াছিলেন "তোমার আর ব্রজে ভজন করিতে হইবে না। যাও জীবের দ্বারে দ্বারে নাম-প্রেম দিয়া জীবকে রক্ষা কর। যার যার পেটের চিন্তা সবাই করে। সকলকে যে দিয়ে খায় সেই মানুষ।"

কথা প্রসঙ্গে একদিন শ্রীগুরুদেব বলিলেন—

তখন দিদির (সখীমার) খুব অসুখ, গ্রহণী-রোগে মৃতপ্রায়, কর্ত্তা (বড় বাবাজী) কিন্তু উদাস। সেই সময় বুড়ো (বড় বাবাজীর গুরুদেব গৌরহরি দাস মোহন্তজী) কর্ত্তাকে (বড় বাবাজীকে) নিয়ে দিদির ঘরে উপস্থিত। বল্লেন ছেলেটাকে ছাখো। তাতে কর্ত্তা বল্লেন আমি কি করব, আমার কাছে কিছু হয়নি। ও যার কাছে ফেলে দিয়েছি, যদি হয়ে থাকে ত তাদের কাছেই হয়েছে, ঠাকুর কিম্বা বৈষ্ণব সেবায় অপরাধ। এখন আসল কথা দুজনের দুদিকে আবেশ, কিশোরী দাসীর ঠাকুর সেবায় আর দিদির হলো গুরু সেবায়। (ঝাঁজপিটা মঠে) একদিন ঠাকুরের স্নানের সময় ঠাকুর বস্ত্রহীন অবস্থায়; এমন সময় দিদি ভোগের থালা লইয়া দরজা ধাক্কা দিয়া ঠাকুরকে মাত্র থালাখানা দেখাইয়া কর্ত্তার সাম্‌নে এনে ধরে দেয়, পাছে কর্ত্তা হঠাৎ বাইরে চলে যান। তাই দিদির এই ব্যবস্থা। দিদিকে শুনিয়ে কর্ত্তা বল্লেন, আমার হাত নাই। যার জিনিষ তার হয়ে পড়ে থাক্ ভাল হয়ে যাবে। দিদি ভাল হলে কর্ত্তা একদিন বলেছিলেন—"আমাকে ছমাস আমানিয়া খাইয়েছে, তাই ঠাকুর তাকে দণ্ড দিয়ে সাবধান করলেন।"

একপ্রিয় ভক্ত শ্রীগুরুদেবকে প্রশ্ন করিল আচ্ছা বাবা! একনিষ্ঠ সেবকের প্রীতি সেবায় কি ক্রুটী হওয়া সম্ভব?

শ্রীগুরুদেব—"ও সব কি জান? প্রিয়জনকে দিয়ে এ জাতীয় লীলা ক'রে সাধারণ জীবকে শিক্ষা দেওয়া। সেব্য-সেবক-লীলাই তাই। জীবশিক্ষা বইত নয়।"

ভক্ত :—আদর্শ চরিত্রের কোন ক্রুটী দর্শনে সাধারণ জীব ত মুস্কিলে পড়িয়া যাইবে।

শ্রীগুরুদেব—"ওগো শেষটা দেখলেইত বুঝা যায় এ দণ্ডটা কি সত্যই দণ্ড না কৃপা; ও যত কিছু দেখ না ওসব জীব কক্ষায় দাঁড়িয়ে ঐ লীলা।" আরোও বল্লেন—"শরণাগত সাধকের আধি, ব্যাধি, যা দেখ সমস্তই শ্রীগুরু-কৃপা-ভোগ। নইলে শরণাগতের আবার আধি,

ব্যাধি, কোত্থেকে এলো? ও সব তারা কুড়িয়ে নিয়ে ভোগ ক'রে—জীবকে তার দিকে ঠেলে দেয়।"

শ্রীগুরুদেব আবার বলছেন, কত বলব।

কোন দিন আশ্রমে বৈষ্ণব না আসলে দিদি ছট্‌ফট্ করতো। আর বৈষ্ণব আসলেই তার বুকটা ধড়ফড় করতো। সে ত সব সময় কাছে থাকতে পারতো না, পাছে আশ্রমের কেহ কোন আচরণে বৈষ্ণবাপরাধ করে ফেলে। এই যাদের চরিত্র তাদের আবার .....

সকালে একদিন শ্রীগুরুদেব একাকী পোস্তায় ছাদে পায়চারী করিতেছেন। খুব বিমর্ষ ও চিন্তাযুক্ত; আস্তে আস্তে পিছনে পিছনে এক প্রিয় ভক্ত ঘুরিতেছে। মুখপানে একবার ফিরিয়া চাহিলেন। ফিরে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"হাগো! আত্মসমর্পণের লক্ষণ কি?" ভক্ত একটু ভেবে জবাব দিব মনে করিতেছে—ইত্যবসরে শ্রীগুরুদেব নিজেই বল্লেন—

তোমার চরণে আমার পরাণে লেগেছে প্রেমের ফাঁসি।
সব তেয়াগিয়া একান্তী হইয়া হইলাম চরণে দাসী॥

ঘরে বাপ, মা, বন্ধু, বান্ধব ছেড়ে ৭।৮ বছর বয়সে যার কাছে আসা গেছে। তার ভালবাসায় পড়ে তার সঙ্গে ছেলেমী ব্যবহার, কত কি আবদার এই যার ছিল, তাতে কতজনা কত কি বাধা দিয়েছে। যে তার ভালবাসা পেয়েছে সে কি তা মানে। আজ তার নাম শুনলেই তার চেহারাটী সামনে এসে দাঁড়ায়, তবে ত। নতুবা তার সঙ্গে যে সম্বন্ধ, তার যে ব্যবহার আমি পেয়েছিলাম, আমি তা ভুলে গেছি। তার মানে আমি তাকে ছেড়েছি।

শ্রীবৃন্দাবনে বড় বাবাজী মহাশয়ের প্রসঙ্গে শ্রীগুরুদেব বল্লেন—

সেখানে কোন মহাত্মা কর্ত্তাকে (বড় বাবাজী) জিজ্ঞেস করেছিলেন—"আচ্ছা অনেকেই ব্রজে এসে রজে গড়াগড়ি দিয়ে যান। কিন্তু কারোও ত বিশেষ পরিবর্ত্তন কিছু দেখতে পাই না।" কর্ত্তা (বড় বাবাজী) খুব দুঃখ করে সাদা ও সহজ কথায় বলেছিলেন—"কি করে হবে পাথরের উপর পাথর গড়াগড়ি দিয়ে যায়, রজের স্পর্শ হলে ত হবে।" বলেই শ্রীগুরুদেবও নিজের কথা বল্লেন। বেশী কি বলব এখানেত (পোস্তায়) শ্রীশ্রীঅষ্ট প্রহর শ্রীনামযজ্ঞ প্রায়ই হন, সাধু বৈষ্ণবেরও যথেষ্ট পায়ের ধুলো পড়ে, তাতে গড়াগড়িও দেওয়া হয়। দিলে কি হবে, নইলে ন বছর বয়সে ঘরছাড়া করেছে। বহু মহাপুরুষের আশীর্ব্বাদ ও কৃপা পেয়েছি। তাদের আচরণ দেখে শুনে দেখা-দেখি অভ্যাসে পড়ে কিছুত করা হয়। স্বাভাবিক দৈন্যে শ্রীগুরুদেব বলিলেন—তাদের সঙ্গে যদি সম্বন্ধ হতো, আর ঠিক ঠিক কিছু করা হত; তবে রং ফিরে যেত, তা হলে কি এই রকম দেখ ।

প্রসাদ পাওয়ার সম্বন্ধে শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখে শুনিলাম—

প্রসাদ কখনও চাইতে নাই। বাবা বল্লেন—রাধা বিনোদ দাদার ( বিনোদিনী দিদি ) চরিত্রে এটী আদর্শ ছিল। একদিন হঠাৎ কিছু চেয়ে ফেলেছেন, অমনি গোবিন্দদা গালে এক চড়। তাড়াতাড়ি আর গাল এগিয়ে দিয়ে বল্লে, দাদা এ গালে একটী। পরে বল্লেন, প্রসাদ পাওয়া সম্বন্ধে যদি কোন বাধা বিঘ্ন ঘটে, বুঝবে ঐ জাতীয় কোন অপরাধ হয়েছে।

আর একদিন বৈকালে অনেক বিশিষ্ট এবং ভক্ত মণ্ডলী শ্রীগুরুদেবকে ঘিরে বসেছেন। নিরপেক্ষভাবে অনর্গল পরিবেষণ করিতেছেন। প্রসঙ্গে ভারী উল্লাস, শুনিয়া বোধ হইল শ্রীগুরু তত্ত্বেরই সূচনা। শ্রীগুরুদেব বলেছেন—

"বিশ্বরূপ সভায় আসতেই বুড়ো ( অদ্বৈত প্রভু ) শ্রীকৃষ্ণার্চ্চনে থাকিলেও তৎক্ষণাৎ সবফেলে ছুটে বিশ্বরূপকে আলিঙ্গন করে, তবে শান্ত। নিমাই একদিন অদ্বৈত সভায় দাদাকে ( বিশ্বরূপকে ) ডাকতে গেছে। বিশ্বরূপ ভাগবত ব্যাখ্যায় উন্মত্ত, আর অদ্বৈত প্রভু সম্মুখে তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছেন। হঠাৎ নিমাইকে দেখে বুড়োর হুঙ্কার, গর্জ্জন; সবাই স্তম্ভীত। অবাক হয়ে অপলক দৃষ্টিতে দেখছেন, আর মনে মনে ভাবছেন, কে এই বালক, একি আমার আনা ঠাকুর, নইলে আমার প্রাণ ধরে টানছে, আমায় যে পাগল করে তুলল। তাইত এসে আমায়-ত ডাকলে না, একবার ফিরেও চাইলে না। অভিমানে বুড়ো শান্তিপুর চলে গেল। না ডাকলে আর আসব না।

অদ্বৈত প্রভুর অভিমানের কথা বলতে গিয়ে শ্রীগুরুদেবের কোন অভিমান জেগেছে, কথা বলিতে পারিতেছেন না, অভিমানের চাপটা বেশ। ২।৩ মিনিট চুপ করিয়া রহিলেন। পরে আবার বল্লেন—

একদিন মা বিশ্বরূপকে নালিস কচ্ছেন, তোমার ছোট ভাইটি বড় দুষ্টু। নিমাই কিন্তু দাদাকে দেখলেই শান্ত। একদিন দাদার সঙ্গে গঙ্গাতীরে বেড়াতে গেছেন, মা নিমাইকে দেখ্তে না পেয়ে ডাকছেন, নিমাই! ও নিমাই! একা গঙ্গাকুলে গেছ, সাঁতার শেখ নাই, জলে পড়ে যাবে।

ব্যস্ শ্রীগুরুদেব বল্তে পাচ্ছেন না, ভাব সঙ্কোচ করতে গিয়ে মুখ খানি স্ফীত হইল, কথা বন্ধ হইয়া গেল, কিছু বলিতে চেষ্টা করিয়াও আর পাচ্ছেন না। অবশেষে দুচোখের জলে গণ্ডস্থল ভাসিয়া যাইতে লাগিল, ৩।৪ মিনিট কাল এই অবস্থা। অনেকক্ষণ পর নিজেকে সামলাইয়া বলিতে লাগিলেন—

মায়ের ডাক শুনেই নিমাই বাড়ী এলো। বাড়ী এসেই দুষ্টুমি, এমন সময় বিশ্বরূপ এসে ডাকতেই নিমাই অমনি শান্ত। বিশ্বরূপের যৌবন বিকাশ দেখে, মা বিবাহের প্রস্তাব করায় বিশ্বরূপ অমনি গৃহত্যাগের সঙ্কল্প কল্লেন। আর না, আর আমার ঘরে থাকা উচিৎ নয়, আর পারিনা, সেদিকে আমায় টান্‌ছে, আমি তার সঙ্গে না মিলা পর্য্যন্ত নিমাইয়ের

লীলাস্বাদন পরিপূর্ণ হবেনা। বিশ্বরূপ চলে গেলেন, তারপর সন্ন্যাস ক'রে হাড়াই নন্দনের সঙ্গে মিলে নিত্যানন্দ-স্বরূপে এসে আবার নিমাইয়ের সঙ্গে মিল্‌লেন। কিছুদিন পরে নিমাইও সন্ন্যাসী হলেন জীবের দ্বারে দ্বারে গিয়ে জীব উদ্ধার করবার জন্যে।

বলেই শ্রীগুরুদেব বলছেন,—

এসব রহস্য কি জান? করুণার পরিচয় দেওয়ার জন্যই। জগন্নাথ হয়েও হতভাগ্য জীবের মুখের পানে চেয়ে থাকা, জীব কবে আমার মুখের দিকে চাইবে। কেনগো তাঁর ইচ্ছাতেই ত সব হয়, তবে আবার জীবের মুখ পানে চেয়ে থাকা কেন? ইহা হইল, শ্রীনিতাই গৌরাঙ্গের পরম করুণ, পতিতপাবন, অদোষ দরশী, দাতাশিরোমণি শ্রীগুরু-স্বরূপের লীলা। শ্রীগুরু-স্বরূপেই পরম করুণত্বের পরিপূর্ণ প্রকাশ। সেবকের দোষের দিকে দৃষ্টি নাই; কেবল কৃপার দান, আপনার সর্ব্বস্ব দিয়ে সেবকের পাপ তাপ নিয়ে অনর্পিত প্রেমদান, শ্রীগুরু-স্বরূপেই নিতাই দাতা শিরোমণি।

বলেই শ্রীগুরুদেব বালকের মত অভিমানে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। সে দিন শ্রীগুরুদেবে দাতা শিরোমণির আবেশ লাগিয়াছে। ভাব সম্বরণ করিয়া আবার বলিতে লাগিলেন—

নন্দের নন্দন কৃষ্ণ বৃষভানুর ঝি।
ইহার উপর তত্ত্ব আর আছে কি?
কেহ বলেন ইহার উপর আরো শুনেছি।
নিতাই গৌরাঙ্গ বল, আর ছি ছি ছি॥

শ্রীগুরুদেবের আজ গুরুপ্রসঙ্গে "পঞ্চাননের আবেশ লাগিয়াছে।" সময়ের দিকে লক্ষ্য নাই, বলিয়াও আশা মিটিতেছে না। এমন সময় আরতির ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল সে দিনের মত প্রসঙ্গ সাঙ্গ হইল।

---

স্থান—পোস্তা রাজবাটী। সন ১৩৫৮ চৈত্র

সন্ধ্যার পর নিত্য পাঠ আরম্ভ হইয়াছে। এক অনুগত সেবক শ্রীব্রজগোপাল দাস পাঠ করছেন। পাঠের বিষয় শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের শ্রীমুখোদগীর্ণ কীর্ত্তন, কীর্ত্তনের বিষয় ছিল কিশোরীভাবে গৌরের জগন্নাথ দর্শন। পাঠে শ্রীগুরুদেবের ভোগের প্রাচুর্য্য খুব বাড়িয়াছে,

মাঝে মাঝে হুঙ্কার গর্জ্জন করিতেছেন। চোখের জলে বুক ভাসিয়া কোলের কাপড় ভিজিয়া যাইতেছে। শ্রোতাদের মধ্যে প্রধান শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভুর সমাধির মহান্ত, এবং পূজনীয় নন্দ কাকা ও শ্রীগুরুদেবের অনুগত বহু সজ্জন। পাঠ শেষ হওয়ার পর অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ঘরখানি নিস্তব্ধ, কারো মুখে সাড়া নাই। সকলেই মাথা নীচু করিয়া শ্রীগুরুদেবের ভোগের উচ্ছিষ্ট-আস্বাদনে মেতে আছেন। শ্রীগুরুদেব নন্দ কাকাকে লক্ষ্য করে প্রশ্ন করলেন।

**প্রশ্ন। আচ্ছা! শ্রীনরেন্দ্র তীরে যে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ হইতেন। সেখানে কে বক্তা, কে শ্রোতা?**

পূজনীয় নন্দকাকা বল্লেন—আপনি বলুন আমরা শুনি—তাতে শ্রীগুরুদেব একটু গম্ভীর হলেন, বল্লেন—

**বেশ আমি তোমাদের কাছে শুন্‌তে চাইলাম!**

বলেই চুপ, কিছুক্ষণ যায় আর কোন কথাই বলেন না।

ভক্ত বলিল—আমাদের দৃষ্টিতে যা দেখি তাতে শ্রীপণ্ডিত গোস্বামী বক্তা ও শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রোতা।

**প্রঃ। পণ্ডিত গোস্বামীর স্বরূপ কি?**

উঃ। শ্রীমতী রাধা। শুনে বল্লেন তা বেশ।

**প্রঃ। শ্রীমন্মহাপ্রভুর এখানে স্বরূপ কি?**

এ প্রশ্নে সমস্যা হইল, হঠাৎ শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখের বাণী স্মরণ হলো, নীলাচল বিহারী গৌর সর্ব্বদা কিশোরী-ভাবে ভোর।

উঃ। কিশোরী স্বরূপ।

**শ্রীগুরুদেব শুনে বল্লেন—**

**আমারও তাই মনে হয়। এক রাধারাণীই এক স্বরূপে বক্তা অন্য স্বরূপে শ্রোতা। যিনি বক্তা তিনিই শ্রোতা। আসল কথাই হলো উভয়ে যদি এক স্বভাব না হয় তবে এক স্বরূপকে অন্য স্বরূপ সেবা করে সুখী করতে পারে না।**

ভক্ত বলিল—শ্রীনদীয়া লালায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর সঙ্গে পণ্ডিত গোস্বামীর প্রাণ বঁধু সম্বন্ধ ছিল। নীলাচল লীলায় কি সম্বন্ধ?

**শ্রীগুরুদেব। সেখানেও তাই। তার জন্যই ত গম্ভীরার আস্বাদনের বাধক বলে টোটা-গোপীনাথে সরাইয়া রাখ্‌লেন।**

ভক্ত বলিল—গোপীনাথ স্বরূপে গদাধরের গৌর নিষ্ঠার কি কোন ব্যাঘাত হইত ? না, গোপীনাথে গৌর দর্শন করিতেন। কিম্বা প্রাণ বধুত্ব আরোপ করিতেন অথবা গোপীনাথ দর্শনে গৌর স্বরূপের অভাব মিট্‌ত ?

শ্রীগুরুদেব। এখানে দেখা-দেখির হিসাব ত নয়। তা হলে একটা স্বতন্ত্র চেষ্টা ও কর্ত্তৃত্ব এসে যায়।

দেখ, যেমন শ্রীমতী রাধারাণীর সম্মুখে শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপ ভিন্ন অন্য স্বরূপের অবস্থান অসম্ভব, তেমনি পণ্ডিত গোস্বামীর সম্মুখে গৌর-স্বরূপ ভিন্ন অন্য স্বরূপের অবস্থান অসম্ভব। পণ্ডিত গোস্বামী যখনই শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করেন তার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে শ্রীগোপীনাথ শ্রীগৌর স্বরূপে প্রকাশ হন। এখানে দেখা-দেখির কথা নাই, তীব্র স্বরূপ-নিষ্ঠার প্রভাবই এইরূপ। যে স্বরূপে যার নিষ্ঠা তার কাছে তিনি সেই স্বরূপে প্রকাশ ও বিদ্যমান।

ভক্ত। ভক্তের ভাবানুকুলে তিনি, না তাঁর ভাবানুকুলে ভক্ত ? শ্রীমুখের দানে পাই, স্বভাব জাগায়ে করে সঙ্গ! আবার পাই—যার যেমন ভাব সে তেমনি দেখে। এদিক নীলাচলে শ্রীরথাগ্রে শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা আস্বাদনে যাহা বুঝাইয়াছেন তাহাতে ভিন্ন ভিন্ন রসাশ্রিত সমস্ত গৌর-পরিকর শ্রীশ্রীগৌর-কিশোরীর ভাব পুষ্টির সহায়তায় সেইভাবে উন্মত্ত।

শ্রীগুরুদেব। ও দুইই ঠিক। শ্রীভগবানও ভক্তাধীন ও ভক্তও শ্রীভগবানাধীন। শ্রীভগবান ও ভক্ত উভয়ে উভয়ের সুখের জন্য ব্যস্ত। এই যে পরস্পরের সুখ বিধান, ইহ কোন চেষ্টা কর্ত্তৃত্ব বুদ্ধিতে নয়। এ তাদের স্বভাবের ধর্ম্ম ; তবে যখন যার ভাব প্রবল হয় তখন তদনুকুলে কাজ হয়।

ভক্ত। শ্রীনদ্বীপ ধামের স্বরূপ বর্ণনে পাই, "মধ্যে গৌর কৃষ্ণেশ্বর" এই বাক্যের অর্থ কি ?

শ্রীগুরুদেব। শ্রীগৌর-কৃষ্ণ যে ঈশ্বর তিনি সিংহাসন মাঝে।

ভক্ত। সহজ ও সরল অর্থে অন্য কিছু বুঝায়।

শ্রীগুরুদেব। সে কথা বিকাবে না।

ভক্ত। কেন বিকাবে না ? শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র, শ্রীনৃসিংহ, শ্রীবরাহ, শ্রীহলধর, শ্রীবলরাম ইত্যাদি প্রত্যেক অবতার বিগ্রহই ত শ্রীগৌর-স্বরূপে আশ্রিত ও প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছেন।

শ্রীগুরুদেব। তার কৃপায় তারে বুঝায়, তুমি বল্লে হবে কি ?

কোন অসুবিধার কথা শুনলে শ্রীগুরুদেব বলেন—

দাদা মহাশয়কে জানাও।

কেহ বলিল, আপনি কথায় কথায় দাদা মশায়ের চরণে ঠেলে দেন ; কিন্তু ৪০।৪৫ বৎসর হতে যায় একদিনের তরেও দাদা মশাই আমার কোন খবর নেন নাই।

শ্রীগুরুদেব বল্লেন—

**তুমি দুঃখ করছ; বল্লে হয়ত বিশ্বাস করবে না। অপ্রকটের পর আমি একবারও দেখা পাই নাই।** একজন বিশিষ্টের নাম উল্লেখ করে বল্লেন—**তাঁর যখন কিছু অবস্থান্তর ঘটে তখন খুব চঞ্চল হয়ে পড়লাম। শুধু সেই সময় এক দিনের জন্য দেখা দিয়ে বল্লেন—কোন চিন্তা নাই, ত্রিসন্ধ্যা নাম কর, সব ঠিক হয়ে যাবে। তা ছাড়া দেখা দেন নাই বটে কিন্তু যখন যে বিষয়ে তাকে স্মরণ করে কাজে ব্রতী হয়েছি, প্রত্যেক ব্যাপারে তার অস্তিত্ব ও সহানুভূতি পদে পদে প্রাণে প্রাণে বুঝিয়েছেন, নিরন্তর তার কৃপা আমায় রক্ষা করছেন। তা যাই হউক, দেখা দিক আর নাই দিক্, তার যাতে সুখ হয় তাই করুক॥**

বলে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেল্লেন, অবশেষে অধীর হয়ে পড়লেন।

শ্রীগুরুদেবের কথা শুনে মনে মনে ভাবছি, একি অদ্ভুত কথা, মুখ দেখার জন্য ব্যস্ত নয়, তার সুখের জন্য ব্যস্ত। শ্রীগুরুদেব তখনও প্রকৃতিস্থ নন। তারপর ভক্ত প্রশ্ন করিল। মুখ না দেখ্‌লে প্রীতি বাড়ে ?

শ্রীগুরুদেব। নিজ ভাব একটু সঙ্কোচ করে অর্দ্ধস্ফুট ভাষায় উত্তর দিলেন।

**মুখ দেখার অন্তরালে আত্ম সুখের গন্ধ আছে।**

একটু পরেই কোন সেবক শ্রীচরণামৃতের পাত্রটী ঘরের মেজেতে রাখিতেই যেই ঠুক্ করিয়া শব্দ হইল, অমনি শ্রীগুরুদেবের বুক খানি কাঁপিয়া উঠিল। এ মর্ম্ম বেদনার অনুভব ত আমাদের নাই। মুখ দেখিয়া বোধ হইল শ্রীগুরুদেবের বুকের হাড় বুঝি একখানি ভাঙ্গিয়া গেল। শ্রীগুরুদেব বড় দুঃখ করে বল্লেন—

**সম্বন্ধ না হলে এই দুর্দ্দশা, ভজন তার বহু দূরে॥ শ্রীচরণামৃত ও তার পাত্র, সবই যে শ্রীনিতাই তত্ত্ব—এ বোধ না হলে ভজন করবি কার।**

শ্রীগুরুদেবকে সুখ দেওয়ার মত যোগ্যতা আমাদের নাই, পাছে তার সে সময়ের ভোগের বাধা হয়। এই ভয়ে সেদিন আর প্রসঙ্গ হইল না। একটু বেলা হতে সকলে প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিল।

---

সন্ধ্যা আরতির পর "চরিত-সুধা" ৪র্থ খণ্ড পাঠ হইল,—বিবিধ ঘটনা হইতে ফণীর নবজীবন লাভ পর্য্যন্ত পাঠ হইলেন। ১৯৫ পৃষ্ঠা পাঠের সময় গুরুরুদেব বলিলেন,—প্রাণ-বল্লভ মঠে ফণী, আমি প্রভৃতি ছিলাম। কীর্ত্তনের পূর্ব্বে পায়খানা হ'তে এসে বলছে 'রামদা' পাতলা পাইখানা হয়েছে। তারপর কীর্ত্তনের মধ্যে বাহ্যে পাওয়ায় আউলিয়া মঠে পায়খানা করে অবশ হয়ে পড়ল। ২১২ পৃষ্ঠা পাঠের সময় বলিলেন – নগর কীর্ত্তন ফিরে এলে কীর্ত্তনের আখরে বলা হচ্ছে, যদি কিছু ফণীর হয় তবে মালা কণ্ঠী খুলে চলে যাব ইত্যাদি নামের মধ্যে সে বিকটরূপ দেখে প্রথম আমার মনে হ'ল বুঝি 'ফণী' আর বাঁচে না, তারপর দেখি যে, যে বলদেব মূর্ত্তি এখন ঝাঁজপিটা মঠের দেউড়িতে, ঢুকেই ডানদিকে আঁকা আছে উনি তাড়িয়ে দিলেন। তখন আশ্বাস এল।

পাঠের পর শ্রীগুরুদেব বলতে লাগলেন—দিদি ( শ্রীযুক্তা ললিতা সখী ) হুগলীতে চিঠি লিখে পাঠালেন ও কে লিখেছে ? ও কেউ লিখিয়েছে, ওতে ইঙ্গিত আছে "মহাপ্রভুর নিজের কাজ হরিদাস ঠাকুরের উৎসব নিজে করবেন। তুমি শ্রীগুরুদেবের কাছে এসে শ্রীগুরুদত্ত নাম কর। নীলাচলে না যাবার ইচ্ছা কর্ত্তার যদি হয় তবে আমাদের স্বতন্ত্র চেষ্টা করা কি উচিৎ ?" আজ রাধাষ্টমী। "মহাপ্রভু ললিতা আবেশে শ্রীরাধা অষ্টমী ভোগ করছেন। স্নানের পূর্ব্বে শ্রীগুরুদেব বলিলেন—গতবারে এ কথা জেগেছিল, তবে খোলেনি ( প্রকাশ পায়নি )। আজ কীর্ত্তনের পূর্ব্বে মহাপ্রভুকে দণ্ডবৎ করতে গিয়ে দিদিকে দেখে জিজ্ঞাসা করলাম—"মহাপ্রভু কি আজ ললিতার কক্ষায় ভোগ করছেন ?" দিদি মাথা নাড়লেন, তাইতে খোলাখুলি বলা হয়েছে।

## শ্রীশ্রীহরিদাস ঠাকুরের সেবা

**২০শে ভাদ্র শুক্রবার, ১৩৫৩ সাল।**

আজ নবদ্বীপ হ'তে রওনা হইয়া পুরীতে যাইবার কথা পূর্ব্ব হইতে হইয়াছিল। কিন্তু ঠিক হইয়াছে যাওয়া হইবে না। শ্রীগুরুদেব বলিলেন—কর্ত্তার ইচ্ছা নয় যখন, তখন কি করা যাবে হরিদাস ঠাকুরের সেবা ত তাঁরই কৃপার দান। এই কথা লইয়া সন্ধ্যার পর শ্রীহরিদাস ঠাকুর মঠ প্রাপ্তির বৃত্তান্তের কথা বলিলেন—পুরীর রঘুনাথ গোস্বামীর জামাই কুঞ্জলাল গোস্বামী এরা দুই ভাই ছিলেন। দক্ষিণ পার্শ্ব মঠের নিকট হরিদাস ঠাকুরের মঠ ও টোটা গোপীনাথের মন্দির বাঁধা দিয়ে কিছু টাকা ধার করেন। টোটা গোপীনাথ ও হরিদাস ঠাকুরের মঠের সেবার ভার এদের উপর ছিল বটে ( আউলিয়া মঠের গোঁসাই

তাঁর প্রথম পক্ষের ছেলে দুটিকে এই দুই মঠে দিয়াছিলেন ) কিন্তু এরা সেবার দিকে নজর দিতেন না। হরিদাস ঠাকুরের সমাধির আশে পাশে সব জায়গা হরিদাস ঠাকুরেরই ছিল। সব ১৫৲। ৩০৲ টাকায় হাত ছাড়া ক'রলেন।

টোটা গোপীনাথেরও সম্পত্তি নষ্ট করলেন। দেনা শোধের কোন ব্যবস্থা না করে বড় ভাই সরে পড়লেন। তখন কুঞ্জ গোস্বামীর উপর সেবার ভার। বাবাজী মশাই বাবু হরিবল্লভ বোসকে বলে ১৷৹ দেড় টাকা গোপীনাথের ও ॥৹ আট আনা হরিদাস ঠাকুরের সেবার জন্য ব্যবস্থা করে দিলেন। কুঞ্জ গোঁসাই টোটা গোপীনাথের নিজের ঘরে থাকিতেন। হরিদাস ঠাকুরের সেবার জন্য রেখেছিলেন "রামকৃষ্ণ" পূজারী এবং এক বুড়ী "কেতকীমা।" বাবাজী মহাশয়ের প্রকট কালে আমরা উৎসবের সময় গিয়ে হরিদাস ঠাকুরের উৎসব করতাম—কোন বাধা পাই নাই। অপ্রকটের পর বৎসর আউলিয়া মঠ থেকে হরিদাস ঠাকুরের মঠে গিয়ে কীর্ত্তন করে যা প্রসাদ হয়েছিলেন তাই একটু একটু মুখে দিয়ে আউলিয়া মঠে ফিরে এসেছিলাম। এ বৎসর ( ১৩১৪ সাল ) ঠিক করা হল রান্না আউলিয়া মঠে না করে শ্রীহরিদাস ঠাকুরেব মঠে করলে ( করিলে ) দুপুর রোদে আসতে হয় না, একেবারে রাত্রে সমস্ত সূচক কীর্ত্তনটি করে সেই রাত্রে অথবা পরদিন সকালে আউলিয়া মঠে ফিরবো। উৎসবের পূর্ব্বদিন বৈকালে শ্রীকরুণাকর দাস বাবাজী এবং শ্রীসখীচরণ দাস বাবাজীকে রান্নার জিনিষ পত্র দিয়ে পাঠান হল। তখন হরিদাস-মঠে সমাজ এবং ঠাকুর ঘর ছাড়া খোলার ঘর ছিল। মঠে ঢুকতে দুপাশে দুঘরে "পূজারী" এবং "কেতকীমা" থাকতেন। আর ঠাকুর ঘর থেকে এখনকার রান্নাঘরে যেতে দুপাশে দুটী ঘর ছিল সেই ঘর দুটিতে জিনিষ পত্র রেখে তালা দিল। কেতকী মা গোঁসাইজীকে এ খবর দিলে তিনি আমাদের তালার উপর তালা দিতে বলিলেন, বুড়ী তাই করল। এখবর আমাদের নিকট একজন দিলে আমরা শ্রীযুক্ত রঘুনাথ প্রভুর কাছে গেলাম, তিনি বলিলেন. আমি আছি কোন ভয় নাই, তোমরা কুঞ্জর দেওয়া তালা ভেঙ্গে উৎসব কর। আমরা তাই করলাম। তালা ভাঙ্গার খবর কেতকী মা দিয়ে থাকবে। সকালবেলা হরিদাস ঠাকুরের নির্য্যাণ প্রসঙ্গ পর্য্যন্ত কীর্ত্তন করে প্রসাদ পেয়ে বিপিন বাবুর বাড়ীতে বিশ্রাম করছি, শ্রীরঘুনাথ প্রভুজী আমাদের সঙ্গে আছেন। কুঞ্জ গোঁসাইকে প্রসাদ পাবার জন্য আমরা ডাকতে গিয়ে দেখা না পাওয়ায় শ্রীরঘুনাথ প্রভুর আদেশ মত তাঁর জন্য একটি পারশ ধরে রেখেছিলাম, সবে বিশ্রাম করছি দেখি যে কুঞ্জ গোঁসাই কতকগুলি গুণ্ডাধরণের লোক নিয়ে আসছেন—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ প্রভু এগিয়ে যেতে কুঞ্জ গোঁসাই থতমত খেয়ে গেলেন এবং সঙ্গের লাঠিধারীরা সরে পড়ল।

কুণ্ড গোঁসাঞিকে প্রসাদ পাইয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার উদ্দেশ্য কি? আপনিইত সেবাইত, কোথায় সেবায় আনুকূল্য করবেন তা নয় এরূপ বিরোধিতা কচ্ছেন কেন? গোঁসাইজী বললেন আমি কি করব? আমি বল্লাম—"দেখুন, শ্রীমন্ মহাপ্রভুর দেহ টোটা শ্রীগোপীনাথ, এবং প্রাণ হচ্ছেন শ্রীহরিদাসঠাকুর, এ দুয়ের সেবা আপনাকে দিয়াছেন, আপনি এ সেবায় অবহেলা করিবেন না।" শ্রীগোঁসাঞিজী বল্লেন—২৮০০৲ টাকায় এ দুটি মঠ বন্ধক আছে। টাকা জমা দিবার সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, ঋণের দায়ে মঠ দুটি নীলাম হয়ে যাচ্ছে। মোট ৩০০০৲ তিন হাজার টাকা হ'লেই সব হয়ে যায়। যদি আপনি আমাকে ঋণ মুক্ত করে দেন আমি এ হরিদাস ঠাকুর মঠের সেবা আপনাকে দিয়ে দিব। আমার তখন মনে হ'ল শ্রীযুক্ত বিশ্বরূপ গোঁসায়ের কথা, তিনি খুব উচ্চ অধিকারী ছিলেন। পাঠ শোনবার সময় তাঁর কোনও সাত্ত্বিক বিকার না দেখে প্রথমে তাঁর উপর আমার বিচার আসছিল। তারপর ঠাকুর আমায় বাঁচিয়ে দেন। দেখি যে কেবল নাক দিয়ে জল ঝরছে, এঁর মুখে প্রথম শোনা "শ্রীরাধেশ্যাম নব ঘন মনচোরা।"

ইনি শ্রীধাম বৃন্দাবনে ৫০ বৎসর বাসের পর শ্যামকুণ্ডের পঙ্ক উদ্ধারের জন্য শ্রীধামবাস ছাড়লেন, ( নিজের ভজন নিষ্ঠা রক্ষার জন্য প্রায় কথা বলিতেন না ) ছেড়ে দেশে দেশে ঘুরে ৫০০০০৲ পঞ্চাশ হাজার টাকা যোগাড় করেছিলেন। আর আমায় ধাম ছাড়তে হবে না, কলিকাতাতেই থাকিব। ভজনের নিয়ম নিষ্ঠাও ছাড়তে হবে না। আর মাত্র ৩০০০৲ তিন হাজার টাকা এ আর যোগাড় হবে না—শুধু লোকের কাছে যাওয়া—এ আর করতে পারবো না? এই মনে হ'ল।

## শ্রীশ্রীহরিদাস ঠাকুরের সমাধি-মঠ রক্ষা

পরদিন সকালে শ্রীহরিদাস ঠাকুরের পিছনে বিপিনবাবুর বাড়ীতে নাম কীর্ত্তন করছি, কীর্ত্তনের মধ্যে খুব আবদার জুলুম আসতে লাগল। হরিদাসঠাকুরের সেবা তুমিই করে গেছ এ তোমারই সেবা ইত্যাদি। অন্যান্য গৌরগণের নিকটও হরিদাস ঠাকুরের সেবা নিয়েই প্রার্থনা চলতে লাগলো। আনন্দের পাথার বয়ে যাচ্ছে, খুব কান্নাকাটি হচ্ছে। এদিকে করুণাদাস, হরিদাস ঠাকুর মঠের ঠাকুর সেবা করছিল। সমাধি মন্দিরের মাথার উপরে যে পাথরের চক্র ছিল তাহা মন্দিরের সামনে পড়ে গেল, সে সেই চক্রটী তুলে নিয়ে আমাদের কাছে ছুটে এসে বলল, "তোমরা যখন খুব ব্যাকুলভাবে জানাচ্ছিলে তখন এই চক্রটী পড়ে যায়।" তা শুনে আমার মনে হ'ল শিবের গাজনের সময় শিবভক্তরা সারাদিন উপবাসী থাকে, সন্ধ্যার পরে শিবপূজা করে। অপেক্ষা করে কখন শিবের মাথার ফুল পড়বে। না পড়া পর্য্যন্ত তারা কিছু খায় না। শিবের মাথায় ফুল পড়াটা তারা শিবের

সন্তোষ এবং প্রসাদ গ্রহণের অনুমোদন বলে মনে করে॥ ( গাজনের সময় মানত নিয়ে এই গাজনে যোগ দেয় এবং নীচ জাতির সঙ্গে একসঙ্গে খাওয়া-খায়ি করে, জাত্যাভিমান ভুলে গিয়ে সকলে শিবের ভক্ত হয়। আর তোমরা ঠাকুরের সঙ্গে এসেও উচু নীচু কর ) এক্ষেত্রে 'চক্র খসে পড়া' আমার মনে শিবের মাথার ফুল পড়ার মত বোধ হল। আমাদের কাতর প্রার্থনা ঠাকুরের কাছে পোঁছেছে মনে হওয়ায় মনে বল পেলাম। গোবিন্দদা আমায় কলিকাতায় গিয়ে টাকার চেষ্টা ক'রতে ব'ললেন, আমি বলে ফেল্লাম "আচ্ছা তাই হবে।" তারপর বলরামদা ব'লল, গোঁসাইত অর্থলোভী বেশী টাকার লোভে আবার অন্য জায়গায় কথা দিতে পারেন। একটা চুক্তি পত্র লিখিয়ে নেওয়া দরকার। তাই করা হল। টাকা সংগ্রহের জন্য একুশ দিনের সময় পেলাম। গোঁসাইকে ত কথা দিলাম, কিন্তু কখনও ত কাহারও কাছে কিছু চাই নাই। ( বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে নাম করছি দেখে বলেছিলেন তোমাকে একটা অয়েলক্লথ কিনে দেব। কাপড় কাচার জন্য কাহারও নিকট কিছু চাইতে আমার মন হত না। এত ময়লা কাপড় প'রতাম যে চিমটী কাটলে ময়লা উঠতো ) এখন কি করি মহাসমস্যা। যতীন মুন্সি ( ঢাকার জমিদার, বরাহনগরে তখন গৌরাঙ্গ সমাজের কোষাধ্যক্ষ ছিলেন ) ফিটন্ গাড়ী করে রাস্তায় যেতেন। আমার সঙ্গে দেখা হলে গাড়ি থেকে নেমে এসে দণ্ডবৎ ক'রতেন—তাঁহার বাড়ীতে গেলাম। তিনদিন বাড়ীতে গিয়েও তার কোন পাত্তাই পেলাম না। আর যার সঙ্গে দেখা পেলাম সে আমলই দিল না। মনটায় বড় চিন্তা এসেছে, রাত্রে ঘুম হয় না, কি করি, ১২।১৪ দিন কেটে গেল এখনও কিছু যোগাড় হলো না। অথচ সেখানে কথা দিয়েছি, কতদূর পর্য্যন্ত এগুলাম তাত জানতে পারছি না।

বরাহনগরে কামাখ্যাদাস বাবাজীর বাড়ীতে আছি, একদিন চণ্ডী সিং নামে ( জনৈক ভক্ত পাটের দালাল প্রিয়নাথ তার নিকট কাজ ক'রত ) ভক্তের নিকট যাব বলে ঠিক করেছি—বাহির হব, এমন সময় একটি মেয়ে এসে খবর দিল তার গুরুদেব ( গৃহস্থ বৈষ্ণব ) পুরী থেকে রথ দর্শন করে এসে কুঠীঘাটে দেহান্ত হয়েছে। পাশেই থানা, দারোগাবাবু বলেছিলেন, আমরা সৎকার করলে আপনাদের আচার নিষ্ঠা বজায় থাকবে না—হাড়ি দিয়ে করাতে হবে। কামাখ্যাদাস বাবাজীর কাছে যান, সেখানে ছেলেরা আছে, তারা শুনলে একাজ করবে—তাদের উপর তাদের শ্রীগুরুদেবের এরূপ আদেশ আছে শুনেছি, এই কথা শুনে মেয়েটী এসেছেন। আমি বল্লাম, আচ্ছা আমার সঙ্গে চলুন। সিথির ছেলেরা গঙ্গা স্নান করতে আসে, তাদের ( নীলরতন, গোপী, প্রিয়নাথ, ছোট বিহারী দা ) দেখা পেয়ে খবর দিলে—তারা বলল,—আপনি যে কাজে যাচ্ছেন যান, আমরা ব্যবস্থা করছি।

আমার তখন মনে হ'ল কখনও তো কলে স্নান করিনি, যখন গঙ্গার ধারে এসেছি, ডুব দিয়ে নি। যেই ডুব দেওয়া অম্নি মনের সঙ্কল্প বদলে গেল। আমার মনে হ'ল এই তো ১২।১৪ দিন কত পরিচিত লোকের কাছে ঘুরলাম কেউ কথাটা মাথায় নিল না। প্রায় ছয় মাস আগে "করুণা" এক চিঠি দিয়ে, তাতে লেখে, সমুদ্রের ধারে বাড়ী বিক্রী আছে কিনা দেখবার জন্য এক খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী, জুতা পায়ে সমাজের কাছে আসতে গেলে আমি বাধা দিই, তাতে সে এল না, বল্ল আমি তো বাঙ্গালী ঘরের ছেলে, ঠাকুরের স্থান আমি জানতাম না, ঠাকুর মন্দির এ আমি নেব না, বলে চলে গেল। কিন্তু ভয় হয় গোঁসাই আর কার কাছে বিক্রয় ক'রবে। তখন ছখানা কাগজে এই খবর নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মাচারীর (আমাদের গুরুভাই, দেবকীনন্দন প্রেস ইহার) মারফৎ ছাপিয়ে দিলাম—একমাত্র বৃন্দাবন থেকে শ্রীযুক্ত মধুসূদন গোস্বামী লিখেছিলেন খবর পেয়ে চিন্তিত রহিলাম, কি হয় জানাইও। আর কেউ সাড়া দিল না। আমার দ্বারা আর টাকা সংগ্রহের চেষ্টা হবে না, হরিদাস ঠাকুর তোমার যদি দরকার মনে কর—তবে কত লাখপতি, কোটিপতি আছে, তাদের ইঙ্গিত করলে ডেকে টাকা দিয়ে যাবে—আমি আর কার দ্বারে চাইতে যেতে পারব না—আর আজকার দিনের মধ্যে কোন ইঙ্গিত না পেলে আমি জল গ্রহণ করব না। এই সঙ্কল্প যেন মা গঙ্গা দিয়ে দিলেন। গঙ্গা স্নান করে কামাখ্যাদাস বাবাজীর বাড়ী গিয়ে দেখি, কামাখ্যাদাস বাবাজী প্রভৃতি যাদের সঙ্গে পাটের দালালের কাছে যাবার কথা হয়েছিল, তারা সকলে চলে গেছে। বলে গেছে, এবেলা দেরী হয়ে গেছে ওবেলা যাবে। আমার ত সঙ্কল্প পূর্ব্বেই বদলে গেছে। যাক আমি রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম—তখন বরাহনগর বাজার হ'তে বীডন স্কোয়ার পর্য্যন্ত ঘোড়ার গাড়ী চলার ব্যবস্থা হোয়েছে। শেয়ারের পয়সা আমার কাছে—তবু আমার কি খেয়াল হল, বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড দিয়ে হেঁটে হেঁটে চললাম। এখনকার হিসাবে তখন কলকাতায় প্রায় ছয়আনা লোক—বড় রাস্তায় বিশেষ লোকের চলাচল নাই—আমি হাসি কাঁদি কেউ নজর করবার নেই। মনে মনে পূর্ব্বোক্তরূপ আব্দার চলেছে। এইরূপে টালার পুল পার হয়ে চীৎপুর ঢাকাপটীতে হীরালাল দত্তের বাটীতে গেলাম। তখন বেলা ১১।১২ হবে।

রায়বাহাদুরের বাগান বাড়ীতে অষ্ট প্রহরের দিন—ঘি ঢেলে ঢেলে মেঝে পিছল হয়েছিল, সে কারণ সকলে নাম থেকে সরে পড়েছিল—এই হীরালালকে বাবাজী মশাই জড়িয়ে ধরে যেতে দেন নাই এবং এর দ্বারা নাম রক্ষা করেন। আমায় হীরালাল জিজ্ঞাসা করল স্নান হয়েছে? আমি—হাঁ, তিলক করুন, করলাম। বল্ল তবে কিছু বাল্যভোগ

পান—আমি বল্লাম না—তখন আর কিছু জেদ ক'রলনা। সেখান থেকে হাঁটতে হাঁটতে বিডনষ্ট্রীট অতীনদার বাড়ী গেলাম—বাড়ীতে দুর্গোৎসব, বাজার করতে গেছেন ফিরে আসলে বল্‌ল—রাম দা! স্নান তিলক হয়ে গেছেত—কিছু খাবারের ব্যবস্থা করে দিই? আমি বল্লাম না, অতিন দা—কেন? আমি আমার সঙ্কল্পের কথা বললাম। তখন অতীনদা বল্লেন "তুমি কি পাগল হয়েছ? ও ভাবনা তোমার কেন, ওতো মহাপ্রভুর নিজের কাজ।" তখন ভাবলাম ঠিক তো আমার মাথা ব্যথার কি দরকার—যা করবার মহাপ্রভু নিজে করবেন। অতীনদার মুখ দিয়ে যা ঠাকুর বললেন তাতে আশা হল। সেখানে তখন একটু সরবৎ ভোগ দিয়ে প্রসাদ পেলাম। সেখান থেকে চাঁপাতলায় রামকান্ত মিস্ত্রীর লেনে বড় বিহারী দার বাড়ীতে গেলাম—তখন দুখানা খোলার ঘর, স্ত্রীপুরুষে থাকেন। তখন প্রায় আড়াইটা বেজেছে, আমি যেতেই বিহারীদা ব'লল'—রামদা! প্রসাদ পেয়েছ? আমি বল্লাম—না, দেখ আজ কি জানি কি মনে হল, ঠাকুরের পারশটা ধরে রেখেছি—অন্যদিন খাবার পর দু এক মুঠা বেশী হয় কিন্তু এ রকম পারশ কখনও ধরা থাকে না, একথা শুনে আমার প্রাণে জাগল—খাবার সঙ্কল্প করেছিলাম বলে পারশ ধরে রেখেছে। তবেতো ব্যথাটী কানে পৌঁচেছে। প্রসাদ পেলাম। বিশ্রাম করছি, এমন সময় শীলবাবুর ঠাকুর সেবক নারাণ বাড়ুয্যে এসে খবর দিয়ে গেলেন। গিন্নিমা একবার আপনাকে দেখা করতে ডেকেছেন।

"আমার মনে তখন জাগল, কত লাখপতি, কোটীপতি আছে, ডেকে দেবে," ইহাও সঙ্কল্পের মধ্যে ছিল—এখন যে ধনীলোক ডাকে তবে ত নিশ্চয়ই প্রার্থনা কাণে পৌঁছেছে। আমরা কাল যাব ব'লে নারাণ বাড়ুজ্যেকে পাঠিয়ে দিলাম। বিহারীদার ভগ্নিপতি বেনে মহলের শিক্ষাগুরু, কাজেই বিহারীদার বেনে মহলে সব জানাশুনা ছিল॥ তার সঙ্গে পরদিন সকালে মতি শীলের বাড়ীতে (মতি শীলের ছেলে কানাই শীল, তাহার পুত্র গোপাল শীল তাহার স্ত্রী কুমুদিনী দাসী-তাহার বাবার নাম হেমচন্দ্র দে, ধর্ম্ম-প্রকৃতি ছিলেন না, খুব ধড়িবাজ ছিলেন, তাঁর বাড়ী ছিল বৌবাজারে।) গেলাম। খবর পাঠালে শীল গিন্নী নীচে নেমে এলেন, বল্লেন—"দেখুন, এবার পুরীতে গিয়ে ঝাঁঝপিটা মঠে বেড়াতে গিয়ে খুব দুঃখ পেয়েছি। (তখন মহান্ত নিত্যানন্দ দাস, জগন্নাথের ষ্টেটের নামে মঠটী লিখে দিয়েছেন, একা মঠে থাকিতেন, খুব নোঙ্‌রা করে রেখেছিলেন, নিজের ইচ্ছামত ৩৷৪টার সময় ভোগ দিয়ে প্রসাদ পেতেন) যদি কিছু দলিল পত্র পাওয়া যায় তবে চেষ্টা করা যায়। বিষয় কথা পড়ায় আমি তখন বল্লাম—এখন নিয়ম সেবার মাস, পুরী ছেড়ে এ সময় আমাদের কলিকাতায় আসিবার কথা নয়, এইজন্য আমরা

কলিকাতায় এসে রয়েছি—এই কথা বলে, হরিদাস ঠাকুরের মঠের কথা বল্লাম। একুশ দিনের মধ্যে ১৫ দিন হয়ে গেল, সে কথাও বল্লাম। তিনি একথাটি কানেই শুনিলেন না, ( কি ঠাকুরের ভঙ্গী, দেখেন যে কি করি ) বল্লেন—এখন বাড়ীতে বড় রোগ চলছে, একদিন নাম করিলে হয়। এ কথাবার্ত্তার পর আমরা ফিরে এলাম। দু-একদিন পরে কয়েকজনকে যোগাড় করে ( কামাখ্যা বাবাজী, হরেকৃষ্ণ বাবাজী নীলরতন দা, প্রিয়নাথ, অনাথ দা, বিজয় দা, জ্ঞান দা, গোপী, শিবুদাস, গৌরহরি দাস বাবাজী, বিহারী দা ) কীর্ত্তন ক'রতে গেলাম। রাত্রে পাকি প্রসাদ পেয়ে সেখানে রইলাম, সকালে চলে আসছি, বল্লেন—কাল রাত্রে কীর্ত্তন ভাল করে শুনতে পাই নাই, আজ কীর্ত্তন করে এখানে মধ্যাহ্নে প্রসাদ পেতে হবে, থাকুন। বৈকালে চ'লে আস্‌তে চাহিলে বল্লেন,—মা প্রভৃতিকে খবর দিয়েছি আজ কীর্ত্তন শুন্‌তে আসবেন—কাজেই থাকলাম। রাত্রে কীর্ত্তন হ'ল, প্রসাদ পাবার পর গৌরহরিকে ( পুরীতে সিন্ধু নিবাসে থাকিত ;—শীল দিদি পুরী গিয়ে ওখানে উঠেছিলেন, শীলদিদিকে সে মা বলেছিল—বড় সরল, সে এসময় এখানে ছিল ), শীল দিদি ডেকে বল্লেন—রামদাদাকে ডেকে দাও আমার বিশেষ কথা আছে। গৌরহরি ঐ কথা আমায় বলিলে আমি ভাবলাম—একেবারে সম্বন্ধ ক'রে ডাক কে শেখালে? এ সম্বন্ধ কে ঠিক করে দিল? এর আগে একবার শালকিয়ার হরিদাসের সঙ্গে কীর্ত্তন কর্ত্তে এসেছিলাম—কীর্ত্তনের পর একটু বাল্যভোগ পেয়ে চলে এসেছিলাম, বাড়ীর মালিকের সঙ্গে দেখা শুনা হয় নাই—তখন ভাগ্নেদের সঙ্গে মামলা চলছিল, তেতলায় তাঁরা ছিলেন, এবারে একেবারে সম্বন্ধ কি ক'রে হ'ল? থাক্, গেলাম। দোল-মণ্ডপের বারান্দায় একা চুপ করে বসে আছেন, আমি গেলে গৌরহরিকে সরিয়ে দিয়ে বল্লেন আমি যা বল্‌ব তা যেন তৃতীয় কাণে না যায়, তা হ'লে বাধা হতে পারে, আমি গরীব ঘরের মেয়ে, কখনও কাউকে নিজহাতে ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা দিই নাই, আমার বাবা "এক্‌জিকিউটর" তাঁকে না জিজ্ঞাসা ক'রে আমি চারটি পয়সাও খরচ করি না, যা বল্‌ব তা যদি বাবার কাণে পৌঁছায় তাহ'লে তিনি বাধা দিতে পারেন, তা ছাড়া ছেলে মেয়ে না থাকায় ভাগ্নের সঙ্গে গোলমাল চল্‌ছে, জানিলে তাহারাও বাধা দিতে পারে, এজন্য গোপনে বলা দরকার। ইণ্টালীর হরিদা আমার বাবার বাড়ীতে—বৌবাজারে খোল বাজাতেন, বাবা গাহিতেন, পুরীতে গিয়ে হরিদার খোঁজে ঝাঁঝপিঠা মঠে গিয়ে তাঁর দেখা না পেয়ে ফিরে আসছি, তখন বাবাজী মহাশয়ের দেখা পাই, তিনি কথা কইতে কইতে মঞ্জু মঠে—যে স্থানে আমরা উঠেছিলাম সে স্থান পর্য্যন্ত এলেন। ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা হ'ল, আমি কিছু টাকা দিতে

চাহিলে তিনি বল্লেন—"টাকা নিয়ে কি কর্ব্ব? ধামে এসেছ ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব সেবায় খরচ কর" আমি বল্লাম, সে ত করিব, আপনাকেও কিছু নিতে হবে, তখন বল্লেন, সামান্য অর্থের প্রয়োজন—তোমার অর্থের অভাব নাই—কি কাজ পরে বল্‌বো।" এই তিনটি কথা বলেছিলেন,—( কলিকাতায় আসিলে আমার বাড়ীতে আসবেন—এ কথা দিয়েছিলেন ) তারপরেই অপ্রকট হলেন। শীলদিদি বাবাজী মহাশয়কে দেখেই বিকিয়েছিলেন—মন্ত্র নিতে হয়নি, খড়দহের সৌরীন্দ্রমোহন গোস্বামী কুলগুরু মন্ত্র দিয়াছিলেন, আজ উঠোউঠি দুদিন স্বপ্নে আদেশ কর্‌ছেন—তোমার এই কাজ ( হরিদাস ঠাকুরের ব্যাপার ) তোমার রাম দাদার সঙ্গে পরামর্শ ক'রে কাজ কর, ( এখন বুঝলাম "রামদাদা" সম্বন্ধ, কর্ত্তা নিজে ঠিক করে দিয়েছেন, এখন পূজার হাঙ্গামা চল্‌ছে। পূজার পর আমরা প্রতি বৎসর বাইরে বেড়াইতে যাই, এবার না হয় পুরীতে যাওয়া যাবে। আপনাদের যা লোক দরকার নিয়ে যাবেন। আমার সঙ্গে লেখাপড়া কর্ব্বার লোক থাক্‌বে, পূজার তিনদিন নিমন্ত্রণ রহিল, আপনারা থাকবেন, কীর্ত্তন ক'রে প্রসাদ পাবেন তাই হ'ল। নবমীর দিন শ্রীনামমহিমা কীর্ত্তন হইল, দশমীর দিন কামাখ্যা দাস বাবাজীর বাড়ীতে গেলাম। ত্রয়োদশীর দিন তিন প্রভুর সূচক শীলবাড়ীতে হ'ল, তার পরদিন পুরীতে রওনা হলাম, গোবিন্দদাকে পূর্ব্বে এ সংবাদ দিয়াছিলাম, আমি ও ফণী পুরী গেলাম। শীল দিদিরা রাধাবল্লভ মঠে উঠলেন—আমি প্রতিদিন জগন্নাথ দর্শন করে ওখানে ঘুরে আসি, সে দিনেও সকালে গিয়েছি। কিছু বলেন নি, দুপুর বেলায় আমাদের একজন উড়িষ্যাবাসী গুরুভাইকে দিয়ে আমায় ডাকতে পাঠিয়েছেন। আমি গেলাম, গিয়ে দেখি যে বাড়ীর সকলকে বাবা, মা প্রভৃতিকে পঞ্চতীর্থ দেখ্‌তে পাঠিয়েছেন, নিজে অসুস্থতার ভান ক'রে শুয়ে আছেন। কাছে বসে আছেন ওঁর মাসতুতো বোন। বয়সে বড়, নাম রাসমণি, রামকৃষ্ণপুরের রাসবিহারীর স্ত্রী ওর কেশিয়ার। আমি গিয়ে বল্লাম "এই তো আজ সকালে এলাম আবার আজ দুপুরে ডাক কেন? তখন বালিশের তলা থেকে এক হাজার টাকার তিনখানি নোট বাহির ক'রে দিয়ে বল্লেন, 'এবার আমি খালাস হ'লাম। তারপর লেখাপড় হ'ল। রেজেষ্ট্রীর প্রথম মুশাবিদার মধ্যে একটি সর্ত্ত ছিল যখন শীলদিদি পুরীতে থাকবেন তখন যেন শ্রীহরিদাস ঠাকুরের প্রসাদ, চরণামৃত পান। এই সর্ত্তের কথা শুনে শীলদিদি কাগজখানি ছিড়ে দিয়ে বল্লেন, এ লেখা না থাক্‌লে কি এঁরা আমায় প্রসাদ চরণামৃত দিবেন না? এ আবার লিখ্‌তে হয়? তোমাদের ভাড়া দিয়ে কলিকাতা হ'তে কি এইজন্য আনিয়াছিলাম এঁরা বাবাজী, বৈষ্ণব, এমনভাবে লেখ যে ভবিষ্যতে কোনরকম গোলমালের মধ্যে এঁদের পড়তে না হয়, আমার নামে লেখা হচ্ছিল আমি বল্লাম—

আমি সেবার কিছু বুঝি না, যদি গোবিন্দদা ভার নেন আমি নিশ্চিন্তই হই।" দুজনার নামে লেখা হল।

হেমবাবু এই তিন হাজার টাকার খবর পেয়ে পুরীতে বল্লেন, "মেয়ে ছেলে পেয়ে ভুলিয়ে টাকা নিল,—কলিকাতায় গেলে খুন কর্‌ব" শীলদিদি জেদী, বল্লেন এবার কলকাতায় গিয়া আমার বাড়ীতে থাকবেন, আমার ঠাকুর বাড়ী পড়ে আছে।

বাবাজী মশায় কলুটোলায় পুলিনদার বাড়ী এসে শীলদিদির বাড়ী খবর দিয়াছিলেন, কিন্তু শীলদিদির বাবা শীলদিদির কাণে সে কথা পৌঁছতে দেন নি পাছে বাবাজীদের জন্য বাজে খরচ হয়। সে ক্ষোভ শীলদিদির বরাবর ছিল। বাবার ঐ ব্যবহারের কথা শুন্‌লেন বাবাজী মহাশয়ের অপ্রকটের পর, প্রাণে খুব লেগেছিল এবং সেই হতে নিজের বাবার উপর বিতৃষ্ণা হ'ল। সে ক্ষোভ মেটালেন আমাদের বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে বাবাজী মশাই এসেছেন এটা ভোগ করিতেন।

বাবা প্রভাতি কীর্ত্তনের কাছে দণ্ডবৎ করতে গেলেন, এদিকে গৌর গোপাল প্রভু ফুল নিতে এসে মার কাছে বসেছেন। বাবা দণ্ডবৎ সেরে সেখানে দাঁড়ালেন। মা 'সঙ্গীত মাধবের" একটু ব্যাখ্যা করছিলেন—কষায় বিশিষ্ট গোপীদের দেহ নিয়ে গোস্বামীরা একটু মুস্কিলে পড়েছিলেন, টীকা দেখে মনে হয়—শেষে এ পর্য্যন্ত আসতে হয়েছে, যোগমায়া সে দেহ অন্তর্দ্ধান করে দেন। আর এখানে প্রবোধানন্দ সরস্বতী পাদ কি সুন্দর মধুরভাবে অতি অল্প কথায় মীমাংসা করেছেন। একি জান ? আসর বুঝে কথা। সঙ্গীত মাধব আসরে আমাদের সম্প্রদায়ের মাধুর্য্যের ভক্তরা আছেন, আর শ্রীমদ্ভাগবতের আসরে সব সম্প্রদায়ের বক্তারা আছেন। তারপর মা সঙ্গীত মাধবের মধ্যে গুরুনিষ্ঠা দেখালেন—শ্রীগুরুদেব এবং অন্যান্য সখীরা বল্‌ছেন—"ঐ রাধারাণীর শ্রীচরণে বিকাও, সব ভোগ করবে—ইনি কি করলেন ? শ্রীগুরুচরণে গিয়ে পড়লেন। মাথা যে এক জায়গায় বিক্রয় করা হয়ে গেছে, তখন শ্রীগুরুদেব সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে একটার পর একটা লীলা ভোগ করাতে লাগলেন। কি সুন্দর প্রার্থনা—এমনভাবে আমায় সঙ্গীত শিক্ষা দিন যেন আপনার সুখ বিধান হয়।

সন্ধ্যারতির পর বাবা বলিলেন—"আজ আরতি দেবার সময় একটা কথা মনে আস্‌ছিল—শ্রীরাধারাণীর শ্বেত চাঁপার বরণ, অনঙ্গমঞ্জুরীর রং কনক চাঁপার মত—নিতাইয়ে অনমঙ্গমঞ্জুরী বলাইকে ঢেকেছেন—তাই ঐ প্রকার রঙ। গৌরের মধ্যে কৃষ্ণ, রাধাভাব-কান্তিতে নিজ মাধুরী আস্বাদন করবার ইচ্ছা করেছেন—এখন নিতাইয়ে

অনঙ্গমঞ্জুরী ফুটে রয়েছেন। অনঙ্গমঞ্জুরী শ্রীরাধার গুপ্ত অঙ্গ—তা দেখে কৃষ্ণের বিস্ময়তার কেমনে চাপা রাখা সম্ভব। তাই নিতাইকে দূরে দূরে রাখছেন।"

তারপর বাবা বলিলেন—"দিদি শ্রীহরিদাস ঠাকুরের নির্য্যাণ কীর্ত্তন সম্বন্ধে যে প্রশ্ন তুলেছেন—তার উত্তর আমার মনে একটু একটু জাগছে। মঙ্গল আরতিতে কেন গৌরের আবেশ? মঙ্গল আরতির পর শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীরাধা প্রভাত হয়ে গেছে এই ভয়ে নিজ নিজ ঘরে চলে গেলেন। সে সময়কার পরস্পরের মাধুরী তাঁরা ভোগ করতে পান নাই—এখন জগন্নাথের মঙ্গল আরতির পর প্রভু অনিমেষ নয়নে তাই ভোগ করছেন। আর এক কথা—বড় সাজ বা সিঙ্গার কোনটা? শৃঙ্গার রসকেলির ফলে সে সাজ অর্থাৎ যে সাজে সম্ভোগ-চিহ্ন ফুটে রয়েছে—সেটি নাগরের সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর সাজ বা সিঙ্গার। সেই মাধুর্য্যই সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর ও সর্ব্বোৎকর্ষী—তাই গৌরকিশোরী ভোগ করছেন। অঙ্গে অষ্টসাত্ত্বিক বিকার ফুটে উঠেছে। কোন্ কোন্ ভোগে কোন্ কোন্ বিকার হয় তাহা গ্রহ দেখে আলোচনা করলে বুঝতে পারবে। কখন কি জাতীয় ভোগ হচ্ছে। আর হরিদাসকে নিয়ে মহাপ্রভুর যে কিছু সুখ এ সম্বন্ধে হচ্ছে স্বরূপ, রাম রায় ভাবের অনুকূল পদাবলী-গানে ভাবের পুষ্টিবিধান-করতেন—আর হরিদাস করিতেন কি? লীলা প্রকট করে দিতেন। নামেতেই ব্রজলীলা রয়েছে। শ্রীহরিদাস ঠাকুর নিরন্তর সেই লীলা প্রকট করে মহাপ্রভুকে ভোগ দিতেন।

"দিনে দিনে বাড়ে বিকার, রাত্রে অতিশয়।
চিন্তা উদ্বেগ প্রলাপাদি যত শাস্ত্রে কয়॥"

এ বিকার সাধারণ অষ্ট সাত্ত্বিক বিকার নয়। এ বিরহের বিকার—অন্য জাতীয় চিন্তা উদ্বেগাদি। এ সময় প্রাণ রাখ্ছেন হরিদাস। রাধারাণীর দশম দশায় প্রাণ বাঁচিয়েছেন হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ··· ··· ··· ···এই নাম। সেই নামের মহাজন হরিদাস। এই হরিদাসকে নিয়ে মহাপ্রভুর যে কিছু সুখ।"

রাত্রে প্রসাদ পেয়ে বাবা কয়েকটি গানের সুর ধরিলেন—

"রাই আমাদের নীল-নীচোলিনী—শ্যাম আমাদের পুরট-পটাম্বর-ধর
রাই আমাদের রাস-রস-রঙ্গিণী—শ্যাম আমাদের রসিকেন্দ্র-চূড়ামণি।"

বল্লেন এরূপ কেবল আঁখর নিতাইদার মুখে শুনা। কাটোয়ার বড় প্রভুর ছেলে নিত্যানন্দ দাস পুরীতে জগন্নাথ মন্দিরে পাদপদ্মের নিকট বসে গাইতেন আর ঝুরতেন।

প্রভুর একটি ছোট গান বলিয়া আবার গাহিলেন—এটিও পুরীতে পাদপদ্মের নিকট বসে নিতাইদার মুখে শোনা।

জয় গৌর গোপাল—জয় আমার প্রভুর জয়
জয় শচীনন্দন জয়—স্বরূপের জীবন জয়
গদাধরের প্রাণনাথ জয়, জয় গৌরগোপাল।
জয় নিজ কান্তা কান্তি কলেবর হে, হা নাথ
জয় নিজ প্রেয়সী ভাববিনোদ হে, জয় গৌরগোপাল।
ব্রজ-তরুণীগণ-লোচন-মঙ্গল হে—হা নাথ
নদীয়ার বধূগণ-নয়ন-আমোদ হে, জয় গোরগোপাল।
যাবৎ জনম তোর অপরাধে হইনু ভোর হে, হা নাথ নিষ্কপটে না ভাজিনু তুয়া হে।
এখন দয়া কর বলতে আমার সরম লাগে হে।

এই একটি আসরে সব কিছু বলা হ'ল। তারপর বল্লেন—এ সব কেউ নিল না— রাত্রি ২টা থেকে ৪টা পর্য্যন্ত প্রভু আর আমি। প্রভু নিজে সুর শিখাতেন, রসালাপের গান প্রভৃতি গাওয়া হত। কুঞ্জের সমর্পণের গান ( খোল করতাল এখানে লাগে না ) ( খোল করতালে গোলমাল হয়ে যাবে)।

বঁধু— আমাদের রাই আমাদের রাই আমাদের রাই কুঞ্জে রইলগো।
আমরা যেমন দিলাম—তেম্নি নিব— ... ... আমাদের রাই
যেন রাইএর মাথার বেণী—অম্নি থাকে ... ... ঐ
আমরা কত সাধে বেঁধেছি— আমাদের রাই
যেন রাইএর সিঁথির সিন্দুর অম্নি থাকে— ঐ
যেন নাসার বেশর অম্নি থাকে— ঐ
যেন বেশভূষা অম্নি থাকে— ঐ
যেন রাইএর চোখের কাজল অম্নি থাকে— ঐ

ইত্যাদি উল্লেখ করে এই সব অঙ্গের ভোগের লালসা জানিয়ে দেওয়াই তাৎপর্য্য—অর্থাৎ ভাল করে ভোগ কর।

# শ্রীশ্রীহরিদাস ঠাকুরের নির্য্যাণ প্রসঙ্গ

**২৪শে ভাদ্র মঙ্গলবার।** **নবদ্বীপ সমাজ বাড়ী**

আজ হরিদাস ঠাকুরের নির্য্যাণ কীর্ত্তন—সকাল থেকে খুব বৃষ্টি হচ্ছে; তাই ঠাণ্ডা লাগবার ভয়ে নাটমন্দিরে বসলেন না। বৈঠকখানা ঘরে কীর্ত্তনে বসলেন। বৃষ্টি হ'বার জন্য এবং কীর্ত্তনের ঠিক সময় জানা না থাকায় শ্রোতার ভীড় ছিল না। নিমাই ঠাকুর, সখী মা, মধু জ্যাঠা প্রভৃতি ছিলেন। সিদ্ধ বকুলে বসে যে টুকু কীর্ত্তন হয় সেটুকু সকাল ৭টা থেকে ৯॥টা পর্য্যন্ত কর্‌লেন; খুব আনন্দ পেলেন। কীর্ত্তনের পর সখীমা, যুগলদা ও নিমাই ঠাকুরকে ডেকে বল্‌লেন—

"শ্রীহরিদাস ঠাকুরের অপ্রকটের পর শ্রীমন্মহাপ্রভুর কেন প্রেমানন্দ হ'ল, এটী বেশ সুন্দর—বল্‌তে বল্‌তে শেষ ভাগের কথাটা চেপে গেলেন। বাবা একথা শুনে বল্লেন "কি জানি দিদির প্রাণে জেগেছে তোমরা জিজ্ঞাসা কর না?"

সখীমার নিকট প্রশ্ন কর্‌লে তিনি বল্‌লেন—"(১) আমার যে কিছু সুখ সব তোমা লইয়া—এ বলছেন কে? বিরহিণী গৌর কিশোরী। বিরহিণী কিশোরী কাহার সঙ্গে সুখ পান? যদি বল সে অবস্থায় একমাত্র নামই আশ্রয়—শ্রীহরিদাস ঠাকুর নামের মূর্ত্তি তাই তাঁর সঙ্গে? এখানে সুখের একটু বিরোধ আসে। নামের স্বরূপ শ্রীহরিদাস ঠাকুরকে বুকে লইয়া প্রেমানন্দ কেমনে আসে? সাযুজ্য-ত বাঞ্ছনীয় নয়, আরও কিছু ওর ভিতর আছে। (২) প্রেমানন্দে নাচেন প্রভু বিহ্বল হইয়া। শুধু আনন্দে না ব'লে প্রেম শব্দটি কেন ব্যবহার করলেন? প্রেম শব্দটি কোন্ ভোগের দ্যোতক?

(৩) শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের অন্যান্য আরতির পরত শ্রীমন্ মহাপ্রভু হরিদাস ঠাকুরের কাছে আস্‌তেন বলে পাওয়া যায় না। মঙ্গল আরতির পর কেন প্রত্যেক দিন আস্‌তেন? মঙ্গল আরতির সঙ্গে শ্রীহরিদাস ঠাকুরের কোনো সম্বন্ধ আছে কি? যদি থাকে তবে হরিদাস ঠাকুরের স্বরূপটি কি?

[৪] সন্ন্যাসীদের নাম আনন্দ দিয়ে হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর নাম কেন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হ'ল? ঐ নামে কি ভোগ? শ্রীমন্মহাপ্রভুর অত নাম থাকতে শ্রীহরিদাস ঠাকুরের শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামে কেন আবেশ?"

সন্ধ্যার পর বাবার ঘরে এইসব প্রশ্ন উঠল। বাবা বল্‌লেন—"আমায় যা বলেছেন তা ছাড়াত আমি কিছু জানি না।" ৩নং প্রশ্নের সঙ্গে বাবা নিমাই ঠাকুরকে বল্‌লেন—"মঙ্গল আরতির সময় শ্রীকৃষ্ণের কি ভাব? নিমাই ঠাকুর বল্‌লেন—"বোধ হয়, ধীর ললিত।" বাবা বল্‌লেন—"গ্রন্থে ধীর ললিতের নায়িকা অনুসন্ধান কর্‌লে এই প্রশ্নের উত্তর হয়ত পেতে পার!" পরে বল্‌লেন, "শ্রীহরিদাস ঠাকুর এবং শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু তত্ত্বতঃ অভিন্ন। তাই নবদ্বীপে প্রথম নাম প্রচারের ভার এঁদের দু'জনকে দেন।" (বৈকালে নাটমন্দিরে কীর্ত্তন হয়েছিল। যুগল দাদা 'প্রেমসিন্ধু' গেয়েছিলেন, তারপর বাবা কীর্ত্তন করলেন)

পুরীধাম—শ্রীহরিদাস ঠাকুরের সমাধি মঠ, স্বর্গদ্বার। সন ১৩১৯ সাল।
১৯শে ভাদ্র, বৃহস্পতিবার পূর্ণিমা। অপরাহ্ন ৫ ঘটিকা।
[ শ্রীশ্রীহরিদাস ঠাকুরের প্রসঙ্গ। ]

শ্রীল বাবাজী মহারাজ তাঁহার বিশ্রাম কক্ষের দক্ষিণ দিকের বারান্দায় জপ মালা হস্তে চেয়ারে উপবিষ্ট, কলিকাতাবাসী ও উৎকলবাসী অনেকগুলি ভক্ত বসিয়া আছেন। জনৈক ভক্ত বলিলেন—বাবা! গত কাল শ্রীহরিদাস ঠাকুরের নির্য্যাণ-লীলা কীর্ত্তনে অপূর্ব্ব আস্বাদন হয়েছে। অনেক নূতন কথা কাল কীর্ত্তনে প্রকাশ হয়েছে। তার মধ্যে কয়েকটি কথা জিজ্ঞাসা আছে; যদি কৃপা করেন?

বাবা—ওগো আমি কি কৃপা করবো? ওসব কথার কোনোটিই আমার কথা নয়, কীর্ত্তন শ্রীগুরু কৃপার দান, শ্রীগুরুদেব তা সাক্ষাতে জানিয়েছেন। কলকাতায় গঙ্গার ধারে একদিন শেষ রাত্রে কীর্ত্তন হয়েছিল—তাতে জয় শচীনন্দনের যে সব আখর বেরিয়েছিল, আশ্রমে এসে মনে চিন্তা করে লিখ্‌ছি এমন সময় কর্ত্তা (বড় বাবাজী মহাশয়) এসে বল্লেন—কি লিখছো? বল্লাম—আজ কীর্ত্তনে জয় শচীনন্দনের যে সব আখর এসেছে তাই লিখে রাখ্‌ছি। তিনি বল্লেন—ওসব আখর তুমি জান্‌তে? ঐ সব আখরের অর্থ কি জান? আমি বল্লাম—না। তিনি বল্লেন—মনে রেখো ও সব কৃপার দান, তোমার শক্তিতে প্রকাশ হয় নাই। কেউ কৃপা করে দিয়েছেন; যত্ন করে হৃদয়ে ধ'রে রাখ, কৃতার্থ হবে। তাঁহার এই আজ্ঞা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করি। আজকাল কীর্ত্তন লিখে রাখার ব্যবস্থা হয়েছে, পরে যখন সেই কীর্ত্তন পাঠ ক'রে আমাকে শোনান হয় তখন ঐ সব কথা আমার মুখ দিয়ে বেরিয়েছে বলেই মনে হয় না।

ভক্ত—কীর্ত্তনে আপনি কি বলেছেন তা কীর্ত্তনের পরে কি আপনার মনে থাকে না।

বাবা—মনের মালিক যেগুলি কৃপা করে মনে রেখে দেন, সেগুলি থাকে। যা মনে থাকে না প্রসঙ্গ হ'লে আবার মনে জাগিয়ে দেন।

ভক্ত—গতকাল কীর্ত্তনে শুন্‌লাম—

হরে কৃষ্ণ নাম সাধন ফলে, প্রাণ যায় গৌরাঙ্গ ব'লে।
সাধন—হরে কৃষ্ণ নাম-কীর্ত্তন, সাধ্য—শ্রীচৈতন্য চরণ॥

এই বিষয়ে কিছু শুন্‌তে ইচ্ছা হয়।

বাবা—শোন বলি! শান্তিপুরে শ্রীসীতানাথ শ্রীহরিদাস ঠাকুরকে প্রশ্ন করেছিলেন—
তুমি হও চৈতন্যের পার্ষদ প্রধান। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ছাড়ি কেন গাও আন॥

শ্রীহরিদাস ঠাকুর উত্তর দিয়েছিলেন—আপনি সর্ব্বতত্ত্ব-বেত্তা হয়েও আমার মুখ দিয়ে রহস্য প্রকাশ করতে ইচ্ছে করছেন? আপনার শ্রীমুখেই নিগূঢ় রহস্য ব্যক্ত হয়েছে। আপনিই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভুর স্তব কালে বলেছেন "জয় জয় হরে কৃষ্ণ নামের স্বরূপ।" আমি "হরে কৃষ্ণ" নাম সাধন কালে "হরে কৃষ্ণ" নামের স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুকেই আরাধনা করি, তাঁহাকেই ভোগ করি! ঠাকুর শ্রীহরিদাসের আজীবন এই সাধন। যাবার সময় শ্রীহরিদাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্য চরণে যে নিবেদন জানালেন তাতো কীর্ত্তনেই শুনেছ—

"জিহ্বায় উচ্চারিব তোমার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম।
এই মত গোর ইচ্ছা ছাড়িব পরাণ॥"

প্রাণের প্রাণ শ্রীগৌরাঙ্গের আত্মগোপন-লীলার অনুকূলে ঠাকুর হরিদাস "হরে কৃষ্ণ" নাম-সাধনা-আবরণে গোপনে গৌরাঙ্গ ভোগ করেছেন। যাবার সময় বাসনা জেগেছে এ রহস্য গোপন রাখ্‌ব না জগৎকে জানিয়ে যাব—"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুই সাধ্য নিধি।" "হরে কৃষ্ণ" নাম সেই সাধ্য-প্রাপ্তির সাধন। হরে কৃষ্ণ নামের অর্থ মহারাস-বিলাস ও নিকুঞ্জ বিলাস। কিন্তু ইহাই সাধ্য-তত্ত্বের শেষ নয়। মহারাস-বিলাসের পরিণতি রাই-কানু একাকৃতি সাক্ষাৎ বিলাস-বিবর্ত্ত, রসভূপ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-স্বরূপই সাধ্যতত্ত্বের অবধি। ঠাকুর শ্রীহরিদাস সেই নিগূঢ় রহস্য জগতে জানালেন।

ভক্ত—আজ্ঞে হাঁ, আমরা কীর্ত্তনেও তাই শুনলাম,—

হরে কৃষ্ণ নাম সাধন ফলে, শ্রীচৈতন্য চরণ মিলে।
অনুমান নয় প্রত্যক্ষ প্রমাণ, এ কথার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।
ঠাকুর হরিদাসের জীবন, এ কথার প্রত্যক্ষ প্রমাণ॥
তাই গৌর নামের সঙ্গে গেল রে
হরিদাসের গৌর-ময় প্রাণ— গৌর নামের সঙ্গে গেল রে।

মধুর প্রসঙ্গ শেষ না হইতেই আরতির ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল, শ্রীল বাবাজী মহারাজ উঠিলেন আরতি দর্শন করিতে। আজ আরতির পরে শ্রীল বাবাজী মহারাজ প্রভু শ্রীজগদ্বন্ধু সুন্দরের সূচক কীর্ত্তন করিবেন, আজ ভাদ্র পুর্ণিমা, তাঁর দশাশ্রয় তিথি।

---

## "শ্রীশ্রীহরিদাস ঠাকুরের প্রসঙ্গ"

স্থান—পুরীধাম, শ্রীশ্রীহরিদাস ঠাকুরের সমাধি মঠ স্বর্গদ্বার।
সন ১৩৫৯ সাল, ২০শে ভাদ্র, শুক্রবার, অপরাহ্ন ৪ ঘটিকা।

শ্রীল বাবাজী মহারাজ তাঁহার বিশ্রাম কক্ষের মধ্যেই আসনে উপবিষ্ট, হস্তে জপ মালা, ঘরের মধ্যে কয়েক জন এবং দক্ষিণ দিকের বারান্দায় অনেকগুলি পুরুষ ও নারীভক্ত বসিয়াছেন। জনৈক অনুভবি ভক্ত—গতকল্য যিনি প্রশ্ন করিয়াছিলেন - আজ আবার তিনি শ্রীল বাবাজী মহারাজকে বলিলেন—

ভক্ত—বাবা! গতকল্য আরতির সময় হয়ে গেল বলে সব কথা আলোচনা করা হয় নাই। সেদিন কীর্ত্তনে শুন্‌লাম—"হরিদাসের নির্য্যাণে প্রভুর উল্লাস" এযে বড় বিরূদ্ধ ভাব। প্রভুর দুঃখ হবার কথা, দুঃখের পরিবর্ত্তে তবে কেন আনন্দ? কীর্ত্তনে এই প্রশ্ন উঠ্‌লো এবং তার সমাধানও হ'ল। সমাধান যা শুন্‌লাম তাহা এই—"হরিদাসের চরিত্রে নামের মহিমা-প্রচার ব্রত উদ্‌যাপন হ'ল। তাইতে প্রভুর আনন্দ।" আরও শুন্‌লাম— "শুধুই কি গৌরের আনন্দ; একসঙ্গে দুজন আছে, নিতাই জড়িত গৌরহরি— শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। উল্লাস বল্‌তে দুয়েরই উল্লাস। "গৌর" নামের মহিমা দেখে নিতাই চাঁদের উল্লাস হ'ল। নিজের চরিত্রে হরিদাস গৌর নামের মহিমা দেখালেন। হরিদাস করিলেন গৌর নামের মহিমা প্রকাশ, তাই নিতাই চাঁদের উল্লাস।"

কীর্ত্তনে যখন এই কথাগুলি শুনলাম খুব ভাল লাগ্‌লো। চোখে দু ফোঁটা জলও এসেছিল কিন্তু তবু যেন কিছুই বুঝ্‌লাম না, অন্তরে তরঙ্গ খেলে গেল তবু যেন প্রবেশ ক'রতে পারলাম না। প্রবেশ ক'রতে সাধ হয় যদি কৃপা ক'রে সাধ পূর্ণ করেন।

বাবা—ওগো কথা কি জান! শ্রীগুরু-কৃপায় কীর্ত্তনে যে সব সিদ্ধান্ত প্রকাশ পায় তিনি কৃপা ক'রলে তার উপলব্ধি হয়। তাঁকে স্মরণ করে কীর্ত্তনে বসি, যা বলান তাই বলি। সেদিন বলালেন—নামের মহিমা প্রচার ব্রত উদ্‌যাপনের কথা। ঠাকুর হরিদাসের ব্রত, নামের মহিমা প্রচার। আজীবন হরিদাস এই ব্রত অশেষ বিশেষে পালন ক'রে, সেই দিন গৌর-চরণে সেই ব্রত উদ্‌যাপন ক'রলেন।

প্রাণ গৌরাঙ্গের কৃপা-প্রেরণায় শ্রীহরিদাস ঠাকুর নামের মহিমা প্রচার ক'রে জীব উদ্ধারের ভার গ্রহণ করেছিলেন। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে প্রসঙ্গ আছে না! মহাপ্রভু- হরিদাস ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা ক'রেছিলেন—"হরিদাস! কলিকালে যবন অপার। কি

উপায়ে তা সবার হইবে নিস্তার ?" হরিদাস ঠাকুর উত্তর দিয়েছিলেন—প্রভু যবনেরা "হারাম" বলে। তাতেই তাদের উদ্ধার হবে।

প্রেমভরে ভক্ত বলে হা রাম হা রাম।
যবনের ভাগ্য দেখ লয় সেই নাম ॥

মহাপ্রভু আরও প্রশ্ন করেছিলেন—"হরিদাস ! স্থাবর জঙ্গম কি ক'রে উদ্ধার হবে ? তারাত নাম বল্‌তে পারে না ?" হরিদাস ঠাকুর বলেছিলেন—প্রভু ! তুমি যে উচ্চ সংকীর্ত্তন করেছ তার প্রতিধ্বনি হয়েছে স্থাবর জঙ্গমে। সে প্রতিধ্বনি নয় তারা প্রতিধ্বনি ছলে নাম কীর্ত্তন ক'রেছে তাতেই তাদের উদ্ধার হয়ে গেছে।

ঠাকুর হরিদাস এমন ক'রে আজীবন নামের মহা-মহিমা প্রচার ক'রেছেন। শুধু প্রচার নয়, আচার ও প্রচার দুইই ক'রেছেন। সেই হরিদাস নিজ নির্য্যাণ দিনে এবারের মত সেই ব্রত উদ্‌যাপন ক'রলেন শ্রীগৌর চরণ বুকে ধরে। হরিদাস এই বাসনা জানিয়ে দিলেন প্রাণ গৌরাঙ্গ চরণে। প্রাণগৌর, নিজের প্রিয় হরিদাসের সেই বাসনা পূরণ ক'রলেন। হরিদাসকে সুখী ক'রলেন ব'লে সেই সুখে আজ তার আনন্দ। হরিদাসের বিরহে নিজের দুঃখের কথা ভুলে তাকে সুখী করার সুখে গৌরের আনন্দ।

ভক্ত—বাবা ! আপনার কৃপায় প্রাণ গৌরাঙ্গের আপন আনন্দের কথা শুনলাম। হরিদাসের সুখে গৌরের আনন্দ। এইবার শুন্‌তে সাধ হয় "শুধুই কি গৌরের আনন্দ, এক সঙ্গে দুজন আছে, নিতাই জড়িত গৌরহরি—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।" এ স্বরূপ কেমন ?

বাবা—ঐ স্বরূপই ত রসরাজ মহাভাব। রায় রামানন্দ ঐ স্বরূপ দেখেই মূর্চ্ছিত হয়েছিলেন।

ভক্ত—আজ্ঞে ! রসরাজ শ্রীকৃষ্ণ, আর মহাভাব শ্রীরাধিকা, এই রাইকানু জড়াজড়ি স্বরূপ, রসরাজ মহাভাব এইত শুনেছি।

বাবা—তা ঠিকই শুনেছ ! কিন্তু এর পরেও কিছু শুন্‌বার আছে, জানবার আছে ব্রজের বিশাখা রায় রামানন্দ, রাই কানু নিয়েই তাদের খেলা, নিভৃত নিকুঞ্জে রাই কানু জড়াজড়ি শ্রীগৌরাঙ্গ-স্বরূপও তার নিত্যই দেখা অভ্যাস আছে, কাজেই সেই স্বরূপ দেখে মূর্চ্ছিত হ'বার কথা নয়। রায় রামানন্দ এমন কিছু দেখে মূর্চ্ছিত হলেন যা এর আগে দেখা ছিল না। তিনি দেখেছিলেন রাই কানু জড়াজড়ি গৌরহরি তার উপরে নিতাই অনঙ্গ-মঞ্জরীর আবরণ।

ভক্ত—বাবা ! এই আবরণের রহস্য কি ?

বাবা—বলি শোন! একদিন নিধুবনে—স্বপ্ন বিলাসে গৌর-স্বরূপ দেখে রাধারাণী পরপুরুষ মনে করে কেঁদে আকুল। প্রাণ বঁধুকে কেঁদে বল্লেন—এক গৌর বরণ যুবা আমার মন হরণ ক'রেছে। আমার পরপুরুষে মতি গেল, কেন এমন হ'ল বঁধু? আমিত তোমা ছাড়া আন জানি-না! শ্রীবৃন্দবনে চতুর্ভূজাদি কত বনদেবতা দেখেছি—তাতে আমার মন তৃপ্ত হয় নাই, ঐ গৌরাঙ্গ-স্বরূপ আমার মন হরণ করলো কেন?

শ্রীরাধিকার ঐ কথা শুনে শ্যামসুন্দর বল্লেন—প্রিয়ে! তুমি যাকে স্বপ্নে দেখেছ, সে পরপুরুষ নয়। সে তুমি ও আমি। আমাদের দুজনের মহামিলন। তোমার সোনার বরণ দিয়ে আমার কালো বরণ ঢেকে আমি গৌর হব।

তোমার প্রেম-মাধুরী কেমন, আমার রূপ-মাধুরী কেমন, আর তুমি তোমার প্রেম মাধুরী দিয়ে আমার রূপ মাধুরী আস্বাদন করে কি সুখ পাও, এই তিন বাঞ্ছিত ধন আমি বহু যত্ন ক'রেও ব্রজে আস্বাদন ক'রতে পারি নাই—তাই এই তিন বাঞ্ছা পূর্ণ ক'রতে নদীয়ায় গিয়ে গৌর হব। তোমাকে স্বপ্নে গৌর রূপ দেখিয়ে তাই পরীক্ষা ক'রে দেখলাম যে আমার বাসনা পূর্ণ হবে কিনা? বুঝ্লাম বাসনা পূরণ হবে, গৌর রূপে যখন তোমার মন মজেছে তখন কেউ আর বাকী থাক্বে না।

প্রেমময়ী রাধে! তোমায় বুকে ধরে, তোমার অঙ্গ-আবরণে আবরিত হয়ে, তোমার নাম নিয়ে ধুলায় গড়াগড়ি দেব। তোমার প্রেম-ঋণ পরিশোধ করবার চেষ্টায় আরও কি করবো শোন; আমার চাঁচর কেশ মুণ্ডন ক'রে কৌপীন পরে কাঙাল হ'ব। জীবের দ্বারে দ্বারে গিয়ে অবিচারে আচণ্ডালে তোমার প্রেমধন বিতরণ করবো। হরি ব'লব বলাইব, আমরা দুজনে মিলে গৌর হব।

ভক্ত—হাঁ বাবা! আপনারই শ্রীমুখে 'স্বপ্নবিলাস' কীর্ত্তনে এই নিগূঢ় লীলার কথা শুনেছি। আরও শুনেছি—শ্রীরাধিকা শ্যাম সুন্দরের মুখে ঐ কথা শুনে বল্লেন—"তোমার "চূড়া ধরা কোথা থোবে, বংশী কোথা লুকাইবে, কালো গৌর হইবে কেমনে?" এযে বড় অসম্ভব কথা! ঐ কীর্ত্তনে আপনি যে আখর দিয়েছেন—তাও মনে আছে—"শ্রীরাধা গোবিন্দ প্রেমের বালাই লয়ে মরে যাই। কেবলারগণ কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য জানে-না।

"ঐশ্বর্য্য দেখিলে নিজ সম্বন্ধ মানে-না।"

চূড়া ধড়া কোথা থোবে, বংশী কোথা লুকাইবে,
কাল গৌর হইবে কেমনে?

শ্রীরাধা আরও ব'লেছিলেন— ওহে শুন প্রাণনাথ তুমি।
কহিলে সকল তত্ত্ব, বুঝিনু স্বপন সত্য
সেইরূপ দেখিব যে আমি॥

তখন পর-পুরুষ জ্ঞানে ভাল ক'রে দেখি নাই, সেই চিত-চোরা গৌর-রূপ আর একবার দেখ্‌বো।

ইহা শুনি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র, কৌস্তুভের প্রতিবিম্বে ; দেখাইলা শ্রীরাধার অঙ্গ। আপনি তাহে প্রবেশিলা, দুই তনু এক হৈলা ; ভাব প্রেমময় সব রঙ্গ। নিধুবনে এই কয়ে, দুই তনু এক হয়ে ; নদীয়াতে ক'রল উদয়।

শ্রীগৌরাঙ্গের স্বরূপ রহস্য এই পর্য্যন্ত শুনেছি কিন্তু শ্রীনিত্যানন্দ আবরিত স্বরূপের কথা ত শুনি নাই। কৃপা করে বলুন।

বাবা—ওগো এ বড় নিগূঢ় কথা। জানত! আত্মসুখের নাম কাম। আর কৃষ্ণ সুখের নাম প্রেম। ব্রজে কেবল প্রেমের খেলা। প্রেম চায় প্রিয়তমকে সুখী ক'রতে তাতে নিজের যত দুঃখই হ'ক না কেন, তারা তা গণ্য করে না। শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর রাই অঙ্গ ঢাকা দিয়ে গৌর হবে ; প্রেম বিরাগে সেই অঙ্গে ধুলায় গড়াগড়ি দেবে, এই কথা শুনে সইলো না অনঙ্গ-মঞ্জরীর প্রাণে। সে মনে মনে স্থির করলো, আমি আমার অঙ্গ দিয়ে রাই অঙ্গ ঢাকা দেব। রাই অঙ্গ ধুলায় লুটাবে এ আমি কিছুতেই হ'তে দেব না। এই বিচার ক'রে তিনি নিজ অঙ্গ-আবরণে রাই-অঙ্গ ঢাকা দিয়েছেন। এর পরেও আরও কত জড়াজড়ির রহস্য আছে শ্রীগুরু-কৃপায় প্রকাশ হবে।

ভক্ত—বাবা! এতে নিতাই আবরণে গৌর অঙ্গ ঢাকা কি ক'রে হ'ল।

বাবা—সব কথা আগে শোন। রাই কানু মিলে গৌর হ'লো। কিন্তু ষোল আনা মিলন হ'ল কৈ! কৃষ্ণের দ্বিতীয় দেহ শ্রীবলরাম। শ্রীরাধার দ্বিতীয় দেহ তাঁহার ভগিনী অনঙ্গ-মঞ্জরী। সেই বলাই অনঙ্গ-মঞ্জরী দুজনে মিলে নিতাই হলো। সেই নিতাই, গৌর অঙ্গ আবরণ ক'রলেন। এইবার হ'ল ষোল আনা মিলন। শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন প্রেমের বিষয়, শ্রীরাধিকা ছিলেন আশ্রয়। গৌর স্বরূপে বৈপরীত্য ঘটলো। রাধাভাবে বিভাবিত কৃষ্ণ অর্থাৎ আশ্রয়ের ভাবে বিভাবিত বিষয়। আর কৃষ্ণ ভাবে বিভাবিত রাধা অর্থাৎ বিষয়ের ভাবে বিভাবিত আশ্রয়। বিলাস-বিবর্ত্তে বিলাস-রঙ্গ এই বিষয় আশ্রয়, আশ্রয় বিষয়েও আবার বিবর্ত্ত উঠ্‌লো—তাতে আবার ভোগ চেষ্টা জাগ্‌লো। শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরের পদে শুনেছ—"নাগর নিতাই নাগরী নিতাই, নিতাই কথা সে কয়।" শ্রীগৌরাঙ্গ যখন নাগর তখন সে নাগরালী ব্রজ-নাগরের নাগরালী নয়, ব্রজ-নাগরীর নাগরালী। আবার ভাবনিধি গৌর যখন নাগরী, তখন নিতাই তার নাগর। এই অভিনব নাগর নাগরীর নাগরালী ও নাগরীলীলার রহস্য অতি গূঢ়। তাই বলেছেন—অতিগূঢ় নিত্যানন্দ এই অবতারে। শ্রীগৌরাঙ্গ জানান যারে সেই জানিতে পারে। শ্রীগৌরাঙ্গের ইচ্ছায় ব্রজের

বিশাখা রামরায় এই নিতাই গৌর জড়াজড়ি রসরাজ মহাভাব স্বরূপ দেখে মূর্চ্ছিত হয়েছিলেন।

ভক্ত—বাবা! আপনার কৃপায় এইবার এই অপরূপ রহস্য জান্‌লাম। এই স্বরূপ যে নিতাই গৌর জড়াজড়ি। তাই আজও হরিদাসের নির্য্যাণ লীলায় দুজনের আনন্দ, এইবার তা বুঝলাম।

প্রসঙ্গ সমাপ্ত না হইতেই আরতির সময় হইল, বাবা উঠিলেন।

## শ্রীশ্রীহরিদাস ঠাকুরের প্রসঙ্গ।

স্থান—পুরীধাম, ঝাঁঝপিটা মঠ। সন ১৩৫৯ সাল
২১শে ভাদ্র শনিবার অপরাহ্ণ ৪টা।

শ্রীল বাবাজী মহারাজ তাঁহার ঘরের উত্তর দিকের বারান্দায় আসনে বসিয়া আছেন, হস্তে জপমালা। দুইজন গোস্বামী এবং শ্রীজগন্নাথের সেবক দুইজন পৃথক আসনে উপবিষ্ট। অনেকগুলি ভক্ত, নরনারী, কেহ বারান্দায় কেহ সিড়িতে কেহবা উঠানে বসিয়া আছেন। শ্রীজগন্নাথের সেবার বিশৃঙ্খলা দেখিয়া শ্রীল বাবাজী মহারাজ বলিয়াছিলেন—**যাঁর কাছে এলাম সেই খেতে পায় না আমরা খাই কি করে? এখানে আর থাক্‌বো না চলে যাব।** এই কথা শুনে শ্রীজগন্নাথের তরুণ সেবকগণ সবাই মিলে সুব্যবস্থা করেছেন। গতকল্য হ'তে বেলা ১০টার সময় রাজভোগ হচ্ছে, সেই সুসংবাদ জানাবার জন্য শ্রীজগন্নাথের পূজারী দুজন এসেছেন—

শ্রীজগন্নাথ সেবক—বাবাজী মহাশয়! আপনার দুঃখের কথা জগন্নাথ নিজ কাণে শুনেছেন। যা বহুকাল হয় নাই তাই হচ্ছে। তার পরদিন থেকে ১০টায় রাজভোগ সরছে। না হবে কেন! আপনি যে জগন্নাথের অন্তরঙ্গ। আপনার দুঃখ তিনি কি সইতে পারেন?

এই সংবাদ শুনিয়া সকলে "গৌর হরি বোল" বলিয়া আনন্দ ধ্বনি করিলেন। শ্রীল বাবাজী মহারাজ আত্ম-প্রশংসা শুনিয়া লজ্জায় অবনত বদন হইলেন। এই ঘটনার পরে শ্রীল বাবজী মহারাজ তাঁর অন্তরঙ্গ ভক্ত শ্রীনন্দলাল পালকে বলেছিলেন—"**ওগো প্রতিষ্ঠা ঢুক্‌ছে। আর এখানে থাকা নয়।**"

অতঃপর জনৈক ভক্ত, যিনি গত দুই দিন যাবৎ শ্রীল বাবাজী মহারাজকে শ্রীহরিদাস ঠাকুরের নির্য্যাণ লীলা সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন করিতেছিলেন আজও তিনি বলিলেন—

ভক্ত—বাবা! শ্রীহরিদাস ঠাকুরের নির্য্যাণ কীর্ত্তনে যা শুনেছি, সে সম্বন্ধে আরও কিছু জিজ্ঞাসা আছে। আপনি গতকল্য বলেছিলেন কাল ঝাঁঝপিটা মঠে গিয়ে হবে। এখন সেই প্রসঙ্গের সময় হবে কি?

বাবা—ঘড়িটা দেখ্‌তো কটা বাজে!

নন্দদাস—আজ্ঞে সাড়ে চারটা।

বাবা—আচ্ছা বল।

জনৈক ভক্ত—বাবা! আপনার শ্রীমুখে কীর্ত্তনে শুনেছি—"হরিদাসের তনু প্রভু কোলে লৈলা উঠাইয়া" আখর শুনেছি—হরিদাসের দেহ কাঁধে করি ভক্ত প্রীতি দেখাইছেন। পূর্ব্বে পূর্ব্বে ইঙ্গিত আছে আমার দেহ হ'তে আমার ভক্তের দেহ বড়। ভক্ত দেহ কত প্রিয় হরিদাসের নির্য্যাণেতে এবার প্রত্যক্ষ দেখাইলেন। আবার সাবধান করে দিলেন হরিদাসের মৃত-দেহ বলে যেন বিচার আসে না। ভক্ত দেহ অপ্রাকৃত। জিয় বা মর বা সাধু। ইহায় পরে যা শুনেছি তার সারমর্ম্ম এই বুঝেছি—হরিদাস জন্ম ভ'রে দৈন্য ব্যবহার দেখাইলেন—প্রাণ গৌর সেই হরিদাসকে কোলে করি যেন জগতে এই জানাইলেন—

যে সাধন করে তৃণাদপি।
আমি তারে বুকে রাখি॥

এই পর্য্যন্ত আপনার কৃপায় মোটা মুটি বুঝেছি, তারপরে হরিদাসকে বুকে ধরায় যে নিগূঢ় রহস্য কীর্ত্তনে শুনেছি সেই বিষয়ে একটু কৃপা ইঙ্গিত পেতে ইচ্ছা হয়।

**বাবা—ওগো কৃপা-ভাণ্ডার যার কাছে তিনি যখন যা দেন তা ধ'রে রাখ্‌তে পারলেই ত কাজ মিটে গেল।**

ভক্ত—ধ'রে রাখ্‌তে পারাও তাঁর কৃপা সাপেক্ষ? সেদিন কীর্ত্তনে শুন্‌লাম বটে—

প্রাণ গৌরাঙ্গের—নিজ ভোগ মাধুরী-ভোগের আধার হরিদাস। তাই তার পরশে প্রভুর উল্লাস। প্রভুর কি ভোগ বল দেখি? শ্রীগুরুদেবের কৃপা প্রেরণায় প্রাণে প্রাণে এই ত জাগে, হরিদাসকে বুকে ধরার সাধ প্রাণে প্রাণে ছিল প্রভুর। সে বাসনা পূরণ হয় নাই। বুকে ধরা দূরের কথা, কাছেও ত আসে নাই, হরিদাসকে ডাকলেও হরিদাস দৈন্য-বশে কাছেও ত আসে নাই। আজ সেই বাসনাপূরণ হ'ল, হরিদাসকে বুকে ধরি নাচ্‌ল। আনন্দ আর ধরে না, ডাকলেও যারে পান নাই কাছে, আজ তারে বুকে পেয়েছে। সারা জীবন যে সব দিয়েছে, আজ তারে বুকে পেয়েছে। হরিদাসের নির্য্যাণ করি ছলা, আজ চিরসাধ পূর্ণ কৈলা। আজ ভোগ করছেন প্রভু, বড় ভোগী গৌর আমার। হরিদাসের অঙ্গ-সঙ্গ আজ বড় ভোগ করছেন প্রভু। শুধু গৌরের আশা মিটান

নয়, হরিদাসেরও আশা মিট্‌ল। শ্রীহরিদাসের কি আশা ছিল তাও সেদিন কীর্ত্তনে শুন্‌লাম—প্রাণ কিশোরীরে আবরণ ক'রে অনঙ্গ-মঞ্জরী-আবেশে নিতাই ছিলেন সব উপরে। হরিদাসের প্রাণে কিন্তু সইল না সইল না। হরিদাসের প্রাণে প্রাণে সাধ ছিল—আমি আবরণ দিব, নিতাই অঙ্গে লাগ্‌তে না দিব। ঠাকুর হরিদাসের আজ সে বাসনা পূরণ হ'ল। নিতাই জড়িত মূরতি হৃদয়ে ধ'রল। আরও শুন্‌লাম—গৌরহরি যে হরিদাসকে কাঁধে ক'রলেন—হরিদাস কাঁধে করা নয় যেন গৌর পড়িল ওড়নায়। এত লীলা নয় অভিনয়—ভক্ত-বাৎসল্য লীলায় এই নিগূঢ় রহস্য ভোগের লাগি হরিদাসের নির্য্যাণ অভিনয়।

বাবা—সবইত ঠিক্ ঠিক্ শুনেছ, স্মরণও আছে দেখ্‌ছি, তবে আর কি শুন্‌তে চাও?

ভক্ত—বাবা! শুন্‌তে চাই ঐ জড়াজড়ির ব্যাপার। ঐ জড়াজড়ির লীলা বড়ই জড়াজড়ি মনে হয়, ভাল ক'রে বুঝ্‌তে পারি না। প্রথম রাই-কানু জড়াজড়ি গৌরহরি, তার উপরে অনঙ্গ-বলাই- জড়াজড়ি নিত্যানন্দ-স্বরূপ—দ্বিতীয় জড়াজড়ি। তার উপরে আবার হরিদাস ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গ তৃতীয় জড়াজড়ি। কেবলই জড়াজড়ি আমরা কি ক'রে ধরি?

বাবা—(মৃদু হাসিয়া) ওগো সে ধরা না দিলে কি ধরা যায়? রামরায়কেই ধরা দিতে চান না! সেই গোদাবরী তীরে প্রথম মিলন। সেই দিন হ'তে দশ রাত্রি তাঁর সঙ্গে কৃষ্ণ কথা রঙ্গে যাপন ক'রেও রামরায় গোরারায়কে ধ'রতে পারেন নাই। আজ রামরায়ের চমক ভাঙ্‌লো। কে এ নবীন সন্ন্যাসী? কি আশ্চর্য্য! এই কি সেই! সেইত বটে, নিজ মুখে এঁকে স্বীকার করাতে হবে এই চিন্তা ক'রে শ্রীগৌর সুন্দরের দুটি চরণ ধ'রে রামরায় বল্লেন—

এক আশ্চর্য্য মোর আছয়ে হৃদয়ে।
কৃপা করি কহ প্রভু তাহার নিশ্চয়ে॥
পহিলে দেখুন তোমায় সন্ন্যাসী স্বরূপ॥
এবে তোমায় দেখি মুই শ্যাম গোপ রূপ
তোমার সম্মুখে দেখি কাঞ্চন পঞ্চালিকা।
তার গৌরকান্ত্যে তোমার সর্ব্ব অঙ্গ ঢাকা॥
তাহাতে প্রকট দেখি সবংশী বদন।
নানা ভাবে চঞ্চল তাহে কমল নয়ন॥
এই মত তোমা দেখি হয় চমৎকার।
অকপটে কহ প্রভু কারণ ইহার॥

রামরায়ের মুখে এই কথা শুনে চতুর চূড়ামণি তখনও চাতুরি ছাড়লেন না, ধরা দিতে চান না, বল্লেন—"রামানন্দ কৃষ্ণে তোমার গাঢ় প্রেম"; প্রেমের স্বভাব এই প্রকারই বটে। মহা-ভাগবতের স্থাবর জঙ্গম দর্শনেও শ্রীকৃষ্ণ স্ফূরণ হয়। তিনি স্থাবর জঙ্গম দেখেন না সর্ব্বত্র তাঁর ইষ্টদেব স্ফূর্ত্তি হয়। তুমি সেই ভাগবতোত্তম, রাধাকৃষ্ণে তোমার মহাপ্রেম, তাই যাঁহা তাঁহা (যেখানে সেখানে) তোমার রাধাকৃষ্ণ স্ফূরণ হয়। এই ব'লে ফাঁকি দিতে চাইলেন—কিন্তু আর পারলেন না। রামরায় বল্লেন—তোমার ভারি ভুরি আর চলবে না। আমি তোমায় চিনেছি—তুমি সেই ব্রজের বংশীধারী রাসবিহারী রসরাজ, মূর্ত্তিমতী মহাভাব শ্রীরাধাকে হৃদয়ে ধরে তার অঙ্গ কান্তিতে শ্যামাঙ্গ আবরণ ক'রে তার ভাবে বিভাবিত হয়ে নিজ রস আস্বাদন ক'রতে অবতীর্ণ হয়েছ। আমাকে উদ্ধার করতে কৃপা করে আপনি এসেছ, তবে আবার কপটতা কর কেন? রামরায়ের এই বচন শুনে—

"তবে হাসি প্রভু তারে দেখাইল স্বরূপ। রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ॥"

"তবে হাসি" এই হাসি কেন বল দেখি? কেন জান? রামরায় যখন কাঞ্চন পঞ্চালিকা ঢাকা শ্যাম গোপরূপ দেখে মহাপ্রভুকে সেই রূপের কথা বলে, বল্লেন—প্রভু তুমি অকপটে বল ইহাই কি না?

তখন মহাপ্রভু মৃদু হাসলেন। হাসির অভিপ্রায় এই যে রামরায় তুমি যে রসরাজ মহাভাব স্বরূপ দেখেছ, যার কথা বলছ, তাতো তোমার ব্রজের বিশাখা স্বরূপের নিত্য দেখা, চেনা, জানা। এবার তারও উপরে তোমার অচেনা অজানা আরও কিছু নিগূঢ় রহস্য দেখ। মৃদু হাসিতে এই ইঙ্গিত ক'রে—"তবে হাসি প্রভু তারে দেখাইলা স্বরূপ। রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ॥"

দেখি রামানন্দ হইল আনন্দে মূর্চ্ছিতে।
ধরিতে না পারে দেহ পড়িলা ভুমিতে॥

সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব অপরূপ মহাভাব রসরাজ স্বরূপ দেখে রামানন্দ আনন্দে মূর্চ্ছিত হ'লেন। রামরায় দেখলেন—রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ। রসরাজ শ্রীকৃষ্ণ, মহাভাব শ্রীরাধিকা, তারা দুই একরূপ, শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধা অভিন্ন স্বরূপ। তারাই দুই, একরূপ, রসভুপ শ্রীগৌরাঙ্গ স্বরূপ।

আরও দেখলেন রসরাজ শ্রীকৃষ্ণের দ্বিতীয় দেহ শ্রীবলরাম, মহাভাব শ্রীরাধিকার দ্বিতীয় দেহ অনঙ্গমঞ্জরী, তারা দুই একরূপ, অপরূপ শ্রীনিত্যানন্দ-স্বরূপ। তারা দুই একরূপ, অর্থাৎ শ্রীগৌরাঙ্গ-স্বরূপ ও শ্রীনিত্যানন্দ-স্বরূপ, উভয়েই রসরাজ মহাভাব। শ্রীচরিতামৃতে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেছেন—"দুই ভাই এক তনু সমান প্রকাশ।" শ্রীচৈতন্য ভাগবতে শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলেছেন—"চির দিবসের প্রেমে চৈতন্য নিতাই। দুঁহে দোঁহা ধ্যান করি নাচে এক ঠাই॥" দুই ভাই এক ঠাঁই গোপীকা সমাজে। করিলেন রাস ক্রীড়া বৃন্দাবন

মাঝে॥" অভিন্ন স্বরূপ না হ'লে এক ঠাঁই রাসক্রীড়া কি ক'রে হয়। যে রাস ক্রীড়ায় সুবল মধুমঙ্গলাদি সখারও প্রবেশাধিকার নাই, এক ঠাঁই দুই ভাই সেই রাস ক্রীড়া কি ক'রে হয় বোঝ দেখি? শ্রীচৈতন্য-মঙ্গলে শ্রীল লোচনদাস ঠাকুর বলেছেন—"অভিন্নচৈতন্য বন্দো ঠাকুর অবধূত। শ্রীনিত্যানন্দ নাম রোহিণীর সুত॥" "সর্ব্বোপরি তত্ত্ব নিতাই গৌরাঙ্গ স্বরূপ। রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ॥"

মহাপ্রভু দেখালেন তাই রামরায় দেখলেন—এই রসরাজ মহাভাব নিত্যানন্দ আবরিত শ্রীগৌরাঙ্গ। নিতাই গৌর জড়াজড়ি, নাগর নাগরী, নাগরী নাগর, মূর্ত্তিমন্ত প্রেমবৈচিত্র্য, বিলাস বিবর্ত্ত স্বরূপের আবার বিলাস বিবর্ত্ত, তাতে আবার ভোগ চেষ্টা, রসরাজ গৌর, মহাভাব নিতাই, রসরাজ নিতাই, মহাভাব গৌর, বিলাস বিবর্ত্তে বিলাস রঙ্গ। তাই দেখে রামরায় আনন্দে মুর্চ্ছিত হ'লেন।

ঠাকুর হরিদাস সেই স্বরূপকে নিজ অঙ্গ আবরণে আবরিত ক'রে চির দিনের নিজ বাঞ্ছা পূর্ণ করলেন। নব রসের গোরারায় হরিদাসের নির্য্যাণ ছলে হরিদাসকে বুকে ধ'রে চিরদিনের সাধ মিটালেন।

এইসব নিগূঢ় লীলার অপূর্ব্ব সিদ্ধান্ত শ্রীল বাবাজী মহারাজের শ্রীমুখে শ্রবণ করিয়া সকলে অঝোর নয়নে কাঁদিতে লাগিলেন। আরতির সময় হইল, প্রসঙ্গও সমাপ্ত হইল।

---

১৩৫৯ সাল ৯ই পৌষ শ্রীপাঠবাড়ী রাত্রি ৮॥০।

পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজ—শ্রীশ্রীরথযাত্রার পর হইতে বরাহনগর শ্রীশ্রীপাঠবাড়ী আশ্রমে অবস্থিতি করিতেছেন। এ সংবাদ আমাদের সকল শ্রীগুরু ভ্রাতা ও ভগিনীগণ প্রায় অবগত আছেন। শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজের নিত্য পাঠ্য শ্রীশ্রীদাদামহাশয়ের অষ্টকালীয় লীলাময় শ্রীলবঙ্গ-মঞ্জরী গুটিকা পাঠ সমাপ্ত হইয়াছেন। নিত্য নিয়মানুসারে উদ্দণ্ড শ্রীনাম সঙ্কীর্ত্তনের সমাপ্তি-কালে দণ্ডবৎপ্রণাম করিবার জন্য নিজগৃহের বারাণ্ডায় আসিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করতঃ পুনঃ নিজ আসনে আসিয়া বসিয়াছেন। এমন সময়ে (আমাদের গুরুভ্রাতা) ডাঃ শ্রীযুক্ত গণপতি ঘোষ শ্রীখণ্ডের শ্রীযুক্ত বসন্ত কাকার লিখিত একখানি পত্রী পাঠ করিলেন। গৌররসমাধুর্য্যপ্রকাশময় পত্রীখানি শুনিতে শুনিতে শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজ পরমানন্দিত হইয়া ডাঃ গণপতি দাদার প্রতি দৃষ্টি করিয়া বলেলেন—

**ঐ যে গো তোমাদের সেই শ্লোক যাঁর ভাব এক আত্মা হয়েও দুই হ'লো"।**

গণপতিদাদা শ্লোকাংশ-"রাধাকৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনী-শক্তিরস্মাদ্" উচ্চারণ করিলেন। তত্র উপবিষ্ট শ্রীযুক্ত ক্ষেত্র গোপাল চক্রবর্ত্তী দ্বিতীয় পাদটী, "একাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ" আবৃত্তি করিলে শ্রীল বাবাজী মহারাজ তাহার দিকে দৃষ্টি করিয়া বলিলেন—

**ঐ তো এক থেকে দুই ; সাধারণভাবে যা বলে দুই থেকে এক, তা তো নয়, সেই এক।**

একটু পরেই বলিলেন—

**শ্রীগুরুরূপে প্রকাশ, তার নিজ নাম, গুণ, লীলা আস্বাদ্ করার স্বরূপ।**

ডাঃ গণপতি দাদা বলিলেন এর পরে তো আর প্রকাশ করা চলে না। শ্রীল বাবাজী মহারাজ একটু গম্ভীর হইয়া বলিলেন—

**এর পর বল্লেই যে বিপদ, সব গোলমাল হয়ে যাবে, জগৎ নিতে পারবে কেন?**

কলিকাতার শ্রীগুরুভ্রাতাগণ উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের দিকে দৃষ্টি করিয়া বলিলেন—

**কাল তোমাদের বড় দিন, নাম হবে, কলিকাতার নামে সব একবার যেও, একটু নাম করে এস।**

প্রসাদ পাইবার সময় সমাগত হওয়ায় অদ্যকার প্রসঙ্গ সমাপ্ত হইল।

—০—

১১ই পৌষ রাত্রি ৮৷৷০টা—

নিত্য নিয়মানুসারে নিত্যপাঠ্য শেষ হইয়াছেন। উদ্দণ্ড নাম সঙ্কীর্ত্তনের সমাপ্তি কালে দণ্ডবত প্রণাম করিয়া শ্রীল বাবাজী মহারাজ নিজ গৃহে আসিয়া বলিলেন—

**ত্রিকাল সত্য লীলা ভোগ করলে তবে তো? তখন ছিল এখন নাই, তা তো নয়, ঠাকুর মশায়ের কথা "মনের স্মরণ প্রাণ"।**

ডাঃ গণপতি দাদা বলিলেন নামের সহিত রূপ গুণ লীলা ভাবিলে তবে হয়। সকলকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীল বাবাজী মহাশয় আদেশ করিলেন—

**মনঃশিক্ষা পড়বে, মনঃশিক্ষা পড়লে মনে হয় কিছু করছি না, অদ্ভুত জিনিষ।**

সাধনের প্রথমে শেষেও মনঃশিক্ষারই প্রয়োজন, এই ভাব প্রকাশ করিবার জন্য ডাঃ গণপতি দাদা বলিলেন—"আগেও গোরা পাছেও গোরা", শ্রীল বাবাজী মহারাজ একটু হাসিলেন।

শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রদা বলিলেন রোজ পড়লে ডাল ভাত হয়ে যায়। শ্রীল বাবাজী মহারাজ বলিলেন—

**স্মরণ না থাকলে ভোগ হয় না, কথাতেই তো সব আছে, পড়্‌তে হয় না।**

গণপতি দাদা বলিলেন—বৃন্দাবনে একটা কথা আছে—"গুরু বৈষ্ণব ভগবান তিনের দয়া হ'লো, মনের দয়া বিনে জীব ছারে খারে গেল"। শ্রীল বাবাজী মহারাজ মৃদু হাসিয়া বলিলেন—

**মনঃশিক্ষা পড়্‌লে, কে তুমি উপলব্ধি হয় না? ছোট কথা পড়ে না, সব বড় বড় পুঁথি পড়ে, সমস্ত তত্ত্বের সার হচ্ছে "প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা" পাঠ করবার লোক নাই, 'রস, বস্তু', এর যদি অনুভব হয় তবে তো! আমাদের তো অবস্থা নাম-প্রসঙ্গ করে বেশ আছি, এ সমস্ত শুনলে আর বেশ থাকা যায় না।**

প্রসাদ পাইবার সময় সমাগত হওয়ায় অদ্যকার প্রসঙ্গ সমাপ্ত হইল।

---

**১৩৫৯ সাল ২৩শে পৌষ বুধবার রাত্রি ১০টা হইতে ১২॥০টা পর্য্যন্ত**

শ্রীগুরুমুখ-পদ্মবাক্য হৃদয়ে করিয়া ঐক্য
আর না করিহ মনে আশা।
শ্রীগুরু-চরণে রতি সেই-সে উত্তমাগতি
যে প্রসাদে পূরে সর্ব্ব আশা॥

শ্রীশ্রীমহাপ্রসাদ পাওয়ার পর শ্রীগুরুদেব কোচের উপর বসিয়াছেন। এমন সময় কয়েকমূর্ত্তি শ্রীগুরুভ্রাতা সন্মুখে আসিয়া বসিলে তাহাদিগকে দেখিয়া শ্রীগুরুদেব কিছু উদ্বেগের সহিত বলিলেন—

**ধর্ম্মকর্ম্ম আজকাল একটা হুজুগ হয়েছে যার চিত্ত একটু স্থির আছে তাকেও চঞ্চল করে দিচ্ছে, খালি আড়ম্বর, এক জায়গায় মন না বস্‌লে আর শান্তি নাই।**

শ্রীগুরু-আনুগত্যে ইষ্টনিষ্ঠাই একমাত্র শান্তির পথ। কিন্তু আজকাল জনসমাজ এতই আড়ম্বর-প্রিয় হইয়াছে যে, তাহারা ধর্ম্ম কর্ম্ম বলিতে আড়ম্বরকেই বুঝে। কোন-স্থানে ঐশ্বর্য্যময় আড়ম্বর দেখিয়া তাহাতে চিত্ত লুব্ধ হইলে ইষ্টনিষ্ঠায় হয় বিগতি, তাই শান্তিও হয় দূরবর্ত্তী। আমাদের মধ্যে অনেকেরই এই প্রকার আড়ম্বর-প্রিয়তায় চিত্তচাঞ্চল্য লক্ষ্য করিয়াই শ্রীগুরুদেব অতি দুঃখের সহিত এই কথা বলিলেন।

ইষ্টবস্তুতে নিষ্ঠা রাখিতে হইলে স্বপথে ও স্বমতে অর্থাৎ শ্রীগুরূপদিষ্টসাধনে ও স্বসম্প্রদায়ে মনকে সর্ব্বদা আবদ্ধ রাখিতে হইবে। তাই শ্রীগুরুদেব ইষ্টনিষ্ঠার উপায় দেখাইয়া বলিলেন—

"গুরুসূত্র, গুরুপুত্র, গুরুপরিবার।
এইতিন লইয়া কর, আচার ব্যবহার॥
বাহিরে গেছ কি ব্যস্।

কিন্তু আমাদের এমনই দুর্দ্দৈব যে, কোথাও কিছু আড়ম্বর দেখিলে আমরা ছুটিয়া যাই। যাই কেন? বিচার করিলে স্বতঃই প্রতীয়মান হইবে—ঐশ্বর্য্য ও প্রতিষ্ঠাময় হৈচৈই আমাদের চিত্তকে আকর্ষণ করে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষায় এ-সবই উপশাখা বই কিছু নয়। এই কথা বুঝাইতেই শ্রীগুরুদেব বলিলেন—

**তোমাদের সম্প্রদায়ের যে হিসেব আজকালকার ধর্ম্মজগতে ঠিক তার বিপরীত; "প্রতিষ্ঠার ভয়ে পুরী (** শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরী **) যায় পলাইয়া", আর এখন প্রতিষ্ঠাই হ'চ্ছে ধর্ম্ম; শ্রীপাদ গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজ** (প্রতিষ্ঠার ভয়ে) **পায়খানায় বাস করতেন।**

পরম-করুণ শ্রীগুরুদেব প্রসঙ্গ-ক্রমে শ্রীআচার্য্যগণের এই প্রকার সদুপদেশ ও আচরণ জানাইতে জানাইতে নিজ-জীবনের কোন অতীত-ঘটনা স্মরণ হওয়ায় তাহাও বলিতে লাগিলেন—

**একবার কাশিমবাজারে ছ'ঘণ্টাধরে নাম, খুব বাহবা; ম্যালেরিয়ার ডিপো পুকুর, সেই খানেই স্নান, ছত্রিশ জনেরই কণ্ঠরোধ। বল্লাম, রক্ষা করবার জন্যই (** প্রতিষ্ঠার হাত হইতে **) এই কণ্ঠরোধ, কব্‌রেজ-ডাক্তার্ কতকী, আমি বল্লাম্ কিছু হবে না; তৃতীয় দিনে নগর কীর্ত্তন, ব্যস সব ঠিক (** গলা পরিষ্কার হয়েছে **), খুব্ মাতামাতি কীর্ত্তন; এই সব জন্যে আর বল্‌তে ইচ্ছে হয় না যে, ওখানে যাব বা এই ক'র্‌ব, নিয়ে যায় যাব, না হয় চুপ করে বসে থাক্‌ব।**

এই বলিয়াই শ্রীগুরুদেব নিজ-ইষ্ট-নির্ভরতা প্রকাশ করিয়া কিছুক্ষণ পরে ইষ্টদেবের অপার করুণার কথা স্মরণ হওয়ায় বলিতে লাগিলেন—

ক্ষ্যাপা ঠাকুর ( সিঙ্গুরের দাদা মহাশয় ) আমায় মহাজিনিষ দিয়ে গেছেন—"প্রতিষ্ঠা শূকরী বিষ্ঠা"; কৃপাকরেই বলেছিলেন, "পথে তিনজনের সঙ্গে দেখা হবে, সাবধান! প্রতিষ্ঠা, গৌরব, অভিমান, এই তিনটীকে বাঁচিয়ে চ'ল্‌বে ; "তৃণাদপি সুনীচেন, তরোরিব সহিষ্ণুনা"—দুটি কথা বেদের সার।

বলিয়া একটু চুপ করিলেন আবার বলিলেন—

"পতিত পাবন নাম শুনেছ",
তাতে তোমার ভরসা কিসে।
অভিমানের মঞ্চোপরি
তুমি যে ভাই আছ বসে॥"

সে কেবল—'যে পড়ে আছে তাকেই দেখে' উঁচুর দিকে দেখে না'—

বলিয়া শ্রীগুরুদেব কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকার পর আবার বলিলেন—

"অভিমানী ভক্তিহীন, জগমাঝে সেই দীন",

"অভিমানীর কখনও ভক্তি হয় না, আর যার ভক্তিধন নাই জগমাঝে সেই প্রকৃত দরিদ্র", তাই শ্রীগুরুদেব আমাদের অভিমানই যে ভক্তিহীনতা-রূপ-দীনতার একমাত্র কারণ, ইহা লক্ষ্য করিয়াই যেন কাতর প্রাণে শ্রীশ্রীনিতাই চাঁদের নিকট আমাদের পরমমঙ্গল প্রার্থনা করিয়া বলিলেন—

কোথা নিতাই পতিত খোঁজা,
আমি যে পতিতের রাজা।

শ্রীগুরুদেবের এত উপদেশ বাণী সত্ত্বেও হায়! হায়! আমরা অভিমান ও প্রতিষ্ঠা-লোলুপতা ছাড়িতে পারি না, কি জানি কোন অজ্ঞাত পথে উহারা আমাদের চিত্ত অধিকার করিয়া বসে। শ্রীনামযজ্ঞ সুদীর্ঘ দিনের জন্য সঙ্কল্প করার মধ্যেও অধিকাংশ স্থলেই প্রতিষ্ঠালোভ লুকাইয়া থাকে। আবার শ্রীনামযজ্ঞ আপন প্রভাবে সুসমারোহে চলিতে থাকিলেও অভিমান আসিয়া চাপিয়া ধরে,—'আমি সুযোগ্য পাত্র'—আমাদের মনের এই কলুষতা চোখের সম্মুখে ধরিবার জন্যই শ্রীগুরুদেব বলিলেন—

সে বড় সূক্ষ্ম হিসেব—এই যে এক বৎসর নাম হচ্ছেন—ভাব উঠছে—অনেকেই বলেছে ;—যদি একটু প্রতিষ্ঠা আসে—আমি যোগ্যপাত্র বলেই ঠাকুর আমাকে দিয়ে করিয়েছেন ; তা'হলেই হ'য়ে গেল। রাস্তা—সবাই যোগ্য, কেবল আমিই অযোগ্য। এইজন্য অনেকেই বলেছিলেন ( উপদেশ দিয়েছেন ) 'চুপচাপ করে যাও' তিন তলায় উঠায় অনেকে, আমায় কে ?

তুলসীদাসজী বল্‌তেন—
নিন্দুক বেচারী মিত্ত হামারী,
নিত ময়লা ধোয়।
এইসে নিন্দুক মর গেও
তুলসীদাস বৈঠ রোয়॥

এই অভিমান, প্রতিষ্ঠা, হায়! হায়! আমাদের গুরুনিষ্ঠাও ভুলাইয়া দেয়, তখন দু'চারটি গ্রন্থ পড়িয়া দু'চারটি সিদ্ধান্ত শিখিয়াই অভিমানমদে মত্ত হইয়া প্রতিষ্ঠার উচ্চসিংহাসনে বসিয়া আমরা শ্রীগুরুদেবের উপদেশ পর্য্যন্ত মানিতে পারি না। দুর্দ্দৈব আমাদের, তখন শ্রীগুরুদেবকে ভ্রান্ত বলিয়া মনে হয়। এমন দুর্ব্বিপাক হইতে আমাদের সতত রক্ষা করিবার জন্যই শ্রীগুরুদেব ঐ প্রকার বলিলেন—

সম্পূর্ণরূপে 'আমি' 'আমার' না ভুলিলে, তোমার হলাম বলে পদে না বিকাইলে পূর্ণ গুরুকৃপা-গ্রহণের আধার তৈয়ারী হয় না। শ্রীগুরুদেব পূর্ণ কৃপা করিতেই ব্যাকুল হইলেও, অপার কারুণ্য-বসেই আধার অনুরূপ কৃপা, আদেশ করিয়া থাকেন।

একমাত্র শ্রীগুরুনিষ্ঠাই সকল বিপদ হইতে বাঁচিবার উপায়। সেই নিষ্ঠাপহারী অভিমানের গতি অতি সূক্ষ্ম, সে-কথা জানাইতে তিনি আত্মচরিতের অবতারণা করিলেন—

"বড় সূক্ষ্মগতি। বন্ধুর আদেশ, আমাকে পাঠিয়ে দিলেন বৃন্দাবন, তখন বয়েস কম"

বন্ধুসুন্দর বৃন্দাবনে শ্রীগুরুদেবকে কঠোর নিয়মে ও তীব্র শাসনাধীনে রাখিয়াছিলেন। বঙ্গদেশে আসার প্রাক্কালে তাঁহাকে আদেশ করিলেন "বৃন্দাবনে থাক মঙ্গল হবে" শ্রীগুরুদেব কিন্তু সঙ্গ ও সেবালালসায় বলিয়া ফেলিলেন "তবে থাকি"।" চিরবান্ধবের মুখে "তবে" কথাটি শুনিয়া প্রভু বলিলেন "ছি চাঁদে কলঙ্ক" হ'ল—সেই কথা স্মরণ করিয়া শ্রীগুরুদেব বলিলেন—

"ছি চাঁদে কলঙ্ক, "পাথরের 'খোদার মত কথাটা বুকে লেগে আছে। বড় শক্ত পথ বড় শক্ত পথ!"

বলিয়া একটু চুপ করিলেন। শ্রীগুরুদেবের কৃপা গ্রহণ করাও বড় কঠিন, এই কথার ইঙ্গিত করিতেই আপন মনেই ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন—

**গুরুর কৃপা পাওয়া! কেউ নিতে পারবে না এ-সব কথা বল্‌লে; আমি অনেক বলে দেখেছি। এখন বল্‌লে বুঝবে না, আসুক সময় বুঝবে।**

আবার একটু চুপ করিয়া বলিলেন—

শ্রীখণ্ডের বসন্তদা এঁরা বলেছেন ভজন ক'রবে চুপে চুপে। কর্ত্তা অপ্রকটের ৭ দিন পূর্ব্বে ডেকে বল্লেন—"রাম! মহাপ্রভুর বাড়ী 'নামের' জন্য ডাক এসেছে, পারবে?" আমি একে তাকে ডেকে বেহদ্দ"। কর্ত্তা আবার ডেকে বল্লেন, কি হলো? আমি বল্লাম — কাকেও তেমন দেখিনা তখন বল্লেন—"করতাল বাজিয়ে নাম করতে পারবে? যদি পার তাই ক'রো, যেন যাত্রার দলটি ক'রো না।"

শ্রীগুরুদেবের বিশ্রামের সময় হওয়ায় অদ্যকার প্রসঙ্গ সমাপ্ত হইল।

—০—

১৩৫৯ সাল ৬ই মাঘ, শ্রীশ্রীসরস্বতী পূজার দিন—বেলা ১০টা

শ্রীগুরুমুখ-পদ্মবাক্য হৃদয়ে করিয়া ঐক্য
আর না করিহ মনে আশ।।

শ্রীল বাবাজী মহারাজের শ্রীঅঙ্গে তৈল মর্দ্দন হইতেছে, মঠে উপস্থিত কয়েক মূর্ত্তি শ্রীব্রজবাসী-সম্বন্ধে শ্রীলবাবাজী মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন—

'এঁরা কি নবদ্বীপ হ'য়ে অন্য কোথাও যাবেন না কি?'

যেই শুনিলেন প্রয়াগ হ'য়ে যাবেন—অমনি কি এক ভাবে বলিলেন—

"প্রয়াগের মেলা? মাঘে প্রয়াগে কোটীকল্পবাসী"। কেন এত কষ্ট ক'রে লোক করে এই সব। শুধু নাম করলেই তো হয়। সংসারী লোক ঐ সব করে—পদ, প্রতিষ্ঠা পাবো বলে। ফল শ্রুতি তো তাই। বুড়ো (সিঙ্গুরের দাদামহাশয়) রাত ১২টায় 'মন্ত্র' দিয়ে ব'ল্লে 'বাবা'! পথে তিনজনের সঙ্গে দেখা হবে—লাভ, পূজা প্রতিষ্ঠা, এদের খপ্পরে পড়িস্ না। বৃষ্টি হ'লে জল দাঁড়ায় নীচে—নীম্ন ভূমি হ'লে তবে তো দাঁড়ায়। রবিঠাকুর যে পথেই থাক্ না কেন 'আমার মাথা নত ক'রে দাও হে তোমার চরণ ধূলার পরে'। এ ভাষা এলো কোথা থেকে? দৈন্যেই আসনে না ব'সলে'। আরে পতিতপাবন! পতিতের জন্যেই তো! অভিমান মঞ্চে তুমি রয়েছ ব'সে, শুধু আমি আমি, আর কিছু নাই'।

গতকল্য রাত্রে শ্রীলবাবাজী মহারাজ শ্রীশ্রী"নদের নিমাই" মন্দিরে (হাওড়ায়) শ্রীনীলাচল-লীলা অভিনয় দেখিয়া আসিয়াছেন। সেই কথা ভাবিতে ভাবিতে স্নান সারিয়া আসিয়া, অনুগতদাস-ক্ষেত্র-গোপালকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

'বিদগধ নাগর নাগরী ভাবে' এই গানটী মুখস্থ আছে কি না? না থাকায় সে-সঙ্গীতের শ্রীগ্রন্থটী আনিয়া দিলে শ্রীতিলক রচনা করিতে করিতে গানটী পড়িবার ইঙ্গিত করিলেন—

ডাঃ শ্রীযুক্ত গণপতি ঘোষ উক্ত গানটি পাঠ করিলেন। তখন সকলকে লক্ষ করিয়া শ্রীল বাবাজী মহারাজ বলিলেন—

শুধু গ্রন্থ প'ড়ে "ও" টাকার মারফতে ভোগ হবে না, গ্রন্থ প'ড়েও কিছু হবে না, "গুরু কৃপায় বুঝতে হবে।" জিজ্ঞাসা ক'রেছিলুম্ (বড় বাবাজী মহাশয়কে) নাম তো সবই আছে—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, শচীসুত, নিতাই-গৌর, তুমি উল্টো পাল্টা ক'রে দিলে কেন? (ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম্ জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম)। ব'ল্লেন—

'ভজ আর জপ রইলো'।

কিছু পরে আবার বলিলেন—

'কৃপাসিন্ধু থেকে জীবে দয়া আসে। ব'সে নরকের ছবি দেখ্‌ছেন (বড় বাবাজী মহাশয়); হঠাৎ আমি গিয়ে দাঁড়িয়েছি, দেখি চোখ দুটো লাল, জোর করে ব'লছে—'কি সে তুমি পতিত পাবন? নিতাই! আমি ঘোর নারকী আমায় উদ্ধারিতে নার কি?

একটু পরে শ্রীবৃন্দাবনের সিঙ্গারবটের গোঁসাইজীকে (শ্রীযুক্ত দেবকী-নন্দন প্রভু) স্মরণ করিয়া বলিলেন—

গোঁসাই এক কোনে ব'সে থাকতেন, সামনে সমান ক'রে পাতা শ্রীচরিতামৃতের গ্রন্থ····· শেষের পয়ার—"কৃষ্ণলীলামৃতসার, তার শত শত ধার; দশদিক বহে যাহা হইতে। সে চৈতন্যলীলা হয়" ব্যস এই পর্য্যন্ত, আর বেরুতো না; দর্শন ক'রতে গেছি—বলছেন······ আমি পতিত, এক পাশে পড়ে আছি, একবার কোরে এস, একবার ডাকি, এসে দেখ্‌তে নাই।

ডাঃ দাদাকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীল বাবাজী মহারাজ পুনঃ বলিলেন—

"কীর্ত্তন হ'চ্ছে রাজবাড়ীতে, অভাব সূচক পদ গাওয়া হচ্ছে, গোঁসাই শুনে হুঙ্কার দিয়ে "সাক্ষাৎ দেখে আবার কই"! বলে'ই একেবারে উলঙ্গ"। এ সব চোখে দেখা! এই সবই স্মরণ করি। শেষে কাপড়ে ঘেরা দিয়ে নিয়ে যাই।

বেলা অধিক জানিয়া সকলে প্রণাম করিয়া বাহিরে আসিলেন।

---

১৩৫৯ সাল ৯ই মাঘ শুক্রবার, স্থান শ্রীশ্রীপাঠবাড়ী আশ্রম

শ্রীশ্রীসন্ধ্যারতি শেষ হইয়াছেন। শ্রীগুরুদেবের বহির্ব্বারাণ্ডায় কয়েকজন ভক্ত ও আমাদের গুরুভ্রাতা কয়েকজন এবং শ্রীগুরুদেবের পূর্ব্ব সম্পর্কে এক কাকা শ্রীপাদের দর্শনোৎকণ্ঠায় অপেক্ষা করিতেছেন। শ্রীগুরুদেব গৃহে আসিলে সেবক "শ্রীদাদামহাশয় এসেছেন" বলাতে সকলের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া উক্ত দাদামহাশয়কে লক্ষ্য করিয়া 'বলিলেন—এত ঠাণ্ডায় কেন ?'

শ্রীশ্রীদাদামহাশয় বলিলেন—এই এলুম এর সঙ্গে একবার—

শ্রীগুরুদেব—"এক-জায়গায় থাকা হয় না কি ?"

পূজ্যপাদের শ্রীমুখে আনন্দ ও অন্তরঙ্গতার চিহ্ন। ইহার পর শ্রীদাদামহাশয় শ্রীগুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"নবদ্বীপ কবে যাবেন ?" ( শ্রীশ্রীবড়বাবাজীমহাশয়ের উৎসবে ) ?

শ্রীগুরুদেব— "যবে নিয়ে যাবেন, নিয়ে গেলে যাবো, না নিয়ে গেলে যাবো না"।

শ্রীদাদামহাশয়—উৎসবে আমি এবার নবদ্বীপ যাবো।

শ্রীগুরুদেব— "ভালো, আপনাদের বুকে বল আছে, আপনারা যাবেন"।

শ্রীদাদামহাশয়—আপনার বল নাই আর আমাদের বল আছে ?

শ্রীগুরুদেব— "বল না থাকলে যাবেন কেমন ক'রে। আমার বল নাই তাই হাত ধ'রে নিয়ে গেলে যাবো, না নিয়ে গেলে যাবো না"।

এইরূপ শ্রীমুখের বাক্য শুনিয়া সকলে ঈষৎ হাসিলে শ্রীগুরুদেব কিছুক্ষণ নির্ব্বাক থাকিয়া বলিলেন—

"উড়িয়াতে বেশ একটী কথা আছে——

দৈব দৌড়ী মানুষ গাই
যেনে যীব তেনে যাই"

পদটী দুইবার বলিয়া আমাদিগকে বুঝাইবার নিমিত্ত ভাবার্থ খুলিয়া বলিলেন—

'গলায় দড়ি বাঁধা গরু দেখেছ ? দড়ি যেমন ছাড়বে গোরুও তেমনি যাবে। আমাদের অবস্থাও তেমনি, যতটুকু করাবে বা নিয়ে যাবে ততটুকু।

পুনরায় সকলের প্রতি দৃষ্টি দিয়া বলিলেন—

"মুখের গ্রাস তুলে খাওয়া হয় না জান ? কর্ত্তা খেতে বসেছেন গৃহিনী থালা ধরে দিয়েছেন, এক বচসা হ'লো, শেষে থালা সমেত উঠানে গেলো। এতো গৃহস্থের ঘরে দেখা যায়।

আপন মনে পুনঃ বলিলেন—

**"প্রভু! দয়া হবে কবে? প্রভু কহে সনাতন! 'আমি' মরি যবে।"**

ইহার পরে নিত্য পাঠের ইঙ্গিত করিলেন। ইঙ্গিত পাইয়া নিত্যপাঠের সেবক শ্রীপাঠ আরম্ভ করিল। পাঠ আরম্ভ হইতেই স্থানীয় কোনও এক ব্যক্তি প্রণাম করিয়া উঠিয়া গেলেন, ইহা লক্ষ্য করিয়া শ্রীগুরুদেব বলিলেন—

**"ছাখো না ছুটীর দিন, কাছে বাড়ী তো? দুর্দ্দৈব সব, সে না দিলে কিছু হবে না"।**

এই সময় দেশ-সেবিকা শ্রীযুক্তা লাবণ্য প্রভা দত্ত, এটর্নি শ্রীযুক্ত সত্যহরি দত্ত, অরুণ মুখার্জ্জী ও শ্রীযুক্ত ডাঃ গণপতি ঘোষ প্রবেশ করিলেন। গুটীকাপাঠ শ্রবণান্তে উদ্দণ্ড-কীর্ত্তনে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া আসিয়া শ্রীগুরুদেব বলিলেন—

**"অষ্টোত্তর-শত নামটী ঠিক "দান আর পান"।**

ডাঃ গণপতিদা—এযুগে এই তো লীলার চরমত্ব।

শ্রীগুরুদেব— **"হুঁ হুঁ"** (সমর্থন)

ডাঃ দাদা—ওইখানে তো "রস রত্নখনি তবু কাঙ্গাল রসের"।

শ্রীগুরুদেব— "এদিকে **অষ্টক** (শ্রীরূপ-গোস্বামীকৃত সদোপাস্য), **ওদিকে স্তবকল্পবৃক্ষ, দুটীই চরম। স্মরণের পদ্ধতি তো**—**প্রসঙ্গ-স্থান না স্মরণ** হ'লে কোথা থেকে হবে?

ডাঃ দাদা—যেখানে যাবেন শ্রীগুরুদেব

শ্রীগুরুদেব— "সেখান দিয়েই যেতে হবে"।

শ্রীগুরুদেব—'**দাস-গোস্বামীর সূচক কীর্ত্তনে কথাটী আসে। যখন শ্রীখণ্ডে নিয়ে যায় তখন সেই লীলাটী ভোগ হয়। দাস-গোস্বামী কবিরাজকে ব'লছেন "শোন আমার গৌর কথা'……তবে তো ভোগ। কথার ওজন কত? এই যে বিনিময় ব'লেছেন— "লৌল্যমেব মূল্যমেকলম্" এই দিয়ে কেনা যায়।**

লাবণ্যদিদিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—

**"তোমরা স্তবকল্পবৃক্ষ পাঠ কর"।**

লাবণ্যদিদি—পাঠ তো করি, কিছু বুঝিতো না।

শ্রীগুরুদেব—**দাস-গোস্বামীকে স্মরণ ক'রে ভোগ ক'রতে হবে। 'কবিরাজের গলা ধ'রে ব'লছেন—এই ভাবে পাঠ ক'রো তবে তো ভোগ। শ্রীল- রামহরিদাস বাবাজী 'গৌরমন্ত্র' নাই ব'লে বৃন্দাবন ত্যাগ। তখন তাঁহাকে কেহ বলিলেন—আপনি চলে যাচ্ছেন্ গোবিন্দজীকে ছেড়ে? তখন শ্রীল রামহরিদাস বাবাজী মহাশয় বলিলেন—'আরে রেখে দে তোর গোবিন্দ,' আমি গৌর বাদীর (বিবাদীর) দেশে থাকি না। কত বড় জোরের কথা।**

**লীলা!! লীলা!! লীলা!! কীর্ত্তন হ'চ্ছে "সখী-সঙ্গে রূপের কথা কইতেছিল বসি"। উচ্চৈঃস্বরে হরিবলা তো নাই, যাবটে নির্জ্জনে সেইকথা হ'চ্ছে, সখীরা বলছেন, রাধারাণী**

শুন্‌ছেন, দরজায় একজন দাঁড়িয়ে আছেন। সে কথা কইছ, শুন্‌ছ তুমি কে? সেইদেশে শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে তোমায় যেতে হবে, সেই তো রাস্তা।

লাবণ্য দিদিকে লক্ষ্য করিয়া—

"তুমি পাঠ যখন করো, নিস্তব্ধে সময় হাতে নিয়ে পাঠ ক'র্‌বে। রাধাকুণ্ডের তীরে সেই আসন, বাসস্থান বাঁদিকের কুঠীর, বড়-ঘরের বাঁপাশে কবিরাজ গোস্বামী, গোপালভট্ট গোস্বামী একটু এগিয়ে গেলে, দক্ষিণ দুয়ারী ঘরে ভজন স্থান। পঞ্চপাণ্ডবের ঘাট মনে আছে? তার পাশেই হ'লো মোটামুটি 'স্থান ও পরিবেশ-স্মরণ।' "কবিরাজ! শোন আমার গৌরের কথা।" দাস গোস্বামী কবিরাজের কণ্ঠ ধ'রে ব'ল্‌ছেন। মনের স্মরণই হ'চ্ছে প্রাণ, যে মনে স্মরণ নাই সেই মরা। সে কোন্ স্মরণ? এই স্মরণ। বোঝবার তো লোক নাই। এই যে গৌরহরি বোল হয় না? শেষে সে স্মরণের সময় হ'লে পাগল হ'য়ে যাবে। 'গৌরহরি বোল' উঠেছে কোথা থেকে? নিতাই চলে যাচ্ছেন সুরধুনীর কুলে কুলে ব'লে ব'লে—তবে তো ভোগ হবে। 'যাঁহা নাম তাঁহা ধাম'—যতদিন ঘুরিয়েছেন আর কিছু মনে ছিল না'।

ডাঃ দাদা—বলিলেন—সেই তো চরম সত্য।

"নাম তো হচ্ছেন—এই ধাম, হরি-বোল হরি-বোল"।

প্রসঙ্গ সমাপ্ত জানিয়া সকলে উঠিবার উপক্রম করিলে পাশের ঘরে যাইয়া পুষ্প-মাল্যচন্দনে সজ্জিত নেতাজীর চিত্রের দিকে দৃষ্টি করিয়া শ্রীগুরুদেব বলিলেন—

"পোস্তার খোকা (বিশ্বনাথ রায়) ক'রতো, আমাদের যা আছে তাই দাও।

শ্রীশ্রীমহাপ্রসাদ পাইবার সময় হওয়ায় অদ্যকার প্রসঙ্গ সমাপ্ত হইল।

---

১৩৫৯ সাল ২৪শে মাঘ, শ্রীপাঠবাড়ী, রাত্রি ৮॥টা—৯॥টা।

শ্রীশ্রীশিক্ষাষ্টক পাঠ চলিতেছেন, সম্মুখে শ্রীরজনী দাস বাবাজী, শ্রীহরিদাস বাবাজী (হরিবোল কুটীর), ডাঃ শ্রীযুক্ত গণপতি ঘোষ, পণ্ডিত শ্রীল গোবিন্দ চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় প্রভৃতি বসিয়া আছেন। শ্রীশ্রীশিক্ষাষ্টকের—"নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তি-স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ। এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্! মমাপি দুর্দ্দৈবমীদৃশ-মিহার্জনি নানুরাগঃ॥" এই দ্বিতীয় শ্লোকটী শ্রবণ করিয়া শ্রীগুরুদেব শ্রীরজনীদাদার মুখের দিকে একবার তাকাইলেন। পরক্ষণেই শ্রীমুখখানি নত করিয়া পাঠ শুনিতে লাগিলেন; উক্ত শ্লোকের অনুবাদ পাঠ হইতেছেন—

"অনেক লোকের বাঞ্ছা অনেক প্রকার।
কৃপাতে করিল অনেক নামের প্রচার॥"

এই সময় শ্রীগুরুদেব শ্রীরজনীদাদার দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—

"অনেক নাম বলিতে কি বলো তোমরা? তাহ'লে কি আমাদের বাছা বাছা নামই? শ্রীকৃষ্ণসহস্রনাম আছে, তাহার মধ্যে 'শিব' নাম, 'কৃষ্ণ' নাম; শ্রীরাধিকার সহস্রনাম আছে, তাতে "দুর্গা" এই নাম উল্লেখ আছে। সকল নামেই সর্ব্বশক্তি আছে—"সর্ব্বশক্তি নামে দিলা করিয়া বিভাগ"।

এই পর্য্যন্ত বলিয়া চুপ করিলেন। যথা সময়ে শ্রীপাঠ সমাপ্ত হইলে শ্রীরজনীদাদা ও শ্রীহরিদাস দাদা দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া উঠিয়া গেলেন। অন্যান্য সকলে ধীরে ধীরে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখের দিকে চাহিয়া অপেক্ষা করিয়া রহিল। শ্রীগুরুদেব নিজগৃহের মধ্যস্থলের তারটী শ্রীহস্তে ধরিয়া দাঁড়াইলেন এবং ভক্তবৃন্দের দিকে চাহিয়া বলিলেন—

"একটা কথা বল্‌তে ইচ্ছে হচ্ছে—শ্রীচরিতামৃত, ভোগ করবার উদ্দেশ্য আছে তো? শিক্ষাষ্টক কিসের ভোগ উদ্দেশ্য? ভোগ উপলক্ষে দান। সোজা কথা ঠাকুর মশাইয়ের—"মনের স্মরণ প্রাণ" যা কিছু গ্রন্থ-প্রণয়ন, রসগ্রন্থ সব তাঁকে সুখ দেবার জন্য, ভোগ দেবার জন্য, (সেবা সুখ দেবার জন্য সেবকের দুটো ভোগ, সেবানন্দ ও রসানন্দ)।

শ্রীগুরুদেব একটী শ্লোকের ("নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায়তে। কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ")॥ ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন—

সে (গুরুগৌরবানন্দ স্বামী) উদ্ধার করেছে, নন্দভায়া সঙ্গে ছিল, এই যে "বদান্য", শ্লোকে প্রকাশ পাচ্ছে সে নিজে "বদান্য" না কেউ তাকে "বদান্য" বিশেষণ দিচ্ছে। তিনি যদি "বদান্য" রক্ষায় চ'লে যান, তাহ'লে—"শেষ যে রহিল প্রভুর দ্বাদশ বৎসর"? দান যে, কখন কে দেয় কিছু বোঝবার উপায় নেই। একটা লঙ্কার বস্তা বোঝাই গাড়ী চ'লে যাচ্ছে, এই তো বদান্যতা প্রকাশ পেয়েছে। নন্দভায়াকে ডেকে বল্‌লাম এই যে গোঁসাইয়ের শ্লোকের অর্থ প্রকাশ পেলে।। এই জাতীয় ভোগ, সে ভোগ করছে, আনুসঙ্গে দান হয়ে গেলো। ও ভোগ ব্রজবাসীদের কাছে। শ্রীরূপ সনাতন শিক্ষা, আমার মন তো ওতে মানবে না। ওর বক্তা কে? বক্তা যদি গৌর হন তবে তো ভোগ চ'লে গেল। "আমার যতেক কার্য্য নিত্যানন্দ দ্বারে"। জগৎকে দিতে হবে তার দরকার। সে ভোগী, সে ভোগ ক'রে চ'লে যাচ্ছে। রামানন্দ-সংবাদও তাই। নবগ্রহ আসছে, শিব আসছে, ঐ সকল কার্য্য নিত্যানন্দ দ্বারে।

শ্রীল পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন—রক্ষক যে এরাই, কলাভিঃ স বর্ত্তমানঃ।

শ্রীগুরুদেব—কথাগুলো তো তাই, "অন্তরে নিতাই, বাহিরে নিতাই", সব তো নিতাই তত্ত্ব, সবই নিতাই।

ডাঃ দাদা—ও তত্ত্ব ছাড়া আর তত্ত্ব তো নাই।

শ্রীগুরুদেব একটী নিশ্বাস ছাড়িয়া "নিতাই গৌর হে" ! বলিয়া সম্বোধন করিলেন। সকলে একে একে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া বাহিরে আসিলেন।

---

শ্রীপাঠবাড়ী আশ্রম, চৈত্রমাস, শেষ সপ্তাহ, ১৩৫৯।

তারিখ ঠিক মনে নাই। হাওড়া সমাজের "নদের নিমাই" নাট্যসম্প্রদায় কটকে যাইয়া অভিনয় দেখাইবেন, যাওয়ার মাত্র আর দুই এক দিন বাকী। সপরিকরে শ্রীপাদ-বাবাজীমহারাজও সঙ্গে যাইবেন। গাড়ী রিজার্ভ হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বাবার ইচ্ছাক্রমেই আজ 'নদের নিমাই' কটকে যাইতেছেন বলা বাহুল্য। বাবা সারাজীবন সংকীর্ত্তন করিয়া বিভিন্ন স্থানে মঠমন্দিরাদি জাগ্রত করিয়া শ্রীমন্ মহাপ্রভুর প্রেমরসে জগৎ মাতাইয়াছেন তথাপি তাঁর তৃষ্ণা মিটিবার নহে। আবার অভিনয়ের ভিতর দিয়া তাঁর সর্ব্বস্বনিধি শ্রীগৌরসুন্দরের লীলা মাধুরী জগবাসীকে ভোগ করাইবেন, এ-বাসনা তাঁর তীব্রতর। বাবার এ-বাসনা অপূর্ণ থাকিবার নয়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলাভিনয়ে "নদের নিমাই" এর মত নাট্য সম্প্রদায় আর দ্বিতীয় কোথাও দৃষ্ট হয় না ; কারণ, ইহাঁদের আধার সেইরূপ প্রস্তুত হইয়াছে এবং সুযোগও ঘটিয়াছে যাহাতে সাধু মহাপুরুগগণের আন্তরিক শুভেচ্ছা গ্রহণ করা যায়। তাই, ইহারা যখন অভিনয় করেন, যাঁরা অনুভবী তাঁরা মনে করেন সাক্ষাৎ শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেই লীলা প্রত্যক্ষ করিতেছি ও সাধারণ দর্শক মনে করেন, কি যেন এক অপূর্ব্ব মধুর হইতে মধুর বস্তু নয়নে দেখিতেছি। এই "নদের নিমাই" দেখিয়া কতশত পাষণ্ডের মন ফিরিয়া গিয়াছে এবং ঐ শ্রীগৌরসুন্দরের অভয়চরণে নিজের জীবন জন্মের মত অর্পণ করিয়াছে। উক্ত সম্প্রদায়ের উপর বাবার দৃঢ় বিশ্বাস, প্রগাঢ় প্রীতি। বাবা উক্ত সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করিয়া মাঝে মাঝে" বলেন,—

"করতাল ছাড়া যে টুকু বাকী আছে, তা ঐ 'নদের নিমাই পুরণ করবে।

বাবা ইতিপূর্ব্বে নিজে সমস্ত ব্যয় বহন করিয়া "নদের নিমাই" কে পুরীধামে লইয়াছেন এবং তদ্বারা পুরীবাসীদিগকে চিরস্মরণীয় আনন্দ উপভোগ করাইয়াছেন। সেইরূপ বাবা নিজে ভিক্ষা করিয়া একবার নয়, দুইবার সুদূর শ্রীবৃন্দাবনধামে "নদের

নিমাইকে” লইয়াছেন। তথায় চৌরাশী ক্রোশ ব্রজমণ্ডলের ভজন-নিষ্ঠ বৈষ্ণবগণ তথা ধন্য-জীবন ব্রজবাসীগণ উক্ত অভিনয়ের ভিতর দিয়া প্রেম-পুরুযোত্তম শ্রীগৌরসুন্দরের পতিতপাবনী মাধুর্য্যকাদম্বিনী পাষাণগলান লীলা দর্শন করিয়া যে অপার আনন্দরসে মজ্জিয়াছিলেন তাহা ভাষায় কে বর্ণনা করিবে? তাঁহারা যেন চিরহারান হৃদয়নিধিকে পুনঃ প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহাদের মানস ক্ষেত্রে এক অভিনব ভাববন্যা বহিয়াছিল। তদ্বারা তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণউপাসনা স্রোতস্বিনী হইতে আর এক নবীন ধারা প্রবাহিত হইয়া শ্রীগৌরসুন্দরের পদযুগল ধৌত করতঃ শ্রীকৃষ্ণউপাসনার পূর্ণতা আনয়ন করিয়াছে। আজও সেই বাবার অনুপ্রেরণাতেই “নদের নিমাই” কটকে যাইতেছেন। বাবাকে লইয়া যাইতে কটক থেকে শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর ভট্টাচার্য্য (মুসীদা) আসিয়াছেন। মুসীদা না আসিলে বাবার যাওয়াতে যদিও কোনও বিঘ্নের সম্ভাবনা নাই তথাপি যে তিনি আসিয়াছেন তাহাতে কটকের আয়োজনে বাবার উপস্থিতির প্রতি সারা-কটকবাসীর যে আন্তরিক গভীর আগ্রহ তাহার নিদর্শনই মুসীদার আগমন।

ইহার ভিতরে খুব গরম পড়িয়া গেল, তাহাতে বাবা শারীরিক অসুস্থতা বোধ করিলেন। এখান হইতে কটকে অধিক গরম পড়া স্বাভাবিক! সেই জন্য বাবার যাওয়া হইবে না বলিয়া কথা উঠিল, শুনিয়া শ্রীযুক্তমুসীদার মন কিছু বিমর্ষভাব ধারণ করিল। কটকে বিরাট আয়োজন চলিতেছে। “নদের নিমাই” যাইবেন, বাবাও যাইবেন। অভিনয়ের মাধ্যমে বাবা নিজ ভোগ্যনিধি শ্রীনিতাইসুন্দর ও শ্রীগৌরসুন্দরের লীলামাধুর্য্য অকাতরে সবাইকে উপভোগ করাইয়া স্বয়ং উপভোগ করিবেন। বাবার সেই উপভোগ আস্বাদনে আমরা এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দের অধিকারী হইব, এইরূপ সুখময় আশায় কটকের ভাইয়েরা অধীর হইয়া উঠিয়াছে, এতদ্‌ব্যতীত সদলবলে বাবাজীমহারাজের ও নদের নিমাইয়ের সর্ব্ববিধ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য সেইরূপ সুবন্দোবস্ত করিতে তাহারা প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে। এই অপূর্ব্ব আনন্দ সংবাদে কেবল কটক সহর নয়, মফঃসল অঞ্চলেও একটা বিরাট আকর্ষণের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। অথচ যাহার আকর্ষণেই “নদের নিমাইয়ের” প্রতি সকলের আকর্ষণ সেই বাবাজীমহারাজ যাইবেন না, এই অপ্রত্যাশিত সংবাদে মুসীদার মন কিছুটা মূসড়িয়া পড়িতেই তিনি পর মুহূর্ত্তে সেই মনের অবস্থা পরিবর্ত্তন করিয়া লইলেন।

তিনি ভাবিলেন এক্ষণে বাবার এই পরিণত বয়সে তাঁর দেহের ও মনের অবস্থা যেরূপ, তাহাতে ইচ্ছার অনুকূলেই সকলের চলা উচিত তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে একস্থান হইতে স্থানান্তরে তাঁকে টানাটানি করিবার চেষ্টা করিলে তদ্বারা স্বার্থপরতার পরিচয় কেবল পাওয়া যাইবে না, তা'তে জাগতিক কল্যাণ পথে এক মহান্ অন্তরায় সৃষ্টির সুযোগ

দেওয়া হইবে। জগৎকল্যাণকামী মহাপুরুষগণের ইচ্ছার বিপরীতে যাহা কিছু করিতে যাইনা কেন, তা'তে জগতের অনিষ্ট বই ইষ্টসাধিত হয় না। সুতরাং বাবাজীমহারাজ যদি কটক যাইতে অনিচ্ছুক হন তাহাতে কোন প্রকার পীড়াপীড়ি করা বা নিজেদের মনকে দুঃখিত করা কখনও উচিত নয়। এইরূপ চিন্তা করিয়া মুসীদা নিজের সম্বন্ধে স্থির করিলেন, তবে আমি আর কটকে এক্ষণে যাইব না, কয়েকদিন বাবাজীমহারাজের নিকট থাকিয়া যাইব। আমার অভাবে কটকে নদের নিমাইএর কোনই অসুবিধা হইবে না। সেখানে সব উৎসাহী ও কর্ম্মঠ ভাইয়েরা আছে, তা'রা কাজ চালাইয়া লইবে। এইরূপ সিদ্ধান্তে নিজের মনটীকে গঠন করিয়া দাদা বেশ সুস্থচিত্তে আশ্রমে রহিয়াছেন। আশ্রমের কোন ভাইয়ের নিকট কিম্বা বাবার নিকট তাঁ'র এইরূপ মনোভাব তিনি ব্যক্ত করেন নাই। মনের কথা মনেই রাখিয়াছেন। শেষ পর্য্যন্ত বাবার শারীরিক-দুর্ব্বলতা বিশেষ প্রকাশ পাওয়াতে ডাক্তারদের পরামর্শমতে বাবার কটকে যাওয়া স্থগিত হইল। এই হইল স্থূল কারণ। বস্তুত ইহার সূক্ষ্ম কারণ কি, তাহা আমাদের নির্ণয় করা অসম্ভব। সে যাহাই হউক না কেন, মহাপুরুষগণ যাহা করেন সবই জীবের মঙ্গলের জন্য।

আমাদের বাবাকে অন্তর্য্যামী বলিলে কথা ঠিক শোভন হইবে বলিয়া মনে হয় না। ঐশ্বর্য্য-প্রকাশে বাবার অতিশয় কুণ্ঠা। বাবা স্নেহ-করুণার অফুরন্ত আধার। কলিকবলিত-জীবের জননী-আসনে বাবা বসিয়াছেন। যা'র ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়াছে সেই জীবই বাবার স্নেহ-করুণার স্পর্শ নিজ অনুভূতির মধ্যে আনিতে পারে। সন্তানের মুখ দেখিয়াই তা'র বুকের মাঝে লুকান ব্যথা জননী জানিতে পারেন। অনেক স্থলে মুখ দেখিবারও প্রয়োজন হয় না। যেখানে সন্তানের প্রতি স্নেহমমতা উছলিয়া উঠে সেখানে সন্তানের দরদ তা'র অনুভূতির মধ্যে আসার আগেই মায়ের অন্তর দরদী হইয়া উঠে। এই হইল বিশুদ্ধ প্রীতি রাজ্যের নিদর্শন।

বৈকালের দিকে বাবা তাঁর ভজনকক্ষে নিত্যপাঠ্য শ্রীগ্রন্থ পাঠ করিতে উপবিষ্ট আছেন। গৃহ নিস্তব্ধ। পাঠরত বাবার চক্ষুযুগল প্রেমাশ্রুতে ছল ছল। সে যেন পাঠ করা নয়। যেন অতি প্রিয়জনের নিকট বসিয়া বাবা কত কি মরম কথা অতিমৃদুমধুরকণ্ঠে আলাপ করিতেছেন। মাঝে মাঝে তন্ময় হইয়া যাইতেছেন, আবার অবনত মস্তকেই দৃষ্টি সম্মুখে মেলিয়া পার্শে উপবিষ্ট বাবার অন্তরঙ্গ আমাদের পূজনীয় শ্রীযুক্ত দীনেশ কাকা মহাশয়ের সঙ্গে একটি কথা আদান প্রদান করিতেছেন। সে যেন অন্তর্জ্জগতের অন্তহীন মাধুর্য্য আস্বাদনের আদান প্রদান চলিতেছে। এমন সময়ে সেই নিস্তব্ধ কক্ষে প্রবেশ করিলেন পূজনীয় মুসীদা, উপবিষ্ট হইলেন বাবার পদপ্রান্তে। বাবা একবার মুসীদার দিকে প্রীতিভরা চোখে চাহিয়া আবার পাঠে মনোনিবেশ করিলেন। কিছুক্ষণ যাবৎ কক্ষ

নীরবতায় পূর্ণ হইল। মুসীদা ও শ্রীযুক্ত কাকা উভয়ের দৃষ্টি বাবার ঐ শ্রীমূর্ত্তির দিকে নিবদ্ধ। দ্রষ্টাদ্বয়ের মনে হইল, বাবার ঐ আসনের পরিধি জুড়িয়া একটী স্নিগ্ধ শান্তির ফোয়ারা উঠিতেছে। তাহাতে বাবা সর্ব্বাঙ্গে স্নাত হইতেছেন, দ্রষ্টাদ্বয়ও স্নাত হইতেছেন, এমন কি, সমগ্র কক্ষের প্রতিটি বস্তুও স্নাত হইতেছে এবং প্রতিটি বস্তু প্রাণ পাইয়া নিথরভাবে অপলকদৃষ্টিতে বাবার ঐ শান্তি-স্নাত সর্ব্বাঙ্গের পানে চাহিয়া আছে। এবার বাবা ধীরে ধীরে গ্রন্থ হইতে মস্তক ঈষৎ উত্তোলন করিয়া মুহূর্ত্তমাত্র মুষিদার দিকে বক্র দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়া পূজ্য কাকাজীকে উদ্দেশ করতঃ কিছু বলিবার জন্য যেন প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। মুখ-মণ্ডলে শাসন-মিশ্রিত সান্ত্বনার আভাস প্রতিফলিত হইতেছে। থামিয়া থামিয়া আস্তে আস্তে বলিতেছেন,—

**কীর্ত্তন হয়েছিল, সে অনেক দিন আগে, তাতে আঁখর এল—"প্রীতিরাজ্যের এইত রীতি, প্রিয়ের-প্রিয়ে অধিক প্রীতি"**

বাবা এই কথাটি বলিয়া কিছুক্ষণ নীরব থাকিলেন, যেন ঐ কথার মধ্যে কাহার মধুরমূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন, সেই মূর্ত্তির মাধুর্য্যে ডুবিয়া গেলেন, আবার বাহ্যস্মৃতি আসিল। বাবা দৃষ্টি মেলিয়া ভাবাবেশে প্রীতিরাজ্যের কথা আবার বলিতে লাগিলেন। হৃদয়ঙ্গম করাইবেন—

**মা যশোমতী দধি মন্থন করছেন, গোপাল তখন কোলে রয়েছে, গোপাল একবার হাত নাড়া নিয়ে ইতস্ততঃ মাখন ফেলছে একবার মন্থন দণ্ড ধরছে। তাতে মা কি করেন? বিরক্ত হয়ে গোপালকে কোল থেকে নামিয়ে দিলেন, কাজে লাগিলেন।**

**বুঝলে? এই মাখন খেয়ে গোপালের শরীর পুষ্ট হবেত? তাই, আগে মাখন তোলা হোক, পরে গোপালকে আদর করা যাবে।**

এই কথা বলিয়া বাবা ঈষৎ হাসিয়া ফেলিলেন, অন্তরের তৃপ্তির ঢেউ যেন উচ্ছলিয়া উঠিল। বাবা ছলছল নেত্রে শ্রোতার পানে চাহিয়া আবার পাঠে মনোনিবেশ করিলেন।

বাবার ঐ উক্তিতে মুষিদার মন সদ্য প্রস্ফুটিত পদ্মের মত প্রফুল্লিত হইয়া উঠিল। আনন্দের আতিশয্যে তাঁর হৃদয় খানা ভরিয়া গেল। বাবার কটকে না যাওয়ার সংবাদে উদীয়মান বিমর্ষকে বিচারচাবুক দিয়া অনুভূতি থেকে সরাইয়া দিলেও সে ঠিক অন্তঃসলীলা সরস্বতীর মত অন্তরের নিভৃত-দেশে গা ঢাকা দিয়া বসিয়া ছিল। তার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ দেখা দিয়াছিল দাদার মনে সম্প্রতি কটকে না ফিরিবার সংকল্প। অন্তরের যিনি অন্তরতম তদ্‌ভিন্ন ঐ অন্তরের অজ্ঞাত ব্যথাকে সরাইবার আর কোন উপায় ছিল না।

আজীবন শ্রীগুরুসেবাপ্রাণ মুষিদা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিলেন, বাবাজী যদি আমার একান্ত প্রিয়জন, তবে তাঁর প্রিয় নদের নিমাইয়ের প্রীতিবস্তু-সম্পাদনের জন্য

আমার সব কিছু করা দরকার। এই ভাবিয়া তিনি কটকে সত্বর রওনা হইলেন এবং সঙ্গে লইয়া গেলেন বাবার এক শক্তিশালী অনুপ্রেরণা। যাহা না কি উদ্যোক্তা, অভিনেতা ও দ্রষ্টা সকলের মনেই পূর্ণ প্রভাব বিস্তার করিয়া ছিলেন। কর্ম্মীগণ অভিনয়ের আদ্যোপান্ত পর্য্যন্ত এমন বিভোর হইয়া কাজ করিয়াছিলেন, তারা ভাবিতে পারেন নাই বাবাজী মহাশয় কটকে আসেন নাই। তারা মানস চক্ষে সর্ব্বত্রই যেন বাবার সান্নিধ্য লাভ করিয়া প্রবল উৎসাহে মাতিয়া গিয়াছিল। অভিনেতাগণ স্বীয় অভিনীত ভূমিকায় নিজেকে এমন নিঁখুতভাবে হারাইয়াছিল যে তাঁরা শেষে নিজ অনুভূতির নিকট স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিল, অভিনয়ের মধ্যে এত অফুরন্ত তৃপ্তি আর কবে পাইয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। দর্শকদের কথা কি বলা যায়! সে এক অভূতপূর্ব্ব চিরস্মরণীয় ব্যাপার। প্রকাণ্ড পার্কের মধ্যে অভিনয় মণ্ডপ। সহস্র সহস্র নরনারী বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া পিপাসু-প্রাণে সেই অপূর্ব্ব অভিনয় দেখিতেছে, শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর ও শ্রীমন্‌নিত্যানন্দ প্রভুর অখিল-বিশ্ব-প্রেমিকতার চুড়ান্ত পরিচয় পাইয়া কি শিক্ষিত, কি অশিক্ষিত, কি জ্ঞানী, কি মূর্খ, কি বৃদ্ধ, কি যুবক, সকলেই কাঁদিয়া কাঁদিয়া মুখ বুক ভাসাইতেছেন। সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! কটকের যত সব যজ্ঞ ম্যাজিষ্ট্রেট, উকিল, ব্যারিষ্টার প্রভৃতি উচ্চপদস্থ অভিজাত-বংশীয় ভদ্র মহোদয় ও ভদ্র মহিলাগণ, যত সব সমাজের নিকট চির অবহেলিত নিম্নবংশীয় দীন দরিদ্রগণ তারা সকলে ঐ অভিনয়দর্শনে ফুপাইয়া ফুপাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিল, ঐ বিরাট নাট্য সভা যেন এক প্রেমাশ্রু-দীর্ঘিকায় পরিণত হইল। ঐ সহস্র সহস্র জনাকীর্ণ নাট্য সভা প্রেমে টল মল করিয়া যেন সমগ্র কটক সহরকে ভাসাইয়া দিতে উদ্যত হইল।

কটকবাসীরা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিল, আজ সাড়ে চারিশত বৎসরাধিক পূর্ব্বে বাংলা হইতে যে ব্রাহ্মণ যুবক সন্ন্যাসি সাজিয়া উড়িষ্যায় আসিয়াছিলেন তিনি কেবল বাংলা কি উড়িষ্যার নহে, তিনি সারা বিশ্ববাসীর হৃদয়ের আরাধ্য দেবতা।

—০—

### শ্রীপাঠবাড়ী আশ্রম, ২৯শে বৈশাখ ১৩৬০, বৈকাল ৬টা

যিনি অবিরত পরিভ্রমণ করিয়া সংকীর্ত্তন-রসতরঙ্গে বঙ্গ উড়িষ্যা প্রভৃতি নানা দেশ প্লাবিত করিয়াছেন, সেই পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্‌বাবাজীমহারাজ এখন কেবল নিভৃতে বসিয়া তাঁর ইষ্টবস্তুর স্মরণ-বন্দনাদি দ্বারাই দিবানিশি বিভোর। শাস্ত্রকথিত ভক্তিমহারাণীর

অব্যর্থকালত্ব লক্ষণটী যেন মূর্ত্ত বিগ্রহ রূপে প্রকট হইয়াছেন। সমাগত কোন ভক্তের সহিত কিছুক্ষণ আলাপ করিবেন সেরূপ অবসর ক্রমশঃই দুর্ল্লভ হইতেছে। দিবারাত্র ২৪ ঘণ্টা তাঁহার নিকট স্বীয় ইষ্টসাধনার নিয়মে সুনিয়ন্ত্রিত। তিনি নিভৃত সাধনার সঙ্গে এমন অন্তরঙ্গতার অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ পাতিয়াছেন যে, বহির্জ্জগতের কোন ব্যাপার তাহাতে বিঘ্ন সৃষ্টি করিতে উপক্রম করিলে তাঁহার হৃদয় আক্ষেপে ভরিয়া যায়। তখন বলেন—

**"দেওয়ার সময় আলাদা, এখন কি আর সে সময় আছে? একথা কেউ বুঝে না, তাহ'লে আমাকে আর টানাটানি করিত না"।**

তথাপি ইচ্ছা করিলেই স্বভাব ত্যাগ করা যায় না। যার যে স্বভাব, তিনি যে অবস্থায় উপনীত হন না কেন তাঁর অজ্ঞাতসারে সে স্বভাব প্রকাশ পায়। তাই আজও আমরা সেই দানী-শিরোমণি শ্রীল বাবাজী মহারাজের করুণা হইতে বঞ্চিত হই না। তিনি নিভৃত সাধনার অতল সমুদ্রে নিমগ্ন হইলেও আমাদের আর্ত্তি তাঁর কাছে পঁহুছায়। তিনি বহির্জ্জগতে ফিরিয়া আসেন; আমাদের মায়াবন্ধন মোচন করিতে চিরশান্তিরাজ্যে প্রবেশ-পথের সন্ধান দান করেন। অতি সংক্ষিপ্ত বাহ্য অবসর মধ্যেও তিনি নানা উপদেশছলে দিব্য আনন্দ বিতরণ করেন। তাঁর অনুভবসিদ্ধ শ্রীমুখবাণী শুনিলে তাহা শুধু উপদেশ বলিয়া মনে হয় না। মনে হয়, তাঁর মানসসরোবরে যে পরম আস্বাদনীয় অপার্থিব আনন্দরসের ঢেউ খেলিতেছে তারই বিন্দুকণা সন্তাপী জীবকে শীতল করিতে উপদেশাকার ধারণ করিয়া বাহিরে প্রকাশ পায়। প্রকৃত আধার যাঁর তৈরী হয়েছে, তিনিই তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন। আমাদের মত অভাগা শুনেও শুনে না, বুঝেও বুঝে না।

প্রতিদিনকার মত আজ পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ বাবাজীমহারাজ শ্রীগ্রন্থমন্দির দর্শনবন্দনাদির জন্য অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। সঙ্গে এক প্রিয় ভক্ত-শ্রী সত্যহরি দত্ত ( এটর্ণি ) আর সেবক কয়েকজন। বাবা শ্রীমন্দিরস্থ আলমারিতে সযত্নে রক্ষিত সাধুমহাপুরুষগণের প্রতিকৃতি দর্শনবন্দনাদি করিতে লাগিলেন। সেদিন বাবার আদেশক্রমে একটী আলমারিতে প্রতিকৃতি সকল মর্য্যাদানুসারে নূতন করিয়া সাজান হইয়াছেন। তন্মধ্যে উক্ত আলমারিতে উপর-থাক হইতে সরাইয়া নিম্নথাকে লোকবরেণ্য শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতিকৃতি সাজান হইয়াছে। উপর থাকগুলিতে আছেন ইতিহাস প্রসিদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারক ও ত্যাগিমহাত্মাগণের প্রতিকৃতি, সর্ব্বনিম্নথাকে আছেন দেশবরেণ্য সমাজনেতা ও কয়েকটী ভক্তিপরায়ণ রাজা মহারাজের প্রতিকৃতি, তন্মধ্যে শ্রীবিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতিকৃতিকে লক্ষ্য করিয়া বাবা অপ্রসন্নভাবে শ্রীগ্রন্থমন্দিরের সেবককে বলিলেন—

বিদ্যাসাগর মহাশয়কে এখানে আনিলে কেন ?

সেবক ভাবিল সাধুমহাত্মা ও ধর্ম্মপ্রচারক ছাড়া অন্যের প্রতিকৃতি এ আলমারিতে রাখা বাবার বোধ হয় অভিপ্রেত নয় ; এবং পূর্ব্ব হইতেই যে, বিদ্যাসাগরের চিত্রপটে এই আলমারিতে আছেন, ইহা বোধহয় বাবার স্মরণ নাই। তবু ইহাদের সম্পূর্ণ পৃথক্ আলমারিতে সরিয়ে নেওয়া উচিত হইবে কি ? এই অভিপ্রায়ে সেবক তখন বিনীতভাবে নিবেদন করিল—আজ্ঞে, উনি আগেথেকেই এখানে আছেন। এই ভ্রান্ত ধারণা দূর করিবার জন্য, বাবা ঐ আলমারীর উপর-থাকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া অসন্তোষ-ব্যঞ্জককণ্ঠে বলিলেন—

আমি নিত্য দর্শন করি, ঐ উপরে উনি থাকেন, আমি বল্লেই হ'ল !

সেবক তখন জিজ্ঞাসু হইয়া বলিল, উপরে যে আচার্য্যেরা আছেন ? এই কথা শুনিয়া বাবা তিরস্কারভরাকণ্ঠে বলিলেন—

উনি আচার্য্য নন ? এই সব তোমাদের লেখাপড়া শিখে পাণ্ডিত্য হ'চ্ছে ; 'আচার্য্য' বুঝি গায়ে লিখা থাকে ?

কম্পিত কলেবরে ক্ষুব্ধকণ্ঠে বাবা আবার বলিতে লাগিলেন—

বার বার ব'লে গেছে, "পারিস্‌ত ভেতরটা দেখিস্, বাহিরের খোসা দেখে বিচার করিস না, ঠকে যাবি" এই কথা মনের মধ্যে লিখে রাখ, তবে কিছু হ'তে পারে।

আবার আক্ষেপ-জড়িতকণ্ঠে বাবা বলিলেন—

কাগজে ত লেখা আছে, তা'ত তোমরা পড়বে না ?

তারপর বাবা অতি ভাবপ্রবণচিত্তে ধীরে ধীরে শ্রীগ্রন্থমন্দিরে সুরক্ষিত তাঁর অভীষ্ট বস্তুর দর্শনবন্দনাদি করিতে লাগিলেন, তৎকালীন তাঁর সেই অপূর্ব্ব ভাবমাধুর্য্য দেখিয়া মনে হইল—বিশুদ্ধভক্তিমহারাণীর যে দৈন্যাত্মিকাভাব তাহা যেন আজ পৃথিবীর মহাপুণ্য-স্মৃতিপীঠ এই শ্রীমন্দিরাভ্যন্তরে মূর্ত্তি ধারণ করিয়া মৃদু পদবিক্ষেপে বিচরণ করিতেছেন, তাই অতি উদ্ধত-প্রকৃতি-মানুষও বাবার এইরূপ দৈন্যভাবের কাছে পরাভব মানিয়া সতৃষ্ণ-নয়নে বাবার ঐ ভক্তিবিলাস দর্শন করিয়া জীবনকে ধন্য করিয়া থাকে। তবু, লক্ষিত হইল, বাবার আজকার শ্রীগ্রন্থমন্দির দর্শনে অন্যদিনের মত তেমন আনন্দ প্রকাশ পায় নাই। সেই জন্য গ্রন্থমন্দিরের সেবকের মনে বিশেষ দুঃখ আসা অস্বাভাবিক নয়। বাবা দর্শনাদি সমাপনান্তে বাহিরে আসিতে উদ্যত হইয়া পুনর্ব্বার সেই আলমারীর নিকটে গেলেন এবং উক্ত প্রতিকৃতি পুনর্ব্বার দর্শন করিতে করিতে সঙ্গে অনুগত হইয়া মলিনবদনে দণ্ডায়মান উক্ত সেবককে করুণা ও সান্ত্বনা দ্যোতক কণ্ঠে বলিলেন—

যেখানে ছিলেন সেইখানে রাখিবেন। খবর রাখ? পণ্ডিতেরা কোন কাজ আরম্ভ করিলে এঁকে ( বিদ্যাসাগরকে ) স্মরণ ক'রে কাজ আরম্ভ করেন, তোমাদেরও তাই।

পরে উক্ত মন্দিরের প্রাঙ্গণে আসিয়া প্রণামের জন্য উপবিষ্ট হইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্বরূপটী জানাইবার উদ্দেশ্যে আবার বলিলেন—

কোথায় চলেছেন, ক'রেছেন থার্ডক্লাস্ টিকিট। ( পথে ) ছাত্রেরা দেখে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে, আপনি এখানে? ( বিদ্যাসাগর ) উত্তর করিলেন —"এর চেয়ে নীচু ক্লাস্ নাই, তাই এখানে।" একি তৃণাদপি হ'লো না?

টোলঘরের পাশে আসিয়া বলিলেন—

"তোমাদের পড়াশুনা ঘরেও বিদ্যাসাগর মহাশয়কে রাখা দরকার।

( শ্রীনাটমন্দিরের সংলগ্ন প্রাঙ্গণে ) শ্রীমন্দিরের শ্রীশ্রীবিগ্রহ-দর্শন-প্রণামাদি সারিয়া আবার বলিলেন—

আর এর চেয়ে নীচুক্লাস নাই, থাকিলে সেই টিকিট করিতাম, এই তার মনের বৃত্তি।

এই বলিয়া নিজের থাকার গৃহে বাবা প্রবেশ করিলেন। অদ্য তাঁর এইরূপ করুণাসিক্ত মধুর ভর্ৎসনায় এবং সুদুর্ল্লভ উপদেশে মনে অপার আনন্দ আসিল ঘনান্ধকার থেকে দিব্য আলোকে আসার মত বটে; কিন্তু মনে একটা কঠিন হতাশার ভাব জাগিল যে ভক্তিরাজ্যের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মসিদ্ধান্তে উপনীত না হইলে অশেষ সৌভাগ্য বলে এই শ্রীল বাবাজীমহারাজের সান্নিধ্য লাভ করিলেও তাঁর সুখবিধান সম্ভব নয় আমাদের মত ভক্তিহীনের পক্ষে।

—০—

**১৫ই জ্যেষ্ঠ, ১৩৬০, সকাল ৮টা, শ্রীপাঠবাড়ী আশ্রম।**

শ্রীপাদ শ্রীলবাবাজী মহারাজ স্নান করিতে যাইবেন, সেবকগণ তাঁহার শ্রীঅঙ্গ সেবা করিতেছে। পানিহাটিবাসী একপ্রিয় ভক্ত শ্রীহরেণ চক্রবর্ত্তী আসিলেন। সেবকের মধ্যে একজন হরেনদাকে বলিল, দাদা, আমাকে "শ্রীলদাদামহাশয়ের বাণী" গ্রন্থ দুইখানি দিবেন। একখানি আমার আর একখানি শ্রীগ্রন্থমন্দিরের জন্য। হরেনদা আমাদের এক গুরুভ্রাতার নাম করিয়া বলিলেন, তার কাছ থেকে নিবেন। বাবা জিজ্ঞাসা করিলেন, কি গ্রন্থ? হরেনদা গ্রন্থের পরিচয় দিয়া উক্তগ্রন্থ সম্বন্ধে ঐ গুরু ভ্রাতার মন্তব্যটি ব্যক্ত করিবার

অভিপ্রায়ে বলিলেন সে বলছিল, ও গ্রন্থে তেমন কিছু নাই। শুনিয়া বাবা অসন্তোষের হাসি হাসিয়া বলিলেন,—

বটতলার ছাপাগ্রন্থ ছিল, তাই এখন লোকে গ্রন্থ দেখতে পায়। সে শুদ্ধ হোক বা অশুদ্ধ হোক্। তারা ছাপিয়ে ছিল বলেই এখন শুদ্ধি করে নেওয়া হচ্চে। না ছাপালে শুদ্ধি করত কোথা থেকে? তোমরা তার থেকে তোমাদের মত করে নাও। কিছু ত বিরোধ লেখে নাই। "কিছু নাই" একি ভক্তি-রাজ্যের কথা? এতে অপরাধ হয়। কথা বলিবার হিসাব আছে। এখন সে সব নাই। আগে কথা বলিবার খুব হিসাব ছিল। কোথায় যাবার জন্য কেউ বলিলে, বলতে হত ইচ্ছা রইল, নিয়ে যায় ত যাব।

বাবার ঐরূপ গুণগ্রাহিতা এবং বৈষ্ণবতা শিক্ষার উপদেশ পাইয়া সেবকগণ নিজেকে পরম-সৌভাগ্যবান্ মনে করতঃ অতিশয় আনন্দিত হইল।

—০—

২১শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬০, বৃহস্পতিবার সকাল ৮॥ শ্রীপাঠবাড়ী।

বাবা তৈল মাখিতে বসিয়াছেন সেবারত সেবকদিগকে নানা তত্ত্ব কথা বলিতেছেন। প্রসঙ্গ ক্রমে বাবা বলিলেন,—

একবার শ্রীধাম নবদ্বীপে বিচার হয়েছিল, গৌর ভগবান্ কি না। কৃষ্ণনগরের রাজা আর নবদ্বীপের পণ্ডিত-মণ্ডলী এক দিকে আর বৈষ্ণবগণ একদিকে। বহু শাস্ত্র আলোচনার সঙ্গে নানা তর্কবিতর্কের পর স্থির হল, মহদনুভবই প্রমাণরূপে গ্রহণ করা যাবে। তবে মহৎ এখন কে? তখন ছিলেন (নবদ্বীপে) সিদ্ধ শ্রীচৈতন্য দাস বাবাজী মহারাজ। তাঁকে আহ্বান করা হল, তিনি বল্লেন "গৌর ভগবান্ কি না" এ সন্দেহ আমারও ছিল। এই এখন আপনাদের এই সভায় এসে সে সন্দেহ খণ্ডন হয়ে গেল। কারণ যুগে যুগে শ্রীভগবদবতারের কেউ না কেউ রাজা বিরোধী ছিলেন। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিরোধী কোন রাজা আছেন, এ, আমি এ-পর্য্যন্ত জেনে ছিলাম না। এখন স্বয়ং মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র যখন বিরোধী তখন শ্রীমন্ মহাপ্রভু নিশ্চয়ই শ্রীভগবানের অবতার। এতে আমার আর কোন সংশয় নাই।

বাবা এইরূপ অমূল্য ঘটনাটী বলিয়া অতি আনন্দের সহিত নিজের শ্রীগুরূপদিষ্ট সিদ্ধান্তটী বলিলেন,—

গোটা কতক শ্লোক থাকিলে কি গৌরের ভগবত্ত্বার প্রমাণ হবে? প্রমাণ হবে, তাঁর আচরিত কার্য্যে। তাঁর কার্য্য আলোচনা কর, দেখবে, সে ভগবান্ কি না।

বাবার এইরূপ হৃদয়গ্রাহী বাণী-শ্রবণে প্রত্যেক শ্রোতার মনে একটী তৃপ্তির ঢেউ খেলিয়া গেল।

—০—

২৬শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৬০, সকাল ৮টা, শ্রীপাঠবাড়ী আশ্রম।

বাবা স্নানের উদ্যোগ করিতেছেন। কাছে মাত্র কয়েক জন সেবক। কথায় কথায় বাবা বলিলেন, **সাধন ভজন** কি? এইকথা বলিয়া হাসিভরা মুখে সবার পানে চাহিয়া রহিলেন, পরে নিজেই উত্তর দিলেন,—

**মনটা ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে। সে সব থেকে তুলে নিয়ে তার চরণে অর্পণ করা। মন তারই প্রাপ্য। তাঁর প্রাপ্য বস্তু তাকে দেওয়া** ( র নামই সাধন ভজন ) **একা শক্তিতে কুলায় না, তার জন্য একে ধরা তাকে ধরা, বাবাকে ধর, মাকে ধর, কালী, দুর্গা, যে কোন দেব দেবীর** ( নিকট ঐ শক্তি প্রার্থনা করা )।

বাবার এই অল্প কথার মধ্যে একটী বিরাট সিদ্ধান্তের কথা শুনিয়া সেবকদিগের মনে পরমানন্দ উদয় হইল।

—০—

৩১শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬০, সকাল ৭॥ শ্রীপাঠবাড়ী আশ্রম।

বাবা শ্রীমন্দিরে দণ্ডবৎ প্রণামাদি শেষ করিয়া কাপড় ছাড়িতেছেন, স্নানের সময় আর বিলম্ব নাই। বাবার দর্শনের জন্য অনেক ভক্ত সমাগত হইয়াছেন। ইত্যবসরে বাবা তাঁর এক অনুগতকে আদেশ করিলেন,—

**কাগজ কলম নিয়ে এস, যা বলি লিখে রাখ।**

আদেশ পাইয়াই সেবক গৃহান্তর হইতে কাগজ কলম লইয়া তৈলম্রক্ষণে উপবিষ্ট বাবার পদপ্রান্তে খুব আগ্রহ সহকারে উপবেশন করিল। বাবা লেখকের দিকে চাহিয়া অতি প্রশান্ত কণ্ঠে বলিলেন,—

**আমার কথা ত নয়, যা শুনেছি তাই বলি।** গোবিন্দদাকে রাধাকুণ্ডবাসের আদেশ। ( কর্ত্তা ) আদেশ করিলেন—গোবিন্দ! রাধাকুণ্ডে বাস করিবে, চারিদিকে ঝাড়ু সেবা করিবে, রাজন্নাদি স্থূল ভিক্ষা গ্রহণ করিও না, গ্রহণ করিতে দিও না। মাধুকরী বৃত্তিদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে, বৈষ্ণব সাজিও না, বৈষ্ণব সাজাইয়া দিও না। কাঙ্গাল হইয়া কাঁদিতে থাক।

এই বলিয়া বাবা কথান্তর উত্থাপন করিলেন। তখন দেখা গেল, বাবার শ্রীমুখমণ্ডলে কি যেন এক বেদনার ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। আমাদের মধ্যে ঐ মহামূল্য উপদেশানুরূপ আচরণের একান্ত অভাব দেখিয়াই যেন বাবা নিতান্ত ব্যথিত হইতেছেন। তখন বাবার ঐ ব্যথিত মুখের পানে চাহিয়া অনুগত শ্রোতাদিগের মনে এই প্রার্থনাই জাগিয়াছিল, হে করুণাময়! তোমার অহেতুকী করুণা-বলে নিজ শক্তি সঞ্চার কর, যাতে তোমার প্রদর্শিত পথে চলিবার জন্য বিপুল উৎসাহ আসিয়া আমাদের হৃদয়ের মধ্যে জমাট বাঁধিতে পারে॥

—০—

২রা আষাঢ়, মঙ্গলবার, ১৩৬০ সকাল ৮টা শ্রীপাঠবাড়ী আশ্রম।

অদ্য সকালে শ্রীগুরুদাস নামক জনৈক ভক্ত শ্রীগুরুদেবকে দর্শন করিয়া প্রণমান্তে বসিয়াছেন। শ্রীগুরুদেব স্নানের সময় বলিলেন—কথা আছে, ভাল কথা, ঐ পা খোঁড়া বাবুটি আছেন, তার কাছে অনেক জিনিষ পাওয়া যাবে। বৈষ্ণব জগতের ইতিহাস তার সংগ্রহ করা আছে। কালকে তার পরিচয় পেলাম, আগে জানতাম্ এতটা নয়। মীনকেতন রামদাসের বংশধর ওরা। বেশ নম্র স্বভাব, বল্‌লো যাদের ঘরে জন্মেছি তাদের পরিচয় দেবার মত কিছু নাই, তাই আপনাদের সঙ্গে মিশ্‌তে সাহস হয় না। ও আমাকে বলেছে, সব রেখেছে বলে। তা লিখে টিকে নাও, তোমাদের কাজ দেবে। তোমাদের গ্রন্থ মন্দিরে কিছু আছে না? অমূল্য-দা ত সংগ্রহ করে ছিলেন। আমি বলিলাম—আজ্ঞে হাঁ আছে, কাঁচের আলমারীতে আছে। বাবা—দেখ তার মধ্যে যদি থাকে, তবু তার কাছ থেকে নেওয়া দরকার, জিনিষটা ঠিক পাওয়া যাবে।

ভক্ত শ্রীগুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করিল—বাবা! সে দিন যে বলেছেন, খবরের কাগজে লেখা, সে কি আমাদের এই মঠের হরিদাস সম্বন্ধে? অশ্বিনী বাবু লিখেছেন, মহাপ্রভুর লীলা এখনও চলছে……।

শ্রীগুরুদেব বলিবেন—হ্যাঁ, আমাদের হরিদাসের কথা? এর শ্বশুর ছিল শব সাধক, খুব উচ্চ স্তরের, এ তখন জোয়ান, এও শব সাধনা করত, ক'রতে ক'রতে মায়ের আদেশ হল, হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করতে। সেই থেকে সে এপথে আসে, মুসলমানেরা বিরোধী হল, আনেক অত্যাচার করেছে তবু নাম ছাড়ে নাই। সেই কথা কাগজে দিয়েছিল, এই অত্যাচারের পর ও চলে যায় জগদীশের কাছে, সেখান থেকে আসে নবদ্বীপ মঠে, তাকে

বলে দেওয়া হয়েছিল, অমুক বাবাজীর আশ্রমে যাও, ( চরণ দাস বাবাজীর ) তখন আমরা পানিহাটী আসছি, দু এক বৎসর হল, পানিহাটী উৎসব আরম্ভ হয়েছে, সঙ্গে চারু আর যেন কে ছিল, ট্রেনে চারু দেখায়, কাগজে ঐ অশ্বিনী বাবু ( দত্ত ) বলেছেন, মহাপ্রভুর লীলা এখনও চলছে। শুনে তাকে দেখবার জন্য মনটা ছটফট করলো, গিয়ে দেখি চিন্‌বার উপায় নাই, মাথা নেড়া গান্তি বাঁধা, মালা তিলক ধারণ, একেবারে বাবাজী।

সেবারে সে আমাদের সঙ্গে বৃন্দাবন গিয়েছিল, রথেও গিয়েছে। সেবারে এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘট্‌লো, বস্তা ষ্টেশন, কেষ্ট সঙ্গে ছিল, কেষ্ট, নন্দের ভাই নিত্যানন্দ, বিচিত্রানন্দ এরা দু ভাই, ঐ ষ্টেশনে বড় মুস্কিলে পড়া গেল, রামগতিও ছিল, দারুণ আবেশ আসলে পরে ওদিকে বলে ওদিকে যায়, বৃন্দাবনের আবেশ, নিত্যানন্দের স্ত্রী সেও তেমন, যাক কোনমতে আনা গেল, সেবারও হরিদাস সঙ্গে গিয়েছিল।

শ্রীগুরুদেব যে অশ্বিনী বাবুর কথা বলিলেন ইনি শ্রীশ্রীমদ্ বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভুর প্রিয় শিষ্য বরিশাল নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ শ্রীঅশ্বিনী কুমার দত্ত। ইঁহার লিখিত "ভক্তিযোগ" গ্রন্থ জগৎ বিখ্যাত। এই অশ্বিনী বাবু সংবাদ পত্রে লিখিয়াছিলেন "মহাপ্রভুর লীলা এখনও চলিতেছে", অশ্বিনী বাবু মহা অনুভবি ভক্ত ; তিনি প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়া ঐ কথা লিখিয়াছেন। মহাপ্রভু যবন কুলোদ্ভব শ্রীহরিদাস ঠাকুরকে আত্মসাৎ করিয়া তাঁহার দ্বারা জগতে শ্রীনাম মহিমা প্রচার করাইয়াছিলেন। মহাপ্রভুর এই লীলা এখনও চলিতেছে তাহার কারণ এই যে এই প্রসঙ্গে যে হরিদাসের কথা শ্রীল বাবাজী মহারাজ উল্লেখ করিয়াছেন ইনিও যবন কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া শ্রীহরিনাম পরায়ণ হইয়া মহাপ্রভুর পাদপদ্ম আশ্রয় করিয়াছেন। ইনি জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে হরিনাম করিতে করিতে শ্রীপাঠবাড়ী আশ্রমে নিত্য লীলায় প্রবিষ্ট হন। ভক্তগণ শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখে মহাপ্রভুর লীলা আজও হইতেছে শ্রবণ করিয়া সাক্ষাৎ লীলার পরিচয় পাইয়া ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া গৃহে গমন করিলেন।

—॰—

১৪ আষঢ়, ১৩৬০, ॰টা, শ্রীপাঠবাড়ী আশ্রম।

প্রসাদ পাওয়ার পন বাবা কোচে বসিয়া অছেন। সম্মুখে বসিয়া আছেন বৃন্দাবন হইতে আগত এক দাদা, আর চার পাঁচজন গুরুভাই বসিয়া আছেন আশেপাশে যে সব সাধারণ কথা চলিতেছিল তাহার উপর দাঁড়ি টানিয়া দিয়া বাবা বলিলেন,—

"যাক, তারপর, বৃন্দাবন থেকে তো এলে, এখন বৃন্দাবনের কথা জিজ্ঞাসা করি"

বাবার চোখে স-প্রশ্ন দৃষ্টি, প্রশান্ত হাস্যোজ্জ্বল মুখ—যেন প্রসঙ্গ করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব। বাবার এই নর্ম আলাপরত মূর্ত্তিটি অপূর্ব্ব মাধুর্য্যময়।

বাবার প্রশ্নের উত্তরে দাদা শ্রীবৃন্দাবনের এক মন্দিরের কথা তুলিলেন। এই মন্দির পরিচালন ভার হস্তান্তরিত হইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা চলিতেছে। যদি হস্তান্তরিত হয়, বলিয়া উদ্বেগ প্রকাশ করিলে বাবা বলিলেন—

"ঠাকুর লীলাময়, তাঁর যেখানে ইচ্ছা হয় যাবেন, বিভিন্ন জনের কাছে সেবা নিয়েই তাঁর সুখ, তাতে তোমাদের এত মাথা ব্যথা কেন?" "ভক্তিপথে আমাদের লোকসান হচ্ছে, অপরাধ হয়ে যাচ্ছে। তাদের প্রতি একটা কটাক্ষ এসে যাচ্ছে, যাদের নিয়ম আছে নিষ্ঠা আছে, তোমাদের কী আছে? প্রতিষ্ঠান বিশেষে এক লক্ষ নাম না হলে পাত দেওয়ার ব্যবস্থা নাই, বৈষ্ণব সন্ন্যাসীদের এক কাপড়েই আমরা নাক সিটকেছি।

বাবার মুখ দিয়া কথাগুলি বাহির হইতেছে ঝড়ের মতো, তাঁহার কথার ফাঁকে দাদা যদি কিছু বলিতে যাইতেছেন, তবে বাবা বলিতেছেন, "থামো থাম শুনে যাও"। কৃপাময়ের মধ্যে কৃপার বান আসিয়া গিয়াছে, শিক্ষার প্রবাহ দ্রুতবেগে বাহির হইয়া আসিতেছে; এখন কেবল অঞ্জলি পাতিয়া লোলুপ হইয়া বসিতে পারিলেই হইল। দাদা এক ফাঁকে আবার যেই বলিতে গিয়াছেন-"ওদের মত" অমনি বাবার মুখে গাম্ভীর্য্য, মৃদু তিরস্কার ধ্বনি উঠিল—

"ও সব বাজে কথা ছেড়ে দাও অপরাধ হবে। ওরা রাধা-কৃষ্ণ-গৌর-নিত্যানন্দ ছাড়া আরও কিছু কি ভজে? কেশীঘাটের প্রভু থেকে তো লাল কাপড় আরম্ভ, সেও তো গুরুদেবের আদেশ পালন করা হচ্ছে। পূজোর সময় গিরিপুরী ভারতীর পূজো করতে হয় না? ভোগের সময় তাঁদের আলাদা ভোগের ব্যবস্থা, জানো তো?

কিছুক্ষণের পর আবার বলিলেন,—

"একপাশকরে থুয়ে গেছে (বড় বাবাজী মহাশয়, আপন সংঘকে) ওই থেকে (অপরাধ থেকে) বাঁচাবার জন্যে; তোমরা মিশতে যাও কেন? নিজের গলায় নিজে দড়ি পরবে তা কী হবে"। আদেশ ছিল, (বড় বাবাজী মহাশয়ের) বৈষ্ণব-পঙ্গতে বসবে না। নিজেও তাই করে গেছে। ডাক এলো—আসুন পঙ্গত বসছে, "চলুন যাচ্ছি" তার মানে কি পঙ্গতে বসবে?

নবদ্বীপে বাবাজীর (বড়বাবাজী মহাশয়ের) চিঠি গেল, "বৈষ্ণব সাজিওনা সাজাইওনা, কাঙ্গাল হইয়া প্রার্থনা করিবে। স্থুল ভিক্ষা লইবে না, মাধুকরী বৃত্তির দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ কর'।

বাবা প্রত্যেকটি কথায় জোর দিয়া বারবার উচ্চারণ করিতে লাগিলেন, যেন কথাগুলি উপস্থিত সকলের মাথায় একেবারে ঢুকাইয়া দিতে চান।

"চিঠিখানা নবদ্বীপে আছে, বাঁধানো আছে, দেখেছ ?"

দাদা— দেখেছি, বাঁধানো আছে।

বাবা—থাকলে হবে কী, সে পথে চলেছে কে।......বৈষ্ণবের সঙ্গে মিশতে গেলেই তাদের আচার ব্যবহারে নজর পড়বে।

বাবা আবার চুপ করিলেন। তারপর আবার ধীরে ধীরে বলিলেন,—

"রাধাবিনোদিনী চলে গেল ( সম্প্রতি প্রাপ্তি হইয়াছেন )—পঙ্গতের হিসেব ছিল, মহাপ্রসাদ পাওয়ার সময়ে চাইবে না কিছু। ( বিভিন্ন আস্বাদ্য অন্নব্যঞ্জনাদি অধরামৃতের মধ্যে ) যতক্ষণ প্রত্যেক অধরামৃতের এক আস্বাদ না হচ্ছে, ততক্ষণ অধরামৃত পাওয়াই হ'ল না। চেয়েছিল, একটু রসা দাও—অমনি গালে এক চড়। অমনি আর একটা গাল পেতে দিলে—অপরাধ করেছি ( বলে ), এসব আমাদের চোখে দেখা। নিষ্ঠা নিয়ে চলে গেল। কোথায় পথ আর কোথায় চলেছি আমরা।'

দাদা আবার অতি মৃদুস্বরে "সম্প্রদায়" বলিয়া কি যেন বলিতে গিয়াছেন। বাবা আবার গর্জিয়া উঠিয়া বলিলেন—

"ওসব সম্প্রদায়ের কথা ছেড়ে দাও, যার মত নিয়ে চলেছ তার পথ কী? তা'র কি ছিল? একপাতে কুকুর খাচ্ছে আর আমরা খাচ্ছি। আর নবদ্বীপে পায়স রয়েছে, কুকুরে মুখ দিয়ে গেছে বলে বেটারা খেলো-না।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বেদনা-গাঢ় সুরে বাবা বলিলেন—

আমি "সম্বন্ধ" মুখে আনতে পারি না যে, অমুক ( চরণ দাস ) বাবাজীর সঙ্গে আমার এই সম্বন্ধ। তার গুণের কী আছে যে "সম্বন্ধ" দেব—

আমাদের সকল ত্রুটি বিচ্যুতি অক্ষমতাকে আপন স্কন্ধে চড়াইয়া পরম করুণাময় নির্ব্বেদ ভোগ করিতে লাগিলেন।—

"নীলকণ্ঠ বাবু খড়দহে যাত্রা করিতে এসেছেন—খুব আনন্দ, শেষে গোঁসাই বললেন, নিতাই আমার পরম দয়াল, ছড়িয়ে দিয়ে গেলেন, কিন্তু ঘরে এক কৌটাও রাখেন-নি"।

"চরিতসুধা" অতবড় একখানি গ্রন্থ, তার মধ্যে আছে কি? বিগ্রহ, মহাপ্রসাদ, নাম, বৈষ্ণব—এই চারটে কথা দিয়ে সাজানো চরিত সুধা। বৈষ্ণবের উপর কী করে দৃষ্টি রাখতে হয়, কী করে নাম করতে হয়। মহাপ্রসাদ গ্রহণ করতে হয় কী করে, আর বিগ্রহের সেবা করতে হয় কেমন করে, এই তো"।

রাত্রি হইয়াছে, বাবা কোচ হইতে উঠিলেন। আক্ষেপভরে বলিলেন—

"কি আছে কিছুই নাই"—

বাবা এইবার শৌচে যাইবেন, যে আলনায় শৌচ যাইবার কাপড় থাকে তাহার দিকে যাইতে বলিলেন—

১৮

"ভাই, কাউকে বলিস না, কেউ নেবে-না। যদি পারিস তো কিছু করে যা, কেউ নকল করেও তো মঙ্গল হবে—আমার ওপর এই এক আদেশ (বড় বাবাজী মহাশয়ের)।

কাপড় ছাড়িতে ছাড়িতে আবার বলিলেন—

"অপ্রকটের সাতদিন পূর্ব্বে ডেকে বললেন, (বড়বাবাজী মহাশয়) মহাপ্রভুর বাড়ী থেকে নামের জন্য ডাক এসেছে, পারবে? আমি একে খুঁজছি তাকে খুঁজছি। ওমা পাত-তাই দিচ্ছে না; একটু পরে বল্লেন, করতাল বাজিয়ে নাম করতে পারবে? যদি পার তাই করো, যেন যাত্রার দলটি করো না—

বলিয়া বাবা শৌচে গেলেন। আজিকার প্রসঙ্গ শেষ হইল।

—০—

১৭ই আশ্বিন, ১৩৬০ পাঠবাড়ী আশ্রম। ৮-৩০—৯-৩০ রাত্রি।

শ্রীগুরুমুখ-পদ্মবাক্য হৃদয়ে করিয়া ঐক্য
আর না করিহ মনে আশা।
শ্রীগুরু-চরণে রতি সেই সে উত্তমা গতি
যে প্রসাদে পূরে সর্ব্ব আশা॥

[প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা]

প্রায় তিনমাস অবস্থানের পর কাল শ্রীশ্রীবাবাজী মহাশয় পুরী হইতে ফিরিয়াছেন। আশ্রমের সর্ব্বত্র একটা সহজ সচেতনতা আসিয়াগিয়াছে, সর্ব্বত্র প্রাণের সাড়া পড়িয়াছে। উৎকণ্ঠিত ভক্তবৃন্দ দলে দলে দর্শনে আসিতেছেন। বাবাজী মহাশয় যখন যেখানে থাকেন তখনই সেখানে উৎসব লাগিয়াই থাকে কিন্তু গত তিনমাসের বিরহান্তে এই মিলনানন্দের যেন কেমন নূতনত্ব লইয়া উপস্থিত হইয়াছে।

আজ সন্ধ্যা সাড়ে আটটা, নিত্য সান্ধ্যপাঠ একটু সকাল সকাল সমাপ্ত হওয়ায় বাবাজী মহাশয় ঘরের বারান্দায় আসিয়া বসিয়াছেন আর তাঁহার চারিদিকে ঘেরিয়া পৈঠে গুলিতে ধাপে ধাপে বসিয়া আছেন ভক্তবৃন্দ। কথা প্রসঙ্গে (কাটোয়া) মাধাই-তলার নামযজ্ঞের প্রসঙ্গ উঠিল, সেখানে নাম বেশ সুষ্ঠুভাবে চলিতেছেন সেই কথায় বাবাজী মহাশয় বলিলেন—

"নাম কি আর মানুষ করে? নিজের স্বার্থে নজর না থাকলে কিছুই আটকায় না। ঠাকুরের ইচ্ছা যতদিন চালাবেন চালান।"

ডাঃ শ্রীযুক্ত গণপতি ঘোষ বলিলেন—"কৃপা-শক্তিরই" প্রকাশ—

বাবাজী মহাশয়—"তা ছাড়া আর কি, কোনই ক্ষমতা নাই কারু কিছু করবার। সেদিন ওখানে পুরীতে পাঠ হচ্ছিল—"আশ্রয় করিয়া বন্দোঁ।" অনেক দূরের রাস্তা; আশ্রয় কোথা? প্রসঙ্গ করতে করতে যার যতটুকু আসে তাতেই কৃতার্থ॥"

ডাক্তার—"ক্রমে ক্রমে পায় জীব ভবসিন্ধুকূল।

বাবাজী মহাশয়—আদর্শ চরিত্র আর নিজের জীবন এর ওজন কই? তা হ'লে তো কৃতার্থ হয়ে যায়। যাঁরা ঠিক ঠিক পথে চলে গেছেন তাঁদের দিকে নজর না দিলে কি কিছু করা যায়। কোথায় পথ আর……

কথা অসম্পূর্ণই রহিয়া গেল ক্ষোভের কথা উচ্চারণ করিতেও যেন তাঁহার ব্যথা লাগিল, চুপ করিলেন। ক্ষণেক পরে আবার বলিলেন—

"চাইবার কিছু দাবী আছে? কিছু দাবী নাই। তোমার নিত্যদাস, সেই হিসাবে দাবী'

ডাক্তার—তুমি পরম করুণ—হোক না কেন সুদুরাচার।

বাবাজী মহাশয়—"তোমার কৃপা-করা স্বভাব এই দাবী। কৃপা অজস্র বর্ষণ হচ্ছে, দাঁড়াবে কোথায়? দাঁড়াবার যায়গা তো নাই।

পতিত পাবন নাম শুনেছ
তাতে তোমার ভরসা কিসে,
অভিমানের মঞ্চোপরি
তুমি যে ভাই রয়েছ বসে

তার স্বভাব সে খুঁজে বেড়াচ্ছে পতিত কোথায়, তুমি উচ্চমঞ্চে বসে তা কি হবে। এই স্ফূর্ত্তির কথা, কবিতা নয়। দুলাইনের মধ্যে সব আছে। পতিত হ'লে নজর পড়ত। পড়ে থাকলে তো নজর পড়বে। শ্রীল মধুসূদন গোস্বামী মহাশয়ের শেষ কথা।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যতত্ত্ব-প্রকাশনী সভা। তাতে অনেকেই ছিলেন সব। শ্রীমনমহাপ্রভুর মন্ত্র নিয়েই সভার উদ্দেশ্য। কুলদা মল্লিক ছিলেন, গোঁসাইজী এসেছেন, তাই গেলাম, নইলে সভা-সমিতিতে যাইনা। সেই সভাতে সব ওঠে, শেষ কথা বুড়োর মুখে (মধুসূদন গোস্বামী)—ওরে দুইলীলাই একজনেরই—বৃন্দাবন-লীলা রহঃলীলা, আলোচনায় আমার অধিকার কোথায়। পতিতপাবনের সঙ্গে একটু পরিচয় হ'লেই যথেষ্ঠ।—কথা হচ্ছে এই সাধন জগতে। আমরা পতিত, পতিতপাবন-পাদপদ্ম পর্য্যন্ত আমাদের যাওয়ার অধিকার। তারপরে তার ঘরকন্না দেখাতে হয় দেখাবে।

"সাধনসিদ্ধ যাঁরা তাঁদের নজর পড়ে সাধনভজনের দিকে। কৃপাসিদ্ধ যাঁরা তাঁদেরই দৃষ্টি পড়ে পতিতের দিকে,…অমনি পড়েছিলাম। নরকের চিত্র দেখছেন (বড় বাবাজী মহাশয়)

দর্জিপাড়ায় বসে। সে ছবি নয়, তাঁর ভোগ হচ্ছে। সব দেখা যখন হয়ে গেছে, আর সামলাতে পারেন না, হু হু করে কান্না। কে তোমায় পতিতপাবন বলে'—নিতাইয়ের ওপর জুলুম হচ্ছে, "কে বলে দয়াল! তুমি পতিতপাবন থাকলে কখনো পতিতের দুঃখ হয়? নিতাই আমি পরম নারকী, আমায় উদ্ধারিতে নার কি? আমি তো একলা নই আমাকে তুলতে গেলে অনেককে তুলতে হবে। আমার মতো আর একজন থাকিলে আমি তার কাছে যাব; আমার যে তাই স্বভাব তোমার কাছে যাব কেন? সেই কৃপা সিদ্ধ না হলে পতিতের দিকে নজর আসে-না। এসব দেখা গেছে, সব শোনা গেছে, সব কথারই সুর এক।

এতদূর বলিয়া একটু চুপ করিলেন, তারপর আবার বলিতে লাগিলেন—

"প্রতিক্ষণেই আনন্দ, উচ্ছ্বাস বিকাশ হ'লেই তুমি কেউ নও, তোমার অবস্থা এই "তুমি নাম করতে পার না।" (এই সব বলিয়া বড় বাবাজী উপদেশ দিতেন) এই সবই তো বাঁচিয়ে রেখেছে। (তাঁর নাম-প্রসঙ্গ আলোচনা কর। নজর যাদের ওপর পড়েছে তাদের কৃপা।"

ডাক্তার বলিলেন—"তোমার সঙ্গীর সঙ্গ, তার সঙ্গ।

বাবাজী মহাশয়—এই সূত্রে পড়তে পারলে তবে তো।

ডাক্তার—কৃপা যত নীচে যাবে তত তার শক্তি বাড়ে।

বাবাজী মহাশয়—কালকে কথা হচ্ছিল কটকে বসে; আনন্দবাবুর চরিত্র যা চরিত-সুধায় আছে, নবদ্বীপ দাদার কৃপা;—তাই পাঠ হ'ল। সব সাজানো আছে, সে দিকে নজর পড়লে মানুষ কৃতার্থ হয়ে যায়। ভক্তির বসতি যে রাজ্যে, দৈন্য হচ্ছে তার আসন। বাবাজীদের গোফার হিসেব আছে তো। মাথা নীচু কর-তো, যাও, সেখানে উঁচু ক'রে যাবে তো ঠোকা খেতে হবে"।—

প্রায় ঘণ্টাকালব্যাপী অজস্র উপদেশের ধারায় পথে চলিবাব কৃপা-শক্তি সঞ্চার করিয়া উপস্থিত ভক্তবৃন্দের হৃদয় ভরাইয়া দিয়া শ্রীলবাবাজী মহাশয় চুপ করিলেন। ভক্তবৃন্দও শ্রীগুরুদেবের কৃপামুখী বাণী শ্রবণে আশ্বস্ত হইয়া আপন আপন স্থানে নিস্তব্ধে বসিয়া আছেন। এতক্ষণ কথা বার্ত্তার অন্তে এই শান্ত স্তব্ধতা সমগ্র দৃশ্যটিকে অপূর্ব্ব এক মাধুর্য্যে পরিপূর্ণতা দান করিল। সকলেই শ্রীগুরুদেবের অযাচিত কৃপা ভোগ করিলেন—"ভালবাসার প্রাণ, ভালবাসা দিয়েই বাঁধিতে চান" এ কথা ব'লে বুঝাবার নয়, প্রাণে প্রাণে অনুভবের নিধি।

রাত হইয়াছে। বাবাজী মহাশয়ের প্রসাদ পাওয়ার সময় হইয়াছে, সেবক নন্দদাসের কথায় বাবাজী মহাশয় ধীরে ধীরে উঠিয়া গেলেন। আজিকার প্রসঙ্গ সমাপ্ত হইল।

—০—

৪ঠা কার্ত্তিক, বুধবার, ১৩৬০ সকাল ৭টা শ্রীপাঠবাড়ী আশ্রম।

শ্রীগুরুদেব সকাল বেলার দর্শনাদি সারিয়া নিজের ঘরের বারান্দায় গিয়া দাঁড়াইয়াছেন। এমন সময় একটি গেরুয়া বেশধারী সন্ন্যাসী ঠাকুর শ্রীগুরুদেবের সম্মুখে নীচের উঠানে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিতে শ্রীগুরুদেব অমনি সঙ্গে সঙ্গে প্রতি প্রণাম করিয়া হাটু গাড়িয়া বসিয়া রহিলেন, এদিকে সন্ন্যাসী ঠাকুর সাষ্টাঙ্গেই পড়িয়া আছেন আর উঠেন না—তদ্দর্শনে শ্রীগুরুদেব পুলকাশ্রু ও কম্পিত স্বরে "জয় গুরু" জয় গুরু" বলিতে লাগিলেন। একে ত সন্ন্যাসী ঠাকুরের গেরুয়া বসন—যা দেখে শ্রীগুরুদেব প্রথমেই ভোগের প্যাথারে ডুবেছেন, তদুপরি সন্ন্যাসীর দৈন্য-দর্শনে ভাবের তরঙ্গ উচ্ছলিত হইয়া পড়িয়াছে। পূর্ব্বেও অনেকবার শ্রীগুরুদেবের সঙ্গে অনেক সন্ন্যাসী-মিলন দর্শনের সৌভাগ্য হইয়াছে কিন্তু আজ এ সন্ন্যাসী মিলনে একাধারে বিচিত্র ভাবের তরঙ্গে ভাসিয়া কখনও বা ডুবিয়া যাইতেছেন কখনও বা "হা নিতাই! হা গৌর! স্মরণে পুলকাশ্রু-কলেবরে অঝোরে ঝুরিতেছেন। শ্রীগুরুদেব সেইরূপ হাটুগাড়া অবস্থায় জোড়করে নয়ন মুদে আছেন, অজস্র অশ্রুধারায় বুক ভাসিয়া যাইতেছে, সর্ব্বাঙ্গ বিশেষভাবে ঘন ঘন কাঁপিতেছে, বোধ হইতেছে যেন শ্রীগুরুদেবের শ্রীঅঙ্গ হইতে চারিদিকে একটি জ্যোতিঃ ছড়াইয়া পড়িতেছে।

এইখানে পূর্ব্বে শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখে শুনা তার নিজের ভোগের কথা মনে পড়িল। শ্রীগুরুদেব বলিতেন "গেরুয়া-বেশধারী সন্ন্যাসী দেখে যদি নিতাই-গৌর মিলন ভোগ না হয় তবে সন্ন্যাসী দেখা মিছে।" শ্রীগুরুদেবের ভোগের তাৎপর্য্য এই :— গেরুয়া সন্ন্যাস বেশটি নিতাই, আর সন্ন্যাসী-স্বরূপটী "গৌর"। আজ সন্ন্যাসী দর্শনে নিতাই গৌরের গুপ্ত-মিলন ভোগ, তদুপরি সন্ন্যাসীর দৈন্যে শ্রীগুরুদেবের ভোগের প্রাচুর্য্য বাড়াইয়াছে। অনেকক্ষণ পর সন্ন্যাসী ঠাকুর উঠিয়া আত্ম-সমর্পণের অভিপ্রায়ে করজোড়ে শ্রীগুরুদেবের সম্মুখে অতীব নত ও মুখাপেক্ষী হইয়া দাঁড়াইলেন; শ্রীগুরুদেবও তখন তদুচিত সম্মান ও প্রীতিভরে মৃদু-মধুর হাসিয়া সন্ন্যাসী-ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন— "কোথা হতে আসা হোলো"? সন্ন্যাসী ঠাকুর বল্লেন—ভগবান-গোলা থেকে; কি সর্ব্বনাশ! একেই শ্রীগুরুদেব ভাব-সমুদ্রের তরঙ্গে হেলে দুলে ভাসিতেছেন, কখনও ডুবিতেছেন, তদুপরি আবার "ভগবান-গোলা" শব্দটী শুনার সঙ্গে সঙ্গে ভাবে বিভাবিত হইলেন। তৎপরে এক সেবককে বলিলেন—বুড়োকে ডাক

শ্রীগুরুদেবের মনোভাব বুঝিয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-মিশনের এক প্রিয় সেবক, বৃদ্ধ

শ্রীভূতনাথজীকে কাছে ডেকে আনিল। শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখ হাসি হাসি, প্রচুপ ভোগ-জনিত-আনন্দের চাপে কণ্ঠরোধ-হেতু কিছু বলিতে চেষ্টা করিলেও অস্পষ্ট ভাষার বক্তব্যগুলি ভাল ধরা যাইতেছে না, নিজেও তাহা বুঝিতেছেন, মাছে মাঝে কণ্ঠ শোধন করিয়া লইতেছেন। কয়েকবার চেষ্টার পর বেশ স্পষ্ট সুরে বলিলেন, "দেখ রামচন্দ্র কবিরাজ ও ঠাকুর মশাইর মিলনস্থল ও কবিরাজের বাসস্থানের নাম আগে বুধরী ছিল, তারপর ঐ স্থানের নাম ভগবান-গোলা হোল কেন জান? বুড়ো এবং সকলেই শ্রীগুরুদেবের তাৎকালিন অবস্থা দর্শনে কিছু বলিবার সাহস না হওয়ায় নিঃশব্দে শ্রীপাদের শ্রীমুখপানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে। এই সময় শ্রীগুরুদেব তাঁর এক প্রিয় ভক্ত কলিকাতা হাটখোলা-নিবাসী শ্রীমাখন লাল সাহার পানে চাহিয়া বলিলেন—তুমি অবাক হচ্ছ কেন? এত তোমাদের দেশেরই কথা, পূর্ব্ববঙ্গে সবাই জানে, ও দেশে গোলা, শব্দ খুব চলতি, বলে না? ধানের গোলা, সরষের গোলা, তার মানে, ধান সরষে যেখানে মজুত থাকে, মজুত গুদাম, সাদা কথায় ভাণ্ডার, তবেই হোল "ভগবান-গোলা মানে ঐ-খানে ভগবান মজুত আছেন। ভগবান সম্পত্তির ওরা মহাজন, ওদের কাছে ভগবান মজুত আছেন।" শ্রীগুরুদেবের স্নানের সময় হয়েছে, তৈল-সেবা- উপলক্ষে শ্রীঅঙ্গ-সেবার আনন্দাবেশে কেহ কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিতেছে শ্রীগুরুদেবও তাদের প্রশ্নের সমাধান করিতেছেন। কথাপ্রসঙ্গে পূর্ব্ব আবেশের ঘোরেই বলিলেন "দেখ কোন ধামে যাওয়া খুব সাবধান, ধামের মালিক যাঁরা তাঁরা যদি টেনে নেয় তবে আর ভয় নাই। আগে শ্রীবৃন্দাবন যাওয়ার আকর্ষণ পড়লে বুকটা আনন্দে ভয়ে যেত, অবিচারে চলে যেতাম, কেন জান? কি বলব বল, সাক্ষাৎভাবে যারা সমস্ত অপরাধ থেকে রক্ষা করতেন আর ডেকে নিয়ে কিছু দিয়ে দিতেন, এখন তাঁরা সব গা ঢাকা দিয়েছেন, তাই এখন ধামে যেতে ভয় হয়। বলতে কি এই হচ্ছে ব্যবসার হিসেব, ব্যবসায়ে লোকসানের পথ জেনে তা থেকে যারা সাবধান থাকে তারাই পাকা ব্যবসাদার, তাদের কাছে ব্যবসা শিখতে হয়। ব্যবসায় ২।৪ বার লোকসান না হোলে তারা ব্যবসায়ে সাবধান ও ব্যবসাদার হতে পারে না লোকসানের পথ যারা বন্ধ করতে জানে পরে তারাই পাকা মহাজন হয়। মহাজনের অনুগত্যে থাকলে ভয় নাই, ও সব দায় তাদের। প্রসঙ্গক্রমে মহাত্মা গৌর কিশোর দাস বাবাজী মহারাজের কথা উঠিতে আমাদের একটী ভাই জিজ্ঞাসা করিলেন—উনি কি জাত ছিলেন? শ্রীগুরুদেব শুনে বলিলেন—কি? জাতি? জাতি নিয়ে টানাটানি করে লাভ নাই, ও ত জাতির অর্থাৎ চলে যায় থাকে না, তবে হাঁ জাতির কথা যদি বল তবে "কৃষ্ণ-নিত্যাদাস" এই একটী মাত্র জাত, এ ছাড়া জাত টাত্ নেই বাবা! বলেই বলিলেন! তোমাদের আবার জাত্ কোথায়, তোমরা ত জাত্ হারা। জাতির কথা বলি, তবে শোন,

একদিন কর্ত্তার (বড় বাবাজীর) প্রসাদ পাওয়ার নিমন্ত্রণ যেন মনে নাই, হঠাৎ বল্লে উঠ্‌লেন—"ওগো সদানন্দের ওখানে শ্রীমহাপ্রসাদের নেমন্তন্ন, যেতে হবে চল সবাই।" সঙ্গীদের মধ্যে কে যেন বল্লে—"এতক্ষণ পঙ্গত শেষ হয়ে গেছে", শুনে কর্ত্তা বল্লেন—বেশ ত সে আরোও আনন্দের কথা। এখন তবে আমাদের স্বজাতীয় পঙ্গত হচ্ছে (অর্থাৎ ফেলা পাতায় কুকুরের দল পাতা চাটিয়া খাইতেছে) ভালই হয়েছে আমরা আমাদের স্বজাতির সঙ্গে মিলে প্রসাদ পেয়ে ধন্য হব।

ভক্ত—স্বজাতি কি রকম?

উত্তর—আর কি "কৃষ্ণ দাসত্ব" জীবের স্বরূপ, আজ তোমরা স্বরূপ, স্বভাব, কর্ত্তব্য দাস-অভিমান সব ভুলে গেছ, আর ঐ পশু আবরিত স্বরূপে লক্ষ্য করে দেখ, ভুলে যাওয়া ত দূরের কথা দাস-স্বরূপের স্বভাব ও কর্ত্তব্য পুরোমাত্রায় বিকাশ। প্রতিষ্ঠার ভয়েই যেন আত্মগোপন ক'রে যত মহাপুরুষেরা, সিদ্ধ মহাপুরুষদের সঙ্গ করে জীব শিক্ষার জন্য, দাস্য ধর্ম্মের চরম আদর্শ স্মরণ করাচ্ছে। যা তোমরা মানুষ হয়ে হারিয়ে ফেলেছ, পুনরুদ্ধার করা কঠোর ভজন সাপেক্ষ। কিন্তু পশু স্বরূপে তার সহজ ও পূর্ণ বিকাশ।

তারপর শ্রীগুরুদেব বলিলেন—

কাগজ কলম নিয়ে এস, যা বলি লেখ, কথাত আমার নয়, যা শুনেছি তাই বলি। গোবিন্দ-দাকে রাধাকুণ্ডে বাসের আদেশ করলেন, গোবিন্দ! রাধাকুণ্ডে বাস করবে, চারিদিকে ঝাড়ু কার্য্য করবে, (বনমালি রায় বাহাদুর তখন বাস করতেন রাধাকুণ্ডে) রাজন্নাদি স্থূল ভিক্ষা গ্রহণ ক'রো না গ্রহণ ক'রতে দিও না। মাধুকরী বৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করবে। বৈষ্ণব সাজিও না, সাজাইয়া দিও না, কাঙ্গাল হইয়া কাঁদিতে থাকে, (এই সব দশার কাঙ্গাল হওয়া)।

কয়েক দিন ধরে কথাটা কেবল মনে আসছে, কাব্যতীর্থের দীক্ষার দিন, গোষ্ঠাষ্টমীর দিনে, দীনেশ তখন ছোট, তিনুও তখন শিশু, সখীর (শ্রীললিতা সখী) উপর কটাক্ষ ছিল, একি, সাজ গোজ কেন, দিদির খুব দুঃখ ছিল, পণ্ডিত, অভিমান খুব, এদিকের কিছু পেল-না। দিদি আমাকে বলেছিল, একটু তোমরা জানাও যাতে এদিকে আসে, কর্ত্তা তখন বাগানে রয়েছেন। রায় বাহাদুরের দীক্ষার আগের দিন এসে উপস্থিত, দেখা নবদ্বীপদার সঙ্গে, সে একেবারে ভিজিয়ে দিয়েছে, পরের দিন এসেছে, পাঠের ব্যবস্থা হলো, আমরা চলে গেলাম নাম নিয়ে। আসিলাম পাঠ তখন শেষ হয়েছে, কর্ত্তা এককোণে বসে আছেন, নিউমোনিয়া, নাম খুব আরম্ভ হয়েছেন।

শ্রীগুরুদেবের স্নানের পর সকলে প্রণাম করিয়া বাহিরে আসিলেন।

---

১৩৬০ সাল, ৯০ই অগ্রহায়ণ পাঠবাড়ী আশ্রম রাত্রি ৮-৩০—৯-১৫।

শ্রীগুরুমুখ-পদ্মবাক্য হৃদয়ে করিয়া ঐক্য
আর না করিহ মনে আশা।
শ্রীগুরুচরণে রতি সেই সে উত্তমা গতি
যে প্রসাদে পূরে সর্ব্ব আশা।" [ প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা ]

কলিকাতা মহানগরীর সন্নিকটবর্ত্তী পুণ্যতোয়া ভাগীরথী তীরে পুণ্যভূমি বরাহনগর—শ্রীপাটবাড়ী শ্রীমন্মহাপ্রভুর নৃত্যের-স্থান। ব্যাসাবতার শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর "শ্রীচৈতন্য ভাগবতে" অন্ত্যখণ্ডে ৫ম অধ্যায়ে বলিয়াছেন—

"তবে প্রভু আইলেন বরাহনগরে।
মহা-ভাগ্যবন্ত এক ব্রাহ্মণের ঘরে॥
সেই বিপ্র বড় সুশিক্ষিত ভাগবতে।
প্রভু দেখি ভাগবত লাগিলা পড়িতে॥
সেহো বিপ্র পড়ে পরানন্দে মগ্ন হৈয়া।
প্রভু ও করেন নৃত্য বাহ্য-পাসরিয়া।
এই মত রাত্রি তিনি প্রহর অবধি।
ভাগবত শুনিয়া নাচিলা গুণনিধি॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শুভাগমনে পরমারাধ্য শ্রীপাদ বাবাজী-মহারাজ ভাবাবেশে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিত্য নৃত্য-লীলার কথা কীর্ত্তন-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

"আজিও নাচিছে প্রাণ গৌর"।

ত্রিকাল-সত্য-লীলায়—আজিও নাচিছ প্রাণ গৌর॥"

ত্রিকাল-সত্য-লীলায় ভাগবতাচার্য্যের ঘরে — আজিও নাচিছ প্রাণ গৌর

"ভাগ্যবান জনে দেখিছে।"

এ-ত অনুমান নয় প্রত্যক্ষ প্রমাণ। যিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর সে-নৃত্যলীলা দেখিয়াছেন, শ্রীভাগবতাচার্য্যের সেবিত সেই শালগ্রাম-শিলা শ্রীমন্দিরে আজও বিরাজমান, অদ্যাপিও সেই লীলার সাক্ষী দিতেছেন। আজও নাচিছে প্রাণ গৌর। সে-নৃত্যরঙ্গ তিনি দেখিতেছেন। মহদনুভবেই সে-লীলার নিত্যত্ব প্রতীতি হইতেছে।

এই শ্রীপাটবাড়ীতে শ্রীপাদ বাবাজী-মহারাজ বৎসরাধিক-কাল স্থায়ীভাবে অবস্থান করিতেছেন, এ-সময় নাম-কীর্ত্তন-প্রসঙ্গে অন্যত্র গমনাগমন নাই। সদাই নামানন্দে মগ্ন থাকেন।

শ্রীপাদ বাবাজী মহাশয়ের নিত্য সান্ধ্য পাঠ অনেকক্ষণ শেষ হয়েছে। নাটমন্দিরে পণ্ডিত (শ্রীযুক্ত গোবিন্দ চন্দ্র শাস্ত্রী) মহাশয়ের পাঠ হয় তা'ও সাঙ্গ হয়েছে। বাবাজী মহাশয় তাঁর বসবার আসনে বসে আছেন, কিয়দ্দূরে সতরঞ্চি পাতা, সেখানে ভক্তবৃন্দ। কোন একজন গুরু ভাই নাটমন্দিরে গান করছেন উচ্চৈঃস্বরে। খানিকক্ষণ পর বাবাজী মহাশয় বললেন—

"গানই হচ্ছে, গানের ফল দেখলে সুখ পাওয়া যায়। কাল চান করবার সময় নন্দ এসেছিল, তারা একখানা পুঁথি পেয়েছে—মুরলিবিলাস। সাধারণে প্রচার নাই, বাগনাপাড়ার বিবরণ। তাতে, কথায় কথায় বললে—মহাপ্রভুর অপ্রকটের কথা আমাদের মতের অনুরূপ—গোপীনাথ মন্দিরে। সেই পুঁথিটি আমাদের ছাপানো চাই।

'জাহ্নবামায়ের কথা—অপূর্ব্বলীলা। বীরচন্দ্র প্রভু শান্তিপুর যাচ্ছিলেন, মার ওপর রাগ করে। ও মা'র কাছে মন্ত্র নেব না। মা তো আমাকে ভালবাসে না, কোথাকার কাকে ভালোবাসে। চলে গেলেন শান্তিপুরে সীতা দেবীর কাছে মন্ত্র নিতে। যশোরায় (জগদীশ পণ্ডিতের কাছে) আদেশ হ'ল, শীঘ্র যাও বীরভদ্র মায়ের ওপর রাগ ক'রে শান্তিপুর যাচ্ছে, তাকে ফেরাও। গঙ্গাতীরে গিয়েই দেখে, একখানা নৌকা যাচ্ছে। উচ্চৈঃস্বরে ডাকলে—"কী? কোথায় যাচ্চ" তীরে আসতেই "তুমি তোমার তোমার মাকে চিনতে পার নাই"। ফিরে এলো। মা ছেলের দুঃখ নিবারণের জন্য খাবার জোগাড় করছেন। খেতে বসেছেন, পরিবেশন করতে করতে মায়ের মাথার কাপড় খুলে গেছে, পড়ে যেতেই আর দু'হাতে উঠিয়ে নিলেন। ইনি তো অবাক।

এতদুর বলে বাবাজী মহাশয় চুপ করলেন। ক্ষণকাল পরে ধীরে ধীরে নিজের শ্রীগুরুদেব শ্রীপাদ শ্রীরাধারমণ চরণ দাস বাবাজী মহারাজের সঙ্গে প্রথম মিলনের কথা বললেন—

বাবাজীর (বড় বাবাজী মহাশয়) সঙ্গে প্রথম যে দিন দেখা—পাল গোবিন্দের বাড়ি বসে ছিল, আরো অনেকে ছিল। ওই মোড়ে দাঁড়িয়ে—ভাই রাম! একটি গান গাও তো। সেদিন ওই নামই হয়েছিলো—"হরি বলরে ভাই গদাধর গৌরাঙ্গ বসু জাহ্নবা নিতাই। বসু জাহ্নবা নিতাই সীতা অদ্বৈত গোঁসাই।"

পণ্ডিত মহাশয় (শ্রীযুক্ত গোবিন্দ চন্দ্র শাস্ত্রী)—উচ্চারণ করলেই আনন্দ।

বাবাজী মহাশয়—হ্যাঁ উচ্চারণ করতেই ভালো লাগে। বড় দুঃখের কথা, খড়দা কী জায়গা তার হিসেব নাই। আচার্য্য প্রভু, ঠাকুর নরোত্তম এই খানেই কৃপা পেয়েছেন। এ সবের অনুশীলন কৈ? ঐ নাম প্রসঙ্গে নিতাইয়ের কথা এসে গেল, খুব সুখ হয়ে ছিল। ত্রিকাল সত্য লীলা, তা'হলে নিতাই এখনো আছে। প্রমান কি? প্রমাণ তো পড়ে আছে। প্রচারের কালে তিন শক্তি নিয়েই কাজ করতে হয়েছে—মস্তকে ত্রিপুরা সুন্দরী, ঝোলায় নীলকণ্ঠ, বক্ষে অনন্তদেব। অঙ্গী অঙ্গে তো ভেদ নাই। অঙ্গী যেখানে যাচ্ছে অঙ্গও সে সেখানে যাচ্ছে,

ভারী আনন্দ হয়ে ছিল। খড়দা যে কি ভূমি এ কারো ভোগ নাই।"

বাবাজী মহাশয় আবার জনৈক খড়দহবাসীর সঙ্গে তাঁর একবার কী কথা হয়েছিল সেই প্রসঙ্গ তুললেন—

খড়দহবাসী—'রামদা! তুমি কলকাতায়, যাক, খড়দা যাওনা কেন।

বাবাজী মহাশয়—তোমরা খড়দাবাসী, তোমরা বাস করছ। খড়দা ভাই আমাদের উপাসনা-স্থান। কলকাতার কাছে হ'লে কী হয়? যদি কৃপাক'রে টেনে নেয় তবে ত?

এমন সময় ব্রহ্মচারীদা (শ্রীজীবন কৃষ্ণ দাস) যেই বলতে গিয়েছেন—অপ্রকটের কী কথা আছে..........বাবাজী মহাশয় অমনি জলদগম্ভীরস্বরে ভৎসনার সুরে বলে উঠলেন—

"ও সব খবর রাখ কেন? বাজে কথা, আমাদের ঠাকুর অপ্রকট হয় নাই। আর, প্রকট অপ্রকট কথা তো প্রকাশ অপ্রকাশ।"

ডাঃ শ্রীযুক্ত গণপতি ঘোষ—প্রপঞ্চ-নয়ন-গোচর হ'লেই প্রকট, না হ'লে অপ্রকট।

পণ্ডিত মহাশয়—তুমি মাতৃগর্ভে থেকে জগৎ দেখতে পাচ্ছ না, তাই ব'লে জগৎ নাই, তাতো নয়।

বাবাজী মহাশয় ব্রহ্মচারীদার কথাটি লক্ষ করেই পুনরায় বললেন—

"ও-সব কথা আলোচনা করো না, ভালো লাগে না।

রাত প্রায় শোয়া নটা হয়েছে, বাবাজী মহাশয়ের প্রসাদ পাওয়ার সময় হয়েছে, সেবকবৃন্দ সে কথা জানাইতেই বাবাজী মহাশয় রেগে উঠেছেন। ছেলে যখন থাকে খেলায় মেতে, মা খেতে ডাকলে তার-রাগ কত! তা শুনলে তো মায়ের চলে না, ছেলের শরীরটি তাঁর প্রধান লক্ষ্যণীয়।

বাবাজী মহাশয়ের এই রাগটিও বড় উপভোগ্য। সেই রাগের সুরেই কিন্তু বললেন একটি চরম সত্য কথা—বলছে, "খাও খাও কী খেয়ে মানুষ বাঁচে।"

তখন শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মহাশয় ও শ্রীনিতাই রমণ দাস বাবাজী (মাধাইতলা) শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখ-নিঃসৃত প্রেমের কথা-শ্রবণে অনুভবে সুখ দিতে ভাবে আবেশভরে বলিলেন—

"সেই হরি নামামৃত বিনে, খায় যদি অন্নপানে
তবু ভক্তের দুর্বল জীবন"॥

তাই শাস্ত্র বলেন—"হরি-গুন-কীর্ত্তনং হি আত্মনোঘাসঃ"।

অর্থাৎ—শ্রুতিতে নির্দ্দেশ করিয়াছেন—"হরিগুন কীর্ত্তনই আত্মার খাদ্য। হরিনাম গ্রহণেই আত্মার পুষ্টি সাধন হয় ও সুপ্রসন্নতা জন্মে। দেহাতিরিক্ত আত্মা চিৎ-জাতীয়

বস্তু। যে খাদ্যে দেহের পুষ্টি সাধন হয় সে খাদ্যে আত্মা পুষ্ট হয় না। তাই ভগবান দয়া করিয়া "হরিনাম" দিয়াছেন।

নিত্য লীলানুরক্ত পরমকরুণাময় শ্রীগুরুদেব বিশেষ করুণা পরবশ হইয়া নিজ-অনুগত জনদিগকে কথার ছলে শিক্ষা দিতে বলিলেন—

**"হরিনাম-সংকীর্ত্তনেই আত্মার সুপ্রসন্নতা জন্মে; অতএব হরি-নাম-গ্রহণে পরম যত্নবান হও।**

সর্ব্বপ্রকার সাধন-মার্গের লক্ষ্য "আত্মোপলব্ধি" বা আত্ম-স্বরূপে স্থিতি। শ্রীশ্রীনিতাই-গৌর-গত-প্রাণ বৈষ্ণবাচার্য্যেরা বলেন যে, কেবল জ্ঞান, কর্ম্ম, যোগ লইয়া যুগ যুগ চেষ্টা করিলেও আত্মোপলব্ধি বা আত্ম-স্বরূপে অবস্থিতি লাভ হয় না। এই ঘোর কলিযুগে একমাত্র শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-প্রসাদেই শুদ্ধ প্রেম-ভক্তি-পথে হরিনাম-গ্রহণে শ্রীশ্রীনিতাই-গৌর-চরণে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণেই অত্মোপলব্ধি পরিপূর্ণতা লাভ করে বা আত্মার সুপ্রসন্নতা জন্মে। ইহাতে সন্দেহ নাই।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীপাদ বাবাজী মহারাজ ভাবাবেশে "নাম-মহিমা" কীর্ত্তন প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

**"কলিযুগোচিত এই নাম ধর্ম্ম**
**এযে বেদের নিগূঢ় মর্ম্ম—কলিযুগোচিত এই নাম ধর্ম্ম।**
**চারি বেদে চৌদ্দ শাস্ত্র আঠার পুরাণ তন্ত্র**
**গীতা আদি করিয়া মন্থন।**
**এই হরে কৃষ্ণ নামের প্রকাশ।**
**এই নাম বই আর সাধন নাইরে।**
**পরিপূর্ণ কৃষ্ণ প্রাপ্তি করতে—এই নাম বই আর সাধন নাইরে।"**

জীব! কোন দিকে না তাকাইয়া কেবল হরিনাম করিতে থাকিবে, দেখিবে—

**"নামের গুণে মরুভুমে ডাকে বান।"**

তাই সাধক প্রেমানন্দে নৃত্য করিতে করিতে গাহিয়াছেন—

**"হরিনাম কি মধুর নাম।**
**নাম শুনে যে জুড়াল রে প্রাণ॥**
**ও সে হরিনামের মোহন গুণে গলে যায় কঠিন পাষাণ।**
**আর বলব কি, সে নামের গুণে মরুভুমে ডাকে বান।"**

আমাদিগের স্থায় বিষয়ান্ধ জীবের হরি নামই পরমাবলম্বন। আমাদের স্থায় ভক্তি-হীনের জন্য, আমাদের স্থায় অপরাধীর জন্য, আমাদের স্থায় কলি-কবলিতের জন্য, আমাদের স্থায় পতিত পাতকীর জন্য, ভগবান্ দয়া করিয়া হরিনামের চিদানন্দময় সুধা আনিয়াছেন? তাই বলি—সমস্ত ভয় ভাবনা তুচ্ছ করিয়া, অধিকার অনধিকার বিস্মৃত হইয়া, সাধের মানব জন্মকে সফল করিবার জন্য আসুন, পরম করুণাময় শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে সকলে একবার বদন ভরিয়া বলি—

"ভাগবতাচার্য্যের ঘরে—প্রাণ গৌর নাচে প্রেম ভরে ॥"

শ্রীগুরুদেবের মধুময় সঙ্গ-সুখে প্রসঙ্গ সমাপ্ত হইলে ভক্তবৃন্দ শ্রীগুরু পাদ-পদ্মে প্রণাম করিয়া উঠিয়া গেলেন।

—•—

গৌর হরিবোল ! গৌর হরিবোল ! গৌর হরিবোল !